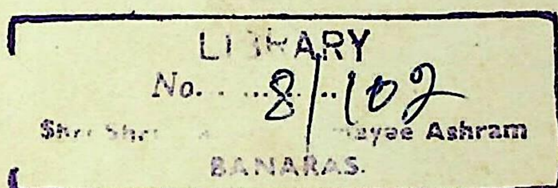
ঈশ্বরসূত্র

অধ্যাত্মবিজ্ঞান



স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী

শ্রীঅমলশংকর সরকার



ঈশ্বরসূত্র

অধ্যাত্মবিজ্ঞান



স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক—অধ্যাপক শ্রীদেবিদাস বসু, এম্-এস্সি, পি-এইচ্-ডি (ডাব্লিন)
৮বি ডাফ্ লেন্, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৬৭ সাল

প্রধান প্রাপ্তিস্থান :—

মহেশ লাইব্রেরী
২-১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-১২

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান :—

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিমিটেড্
৫৪-৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬

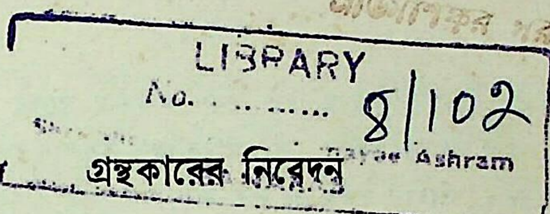
এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

মূল্য দশ টাকা

টেম্পল প্রেস, ২, ন্যায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪ হইতে
শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আমার গুরুদেব
শ্রীশ্রীস্বামী কিরণচাঁদ দরবেশপ্রভুজীর
শ্রীচরণে

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥



গ্রন্থকারের নিবেদন

বর্ত্তমান কালে জড়বিজ্ঞানের প্রভুত বিস্তারের ফলে আধুনিক মানবের বুদ্ধি অতিশয় বিশ্লেষণপরায়ণ এবং বিচারশীল হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানী জড় বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার রূপ, গুণ, শক্তি, ধর্ম্ম এবং কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতেছেন। বিজ্ঞানী না হইয়া কেহ এইরূপে জড়বস্তু বিষয়ক জ্ঞান দিতে পারেন না। অধ্যাত্মতত্ত্বকেও বিশ্লেষণ করিয়া তাহার রূপ, গুণ, শক্তি, ধর্ম্ম ও কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতে হইবে, নতুবা আধুনিক শিক্ষিতসমাজে অধ্যাত্মতত্ত্ব উপেক্ষিত হইবার প্রবল সম্ভাবনা আছে। এইরূপ পন্থায় অধ্যাত্ম-জ্ঞান দান অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর দ্বারাই হইতে পারে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর ব্রহ্মবিষয়ে ভেদবুদ্ধি থাকে না; তাঁহার তত্ত্বদর্শী দৃষ্টিতে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আত্মা, ঈশ্বর এবং ভগবান, এবং তিনি যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ এবং সাকার ও নিরাকার। যাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞানী নহেন, তাঁহাদের ব্রহ্ম বিষয়ে ভেদবুদ্ধি থাকে; এইরূপ ব্যক্তিগণ ব্রহ্ম বিষয়ে ভেদবুদ্ধি লইয়া অতর্ক্য ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তর্কের দ্বারা বিচার করিয়া একটী নির্গুণ এবং একটী সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন এবং এইরূপ কল্পনামূলে এই অযথার্থ এবং অসম্ভব মতবাদ গঠন করিয়াছেন যে নির্গুণ ব্রহ্ম পরাতত্ত্ব, সগুণ ব্রহ্ম নীচ তত্ত্ব, এবং সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম বিষয়ে উক্তরূপ ভেদবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণই আপনাদিগকে অভেদবাদী বলিয়া ঘোষণা করেন! ইঁহারা আবার এই মত-বাদের প্রমাণে উপনিষদের বাক্য উদ্ধার করেন। কিন্তু উপনিষদের বাক্য-সমূহের নিগূঢ় অর্থ অধ্যাত্মবিজ্ঞানীই বুঝিতে পারেন; এইজন্য পূর্ব্বকালে অধ্যাত্মবিজ্ঞানী-গুরুর নিকট শিষ্য উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতেন এবং যোগসাধনার দ্বারা সেই উপদেশ ও অধ্যয়ন লব্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিবার পরে অধ্যাত্মবিজ্ঞানী হইয়া তত্ত্বোপদেশ দিতেন। ভাষ্য, অভিধান এবং ব্যাকরণের সাহায্যে উপনিষদের তত্ত্ব বোধগম্য হয় না, কেবল তর্ক এবং বাদানুবাদ হইতে পারে। তার্কিকগণের এই সকল তর্ক এবং বাদানুবাদ অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর নিকট ক্রীড়ামত্ত বালকগণের কলহের ন্যায় হাস্যকর বস্তু। তিনি তর্ক এবং কলহের উর্দ্ধে থাকিয়া তাঁহার সাধনলব্ধ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বলে

বিশ্লেষণ এবং বিচারের পন্থায় এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সগুণত্ব, নির্গুণত্ব, ঈশ্বরত্ব, এবং ভগবত্তা সম্বন্ধে ভেদদৃষ্টিবিবর্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞান দান করিতে পারেন এবং করেন ; তাঁহার প্রদত্ত এই সত্য জ্ঞান সকলেরই বোধগম্য এবং হৃদয়-গ্রাহী হয়।

"ঈশ্বর" শব্দে ঈশ্বরের যে পরিচয় অন্তর্নিহিত আছে তাহা, এবং ঈশ্বরই যে পরাতত্ত্ব তাহা প্রথমে বিশ্লেষণমূলক যুক্তিবিচার এবং শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। পরমেশ্বর কৃষ্ণ, তাহা কৃষ্ণ নামের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে সৎ, চিৎ, আনন্দকে বুঝিতে হইবে, কারণ ঈশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। এইজন্য সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই তিনটী মূল বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের স্বরূপ বিবৃত করা হইয়াছে। পরমেশ্বর কৃষ্ণ বেদবেদান্তের প্রতিপাদ্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল এবং সদ্‌গুরু, তাহাও প্রমাণ করা হইয়াছে। তাঁহার পরমানন্দস্বরূপের এবং গুরূশক্তির স্বরূপও বিশ্লেষিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার অপ্রাকৃত প্রকাশ এবং প্রাকৃত পরিণাম কেন হয় এবং কিরূপে হইয়াছে ও হইতেছে, প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বই বিশ্লেষণপূর্ব্বক আলোচিত হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে ধামতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব এবং বিশ্বসৃষ্টির বিবরণ স্বতঃই আসিয়া যায় এবং এই সকল বিষয়গুলিও বিশ্লেষণ ও বিচারের পন্থায় আলোচিত হইয়াছে। অবতারতত্ত্বের প্রসঙ্গে পরমেশ্বর কৃষ্ণের স্বয়ংরূপ অবতারের, বিশেষতঃ ব্রজলীলার, বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানযুগের সদ্‌গুরু-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুর তত্ত্বও বিবৃত হইয়াছে। সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছেন। মানবদেহ এবং মানবাত্মাকেও বিশ্লেষণপূর্ব্বক মানবদেহ কি বস্তু, মানবাত্মা কি বস্তু, আত্মার স্বরূপ কি এবং দেহাভিমান কি, দেহের ও আত্মার পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং পরস্পরের উপর ক্রিয়া কি, ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্ম কি, এবং মৃত্যুর পরে মানবাত্মার স্থিতি ও গতি কিরূপ তৎসমুদয় বিবৃত হইয়াছে। ভাব এবং ভাবাতীত ভাব কি, নির্ব্বিকল্প সমাধি এবং সবিকল্প সমাধি কি, এবং যে যোগসাধনার দ্বারা মানব ঈশ্বরের সহিত মিলন লাভ করিতে পারে, বিশ্লেষণপূর্ব্বক তাহারও প্রত্যেকটী প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই মিলনের আনন্দ কি এবং তাহার সম্ভোগ কিরূপ তৎসমুদয়ও বিস্তৃত-

রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সহিত জড়বিজ্ঞানের কোন দ্বন্দ্ব নাই, তাহাও আলোচনাসমূহের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু ডারুইনের জীবোৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ অযথার্থ অনুমানমাত্র, তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। অন্য বহু বিষয়ও গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

আমার উপর শ্রীগুরুর আদেশ হইয়াছিল, দ্বন্দ্বক্লিষ্ট মানবকে তাঁহার "কৃপাশান্তি" শুনাইবার জন্য। আমাকে যন্ত্র করিয়া, আমার হস্তে লেখনী ধরাইয়া, তাঁহার কার্য্য তিনিই করিয়াছেন। এই গ্রন্থপ্রণয়নে এই যান্ত্রিকতা ব্যতীত আমার কোন কৃতিত্ব নাই। এই গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আমার যান্ত্রিকতা সফল হইবে।

গ্রন্থে কতকগুলি মুদ্রণ প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে। যতগুলি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সংশোধন করিয়া একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজিত করা হইল।

গ্রন্থপ্রণয়ন সম্পন্ন হইবার পরে বারাণসীতে অবস্থানকালে, বরাণসী গভার্ণ-মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধুনা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ, ডি-লিট্ মহোদয়কে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়িবার জন্য দিয়াছিলাম। তিনি ইহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গ্রন্থের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থটীর মুদ্রণকালে ভূমিকা লিখিয়া দিতে সম্মত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থটী কলিকাতায় মুদ্রিত হওয়ায় মুদ্রণকালে আমার পক্ষে কলিকাতা হইতে বারাণসী যাওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাঁহার দ্বারা ভূমিকা লেখাইয়া আনিতে পারি নাই। তিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রশস্তিরূপে প্রকাশ করিলাম। তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা গভার্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীঅধরচন্দ্র দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী, তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভূমিকা এবং অভিমত লিখিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমার বি-এ, এম্-এ, এবং বি-এল্ অধ্যয়নকালের দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের সহপাঠী সহোদরপ্রতিম বন্ধু এবং এক্ষণে আমার গুরুভ্রাতা, গয়ার সরকারী

উকিল শ্রীঅম্বুজাক্ষ ঘোষ এম্-এ, বি-এল্, এই গ্রন্থপ্রণয়নকালে তাঁহার গৃহে আমায় কয়েক মাস থাকিতে দিয়া এবং তাঁহার গ্রন্থাগারের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ আমায় ব্যবহার করিতে দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। এজন্য আমি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমার দেহের জন্ম হইয়াছিল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গোপালবেড়া নামক গ্রামে। সেই জন্মসম্পর্কিত আমার পূর্ব্বাশ্রমের দাদা, কলিকাতার এড্ভোকেট্ শ্রীনলিনচন্দ্র বসু এম্-এ, বি-এল, মহাশয় এই গ্রন্থখানির মুদ্রণব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারই পুত্র, আমার পরম স্নেহাস্পদ ক্যাপ্টেন্ শ্রীকমলকুমার বসু স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছায় এই গ্রন্থমুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিয়া স্বীয় স্বভাবসুলভ ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছে।

আমার পূর্ব্বাশ্রমের অন্যতম দাদা, অধ্যাপক শ্রীব্যোমকেশ বসু এম-এ, বি-এল্, এবং স্বর্গীয় বড়দাদা শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম্-এ, বি-এল, মহাশয়ের দুই পুত্র, আমার পরম স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীদেবিদাস বসু এম্-এস্সি, পি-এইচ্-ডি (ডাব্লিন্), এবং শ্রীদুর্গাদাস বসু এম্-এ, ডি-ফিল্ (অক্সফোর্ড), এই গ্রন্থখানির মুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যাপারে আমায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

কাগজ এবং মুদ্রণ উভয়ই অতি উচ্চমূল্য হওয়া সত্ত্বেও, এই গ্রন্থখানি যাহাতে সকলের পক্ষে সুলভ হয় তজ্জন্য স্বল্প মূল্যই নির্দ্ধারিত করা হইল।

কলিকাতা,
১৪ই চৈত্র, সন ১৩৬৬ সাল

বিনীত
নিখিলানন্দ

প্রশস্তি

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

Mahāmahopādhyāya
Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.

2/A Sigra,
Banaras

১৬-৮-৫৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত "ঈশ্বরসূত্র" নামক অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি মোটামুটি দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি। বহু পরিশ্রম, অধ্যয়ন ও আলোচনার ফলে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে মনে হয়। ইহা চিন্তাশীল ও ভক্ত সাধকের পরমাত্মতত্ত্ব মননের সহায়ক হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। গ্রন্থখানি শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইলে ভাল হয়।

আশা করি কুশলে আছেন।

নিঃ
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজঃ

অভিমত

স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতীর "ঈশ্বরসূত্র" বইখানি পড়লুম। বইটীর সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করছি। ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে লেখক অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন। সে আলোচনায় ব্যাপ্তি এবং গভীরতা দুই-ই আছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

এই শ্লোকটীকে নিয়ে লেখক তাঁর গ্রন্থের মূল অংশের (প্রথম থেকে একাদশ) অধ্যায় বিভাগ করেছেন। শেষ অংশে (দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ) সাধনতত্ত্বের আলোচনা আছে।

দর্শন যেখানে ধর্ম্মের সীমানায় পা দেয় সেখানে শুধু তত্ত্বদৃষ্টিই সমর্থ নয়, শ্রদ্ধারও আবশ্যক হয়। তত্ত্বদর্শক পাঠক যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন তবে "ঈশ্বরসূত্র" পড়ে আনন্দ ও উপকার পাবেন। যাঁরা পরীক্ষামোক্ষার্থী, তাঁদেরও এই গ্রন্থ কাজে লাগবে।

গ্রন্থখানিতে পাণ্ডিত্যের ও প্রজ্ঞার পরিচয় আছে। যুক্তি ও বিচারপ্রণালী সুগম। ভাষা সরল। দার্শনিক গ্রন্থের পক্ষে এ দুর্লভ গুণ।

শ্রীসুকুমার সেন
অধ্যক্ষ, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৩-৩-৬০

অবতরণিকা

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইয়া আসিয়াছে। কোথাও তিনি 'পুরুষবিশেষ' রূপে, কোথাও পুরুষোত্তমরূপে, কোথাও মায়োপাধিকরূপে, কোথাও বা মায়াতীতরূপে নানাভাবে কীর্ত্তিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। যাহাই হউক্, সমস্ত দর্শনশাস্ত্রই, অপবাদমুখেই হউক বা সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই হউক, এ তত্ত্বটির আলোচনা না করিয়া পারেন নাই। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ' ইত্যাদি সূত্রে নিরাকরণ বা প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যেও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ অনিবার্য্যভাবেই আসিয়া পড়িয়াছে। 'কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি গ্রন্থে আবার এই ঈশ্বরতত্ত্বের সিদ্ধির জন্যই প্রাণপণ প্রয়াস দেখা যায়। বৈষ্ণবাদি দর্শনে তো এই ঈশ্বরই মূল আশ্রয় বা প্রতিপাদ্য। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতেও সেই ঈশ্বরই যে মূল উপজীব্য, তাহা গ্রন্থের নামকরণ হইতেই উপলব্ধ হয়।

এ গ্রন্থটিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক নানা আলোচ্য বিষয়গুলি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে প্রথম সূত্রাকারে নির্দেশ পূর্ব্বক তাহারই বিশদ ব্যাখ্যাদি করা হইয়াছে। সূত্রগুলি অবশ্য সংস্কৃতে রচিত নহে, বাংলাতেই উপনিবদ্ধ হইয়াছে। সেদিক দিয়াও গ্রন্থখানি অভিনব। ব্যাখ্যাদিতে প্রধানত উপনিষদের এবং অন্যান্য শাস্ত্রেরও প্রমাণ উদ্ধৃত হওয়াতে গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য বিষয় সুপরিস্ফুট ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অবশ্য শাঙ্কর বেদান্তের অনুগামী নহেন। তাই তাঁহার মতে ঈশ্বর ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ 'ন্যূনসত্তাক' কোনো তত্ত্ব নহেন। ঈশ্বরই তাঁহার মতে পরম ও চরম তত্ত্ব; ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি তাঁহারই বিভূতি বা প্রকাশ। ইহা সকলের গ্রাহ্য বা সর্ব্ববাদি সম্মত হইবে কিনা জানি না, তবে ভক্তহৃদয়ের আকুতি ইহাতে মিটিবে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গেই অভিন্নরূপে জড়াইয়া আছে অবতারতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি। গ্রন্থকার এ সব প্রসঙ্গগুলিও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহা অনেকের কাছে সুখপাঠ্য হইবে বলিয়া মনে করি। অবতারবাদের প্রসঙ্গে পূর্ণাবতার, অংশাবতার, আবেশাবতার ইত্যাদির

আলোচনাও করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট ধর্মাচার্য্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনও আলোচিত হইয়াছে। হয়তো নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাই এ জাতীয় গ্রন্থে বাঞ্ছনীয় ছিল, তবে যাঁহারা ঐ বিশিষ্ট আচার্য্যগণের অনুরাগী বা অনুগামী, তাঁহাদের কাছে ইহা আস্বাদ্যই হইবে মনে করি।

গ্রন্থকার প্রভূত পরিশ্রম সহকারে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল ইহাতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নানা শাস্ত্রালোচনা, সহজ সরল প্রকাশভঙ্গী, বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ বিন্যাস গ্রন্থটীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার আপন মনীষা ও সাধনার ফলে ঈশ্বরতত্ত্বকে যেভাবে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এখানে বাদানুবাদের কোনো অবকাশ নাই। তাঁহার প্রভূত পরিশ্রম বঙ্গসাহিত্যের দর্শনবিষয়ক আলোচনায় যে দৈন্য আছে তাহা অনেকাংশে পূরণ করিবে বলিয়া মনে করি এবং তাঁহার এ কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী
অধ্যক্ষ, কলিকাতা
গভার্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা,
১৬ই চৈত্র, ১৩৬৬ সাল

সূচনা

শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী প্রণীত "ঈশ্বরসূত্র" নামক গ্রন্থ আমি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছি। ইহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ, কার্য্য ও অবতারতত্ত্ব প্রভৃতি যেরূপ নিপুণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে, জীবের মুক্তি ও তাহার উপায় প্রভৃতিও সেইরূপ আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় গ্রন্থকারের বহুদর্শিতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। স্বামীজী এই গ্রন্থে প্রাচীন আচার্য্যগণের মতকে গতানুগতিকভাবে অনুবর্ত্তন করিয়া চলেন নাই। তিনি নানা শাস্ত্র ও নানা মতবাদ আলোচনা করিয়া স্বকীয় বিশিষ্ট চিন্তাশক্তি দ্বারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই নির্ভয়ে অসঙ্কোচে পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। পাঠকগণ ধৈর্য্যসহকারে গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই তাহার পরিচয় পাইবেন। স্বামীজী এই গ্রন্থে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেই সকল সিদ্ধান্তের সমর্থনে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই সকল সিদ্ধান্ত সকল দার্শনিকেরই অভিমত না হইলেও অনেক দার্শনিকের মতেই ঐ সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত এবং এই সকল প্রমাণ দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তই যে সমর্থিত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। স্বামীজী শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলির বাংলা অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। পাঠকগণ ধৈর্য্যসহকারে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বহু নতুন তথ্যের সন্ধান পাইবেন। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থের প্রচার নাই বলিলেও চলে। স্বামীজী বাংলাভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচার করিয়া বাংলাভাষারও সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের সকলের নিকটই ধন্যবাদের পাত্র। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী
(তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ)
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
২৮শে চৈত্র ১৩৬৬

ভূমিকা

প্রচলিত মতে বেদ বেদান্তই শ্রুতি, এবং "শ্রুতি" অপৌরুষেয় জ্ঞান অর্থেই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে, এই জ্ঞান ব্যক্তিনিরপেক্ষ কি না। এখানে এই বিতর্কের অবতারণা করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এখানে বিচার্য্য, শ্রুতিতে, বিশেষতঃ ইহার উপনিষদ্ভাগে, পারমার্থিক তত্ত্বের কিরূপ ধারণা সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে। অনেক প্রাচীন ও নব্য ভারতীয় দার্শনিকের অভিমত এই যে, উপনিষদ্ পারমার্থিক জ্ঞানের আধার ও উৎস। তদ্ধেতু ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তদর্শন উপনিষদ্ সমূহের ব্যাখ্যা বই আর কিছুই নহে। অথচ আমরা দেখিতে পাই, বেদান্তীরা উপনিষদের ভিত্তিতে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মত গড়িয়া তুলিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তী শ্রীশঙ্কর ও তাঁহার অনুগামিগণের মতে নির্বিশেষ, নির্বিকার, অক্ষর ব্রহ্মই পারমার্থিক তত্ত্ব। অপরপক্ষে শ্রীরামানুজ প্রমুখ ঈশ্বরবাদী বেদান্তীরা উত্তম পুরুষ অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকেই পারমার্থিক তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উভয়পক্ষই তাঁহাদের একে অন্যে বিপরীত মতবাদের প্রমাণরূপে উপনিষদ্ শ্রুতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের মতানুসারে শ্রুতি সংশয়, বাদ, বিতণ্ডার ঊর্দ্ধে; তাহাতে মানবীয় ভাষায় অপরোক্ষ অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজ্ঞান বিধৃত হইয়া আছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এহেন শ্রুতি বা উপনিষদ্ পরস্পরবিরোধী দুই বা ততোধিক দার্শনিক মতের উৎস হইতে পারে কিনা। সংশ্লিষ্ট দার্শনিকেরা একে অন্যের উপর উপনিষদ্তত্ত্ব ভুল বুঝিবার দোষ আরোপ করেন, এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা উপনিষদের উক্তিসমূহের আপন আপন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যাহা ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তভাষ্য বলিয়া সুপরিচিত। কিন্তু যাঁহারা নিজের চোখে ও নিজের মননশক্তিতে উপনিষদ্ সকল পাঠ করিবেন তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, তাহাতে পরব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব দুই-ই উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর

ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন উপনিষদ্ সমষ্টির কথা নাই বলিলাম, ঈশ, কেন প্রভৃতি সুপ্রাচীন উপনিষদ্‌সমূহে ঈশ্বরতত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঈশই ঈশোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়। "ঈশ" শব্দের অর্থ জগদ্‌কর্ত্তা বা বিশ্বনিয়ন্তা, এবং "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ" বাক্যটী সৃষ্টিকর্ত্তা যে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। এই উপনিষদে স্পষ্ট ভাষায়ই বলা হইয়াছে :—

"স পর্য্যাগাচ্ছুক্রমকায়ব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮

তিনি সর্ব্বত্র ব্যপ্ত হইয়া আছেন, জ্যোতির্ময়, স্থূল সূক্ষ্ম শরীরশূন্য, শুদ্ধ, পাপ-পুণ্যবিবর্জ্জিত, কবি, মনীষী, সর্বোপরি, আপনাতে আপনি বিরাজমান এবং অনন্ত কাল হইতে যথাযথভাবে সমস্ত জগৎ ও তদ্বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

কেনোপনিষদে দেখা যায়, শিষ্য ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য গুরুসমীপে উপস্থিত। গুরু উপদেশ করিলেন, যিনি জগতের সকল কার্য্যের কর্ত্তা তিনিই ব্রহ্ম ; এখানে "ব্রহ্ম" শব্দটী সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আবার, কঠোপনিষদে (১ম অঃ ২য় বল্লী-১৫-১৬) নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও উপদেশ করা হইয়াছে। যথা—

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

গুরু (যম) শিষ্যকে বলিতেছেন, যাহা লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া সাধকেরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তাহা যাহাতে লাভ করিতে পার সেইরূপ বলিতেছি— ওঁ শব্দটী তাহারই প্রতীক, ইহাই অক্ষর ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরাতত্ত্ব। ইহা মন বুদ্ধির অগোচর।

ইহা সুস্পষ্ট যে, এখানে নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই উপনিষদে অন্যত্র এই পরাতত্ত্বকে কেবলমাত্র "অস্তি" বা আছেন বলিয়াই বলা হইয়াছে (কঠ-২য় অঃ ৩য় বল্লী-১২)।

অপরন্তু এই উপনিষদেরই কতিপয় স্থানে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরেরই বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা—১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লী—২৩ এতে বলা হইয়াছে যে, এই আত্মা

বিতর্কের দ্বারা প্রাপ্ত হইবেন না, কেবল মেধা বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অথবা সুদীর্ঘকাল শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারাও নহেন ; যাহাকে তিনি বরণ করেন তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন, সেই আত্মা তাঁহারই কাছে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন (মুণ্ডক ২য় খণ্ড, ৩ ও ৬ষ্ঠ অঃ, ২১ ; ৩য় অঃ ১০, ৭, দ্রষ্টব্য) এখানে "আত্মা" শব্দটী স্পষ্টতঃ ঈশ্বর অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি সগুণ, কর্ত্তা ও নিয়ন্তা, তাঁহারই কৃপাশক্তি থাকিতে পারে। এই ধারণার পরিপোষক অনেক উক্তি কঠোপনিষদেই আছে, যথা "ঈশানং ভূতভব্যস্য..."ইত্যাদি (২য় অঃ ১ম বল্লী-৫, ১২, ১৩)।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের পরিসমাপ্তিতে পরব্রহ্মতত্ত্বই সন্দেহাতীতরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। "অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব..." অর্থাৎ শব্দের (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির) অতীত, তূরীয়, বাক্য মনের অগোচর, জগৎপ্রপঞ্চনিবৃত্তিস্বরূপ, অদ্বৈত, ওঁ যাহার প্রতীক, তাহাই পরব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মকে "যচ্চ তচ্চ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার নির্গলিতার্থ এই—ব্রহ্ম ইহা, তাহা, অসীম, অরূপ, নির্গুণ ও নির্বিশেষ। এই উপনিষদে, যেমন অন্যান্য উপনিষদে, ঈশ্বরতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্বেতাশ্ব-তরে ত ঈশ্বরতত্ত্বের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে, যদিচ পরব্রহ্ম তত্ত্বেরও আভাস স্থানে স্থানে রহিয়াছে। এবম্প্রকারে আমরা বিভিন্ন উপনিষদ্ হইতে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাচক আরও অনেক উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারি।

উপরে যে বিশ্লেষণ করা গেল তাহাতে যদি সত্যের ভিত্তি থাকিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি বা বলিতে বাধ্য যে, ভাষ্যকারেরা স্বকীয় মত বা ভাব অনুযায়ীই উপনিষদ্‌সমূহের ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উপনিষদে যে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়েরই অনুভূতি বা উপলব্ধি লিপিবদ্ধ হইয়া আছে তাহা তাঁহারা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অথবা, যদি পারিয়াই থাকেন, নিজ নিজ মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে কেবল নিজ নিজ মতের অনুকূল উক্তিসমূহ সংগ্রহ করিয়া, কেহ নির্গুণ পরব্রহ্মতত্ত্ব, কেহ বা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব—ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। এই ভাবে ভাষ্য, টীকা, তস্য টীকা রূপে বেদান্তীরা অসংখ্য দুরূহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের ঠিক শিক্ষা কি তাহা ভাষ্য ও টীকায় চাপা পড়িয়াছে (ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১১—বিভিন্ন ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

অদ্বৈতবেদান্তীরা নির্গুণ ব্রহ্মকেই পরা বা পরমতত্ত্ব বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বরকে তুলনামূলক ভাবে নীচতত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু যাহা অস্তিমাত্র, সর্ব্বগুণবিবর্জিত, যাহাতে এমন কি অপ্রাকৃত গুণও আরোপ করা যায় না এবং যাহাতে জগৎ-প্রপঞ্চের বিকাশ নাই, তাহা পরাতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় কি করিয়া? কোন্ ন্যায় (logic) অনুসারে যাহা শুধুমাত্র এক তাহা বহুকে বর্জন করিয়া পারমার্থিক তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন? যে নির্বিকল্প সমাধিতে অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান বা উপলব্ধি হয় তাহাতে অদ্বৈতবাদীদের স্বীকৃতি অনুসারে সাধকের অহং, ব্যক্তিত্ব ও জীবত্ব তিরোহিত হয়; আবার এই অবস্থাই অধ্যাত্ম সাধনার চরম পরিণতি বলিয়া গণ্য হয়। যেখানে সাধকের সব লোপ পায় সেখানে কাহার কিসের জ্ঞান বা উপলব্ধি তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। যাহা অথবা যিনি পরাতত্ত্ব হইবেন তাঁহাকে নিশ্চয় বিশ্বের উৎস ও কেন্দ্র হইতে হইবে, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

অবশ্য আমরা দেখিতে পাই, গীতার বক্তা নির্গুণ সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি তিনটী মৌলিক পদার্থের (Category) বিষয় অবতারণা করিয়াছেন, যাথা ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম (১৫শ অঃ, ১৬-১৮)। ক্ষর বিশ্বভূত সকল যাহা পরিবর্ত্তনশীল, আর অক্ষর হইতেছেন ব্রহ্ম যাহা অবিনশ্বর ও অপরিনামী। "কুটস্থো অক্ষর উচ্যতে"। অতএব অক্ষর ক্ষরের পূর্ণ বিপরীত। তদ্ধেতু দুইএর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। কেননা বিপরীতধর্ম্মী দুই বস্তুর মিলন অসম্ভব। কিন্তু গীতার উদ্গাতা "পুরুষোত্তম" এই "ক্যাটিগরীর" মাধ্যমে যাহা অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই বিপরীতধর্ম্মী একে অন্যকে নস্যাৎ করিতেছে। এই কারণে অক্ষর এবং এই অর্থে ব্রহ্ম পরাতত্ত্ব হইতে পারেন না। যাহা বা যিনি পরাতত্ত্বরূপে গণ্য হইবেন তাহাকে বিশ্বের নিদান হইতে হইবে। অক্ষরের কল্পনা এই অর্থে অনুপযোগী। সুতরাং গীতাকারের মতে ঈশ্বর অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম ও পূর্ণ পরাতত্ত্ব, যেহেতু তিনি অনন্ত অব্যয় হইয়াও আপন শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি, ধারণ ও পালন করিতেছেন। "ক্ষরমতীতোহক্ষরাদপি চ উত্তমঃ।" অতএব ঈশ্বর যুগপৎ সগুণ নির্গুণ, সবিশেষ নির্বিশেষ, অধ্যাত্ম ব্যক্তি ও অব্যক্তি।

প্রাচীন পাঞ্চরাত্রাদি ভাগবৎ ধর্ম্মেও ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে এবং ঈশ্বরের যে এক অব্যক্ত অক্ষরভাবমূলক দিক্ আছে ইহারও নির্দ্দেশ আছে। ক্ষরের অতীত অক্ষর ব্রহ্ম যে ঈশ্বরেরই অব্যক্ত নির্বিশেষ অঙ্গ তাহা ভগবদ্গীতা ও ভাগবতপুরাণেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে যে সমস্যার উদ্ভব হইতেছে তাহা এই—কেমন করিয়া ঈশ্বর যুগপৎ পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইতে পারেন? এই সমস্যার সমাধান ব্যতীত ঔপনিষদিক সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।*

গ্রন্থকার অবশ্য এই দুরূহ সমস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং নিজের একটি সমাধান দিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি স্বকীয় ভাবে এক মহান্ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। তিনি ভাষ্য টীকার অরণ্যে প্রবেশ না করিয়া শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র মন্থন করিয়া পারমার্থিক তত্ত্ব নিরূপণকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। বেদ উপনিষদে যে ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার এই বৃহৎ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভক্ত পাঠকবর্গের, বিশেষতঃ বিদগ্ধ সমাজের, প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। এই অমূল্য গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া উচিত।

শ্রীঅধর চন্দ্র দাস
অধ্যক্ষ, দর্শন বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৮ই চৈত্র, সন ১৩৬৬
কলিকাতা

---

* এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য ভূমিকালেখকের *A Modern Incarnation of God—a Commentary on the Life and Teaching of Sri Ramakrishna* (General Printers, Calcutta) দ্রষ্টব্য

ঈশ্বরসূত্র

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

"ঈশ্বরঃ"

দ্বিতীয় অধ্যায়

"পরমঃ"

তৃতীয় অধ্যায়

"কৃষ্ণঃ"

চতুর্থ অধ্যায়

"সৎ"

পঞ্চম অধ্যায়

"চিৎ"

ষষ্ঠ অধ্যায়

"আনন্দ"

সপ্তম অধ্যায়

"সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ"

অষ্টম অধ্যায়

"অনাদিঃ"

নবম অধ্যায়

"আদিঃ"

দশম অধ্যায়

"গোবিন্দঃ"

একাদশ অধ্যায়

"সর্ব্বকারণকারণম্"

দ্বাদশ অধ্যায়

মানবাত্মা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মানবদেহ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অধ্যাত্মযোগসাধনা

শুদ্ধিপত্র

(মুদ্রণের ভ্রম সংশোধন)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৯	অধ্যাজ্ঞবিজ্ঞান	অধ্যাত্মবিজ্ঞান
১৩	২৩	মাণ্ডুক্য	মাণ্ডূক্য
১৫	২৯	পার্থ বৎস	পার্থো বৎসঃ
১৬	৫	রূপংহসৌ	রূপোহসৌ
২১	১৯	মাণ্ডুক্য	মাণ্ডূক্য
৩৭	১	নিগুণ	নির্গুণ
৩৭	২৬	"অপানি"	"অপাণি"
৩৮	১৩	মহিময়	মহিমময়
৩৮	২৯	মহিময়	মহিমময়
৩৯	১	মহিময়	মহিমময়
৪২	৬	বৈশিষ্ট	বৈশিষ্ট্য
৬৩	১১	নিণাত	নির্ণীত
১০৭	১০	কৃষ্ণের	কৃষ্ণের
১১৬	১০	প্রকৃাত	প্রকৃতি
১১৮	২৭	সেব	সেবা
১৩৪	৪	গোলকে	গোলোকে
১৩৯	৫	মাধুর্য্যের	মাধুর্য্যের
১৪০	১৫	আমদিগকেই	আমাদিগকেই
১৭৭	২	তাঁহর	তাঁহার
১৭৯	২৭	মুহর্ত্তে	মুহূর্ত্তে
১৮১	১৭	বালয়	বলিয়া
১৮২	২৫	হইতে	হইলে
১৮৮	১	উপবিষ্ট	উপদিষ্ট

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৮	৭	পপ্মানং	পাপ্মানং
১৮৮	১১	মৃত্যুপ্রহাণিঃ	মৃত্যুপ্রহাণিঃ
১৯০	১৫	কম্ম	কর্ম্ম
১৯৫	১৫	বর্ণণা	বর্ণনা
২০০	২৫	ইচ্ছক	ইচ্ছুক
২০৯	৫	নিণাত	নির্ণীত
২০৯	৯	যোগার	যোগীর
২৩৯	১৩	দয়িত।	দয়িত!
২৪৩	১৮	অখন্দ	অখণ্ড
২৪৪	২২	মধূর	মধুর
২৫৩	৭	কঞ্চকে	কৃষ্ণকে
২৭৬	৯	হিন্দূর	হিন্দুর
৩০৫	২	ছন্দোগ্য	ছান্দোগ্য
৩০৯	১	কৃষ্ণরূপ	কৃষ্ণরূপা
৩০৯	২০	কারতে	করিতে
৩৩৬	১৩	Cummunism	Communism
৩৪৮	৮	হিন্দূধর্ম্ম	হিন্দুধর্ম্ম
৩৫৫	২	নিগুণ	নির্গুণ
৩৫৬	৬	প্ররম্ভেই	প্রারম্ভেই
৩৫৭	২৭	ব্যাক্ত	ব্যক্তি
৩৭৬	৩	বষয়ক	বিষয়ক
৩৯৯	৩	জড়দের	জড়দেহের
৪২০	২৯	সমুহের	সমূহের
৪২২	২১	সরীপ	সরীসৃপ
৪৫৫	২৮	অখবা	অথবা
৪৮৮	৪	উর্দ্ধগামী	ঊর্দ্ধগামী
৫০৬	৩	অহিন্দূ	অহিন্দু

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

প্রথম অধ্যায়

"ঈশ্বরঃ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

অধ্যাত্মবিজ্ঞান

১।১।১ সত্য : জড়রূপ : চিদ্রূপ

"অস্তীতি সত্যম্"—অস্তিত্ব যাহারই আছে তাহাই সত্য। অস্তিত্বশীল বস্তু সত্য। সৌন্দর্য্য যেমন সুন্দর বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে না এবং থাকে না, তদ্রূপ অস্তিত্বও অস্তিত্বশীল বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে না এবং থাকে না। কেহ কেহ বলেন যে, যাহার অস্তিত্ব অল্পকালস্থায়ী এবং বিনাশশীল, তাহা সত্য নহে, তাহা মিথ্যা। এইরূপ ধারণা সঙ্কীর্ণ এবং ভ্রান্ত। যাহারই অস্তিত্ব কখনও কিছুদিনের জন্যও ছিল, আছে, বা থাকিবে, তাহারই অস্তিত্ব চিরকালই ছিল, আছে, এবং থাকিবে। অস্তিত্ব অনস্তিত্বের বিপরীত। অস্তিত্ব কখনই অনস্তিত্ব হইতে পারে না। অনস্তিত্বের কখনও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। বিশ্ববিধানে ধ্বংস নামক কোন ঘটনা নাই। স্থূল এবং জড় রূপ, শব্দ, স্পর্শ, রস এবং গন্ধ যতক্ষণ আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর থাকে, কেবল যে ততক্ষণই তাহাদের অস্তিত্ব থাকে, তাহা নহে; যখন তাহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর হয়, তখনও তাহারা থাকে, অর্থাৎ তাহাদের অস্তিত্ব থাকে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয়গুলি স্থূল জড় বস্তু; যাহাকে এই স্থূল জড় বস্তুর বিনাশ বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ বিনাশ নহে; তাহা কারণে লীনতাপ্রাপ্তি। প্রত্যেকটী স্থূল জড় বিষয় এক-একটী কার্য্য; প্রত্যেক কার্য্যের অব্যবহিত কারণ আছে; এই অব্যবহিত কারণসমূহ সূক্ষ্ম জড় বস্তু। এই অব্যবহিত কারণসমূহের আরও সূক্ষ্মতর জড়

কারণ আছে ; ইহারা সেই কারণের কার্য্য। এইরূপে কার্য্যকারণ পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা সকল ইন্দ্রিয়গোচর স্থূল জড় বস্তুর যে সর্ব্বশেষ জড় কারণ প্রাপ্ত হই, তাহা সূক্ষ্মতম জড় বস্তু ; ইহাই সকল স্থূল জড় বস্তুর উপাদান-কারণ। এই উপাদান-কারণেরও কারণ আছে ; তাহা জড় বস্তু নহে ; তাহা জড়াতীত বস্তু। জড়াতীত বস্তুকে চিদ্বস্তু বলা হয়। যে চিদ্বস্তু উপাদান-কারণেরও কারণ, তাহারও কারণ আছে ; তাহাই বিশ্বের পরম কারণ। এই পরম কারণের কারণ নাই। এই পরম কারণই সত্যের সত্য এবং পরম সত্য। বিশ্ববিধান অনুসারে কার্য্যসমূহের কারণে লীনতাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ; তৎকালে তাহারা ইন্দ্রিয়গোচর থাকে না, কিন্তু অস্তিত্বহীন হয় না। বিশ্ববিধান অনুসারেই কারণ পুনরায় কার্য্যে পরিণত হয় ; তখন স্থূল জড় কার্য্যসমূহ ইন্দ্রিয়গোচর হয়। এইজন্য, যাহারই অস্তিত্ব কখনও ছিল, আছে, বা থাকিবে, তাহারই অস্তিত্ব চিরকালই ছিল, আছে, বা থাকিবে ; কারণ, পরমকারণের কারণে লীনতাপ্রাপ্তি নাই এবং তাহা নিত্য স্বরূপে বিদ্যমান আছে। সুতরাং, অস্তিত্ব যাহারই আছে, তাহাই সত্য। কেহ কেহ বলেন যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয় না, এমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই ; অর্থাৎ, স্থূল জড় বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। ইহা জড়বাদ। জড়বাদীর এই ধারণাও সঙ্কীর্ণ এবং ভ্রান্ত। স্থূল জড় বস্তুর সূক্ষ্ম কারণসমূহই ইন্দ্রিয়গোচর হয় না, ইহাদের দূরবর্ত্তী সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম কারণসমূহ এবং চিদ্বস্তুও ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। ইন্দ্রিয়গোচর হয় না, এমন অনেক বস্তুর অস্তিত্ব জড়বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা দেখিলাম যে, বিশ্বে সত্যের দুইটী রূপ আছে, জড়রূপ এবং চিদ্রূপ। জড়বস্তুর স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, এবং সূক্ষ্মতম রূপ আছে। চিদ্বস্তু মাত্রেই চিদ্রূপ ; তাহার মধ্যে স্থূলসূক্ষ্মাদি রূপভেদ নাই। পরমসত্য এই দ্বিবিধ সত্যেরই বিশ্বাতীত পরমকারণ।

১।১।২ সত্যানুসন্ধান : জিজ্ঞাসা

মানবের অন্তরে সত্যকে জানিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে। জ্ঞানলাভের এই ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার প্রেরণায় মানব সত্যের অনুসন্ধান করে। সত্য সার্ব্বকালিক—সকল কালেই স্থিতিশীল, এবং সার্ব্বভৌমিক—সকল স্থানেই

স্থিতিশীল। সত্যানুসন্ধী মানব সাধনার দ্বারা সত্যকে আবিষ্কার করিয়া জ্ঞাত হয়। সত্যকে জানিবার সাধনায় মানব বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করে; এমন কি, অদম্য জিজ্ঞাসার প্রেরণায় সত্যের অনুসন্ধানে নিরত কত মানব প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে।

১।১।৩ জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জিজ্ঞাসার প্রেরণায় সত্যানুসন্ধী মানব সাধনার ফলে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া যে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন, তাহা বিজ্ঞান, অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। বস্তুবিশেষের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের দ্বারা তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করা যায়। অনেক মানব বিজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না, বহু জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধেই। কিন্তু জিজ্ঞাসার প্রেরণাকে সার্থক না করিলেও সে তৃপ্ত হইতে পারে না। যাঁহারা বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই সকল বিজ্ঞানী মানব নিজ নিজ বিজ্ঞানকে অন্যের নিমিত্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। যাঁহারা বিজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না, তাঁহারা এই সকল পুস্তক পাঠ করেন, অথবা যাঁহারা এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রবণ করেন, অথবা বিজ্ঞানীদের নিকট হইতে শ্রবণ করেন। এইরূপে, অধ্যয়ন বা শ্রবণের দ্বারা সত্যের সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞানকে জ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞানলাভে অসমর্থ ব্যক্তিগণ এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া জিজ্ঞাসার প্রেরণাকে কতকাংশে সার্থক করেন।

১।১।৪ জড়বিজ্ঞান: সাধনায় লভ্য

সাধারণতঃ মানব জড়বস্তু সম্বন্ধেই বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে, করিতে চাহে, এবং করে। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটী। প্রথম কারণ:—মানব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং মন ও বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা এবং গবেষণা করিয়া যে সকল বস্তু সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তৎসমুদয়ই জড়বস্তু। দ্বিতীয় কারণ:—মানব দেহপরতন্ত্র। দেহরক্ষার এবং দেহের আরামবিলাসের জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, দেহপরতন্ত্র মানব সেই সকল বস্তুই চাহে। সেই সকল বস্তুই জড়বস্তু। জড়বস্তুসমূহকে দৈহিক প্রয়োজনে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য তাহাদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানলাভের

আবশ্যক। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দেহপরতন্ত্র মানব স্বতঃই জড়বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞানই লাভ করিতে চাহে। জিজ্ঞাসার প্রেরণায় কেবল বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, এমন মনস্বী মানবও আছেন; কিন্তু প্রথম কারণে তাঁহাদেরও বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্র জড়বস্তুর মধ্যেই আবদ্ধ। এই দুইটী কারণে মানবের জিজ্ঞাসা জড়বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে। জড়বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান বলা হয়। যাঁহারা জড়বিজ্ঞান লাভ করেন তাঁহারা জড়বৈজ্ঞানিক। জড়বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের লব্ধ জড়বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে জড়বিজ্ঞানশাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। অন্যে এই সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া জড়বস্তু বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে। জড়বিজ্ঞান, পরমসত্য পরমকারণের জড়রূপ-সত্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। পরমকারণ চিদ্বস্তু; তাঁহার সম্বন্ধে এবং তাঁহার যে চিদ্রূপ-সত্য বিশ্বভুবনে বিদ্যমান আছে তৎসম্বন্ধেও, বিজ্ঞানলাভ জড়বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রের অতীত। এইজন্য, জড়বিজ্ঞানের সাধনার দ্বারা চিদ্বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করা যায় না। বিশ্বের সকল জড়বস্তুর কার্য্যকারণ পরম্পরা নির্ণয় করিতে করিতে জগতের শ্রেষ্ঠ জড়বৈজ্ঞানিকগণ সমগ্র বিশ্বের পরমকারণের অস্তিত্বমাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন এবং স্বীকারও করিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, এবং বিজ্ঞানের অভাবে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই।

১।১।৫ অধ্যাত্মবিজ্ঞান: সাধনায় লভ্য

সমগ্র বিশ্বের পরমকারণ চিদ্বস্তু এবং পরম সত্য বলিয়া তিনি পরম চিদ্রূপ-সত্য। পরম চিদ্রূপ-সত্য সচ্চিদানন্দ,—সৎ, চিৎ, এবং আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, ভগবান প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই আত্মারই চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তি নিখিল বিশ্বের প্রতি পদার্থে অধিষ্ঠিত আছেন, এবং তাঁহারই চিৎ এবং আনন্দের অংশ প্রতি জীবদেহে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছেন। আত্মার সম্বন্ধে বিজ্ঞানই অধ্যাত্মবিজ্ঞান। জীবাত্মাও চিদ্বস্তু বলিয়া চিদ্রূপ-সত্য। আত্মা এবং জীবাত্মা চিদ্রূপ-সত্য বলিয়া আত্মাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান চিদ্রূপ-সত্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান। মানব জিজ্ঞাসার প্রেরণায় সত্যানুসন্ধান করিতে করিতে জীবদেহে জীবাত্মার, এবং বিশ্বের

পরমকারণ আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া, জিজ্ঞাসার প্রেরণাতেই জীবাত্মার এবং আত্মার সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিতে সাধনা করে। এই সাধনা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনা। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনাই অধ্যাত্মযোগসাধনা। অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায়। জড়বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যেমন নির্দ্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত সাধনপ্রণালী আছে এবং সেই প্রণালী অনুসারে সাধনা করিলে জড়বিজ্ঞান লাভ করা যায়, তদ্রূপ, অধ্যাত্ম-যোগসাধনারও নির্দ্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালী আছে এবং সেই প্রণালী অনুসারে সাধনা করিলে অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায়, নতুবা যায় না। বেদান্ত বলিয়াছেন ঃ

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

কঠ ।১।২।১২

—"যে ঈশ্বর বিশ্বগুহায়, অর্থাৎ বিশ্বের অন্তর্গত প্রতি পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এবং জীবের হৃদয়গুহায় জীবাত্মারূপে অবস্থিত হইয়া বাসনারূপ গহ্বরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া মানব জাগতিক সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হয়।"

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ ॥

শ্বেত ।৬।১৩

—"যিনি নিত্য বস্তুসমূহের নিত্যত্বের কারণ, চেতন বস্তুসমূহের চেতনার কারণ, এবং সর্ব্বজীবের ভোগবিধাতা, সেই অদ্বিতীয় পরমকারণ ঈশ্বরকে অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।" আমরা শ্রুতির প্রমাণ পাইলাম যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু বুদ্ধি, মন, এবং ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, ইহাও শ্রুতির ঘোষণা।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ ॥ কেন ।১।৩

—"চক্ষু, বাক্‌, এবং মন ঈশ্বরে গমন করে না, অর্থাৎ, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।" অধ্যাত্মযোগের দ্বারা মানবদেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মা আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ করিতে পারে—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ॥ গীতা। ৩২৪

—"কেহ কেহ ধ্যানযোগে আত্মায় আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন।" বেদান্তও বলেন যে ঈশ্বর—

প্রতিবোধবিদিতম্। কেন।২।৪

—"প্রতিবোধ, অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা, অর্থাৎ জীবাত্মার দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষীকৃত হয়েন।" প্রতি জীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত জীবত্মাকে প্রতিবোধ এবং প্রত্যগাত্মাও বলা হয় (Individual soul)। অধ্যাত্মযোগসাধনা না করিলে জীবাত্মা আপনাকে অথবা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

১।১।৬ ত্রিবিধ প্রমাণ : প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শাস্ত্র প্রমাণ, অনুমানপ্রমাণ

ঈশ্বরের এবং জীবাত্মার অস্তিত্বের ত্রিবিধ প্রমাণ আছে। (১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ, (২) শাস্ত্র প্রমাণ, (৩) অনুমান প্রমাণ। অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যিনি এই প্রমাণ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট শাস্ত্রপ্রমাণের এবং অনুমানপ্রমাণের প্রয়োজন নাই। অনেক মহাপুরুষ ঈশ্বরকে এবং জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। অধ্যাত্মযোগসাধনা না করিয়া ঈশ্বর এবং জীবাত্মা নাই, একথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই। জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কোন ব্যক্তি রেডিয়োতে গান শুনিয়া যদি বলে, "দুই হাজার মাইল দূর হইতে গান আপনা আপনি এখানে আসিতেছে, তাহা হইতে পারে না ; এই বাক্সের মধ্যে ভূত আছে এবং সেই ভূত গান করিতেছে," তাহার এই উক্তি শুনিয়া রেডিয়োতত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিক হাসিবেন। তদ্রূপ, অধ্যাত্ম-যোগসাধনা না করিয়া যদি কেহ বলে, "জীবাত্মা এবং ঈশ্বর নাই," তাহার এই উক্তি শুনিয়া, যে অধ্যাত্মযোগসিদ্ধ ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি হাসিবেন। জড়বৈজ্ঞানিককে বাল্যকাল হইতে জড়বিজ্ঞানের কঠোর সাধনা করিয়া জড়বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান লাভ করিতে হয় ; অধ্যাত্মবিজ্ঞানেরও কঠোর সাধনার ফলে জীবাত্মাকে এবং ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায়। এইরূপে যাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রই প্রমাণ। শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্র পাঠ করিয়া শাস্ত্রোল্লিখিত অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রপ্রমাণ লাভ করা যায়। যিনি প্রত্যক্ষ

প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন নাই এবং শাস্ত্রপ্রমাণও মানিতে চাহেন না, তাঁহাকে অনুমানপ্রমাণের উপরেই নির্ভর করিতে হয়।

১।১।৭ বিচার ও বিশ্বাস

অনুমান বিচারসাপেক্ষ। বিচার বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া বিচার করিতে হয়, কেবল তর্ক করিবার জন্য নহে। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য সহজ সরল বুদ্ধিতে বিচার করেন বলিয়া তাঁহার বিচার যুক্তিযুক্ত হয়। তার্কিক ব্যক্তি কেবল স্বমত স্থাপন করিবার জন্য বিচার করেন বলিয়া তাঁহার বিচার সব সময় সহজ সরল বুদ্ধির যুক্তিযুক্ত বিচার হয় না। জিজ্ঞাসু হইয়া যুক্তিযুক্ত বিচারের দ্বারা জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুমানপ্রমাণ সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা প্রাপ্ত হইয়া জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন যে, বিচার (Reason) এবং বিশ্বাস (Faith) পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু তাহা নহে। বিচার ও বিশ্বাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই। বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট মানব বিনা বিচারে বিশ্বাস গঠন করে না। শাস্ত্রপ্রমাণ এবং অনুমানপ্রমাণ বিশ্বাসের ভিত্তি। বুদ্ধির বিচার এই উভয়বিধ প্রমাণের ভিত্তি; এইজন্য, বিশ্বাসের মূলে বিচার আছে। বিচারের দ্বারা যে বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমানপ্রমাণ প্রাপ্ত না হয়, এমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই বিশ্বাস করেনা। বুদ্ধি সকলের সমান নহে; কাহারও বেশী, কাহারও কম। কিন্তু যাহার যেমন বুদ্ধি, সে তেমনি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া অনুমানপ্রমাণ পাইলে তবে কোন বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। নিতান্ত নিরক্ষর এবং অজ্ঞ ব্যক্তিকেও যদি বলা যায় যে শূন্যে একটি নগর রহিয়াছে, তাহা সে বিশ্বাস করিবে না, কারণ সে তাহার বুদ্ধির বিচারে উক্তরূপ নগরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমানপ্রমাণ প্রাপ্ত হয় না।

১।১।৮ বিশ্বাস প্রতিপাদ্য

শাস্ত্রপ্রমাণের অথবা অনুমানপ্রমাণের ফলে জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে বিশ্বাস গঠিত হয়, তাহা বিজ্ঞান নহে। অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করিয়া বিশ্বাসকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হইবে।

জড়বিজ্ঞানসাধনা এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানসাধনা, উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বাস প্রতিপাদ্য (Hypothesis)। জড়বিজ্ঞানের সাধকও বিচারের দ্বারা কোন একটী জড় তত্ত্বের অনুমানপ্রমাণ পাইয়া উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; সেই বিশ্বাসটী তাঁহার প্রতিপাদ্য; সাধনার দ্বারা তিনি প্রতিপাদ্যটীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তাহাকে বিজ্ঞানে পরিণত করেন। একটী দৃষ্টান্ত ঃ—ম্যাডাম্ কুরী ধাতুদ্রব্য পরীক্ষা করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে বিচার করিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে উহার মধ্যে একটি উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী পদার্থ আছে। এই অনুমানপ্রমাণের ফলে উক্তরূপ বস্তুর অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল। এই বিশ্বাস ছিল তাঁহার প্রতিপাদ্য। এই প্রতিপাদ্যটীকে প্রমাণ করিবার জন্য দীর্ঘকাল সাধনার ফলে তিনি রেডিয়াম নামক বস্তুটীকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হইল, বিশ্বাস বিজ্ঞানে পরিণত হইল। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রেও জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস প্রতিপাদ্য। সাধনার দ্বারা প্রতিপাদ্যকে প্রমাণিত, বিশ্বাসকে বিজ্ঞানে পরিণত, করিতে হয়। বিশ্বাস না থাকিলে বিজ্ঞানের সাধনা হয় না। ম্যাডাম্ কুরীর যদি ঐরূপ বিশ্বাস না থাকিত, তবে তিনি রেডিয়াম্ আবিষ্কারের সাধনা করিতেন না এবং তাঁহার দ্বারা রেডিয়াম্ আবিষ্কৃত হইত না। জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে যদি বিশ্বাস না থাকে তবে অধ্যাত্মযোগসাধনা হইতে পারে না এবং তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানলাভও হইতে পারে না। এইজন্য বেদান্ত বলিয়াছেন ঃ

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ কঠ ।২।৩।১২

—"বাক্য, মন, অথবা চক্ষুর দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ঈশ্বর আছেন, এইরূপ যাঁহারা বলেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের দ্বারা ব্যতীত অন্যের দ্বারা ঈশ্বর কিরূপে প্রত্যক্ষীকৃত হইবেন? অর্থাৎ, হইবেন না।" "অন্যত্র" শব্দের দ্বারা অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সূচিত হইয়াছে। জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহারা অবিশ্বাসী। এইরূপ অবিশ্বাসীকে নাস্তিক বলা হয়। নাস্তিক জীবাত্মাকে এবং ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করে না, কাজেই তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হয় না।

অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥ তৈত্তিরীয় ।২।৬

—"যদি কেহ মনে করে যে ঈশ্বর নাই তবে ঈশ্বর সেই নাস্তিকের নিকট অসৎ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষীকৃত থাকেন। যদি কেহ মনে করে ঈশ্বর আছেন, তবে সে পরমসত্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে।" সুতরাং, অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস প্রয়োজন। বিশ্বাসকে শ্রদ্ধাও বলা হয়। বেদান্ত শ্রদ্ধা অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্মযোগসাধনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক-আরুণি শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিতেছেন :

শ্রদ্ধৎস্ব সোম্য। ছান্দোগ্য।৬।১২।২

—"হে সোম্য, শ্রদ্ধা অবলম্বন কর।" বিচারের ফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়; বিশ্বাস লইয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনা আরম্ভ করিতে হয়; সাধনার ফলে জীবাত্মাকে এবং ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায়।

১।১।৯ জীবাত্মার অস্তিত্ব : অনুমানপ্রমাণ

বুদ্ধির বিচারের দ্বারা মানবদেহে জীবাত্মার অস্তিত্বের অনুমানপ্রমাণ পাওয়া যায়। জড়বাদী নাস্তিক বলেন, "চেতনা নামক কোন স্বতন্ত্র জড়াতীত বস্তু নাই। যে সকল জড়বস্তুর সংযোগে জড়দেহ গঠিত হয়, তাহাদের সংমিশ্রণের ফলে চেতনা নামক একটী নূতন গুণ উদ্ভূত হয়। যেমন :—পারদের বর্ণ শুভ্র, গন্ধকের বর্ণ হরিদ্রা। এই দুইটী বস্তুর সংমিশ্রণের ফলে হিঙ্গুল নামক যে বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহার বর্ণ লোহিত। পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে লোহিত বর্ণ উৎপন্ন হইল। সেইরূপ, প্রাণীদেহ যে সকল জড়বস্তুর সংযোগে গঠিত, তাহাদের সংমিশ্রণের ফলে চেতনা নামক একটি নূতন গুণের উদ্ভব হয়। এই চেতনাই জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। জীবাত্মা জড়াতীত স্বতন্ত্র বস্তু নহে।" প্রাচীন ভারতের চার্ব্বাক এবং প্রাচীন গ্রীসের এপিকিউরাস্ এই নাস্তিক জড়বাদের সমর্থক ছিলেন। যুগে যুগেই এইরূপ নাস্তিক জড়বাদী ছিল এবং এখনও আছে। জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের দ্বারাই এই জড়বাদের অসারতা প্রমাণিত হয়। জড়বিজ্ঞান অনুসারেই, যে সকল বস্তুকে সংমিশ্রিত করা হয়, তাহাদের মধ্যে যে গুণ প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, সংযোগের ফলে তাহা পরিস্ফুট হয়; তাহাদের মধ্যে একেবারেই ছিল না, এমন নূতন কোন গুণের উদ্ভব হয় না। বর্ণ জড়বস্তুর গুণ, সংযোগে তাহা পরিস্ফুট হয়; কিন্তু চেতনা জড়বস্তুর গুণ নহে; সুতরাং, সংযোগের ফলে চেতনা জন্মলাভ করিতে পারে না। জড়বস্তুর

যে প্রচ্ছন্ন গুণ সংযোগের ফলে পরিস্ফুট হয়, সংযুক্ত বস্তুগুলি বিশ্লেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত মিশ্রিত পদার্থে সেই গুণ থাকে। পারদ ও গন্ধকের মিশ্রিত রূপ হিঙ্গুলকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিশ্লেষিত করিয়া পারদ ও গন্ধককে আবার পরস্পর হইতে ভিন্ন করিয়া দেওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত হিঙ্গুলে লোহিত বর্ণ থাকিবেই। মানবের জীবাত্মা যদি দেহগঠনকারী পঞ্চভূতের মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত হইত, তবে মানবের দেহটীও যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্লেষিত না হইত এবং আবার পঞ্চভূত পরস্পর হইতে ভিন্ন না হইত, ততক্ষণ তাহার দেহে চেতনা অবশ্যই থাকিত। কিন্তু, মানবের মৃত্যুর পরেই দেহ বিশ্লেষিত হইয়া যায় না; দেহ থাকেই, কিন্তু মৃতদেহে চেতনা থাকে না। মৃত মানবের দেহে মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সমস্তই থাকে, কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক চিন্তা করে না, চক্ষু দেখে না, কর্ণ ও শ্রবণ করে না। যে চেতনা দেহে থাকার ফলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত, মৃত্যুতে সেই চেতনা দেহ ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি মৃত এবং অচেতন হইয়া যায়। আবার, জীবিতকালে মানব প্রণয়, স্নেহ, বাৎসল্য, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি বৃত্তিগুলির ব্যবহার করিতে পারে, এবং তাহাদের ব্যবহারের ফলে আনন্দ প্রাপ্ত হয়। মানবের মৃতদেহ ঐ সকল বৃত্তির ব্যবহার করিতে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে না। যে আনন্দ দেহে থাকার ফলে মানব ঐ সকল বৃত্তির ব্যবহার করিয়া আনন্দ পাইত, মৃত্যুতে সেই আনন্দ দেহ ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় মৃতদেহ তাহা ব্যবহার করিতে এবং আনন্দ লাভ করিতে পারে না। মানবদেহে অবস্থিত, অথচ দেহাতীত এবং দেহ হইতে ভিন্ন এই যে চেতনা এবং আনন্দ, এই চিদানন্দই জীবাত্মা। জীবাত্মা দেহবাসী এবং দেহের অধীশ্বর, এইজন্য জীবাত্মাকে দেহী বলা হয়। এইরূপে, বিচারের দ্বারা জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমানপ্রমাণ পাওয়া যায় এবং ইহার উপর বিশ্বাস গঠন করিতে পারা যায়।

১।১।১০ ঈশ্বরের অস্তিত্ব : অনুমানপ্রমাণ

এই বিশ্বকে পর্য্যবেক্ষণ এবং বিশ্বব্যবস্থার সম্বন্ধে গবেষণা করিলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী দৃষ্টান্ত :—ডুবুরি সমুদ্রগর্ভে নামিয়া মুক্তা সংগ্রহ করে। সে মনে করিতে পারে যে, মুক্তাগুলি

আপনা আপনি জন্মায়। কিন্তু সে যদি তথায় একটি স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত মুক্তাহার প্রাপ্ত হয়, তখন সে ভাবিবে না যে ঐ মুক্তাহার আপনা আপনি জন্মিয়াছে এবং তথায় আসিয়াছে। যদিও সে কোন মনুষ্যকে ঐ মুক্তাহার নির্ম্মাণ করিতে এবং সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতে দেখে নাই, তথাপি সে অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, উহা কোন মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছে। যে বিচারের দ্বারা সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে তাহা এইরূপ :—"মুক্তাহারটী নির্ম্মাণ করিতে নিশ্চয়ই কাহারও ইচ্ছা হইয়াছিল। উহার নির্ম্মাণে কলাকৌশলের জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে। উহা নির্ম্মাণ করিতে ক্রিয়াশক্তির আবশ্যক হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় জ্ঞানশক্তি নৈপুণ্যের সহিত হারের পরিকল্পনা করিয়াছে এবং ক্রিয়াশক্তি সেই পরিকল্পনা অনুসারে হার নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, এবং জ্ঞানশক্তি শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা একত্রিত হইয়া হার নির্ম্মাণ করিয়াছে, এরূপ হইতে পারে না, কারণ শক্তি আধারেই থাকে। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, এবং ক্রিয়াশক্তি যে আধারে থাকিয়া এই মুক্তাহার নির্ম্মাণ করিয়াছে, মনুষ্য সেই শক্তিমান আধার। সুতরাং, মনুষ্য এই মুক্তাহার নির্ম্মাণ করিয়াছে।" যেরূপ বিচারের দ্বারা মুক্তাহারের নির্ম্মাতা মনুষ্য, এই সিদ্ধান্ত অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হইল, সেইরূপ বিচারের দ্বারা বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর, এই সিদ্ধান্তও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। এই বিশ্বের নির্ম্মাণে, বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর—সুবৃহৎ গ্রহতারকাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র স্থাবর এবং জঙ্গম দেহ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী বস্তুর নির্ম্মাণে কত সৃষ্টিকৌশল! এই বিশ্বের সৃষ্টির এবং স্থিতির ঘটনাসমূহে কি বিস্ময়জনক কৌশল! কি সুদৃঢ় নিয়ম! কি সুসংযত শৃঙ্খলা! অনন্ত ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, এবং ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত এই বিশ্বের সৃষ্টি এবং স্থিতি অসম্ভব। এই অনন্ত শক্তিত্রয় যে আধারে অবস্থিত, তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ামক, এবং পালক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। ঈশ্বরকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও, উক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা বিচারপূর্ব্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমানপ্রমাণ পাওয়া যায়, এবং ইহার উপরে বিশ্বাস গঠন করা যায়। চিকিৎসক দেহের মধ্যে অবস্থিত প্রাণকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, কিন্তু দেহে প্রাণের হৃৎস্পন্দনাদি ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েন। তদ্রূপ, বিশ্বে অবস্থিত বিশ্বপ্রাণ পরমেশ্বরকে ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করা না যাইলেও, বিশ্বের প্রতি

পদার্থে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, এবং ক্রিয়াশক্তির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয়হীন হইতে পারা যায়।

১।১।১১ শাস্ত্রপ্রমাণ

শাস্ত্র লিপিবদ্ধ অধ্যাত্মবিজ্ঞান। জড়বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের দ্বারা লব্ধ জড়বিজ্ঞান যে সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা জড়বিজ্ঞানশাস্ত্র। অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিকগণের অধ্যাত্মবিজ্ঞান যে সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানশাস্ত্র। শাস্ত্র শব্দটী সাধরণতঃ অধ্যাত্মবিজ্ঞানশাস্ত্র অর্থেই ব্যবহৃত হয়; এই গ্রন্থে তাহাই হইবে। জড়বস্তুবিষয়ক জ্ঞান যাঁহারা চাহেন, তাঁহারা জড়বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, লিপিবদ্ধ জড়বিজ্ঞানকে মিথ্যা মনে করিয়া অবিশ্বাস করেন না, এবং অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন। যাঁহারা অধ্যাত্ম জ্ঞান চাহেন, তাঁহাদেরও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে মিথ্যা মনে করিয়া অবিশ্বাস করা অনুচিত; শাস্ত্র পাঠ করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যাঁহারা অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, শাস্ত্রোল্লিখিত অধ্যাত্মবিজ্ঞান অভ্রান্ত সত্য; এবং তাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্বকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ঘোষণাও করিয়াছেন। যোগসিদ্ধ, অধ্যাত্মবিজ্ঞানপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণের এই ঘোষণায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শাস্ত্রতত্ত্বকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ লব্ধ হয়। শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা বিশ্বাস গঠন করিয়া, সেই বিশ্বাসকে প্রতিপাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্মযোগসাধনা করিলে বিশ্বাস বিজ্ঞানে পরিণত হইবে। তখন উপলব্ধি হইবে যে, সত্যই শাস্ত্র লিপিবদ্ধ অধ্যাত্মবিজ্ঞান। ইহা সত্য যে শাস্ত্রের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে; শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্র পাঠ করিলে কোন্‌গুলি প্রক্ষিপ্ত অংশ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

১।১।১২ শাস্ত্রপরিচয়

সমগ্র শাস্ত্রকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীকে প্রস্থান বলা হয়। প্রস্থানত্রয়ের নাম :—(১) শ্রুতিপ্রস্থান, (২) স্মৃতিপ্রস্থান, (৩) ন্যায়প্রস্থান। প্রস্থানত্রয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—(১) শ্রুতিপ্রস্থান—বেদকে

শ্রুতিপ্রস্থান বলা হয়। বেদ সকল শাস্ত্রের মূল। স্বয়ং ঈশ্বর বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "বেদ" শব্দের অর্থ, যদ্দ্বারা সত্য জ্ঞান লাভ করা যায়। "বেদ" নামক তত্ত্ববিজ্ঞান স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত বলিয়া বেদ অপৌরুষেয়, স্বতঃপ্রমাণ এবং স্বতঃসিদ্ধ। বেদের তত্ত্ব প্রমাণ করিতে হয় না। প্রাচীনকালে বেদ লিপিবদ্ধ ছিল না; গুরুর নিকট হইতে শ্রুতির দ্বারা, অর্থাৎ শ্রবণ করিয়া, শিষ্য বেদ শিক্ষা করিতেন বলিয়া বেদের অন্য নাম শ্রুতি। ব্যাসদেব বেদের তত্ত্বের পারম্পর্য্য এবং সামঞ্জস্য অনুসারে সমগ্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বেদের চারিটী ভাগের নাম, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ; অথর্ব্ববেদ। পরবর্ত্তীকালে যজুর্ব্বেদ শুক্লযজুর্ব্বেদ এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ নামক দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বেদের দুইটী করিয়া ভাগ আছে, পূর্ব্বকাণ্ড অর্থাৎ প্রথম ভাগ, উত্তরকাণ্ড অর্থাৎ শেষভাগ। পূর্ব্বকাণ্ডে প্রধানতঃ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্মের বিধি ও বিধান আছে বলিয়া ইহাকে কর্ম্মকাণ্ডও বলা হয়। উত্তরকাণ্ডে উপনিষৎসমূহ সন্নিবেশিত আছে এবং উপনিষৎসমূহে অধ্যাত্মবিজ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া উত্তরকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডও বলা হয়। মুক্তিকোপনিষদে পাওয়া যায় যে, মোট ১১৮০ খানি উপনিষৎ ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ১০৮ খানি উপনিষদের নাম মুক্তিকোপনিষৎ উল্লেখ করিয়াছেন। এখন এই ১০৮ খানি উপনিষদও পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যেও অনেকগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেগুলি বর্তমান আছে, তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর নাম এবং উহারা কোন্ বেদের অন্তর্গত তাহা লিখিত হইতেছে। ঐতরেয় নামক উপনিষৎ ঋগ্বেদের অন্তর্গত। ঈশ এবং বৃহদারণ্যক নামক দুইটী উপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত; বৃহদারণ্যক শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত। কেন এবং ছান্দোগ্য নামক দুইটী উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, এবং গোপালতাপনী নামক চারিটী উপনিষৎ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। উপনিষৎগুলি শ্রুতির অর্থাৎ বেদের অন্তর্গত বলিয়া উহারাও শ্রুতি, উহারাও বেদ। উহারা বেদের অন্তে অর্থাৎ শেষভাগে সন্নিবেশিত হওয়ায় উহাদিগকে বেদান্তও বলা হয়। বেদ ও বেদান্তে যে তত্ত্ববিজ্ঞান সন্নিবেশিত আছে, তাহা স্বয়ং ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন; ব্রহ্মা সৃষ্টির পরে দেবতা-গণকে এবং আদি ঋষিগণকে সেই জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাঁহারা ইহা তাঁহাদের শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। উপনিষৎসমূহের মধ্যে দেখা যায়,

কতকগুলিতে দেবতা এবং কতকগুলিতে ঋষি শিষ্যকে অধ্যাত্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন। ইহা দেখিয়া প্রশ্ন হইতে পারে, যখন দেবতা এবং ঋষি উপনিষদের তত্ত্ববক্তা, তখন, উপনিষদের তত্ত্ববিজ্ঞান সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বয়ং ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে বলা যাইবে এবং দেবতার ও ঋষির কথিত তত্ত্ব কিরূপে অপৌরুষেয় ও স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে? উত্তর ঃ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গুরুর নিকট হইতে শিষ্য শ্রবণ করিয়া বেদ-বেদান্ত শিক্ষা করিতেন এবং এইজন্য বেদ-বেদান্তের অন্য নাম শ্রুতি। গুরুর নিকট গমন করিয়া এবং তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া শিষ্য গুরুর মুখ হইতে বেদান্তবিজ্ঞান শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করিতেন বলিয়া বেদান্তের অন্য নাম উপনিষৎ। উপনিষদে তত্ত্ববিজ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া উপনিষৎ শব্দে তত্ত্ববিজ্ঞানও বুঝায়। উপনিষদের তত্ত্ববিজ্ঞানবক্তা দেবতা ও ঋষিগণ নিজ নিজ গুরুর নিকট যে বেদান্ত-বিজ্ঞান শ্রবণ করিয়া অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, যোগসাধনার দ্বারা সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিবার পরে গুরুর নিকট হইতে শ্রুত সেই তত্ত্ববিজ্ঞান তাঁহারা উপনিষদে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেছেন। অতএব, দেবতা এবং ঋষিগণ উপনিষদে যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বয়ং ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রদত্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞান। বেদান্তে ঈশ্বরতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব অধ্যাত্মযোগসাধনার তত্ত্ব, সমস্তই উপদিষ্ট হইয়াছে। স্বয়ং ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে এই বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে কোন দেবতার বা মানবের উহা লাভ করিবার সাধ্য ছিল না; কারণ ঈশ্বর আপনাকে আপনিই জানেন, এবং তিনি আপনাকে না জানাইলে তাঁহাকে জানিবার সাধ্য কাহারও নাই। ঈশ্বর পরম এবং আদি অধ্যাত্মবৈজ্ঞানিক; তিনিই পরম এবং আদি গুরুরূপে বেদ-বেদান্তের অধ্যাত্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইজন্য, বেদান্তে ঈশ্বর, সৃষ্টি, মানব, যোগসাধনা প্রভৃতি বিষয়ে যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান সন্নিবেশিত আছে, তাহা দেবতা এবং ঋষিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইলেও ঈশ্বরদত্ত, এবং ঈশ্বরদত্ত বলিয়া অপৌরুষেয়, স্বতঃপ্রমাণ এবং স্বতঃসিদ্ধ। (২) স্মৃতিপ্রস্থান—পুরাণ, উপপুরাণ ইতিহাস এবং সংহিতা, এইগুলিকে স্মৃতিপ্রস্থান বলা হয়। বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি অষ্টাদশ মহাপুরাণ আছে। ভাগবতও মহাপুরাণ; ইহা পারমহংস্য সংহিতা। উপপুরাণও অনেক আছে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, এইগুলি ইতিহাস।

গীতা মহাভারতের অন্তর্গত এবং চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। ব্রহ্মসংহিতা, মনুসংহিতা, অত্রিসংহিতা প্রভৃতি সংহিতা নামক শাস্ত্রগুলিও স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্গত। স্মৃতিপ্রস্থান বেদ-বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ। ইহা পড়িলে বেদ-বেদান্তের যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায়। (৩) ন্যায়প্রস্থান—সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব-মীমাংসা, উত্তরমীমাংসা, বৈশেষিক, এবং ন্যায়, এই ষড়দর্শনকে ন্যায়প্রস্থান বলা হয়। ন্যায়প্রস্থানও বেদ-বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ। এই প্রস্থানত্রয় ব্যতীত তন্ত্র নামক আর এক শ্রেণীর শাস্ত্র আছে। গৌতমীয় তন্ত্র, রাধাতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, বিশ্বসারতন্ত্র প্রভৃতি অনেকগুলি তন্ত্রশাস্ত্র আছে। প্রত্যেকটী প্রস্থান, প্রত্যেক প্রস্থানের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শাস্ত্রগ্রন্থ, এবং প্রতেকটী তন্ত্রও শাস্ত্র; কিন্তু শাস্ত্র বলিতে প্রস্থানত্রয় এবং তন্ত্রসমূহকে সমগ্রভাবে বুঝায়। সমগ্র শাস্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। সমগ্র শাস্ত্র যেন একখানি দলিল। যেমন একটী দলিলের একাংশ পাঠ করিয়া দলিলটীর মর্ম্মবোধ করা যায় না, এইরূপে দলিলের মর্ম্মবোধ করিবার চেষ্টাও নিয়মবিরুদ্ধ, এবং সমগ্র দলিলটি পড়িয়া উহার মর্ম্মবোধ করিতে হয়, তদ্রূপ, সমগ্র শাস্ত্রের কোন একটী অংশ পাঠ করিয়া যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। সমগ্র শাস্ত্র পাঠ করিয়া, এবং সমগ্র শাস্ত্রের সর্ব্বাংশের সমন্বয় সাধন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়। ব্রহ্মসূত্র এই উপদেশই দিয়াছেন ঃ

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র। ১।১।৩—৪

—"ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার উপায় শাস্ত্র, কিন্তু সমগ্র শাস্ত্রের সমন্বয়পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে হইবে।" সমন্বয়সাধনের দ্বারা শাস্ত্রতত্ত্ব নির্ণয় না করিবার ফলে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ বলেন যে, সমগ্র শাস্ত্রের কোন অংশের সহিত অন্য কোন অংশের বিরোধ নাই; সমন্বয়সাধনের অভাবে মতভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হইয়াছে। অনেকে ভাবিতে পারেন, সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সমন্বয়পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা কর্ম্মব্যস্ত জগতের মানবের পক্ষে সম্ভব নহে; এমন কোন শাস্ত্রগ্রন্থ কি নাই, যাহা পাঠ করিলে সমগ্র শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান তাহা হইতেই পাওয়া যায়?—অবশ্যই এরূপ শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। গীতা এবং ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রসার, শাস্ত্রসাগরমন্থনোদ্ভূত অমৃত। গীতামাহাত্ম্যে আছে ঃ

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থ বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

—"সমস্ত উপনিষৎ গাভীস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ সেই গাভীর দোহনকর্ত্তা; অর্জ্জুন বৎস; সুধী ব্যক্তিগণ ভোক্তা; এবং মহান্ গীতামৃত তাহার দুগ্ধ।" ভাগবত সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন ঃ

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ গরুড়পুরাণ

—"শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্র এবং গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ; ইহাতে মহাভারতের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, এবং সমগ্র বেদের অর্থদ্বারা ইহা পরিপুষ্ট হইয়াছে।" ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে ঃ

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ভাগবত ।১২।১৩।১২

—"শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার। ইহা পাঠ করিয়া যিনি পরিতৃপ্ত হয়েন, তাঁহার অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ থাকে না।" সর্ব্বশাস্ত্রসার বলিয়া ভাগবতকে পারমহংস্য সংহিতা বলা হইয়াছে। ভাগবত জ্ঞান ও প্রেমের পুলকপ্লাবন। এইজন্য, ইহা পাঠ করিলে অন্য শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ থাকে না। রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া গীতা ও ভাগবত পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হয়। অন্ততঃ এই চারিখানি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ না করিয়া বেদান্ত পাঠ করিলে বেদান্তের মর্ম্ম, অভিপ্রায়, এবং তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না।

১।১।১৩ শাস্ত্রাধ্যয়ন

শাস্ত্রাধ্যয়ন অধ্যাত্মযোগসাধনা নহে, যোগসাধনার একটী অঙ্গ। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিজ্ঞান লাভ করা যায় না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা দূরের কথা, পণ্ডিত এবং তার্কিক হইলেই যে সাধু, সচ্চরিত্র, এবং ধার্ম্মিক হইবেই, তাহাও নহে। শ্রুতি বলেন ঃ

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। কঠ।১।২।২৩

—"বেদ-বেদান্ত অধ্যয়নের দ্বারা, অথবা মেধার দ্বারা, অথবা বহু শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।" গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে যে জ্ঞানলাভের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রশ্রবণ বা অধ্যয়ন লব্ধ জ্ঞান নহে, তাহা যোগলব্ধ বিজ্ঞান।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ গীতা।৪।৩৯

—"ইহলোকে জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছু নাই। যোগসাধনায় সম্যক্ সিদ্ধ ব্যক্তি যথাকালে স্বীয় আত্মাতেই সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।" যোগসাধনায় সম্যক্ সিদ্ধ ব্যক্তি অনন্তজ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত যুক্তাবস্থা লাভ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বদর্শী হয়েন। যদিও অধ্যয়নের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তথাপি অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। যেমন ঃ—মধু নামক বস্তুটীর অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞ কোন ব্যক্তি পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইল যে মধু নামক একটী বস্তু আছে এবং তাহার সৌরভ ও সুস্বাদ অনুপম। এই জ্ঞানের দ্বারা মধুর সম্বন্ধে তাহার বিজ্ঞান লাভ হইল না, কিন্তু মধু সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞানলাভের ইচ্ছা তাহার হইল। এই ইচ্ছার ফলে সে চেষ্টার দ্বারা মধু সংগ্রহ করিল এবং মধুর সহিত সংযোগের দ্বারা মধুর সৌরভ এবং সুস্বাদ সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিল। সেইরূপ, শাস্ত্র ও সৎগ্রন্থ পাঠ করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছা হয়, ইচ্ছার ফলে যোগসাধনা, এবং যোগসাধনার ফলে বিজ্ঞান লাভ হয়।

১।১।১৪ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা

সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করিলে অধ্যাত্মযোগসাধনা হয় না এবং জীবাত্মাকে ও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষও করা যায় না। জড়বিজ্ঞানলাভের জন্যও ছাত্ররূপে শিক্ষকের নিকট বহু শিক্ষালাভের প্রয়োজন হয়। যিনি বিদ্যুত্তত্ত্ব জানিতে চাহেন তাঁহাকে বিদ্যুত্তত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের ছাত্র হইয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয়। যিনি আলোকতত্ত্ব শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাকে আলোকতত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের ছাত্র হইয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয়। যিনি যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন, সেই বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাঁহার ছাত্ররূপে তাঁহাকে সেই বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। অধ্যাত্মতত্ত্বও অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ গুরুর শিষ্য হইয়া শিক্ষা করিতে হয়। শ্রুতি বলেন ঃ

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। মুণ্ডক। ১।২।১২

—"ঈশ্বর সম্বন্ধে বিজ্ঞানলাভের জন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।" সদ্‌গুরু কে এবং কেমন, তাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। এবিষয়ে যথাস্থানে

২

আলোচনা করা হইবে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। শ্রুতি বলেন ঃ

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ঃ। কঠ। ১।২।৮

—"মায়াবদ্ধ এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তির উপদেশের দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করা যায় না।"

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ॥ কঠ। ১।২।৯

—"তার্কিক পণ্ডিতগণের উপদেশের দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করা যায় না। যিনি ইহাদের হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং অধ্যাত্মযোগসাধনায় সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশের দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করা যায়।"

স এব সদ্‌গুরুর্যঃ সদসদ্‌ব্রহ্মবিত্তমঃ। গুরুগীতা

—"যাঁহারা পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি সদ্‌গুরু।" এইরূপ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্মযোগসাধনা করিলে অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায়। যিনি স্বয়ং বিজ্ঞান লাভ করেন নাই, তিনি অন্যকে বিজ্ঞান লাভ করাইতে পারেন না। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া যাঁহারা অন্যরূপ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অবস্থা—

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। মুণ্ডক। ১।২।৮

—"অন্ধ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত অন্ধ ব্যক্তির মত।" এবিষয়ে শাস্ত্রের সতর্কবাণী জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকঃ।
দুর্ল্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥ গুরুগীতা

—মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "হে দেবি, শিষ্যের বিত্তাপহরণকারী গুরু অনেক আছে ; শিষ্যের সন্তাপ হরণ করিতে পারেন, এরূপ গুরু দুর্ল্লভ।" যাঁহারা সাধুবেশ ধারণ করিয়া, আপনাদিগকে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে লোকসমাজে প্রচার করিয়া, শিষ্যগণের নিকট হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য গুরুগিরি ব্যবসা করিতেছেন, শাস্ত্র তাঁহাদিগকে প্রতারক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

যে দত্ত্বা সহজানন্দং হরন্তীন্দ্রিয়জং সুখম্।

সেব্যাস্তে গুরবঃ শিষ্যৈরণ্যে ত্যাজ্যাঃ প্রতারকাঃ॥ কুলার্ণব তন্ত্র

—"যাঁহারা সহজানন্দ দিয়া ইন্দ্রিয়জ সুখ হরণ করেন, অর্থাৎ মানবের দেহাভিমান দূর করিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলনের আনন্দ সম্ভোগ করাইতে পারেন, সেইরূপ গুরু শিষ্যের দ্বারা সেব্য। অন্যে, অর্থাৎ যাহারা তাহা করিতে পারে না অথচ অর্থোপার্জ্জনের অথবা সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য গুরুগিরি ব্যবসা করে, তাহারা প্রতারক এবং পরিত্যজ্য।" অনেকেই এইরূপ ব্যবসাদার গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনা করিয়াও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া যোগসাধনায়, এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে এবং তাহাদের ব্যর্থতার কথা শুনিয়া অন্যেও তাহাদের মত অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে। সুতরাং, অতি সাবধানে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া সদ্‌গুরু নির্ব্বাচন করিতে হয়। যথার্থ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্মযোগসাধনা করিলে জীবাত্মাকে এবং ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরসূত্র

১।২।১ ঈশ্বরসূত্র-নির্ব্বাচন

ঈশ্বর কি, ঈশ্বর কে, ঈশ্বর কেমন, ঈশ্বর কিরূপে আপনাকে বিস্তার করিয়াছেন, প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝা যায়। শাস্ত্র এই তত্ত্ববিজ্ঞানই দিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র সাগরদৃশ। সমগ্র শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় যাহার মধ্যে বীজাকারে নিহিত আছে, এমন একটী ঈশ্বরসূত্র শাস্ত্র সকলের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া প্রয়োজন। এইরূপ একটী ঈশ্বরসূত্র বাছিয়া লইয়া, সেই সূত্রটীর ব্যাখ্যা হইতেই শাস্ত্রে নিরূপিত সমুদয় ঈশ্বরতত্ত্বটী বুঝিতে পারা যাইবে।

১।২।২ "ঈশ্বর" শব্দ ব্যবহারের কারণ

প্রথমেই এইরূপ একটী প্রশ্ন হইতে পারে ঃ—বেদান্তে এবং ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব পরাতত্ত্বরূপে নিরূপিত হইয়াছে এবং বৈদান্তিকগণও 'ব্রহ্ম' শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে, 'ঈশ্বরসূত্র' এবং 'ঈশ্বরতত্ত্ব' শব্দ ব্যবহার না করিয়া বৈদান্তিকগণের ব্যবহৃত 'ব্রহ্মসূত্র' এবং 'ব্রহ্মতত্ত্ব' শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে না কেন? উত্তর ঃ—এই গ্রন্থে পরাতত্ত্বকে ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম না বলিয়া কেন ঈশ্বর বলা হইল, তাহার কারণ—প্রথম কারণ ঃ বেদান্তে ঈশ্বরকে পরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, অর্থাৎ, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঈশা বাস্যমিদং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। ঈশ। ১

—"অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসহ এই সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং তিনিই সমগ্র বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে থাকিয়া বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।" এখানে ঈশোপনিষৎ যাঁহাকে ঈশ, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিলেন, অন্য উপনিষদে তিনিই পরব্রহ্ম নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আরও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়

এই যে, যদিও এই উপনিষৎ পরব্রহ্মতত্ত্বই নিরূপণ করিয়াছেন, তথাপি ইহার "ব্রহ্মোপনিষৎ" নাম দেওয়া হয় নাই, 'ঈশোপনিষৎ' নাম দেওয়া হইয়াছে।

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ। শ্বেত।১।৮

—"নশ্বর জীব এবং অবিনশ্বর পরমাত্মার সহিত যুক্ত এই বিশ্বকে এবং ব্যক্ত বিশ্বের অব্যক্ত কারণকেও ঈশ্বর ধারণ ও পালন করেন।" আমরা পাইলাম যে, বেদান্ত পরব্রহ্মকে ঈশ্বরও বলিয়াছেন। ঈশ্বর বলিবার কারণও বেদান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন।

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ সর্ব্বাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ শ্বেত। ৩।১

—"ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত এবং স্বীয় শক্তি সমূহের দ্বারা স্বর্গমর্ত্তাদি লোকসকল সহ সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টির এবং স্থিতির ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই তত্ত্ববিজ্ঞান যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।" ঈশ্বর এবং পরব্রহ্ম যে একই, এখানে বেদান্ত কেবল তাহাই বলিলেন না; পরব্রহ্ম "ঈশতে ঈশনীভিঃ" দুইবার বলিয়া বেদান্ত জানাইলেন যে, তিনি ঈশনীভিঃ অর্থাৎ শক্তি সমূহের দ্বারা ঈশতে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া তাঁহারই নাম ঈশ্বর। অন্যান্য উপনিষদেও পরব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে।

সর্ব্বেশ্বরঃ এষ ॥ বৃহদারণ্যক।৪।৪।২২
এষ সর্ব্বেশ্বরঃ ॥ মাণ্ডুক্য। ৬

—"পরব্রহ্ম সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বর।"

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥ শ্বেত। ৬।৭-৮

—"যিনি কেশব, মাধব, নারায়ণ প্রভৃতি বৈকুণ্ঠস্থ ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বর, দেবতাগণের পরমদেবতা, প্রজাপতিগণের অধীশ্বর, বিশ্বে ব্যপ্ত প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সেই স্বপ্রকাশ ও পূজনীয় মহামহিমময় পরাতত্ত্বকে আমরা ঈশ্বর বলিয়া জানি। তাঁহা অপেক্ষা অধিক, অথবা তাঁহার সমানও কেহ দৃষ্ট হয় না।" এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, বেদান্তে ঈশ্বর এবং পরব্রহ্ম একই তত্ত্বরূপে নিরূপিত হইয়াছেন। সুতরাং, আমরা পরাতত্ত্বকে ঈশ্বর

বলায় আমাদের বাক্য শ্রুতিবিরোধী হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ ঃ—উপনিষদের তত্ত্ব সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বভৌমিক সত্য। কিন্তু উপনিষদের শব্দবিন্যাস অতীব দুর্ব্বোধ্য। এক 'ব্রহ্ম' শব্দটীই উপনিষদগুলির নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোথাও পরব্রহ্ম, কোথাও পরমাত্মা, কোথাও অপরব্রহ্ম, এবং কোথাও জীবাত্মা অর্থে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "আত্মা" শব্দটিও ঠিক ঐরূপভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকরণ ও বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ দুইটি শব্দ কোথায় কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হয়। উপনিষদের ভাষ্যকার পণ্ডিতগণের মধ্যেই অনেকে উপনিষদের তত্ত্ব যথার্থরূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই, সর্ব্বসাধারণের কথা বলাই বাহুল্য। সকল ভাষ্যকারগণই যদি উপনিষদের যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন, তবে সকলেই একই সার্ব্বভৌমিক সত্যের সন্ধান পাইতেন, এবং সকলের ভাষ্যেই সেই এক সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বেরই প্রকাশ দেখা যাইত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, ভাষ্যকারগণ পরস্পর বিরোধী ভাষ্য এবং মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ভাষ্যকারগণের মধ্যে সকলেই উপনিষদের যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। বেদান্ততত্ত্ব-বোধের জন্য যাঁহারা ভাষ্য পাঠ করেন, প্রায়ই তাঁহারা ভাষ্যকারের মতবাদের মধ্যে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলেন, যথার্থ তত্ত্বের সন্ধান পান না। বেদান্তের ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বী বৈদান্তিকগণের অফুরন্ত জটিল তর্কপ্রবাহ এবং পরস্পরবিরোধী মতবাদ "ব্রহ্ম" শব্দটীকে জনসাধারণের নিকট বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু "ঈশ্বর" শব্দটীর সহিত সর্ব্বসাধারণ সুপরিচিত, এবং ইহা সাধারণ্যে ভীতিপ্রদ নহে। বিশ্বের স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা, এবং প্রলয়কর্ত্তাকে বুঝাইতে সর্ব্বসাধারণ "ব্রহ্ম" শব্দটী ব্যবহার করে না, "ঈশ্বর" শব্দই ব্যবহার করে। এই গ্রন্থে পরাতত্ত্বকে ব্রহ্ম না বলিয়া ঈশ্বর বলিবার ইহাই দ্বিতীয় কারণ।

১।২।৩ নির্ব্বাচিত ঈশ্বরসূত্র

যেরূপ একটী ঈশ্বরসূত্র নির্ব্বাচনের আবশ্যকতার বিষয় বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসংহিতায় এরূপ একটী ঈশ্বরসূত্র পাওয়া যায়। ব্রহ্মসংহিতা হইতে যে ঈশ্বরসূত্র নির্ব্বাচিত হইল, তাহা এই ঃ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

অতঃপর আমরা এক-একটী পদের ব্যাখ্যা করিব। এইরূপে সমগ্র সূত্রটীর ব্যাখ্যা হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যাইবে

১।২।৪ অনুবাদ ও বিধেয়

নির্ব্বাচিত ঈশ্বরসূত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শাস্ত্রবাক্যের শব্দবিন্যাস-রীতি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রবাক্যের শব্দবিন্যাস নিয়মানুসারে হইয়া থাকে; ইহা সাধারণ মানবের শব্দবিন্যাসের মত অসংলগ্ন এবং নিয়মহীন নহে। প্রত্যেক তত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রবাক্যের মূলে একটী অভিপ্রায় থাকে। সেই অভিপ্রায় অনুসারে শাস্ত্র যে বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞাত তত্ত্বের প্রথমে উল্লেখ করিয়া পরে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তত্ত্বের উল্লেখ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞাত তত্ত্বটীকে অনুবাদ বলা হয়, এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তত্ত্বকে সেই অনুবাদের বিধেয় বলা হয়। নির্ব্বাচিত ঈশ্বরসূত্রে ঈশ্বর শব্দটী অনুবাদ, কারণ যাহা কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, ঈশ্বর তৎসমুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা, এই সাধারণ জ্ঞান মানবের আছে বলিয়া ঈশ্বর জ্ঞাত বিষয়। এই কারণে নির্ব্বাচিত ঈশ্বরসূত্রে অনুবাদ ঈশ্বরকে সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করিয়া তৎপরে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। ঈশ্বরের পরে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় ঈশ্বরের বিধেয়। সূত্রে অনুবাদ এবং বিধেয় যেরূপভাবে সংন্যস্ত হইয়াছে, আমরা সেইরূপভাবেই ব্যাখ্যা করিয়া উহা হইতে ঈশ্বর তত্ত্বটী প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান অধ্যায়ে "ঈশ্বরঃ" সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর-পরিচয়

১।৩।১ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তা

ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বের এক ও অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তা। একই ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, পালক, এবং প্রলয়কর্ত্তা, এইজন্য এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা। কেবল আমাদের এই জগতেরই নহে, সমগ্র বিশ্বের সকল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালক, এবং প্রলয়কর্ত্তা একই ঈশ্বর। কেবল আমাদের এই জগতবাসী জীবগণেরই নহে, নিখিল বিশ্বের সকল ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবগণেরই স্রষ্টা, পালক, এবং প্রলয়কর্ত্তা একই ঈশ্বর। এইজন্য, ঈশ্বরের অদ্বয়ত্ব সার্ব্বভৌমিক। ঈশ্বর জন্মমৃত্যুহীন এবং নিত্যসত্য বলিয়া সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর অনন্ত কালের ঈশ্বর। মৃত্যুর ফলে অথবা অন্য কারণে রাজ্যের রাজার পরিবর্ত্তন হয়; এক রাজা যায়, অন্য রাজা আসে; কিন্তু ঈশ্বরের পরিবর্ত্তন নাই; এক গিয়া অন্য ঈশ্বর আসে না। অদ্বিতীয় ঈশ্বর অনন্তকালের ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব সার্ব্বকালিক। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব শ্রুতি-নিরূপিত তত্ত্ব।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কঠ। ২।২।১২

একমেবাদ্বিতীয়ম্। ছান্দোগ্য। ৬।২।২

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ;

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥ শ্বেত।৩।১

—"সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তিযুক্ত। তিনি স্বীয় শক্তি সমূহের দ্বারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত, সর্ব্বব্যাপী, এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।" ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব সার্ব্বভৌমিক বলিয়া তিনি সর্ব্বেশ্বর।

এষ সর্ব্বেশ্বরঃ। মাণ্ডূক্য। ৬

ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব সার্ব্বকালিক বলিয়া তাঁহার অপেক্ষা অধিক পুরাতন, অথবা তাঁহার সমান পুরাতনও কেহ বা কিছুই নাই।

তং দুর্দ্দর্শং······পুরাণম্। কঠ।১।২।১২

পুরুষঃ পুরাণঃ। গীতা। ১১।৩৮

পুরাণমনুশাসিতারম্। গীতা। ৮।৯

ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বভৌমিক বলিয়া এই জগতের যে কোন দেশের যে কোন মানব ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁহারা সকলেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভজনা করেন; এই বিশ্বের অন্তর্গত যে কোন ব্রহ্মাণ্ডেরও যে কেহ যে কোন নামে বা রূপে ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁহারাও এই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভজনা করেন। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর আপনাকে বহু নামে ও রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি। ঋক্। ১।১৬৪।৪৬

যো দেবানাং নামধা এক এব। ঋক্। ১০।৮২।৩

—"ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় পরম সত্য। বিপ্রগণ বলেন, সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরই আপনাকে বহু নামে ও রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর অনেক দেবতার নামে আপনাকে প্রকাশ করিয়া অনেক নাম ধারণ করিয়াছেন।" ঈশ্বরের এই অদ্বিতীয়ত্ব বিস্মৃত হইলেই সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়।

১।৩।২ ঈশ্বর স্রষ্টা

ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই তত্ত্ব সকল শাস্ত্রই নিরূপণ করিয়াছেন।

সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত।

স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৈত্তিরীয় ।২।৬

—"ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, 'আমি প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইব।' স্বীয় অনন্ত জ্ঞানশক্তির ব্যবহারের দ্বারা তিনি সমগ্র বিশ্বের পরিকল্পনা করিয়া স্থাবরজঙ্গমসহ বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন।" সৃষ্টি করার অর্থ এরূপ নহে যে, তিনি নিজ হইতে ভিন্ন কোন বস্তু লইয়া তদ্দ্বারা বিশ্বকে নির্ম্মাণ করিলেন; কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুই ছিল না। "সৃষ্টি করিলেন", ইহার অর্থ এই যে, তিনি নিজেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বে পরিণত হইলেন। "আমি বহু হইব," এই

বাক্যের দ্বারাই ঈশ্বর বলিলেন যে তিনি স্বয়ং বিশ্বরূপে পরিণত হইবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন :

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে… । তৈত্তিরীয়। ৩।১

—"যাঁহা হইতে এই ভূত সমূহ উৎপন্ন হয় তিনি ব্রহ্ম।" "যাঁহার দ্বারা" এইরূপ বাক্য শ্রুতি প্রয়োগ করেন নাই। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকার দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে বিশ্বসৃষ্টি সেরূপ ব্যাপার নহে। তিনি আপনা হইতেই বিশ্বকে উৎপন্ন করিয়াছেন।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গা সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাহক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপযান্তি ॥ মুণ্ডক।২।১।১

—"যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তেমনই ঈশ্বর হইতে নানাবিধ সত্ত্বা উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।" অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত যাহা কিছু বস্তু ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদয়ই উক্ত শ্রুতিবাক্যের "বিবিধাঃ ভাবাঃ" অর্থাৎ "নানাবিধ সত্ত্বা" শব্দদ্বয়ের দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম ॥ মুণ্ডক।১।১।৭

—"যেমন মাকড়সা আপনা হইতেই সূতা উৎপন্ন করিয়া তাহা আপনার মধ্যে গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, যেমন জীবন্ত পুরুষের দেহ হইতে কেশ ও লোম উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।" এই দৃষ্টান্তগুলির দ্বারা এই তত্ত্বই সুপরিস্ফুট করা হইয়াছে যে, ঈশ্বর আপনা হইতেই এই বিশ্বকে উৎপন্ন করিয়াছেন।

১।৩।৩ ঈশ্বর পালক

বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর বিশ্বকে পালন করিতেছেন এবং বিশ্ব তাঁহাতেই আশ্রিত, ইহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা। শ্বেতাশ্বতর।৪।১৫

তস্মিল্লোঁকা শ্রিতাঃ সর্ব্বে। কঠ।২।৩।১

—"বিশ্বসৃষ্টির পর ঈশ্বরই বিশ্বকে পালন করেন। নিখিল বিশ্ব ঈশ্বরে আশ্রিত।"

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। গীতা।১৫।১৩

—কৃষ্ণ বলিতেছেন, "বিশ্বের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমি স্বীয় শক্তির দ্বারা ভূতগণকে ধারণ করিয়া থাকি।" ঈশ্বরের বিশ্বপালনকার্য্যটী যে কি বিরাট, তাহা ধারণা করাও মানবের পক্ষে অসম্ভব। কয়েকটি পালনকার্য্যের উল্লেখ করিলে ইহার বিপুলতার কিছু ধারণা হইবে। বিশাল বিশ্বের অসংখ্য সৌরমণ্ডলকে তিনি স্বীয় শক্তিতে স্ব স্ব স্থানে রক্ষা করিতেছেন। তিনি কালরূপে মাস, ঋতু, এবং বৎসর হইয়া আছেন। তিনি প্রাণরূপে দেহের জীবন, চেতনারূপে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের চেতনা, বিবেকরূপে পাপপুণ্যের সংস্কার, এবং ধর্ম্মরূপে জীবগণের ধারণকর্ত্তা। তিনি জীবের জীবনধারণোপ-যোগী খাদ্যপানীয়ের বিধান করিতেছেন, তিনিই জঠরাগ্নিরূপে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিতেছেন। তাঁহার অনন্ত প্রকারের পালনকার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। বিশ্বের পালনের জন্য তিনি নিয়ত অনলসভাবে কর্ম্ম করিতেছেন।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্। গীতা।৩।২৪

কৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমি যদি কর্ম্ম না করি, ত্রিলোক ধ্বংস হইয়া যাইবে।" বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া বিশ্বের স্থিতির জন্য ঈশ্বর নিয়ত অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে: তিনি কি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা নিজ হস্তে সকল কর্ম্ম করিতেছেন? উত্তর: তিনি নিজ হস্তেই সকল কর্ম্ম করিতেছেন না; তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহারই শক্তিসমূহ কর্ম্ম করিতেছেন। বিশ্বের পালনাদি কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য তিনি তাঁহার বিবিধ শক্তিকে বিবিধ রূপে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাও পালনকর্ম্মের জন্য। তাঁহার সকল কর্ম্মই দিব্য কর্ম্ম; ইহাতে তাঁহার বিষয়াসক্তি নাই, এইজন্য তাঁহার কোন বন্ধন নাই এবং কর্ম্মফলভোগও নাই।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। গীতা।৪।১৪

—কৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমার কর্ম্ম আমার বন্ধন সৃষ্টি করে না, কারণ আমার কর্ম্মফল-লাভের কামনা নাই।" ঈশ্বরের সকল কর্ম্মই তাঁহার লীলা।

১।৩।৪ ঈশ্বর প্রলয়কর্ত্তা

বিশ্বস্রষ্টা এবং বিশ্বপালক ঈশ্বরই বিশ্বের প্রলয়কর্ত্তা। ঈশ্বর যখন আপনা

হইতে উৎপন্ন বিশ্বকে আপনার মধ্যেই উপসংহৃত করিয়া লয়েন, তখন বিশ্বের বাহ্যস্থিতি থাকে না; তখন বিশ্ব তাঁহার মধ্যে প্রলীন হইয়া থাকে। ইহাই বিশ্বের প্রলয়। প্রলয়ের পরে বিশ্বের পুনরাবর্ত্তন হয়। এইরূপে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। সংসারাবর্ত্তে ভ্রাম্যমান ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণকে স্ব স্ব কর্ম্মফলভোগ হইতে দীর্ঘকালের জন্য বিরতি দিবার নিমিত্ত প্রলয়ের আবশ্যক, যেমন দিবসের কর্ম্মক্লিষ্ট জীবগণের রাত্রিতে সুষুপ্তির আবশ্যক। ঈশ্বর বিশ্বের প্রলয়কর্ত্তা, ইহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৈত্তিরীয় ।৩।১

নিলয়ঞ্চানিলয়ঞ্চ। তৈত্তিরীয় ।২।৬

—"প্রলয়ে বিশ্ব ঈশ্বরে বিলীন হইয়া থাকে। তিনিই বিশ্বের নিলয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থল এবং অনিলয়ন অর্থাৎ প্রলয়কর্ত্তা।"

সংচুকোচান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ। শ্বেত ।৩।২

—"ঈশ্বর নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এবং প্রলয়ে তিনি বিশ্বকে আপনারই মধ্যে উপসংহৃত করিয়া লয়েন।" এক্ষণে দেখা গেল যে, ঈশ্বর বিশ্বের সৃজন, পালন, এবং প্রলয় করেন। তিনি বিশ্বের নিয়ামক এবং নিয়ন্ত্রণকারী। প্রশ্ন হইতে পারে: ব্রহ্মা বিশ্বের স্রষ্টা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, এবং রুদ্র প্রলয়কর্ত্তা, শাস্ত্রে এইরূপ উক্তিও আছে। তাহা হইলে ঈশ্বর কিরূপে স্রষ্টা, পালক, ও সংহারক হইলেন? উত্তর: ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইঁহারা ঈশ্বরের ত্রিবিধ শক্তির তিনটি রূপ। রাজা রাজ্যপালনের সকল কার্য্য নিজহস্তে করেন না। তিনি বহু রাজপুরুষ নিয়োগ করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা রাজ্যপালনের কার্য্য সম্পাদন করেন। এই সমস্ত রাজপুরুষ রাজার রাজশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তেমনই, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এবং ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণও, ঈশ্বরের বিবিধ শক্তির বিবিধ রূপ। সকলেই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের "বিবিধাঃ ভাবাঃ"।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ভাগবত ।২।৬।৩০

—ব্রহ্মা বলিতেছেন, "ঈশ্বরের নিয়োগে আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি, রুদ্র তাঁহারই অধীনে বিশ্ব সংহার করেন। ত্রিশক্তিধারী ঈশ্বর বিষ্ণুরূপে বিশ্ব পালন করেন।"

১।৩।৫ ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান

শক্তি ব্যতীত কোন কর্ম্মই সম্পাদিত হইতে পারে না। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি পালন প্রভৃতি সমস্তই ঈশ্বরের কর্ম্ম। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এবং তাঁহার সকল শক্তিই অনন্ত বলিয়া তিনি এই সকল বিরাট কর্ম্ম সম্পাদন করেন। ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব হইতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বতঃ প্রমাণিত হয়, কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান না হইলে সর্ব্বনিয়ন্তা হইতে পারেন না। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে "ব্রহ্ম নিঃশক্তি", মায়াবাদীর এই মত অসার ও অসত্য। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, ইহা সকল শাস্ত্রই নিঃসংশয়রূপে ঘোষণা করিয়াছেন। কেনোপনিষৎ নিম্নলিখিত আখ্যায়িকার দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। কেন। ৩।১

—"ব্রহ্মই দেবগণের নিমিত্ত জয়লাভ করিলেন।" ইহা বলিয়া উক্ত শ্রুতি যে ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন তাহা এই :— দেবতাগণ অসুরগণকে পরাজিত করিয়া ভাবিলেন যে, তাঁহারা স্বীয় শক্তিতেই বিজয়ী হইয়াছেন এবং ঐ জয়লাভের গৌরব তাঁহাদেরই। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম তাঁহাদের এই মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথার্থ তত্ত্ব জানাইবার জন্য যক্ষের রূপ ধারণ করিয়া দেবতাগণের দৃষ্টিগোচর হইলেন। স্বয়ং ঈশ্বরই যে যক্ষরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, দেবতাগণ তাহা জানিতে পারিলেন না। ঐ যক্ষ কে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা অগ্নিদেবতাকে অনুরোধ করিলে অগ্নি যক্ষের নিকট গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি অগ্নি"। যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শক্তি কিরূপ ?" অগ্নি বলিলেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমুদয়ই দগ্ধ করিতে পারি।" তখন যক্ষ একটী তৃণ অগ্নির সম্মুখে ধারণ করিয়া উহা দগ্ধ করিতে বলিলেন, কিন্তু অগ্নি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। অগ্নি দেবতাগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত সংবাদ জানাইলে দেবতাগণ বায়ুকে প্রেরণ করিলেন। যক্ষ বায়ুকেও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন করিলে বায়ু বলিলেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় আমি উড়াইয়া লইতে পারি।" যক্ষ বায়ুদেবতার সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন, "ইহা গ্রহণ কর।" বায়ু সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণটীকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। বায়ুও দেবতাগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই

ঘটনা বিবৃত করিলে দেবতাগণ ইন্দ্রকে যক্ষের নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন। ইন্দ্র যক্ষের নিকট গমন করিবামাত্র যক্ষ তিরোহিত হইলেন। ইন্দ্র যক্ষের সন্ধানে যাইতে যাইতে হিমালয়দুহিতারূপে অবতীর্ণা আদ্যাশক্তি উমার দর্শন পাইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যক্ষ কে?" উমা বলিলেন, "ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই এই জয়লাভে তোমরা নিজদিগকে মহিমান্বিত মনে করিতেছ।" এতদ্বারা শ্রুতি দুইটী তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন: (১) ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান; (২) সমগ্র বিশ্বে যাহার যাহা কিছু শক্তি আছে, তৎসমুদয়ই ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির অংশমাত্র; অন্য কাহারও নিজস্ব কোন শক্তি নাই।

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ গীতা। ১০।৪১

—"যাহা কিছু বিভূতিমান, শ্রীমান, এবং শক্তিমান সত্ত্বা আছে, তৎসমুদয়ই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।" গীতায় ভগবানের এই উক্তি হইতেও উক্ত তত্ত্ব প্রমাণিত হইতেছে। বিশ্বকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও এই তত্ত্বটী প্রমাণিত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর ছিলেন; অন্য কিছুই ছিল না। বিশ্ব এবং বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশ্বস্থিত জল, অগ্নি, বায়ু, প্রাণীদেহ প্রভৃতিতে শক্তি আছে, ইহা সকলেরই সুবিজ্ঞাত। বিশ্বে যখন শক্তি রহিয়াছে, তখন তাহা অবশ্যই ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে। সুতরাং, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। এক্ষণে দেখা গেল যে, "ব্রহ্ম নিঃশক্তি," এই মত সম্পূর্ণ অসার ও অসত্য। আরও কয়েকটী শ্রুতিবাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ শ্বেত। ১।৩

—"যে অদ্বিতীয় ঈশ্বর কালস্বরূপে এবং আত্মস্বরূপে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, এবং প্রলয়ের কারণসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহার স্বকীয় শক্তি তাঁহারই গুণের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছে। ধ্যানযোগের দ্বারা যোগীগণ তাঁহার সেই আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছেন।"

সর্ব্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ। শ্বেত। ৩।১

—"ঈশ্বর স্বীয় শক্তিসমূহের দ্বারা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসহ সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ কঠ। ২।৩।৩

—"ব্রহ্মেরই ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সূর্য্য কিরণ দান করেন, এবং ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন।" এই দেবতাগণ অতীব শক্তিশালী। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান না হইলে ঐ সকল শক্তিমান দেবতা তাঁহাকে ভয় করিতেন না।

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায়। বৃহ। ৪।৪।২২

—"ব্রহ্ম বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী, সকলের প্রভু, সকলের শাসনকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা। সাধুকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার বৃদ্ধি অথবা অসাধু কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার ক্ষতি হয় না। ইনি সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বভূতের অধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের পালক। বিশ্বের সকল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এবং সকল স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে ঐক্যসূত্র তিনিই স্থাপন করিতেছেন, যেমন সেতুর দ্বারা নদীর উভয় কূলের ঐক্যসূত্র স্থাপিত হয়।" এইরূপ অনন্তকর্ম্মা ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান, ইহাই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্মসূত্রও ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। ব্রহ্মসূত্র। ২।১।৩০

—"ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, যেহেতু তাহা সকল শাস্ত্রে এবং সমগ্র বিশ্বেও দেখা যাইতেছে।" আমরা পাইলাম যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার মূল শক্তি ত্রিবিধ; এই তিনটী মূল শক্তি বহুবিধ কার্য্যকারী রূপে ক্রিয়াশীল হয়।

১।৩।৬ ঈশ্বরের ত্রিবিধ মূলশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি

সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সদংশে ক্রিয়াশক্তি, চিদংশে জ্ঞানশক্তি, এবং আনন্দাংশে ইচ্ছাশক্তি অধিষ্ঠিত। ক্রিয়াশক্তির কার্য্য দ্বিবিধরূপে হইয়া থাকে, সন্ধিনী শক্তি রূপে এবং মায়াশক্তি রূপে। জ্ঞানশক্তির অন্য নাম সম্বিৎশক্তি; সম্বিৎ শব্দের অর্থ চেতনা। চিদংশে অধিষ্ঠিত এবং চৈতন্যময় বলিয়া জ্ঞানশক্তিকে সম্বিৎও বলা হয়। শ্রুতি ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তিকে তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়াছেন

এবং স্মৃতি ইহাকে হ্লাদিনী শক্তি নাম দিয়াছেন। আনন্দ ঈশ্বরের স্বভাব; তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাঁহার এই স্বভাবে অধিষ্ঠিত বলিয়া শ্রুতি ইহাকে স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়াছেন। হ্লাদিনী শব্দের অর্থ আনন্দদায়িনী। আনন্দাংশে অধিষ্ঠিত ইচ্ছাশক্তি আনন্দময়ী এবং আনন্দদায়িনী বলিয়া স্মৃতি ইহার হ্লাদিনী নাম দিয়াছেন। উভয় নামের মূল তাৎপর্য্য একই, এইজন্য এখানে শ্রুতির ও স্মৃতির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। সকল শক্তিই কার্য্যসাধন করে, এইজন্য সকল শক্তিই সাধারণভাবে ক্রিয়াশক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে। চিদংশের জ্ঞানশক্তিও একপ্রকারের ক্রিয়াশক্তি এবং আনন্দাংশের হ্লাদিনীশক্তিও এক-প্রকারের ক্রিয়াশক্তি। সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই তিন অংশের ত্রিবিধ ক্রিয়া-শক্তিকেই সাধারণভাবে ক্রিয়াশক্তি নামে অভিহিত করিলে তিন অংশের ত্রিবিধ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও কার্য্য বুঝা যাইবে না। এইজন্য সদংশের শক্তিকে ক্রিয়াশক্তি, চিদংশের শক্তিকে জ্ঞানশক্তি এবং আনন্দাংশের শক্তিকে হ্লাদিনী-শক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। শ্বেত। ৬।৮

—"শ্রূয়তে' অর্থাৎ শ্রুতি কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের পরাশক্তি বিবিধ—স্বাভাবিকী শক্তি, জ্ঞানবল অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, এবং ক্রিয়াবল অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি।"

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। বিষ্ণুপুরাণ। ১।১২।৬৯

—"হে ঈশ্বর, হ্লাদিনী, সন্ধিনী, এবং সম্বিত, এই তিনটী পরাশক্তি তোমাতেই বর্ত্তমান আছে।"

১।৩।৭ ঈশ্বর স্বীয় শক্তির সহিত অভিন্ন

ঈশ্বরের ত্রিবিধ মূল শক্তিকে সমগ্রভাবে চিচ্ছক্তি বলা হয়, কারণ, ঈশ্বরের ন্যায় তাঁহার শক্তিও জড়াতীত এবং অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু। মূল শক্তি জড় এবং প্রাকৃত বস্তু হইলে জড়াতীত এবং অপ্রাকৃত ঈশ্বরের মধ্যে থাকিতে পারিত না। মূল শক্তি জড়াতীত এবং অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু বলিয়া ঈশ্বরের সহিত তাঁহার মধ্যে অভিন্নভাবে অবস্থান করে। শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন; এই কারণে ঈশ্বর এবং তাঁহার পরাশক্তি অভিন্ন। শ্রুতি ঐশী শক্তিকে পরাশক্তি বলিয়াছেন, তাহার কারণ, ঈশ্বরের শক্তি মূল চিচ্ছক্তি এবং ইহা অপেক্ষা অধিক অথবা

ইহার সমান শক্তিও কাহারও নাই। বস্তুতঃ, একমাত্র ঈশ্বরই শক্তিমান; অন্য যাহা কিছুর শক্তি আছে, তাহা ঈশ্বরের শক্তির বিবিধ কার্য্যকারী রূপ।

১।৩।৮ ঈশ্বর নির্গুণ এবং সগুণ

ঈশ্বর নির্গুণ এবং সগুণ। প্রশ্ন হইতে পারে: ঈশ্বর নির্গুণ এবং সগুণ, দুই-ই যুগপৎ কিরূপে হইতে পারেন? উত্তর: ঈশ্বরের নির্গুণত্ব কি এবং সগুণত্বই বা কি, তাহা বুঝিলেই দেখা যাইবে যে তাঁহার নির্গুণত্ব এবং সগুণত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ নহে এবং তাঁহার নির্গুণত্বের দ্বারা তাঁহার যুগপৎ সগুণত্ব নিবারিত হয় না, অথবা সগুণত্বের দ্বারা যুগপৎ নির্গুণত্ব নিবারিত হয় না। ঈশ্বর নির্গুণ বলিতে ইহাই বুঝায় যে, ঈশ্বরের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটী হেয় গুণ নাই। শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে যেখানেই ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, সেখানেই নির্গুণ শব্দের অর্থ, উক্ত তিনটী হেয় গুণবর্জ্জিত। ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহে তাঁহার যে মায়াশক্তি আছে, তাহাও চিচ্ছক্তি এবং চিদ্বস্তু। তাঁহাতে বিদ্যমান এবং তাঁহার সহিত অভিন্ন তাঁহার মায়াশক্তিকে তিনি আপনা হইতে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটী গুণে পরিণত করেন। মায়াশক্তির পরিণাম এই ত্রিগুণ ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে নাই। এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি জড়বস্তু এবং চরাচরাত্মক স্থূল বিশ্বের মূল জড় উপাদান। সুতরাং সৃষ্টবস্তু মাত্রেই জড় এবং ত্রিগুণময়। পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা, কামাদি ষড়রিপু, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়বিকার উক্ত ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কার্য্য। এইজন্য এই গুণত্রয়কে হেয় গুণ বলা হয়। ঈশ্বর সৃষ্ট বস্তু নহেন; তাঁহার মধ্যে উক্ত তিনটী হেয় গুণ নাই; তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অপ্রাকৃত; তাহাতে পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা, ষড়রিপু, এবং ষড়বিকার নাই। ইহাই ঈশ্বরের নির্গুণত্ব। তাঁহার নির্গুণত্বের স্বরূপটী বেদান্তে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:

যদ্‌বাচাহনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ কেন ১।৫—৯

—"মনুষ্য বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনুষ্যের বাগিন্দ্রিয়ের প্রকাশক, মনুষ্যের মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না কিন্তু যিনি মনুষ্যের মনের প্রকাশক, মনুষ্যের চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পায় না কিন্তু যাঁহার দ্বারা মনুষ্যচক্ষু দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, মনুষ্যের কর্ণ যাঁহাকে শ্রবণ করে না কিন্তু যিনি মনুষ্যের কর্ণেন্দ্রিয়ের প্রকাশক, মনুষ্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে পারে না কিন্তু যাঁহার দ্বারা মনুষ্যের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঘ্রাণশক্তি-বিশিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকেই তুমি ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হও। মনুষ্য যে সকল স্থষ্ট বস্তুর ভজনা করে, তাহা ঈশ্বর নহে।" এতদ্বারা শ্রুতি এই তত্ত্ব নিরূপণ করিলেন যে, ঈশ্বর স্থষ্ট বস্তু নহেন; তিনি ত্রিগুণাতীত, স্নুতরাং জড়াতীত, অপ্রাকৃত এবং বুদ্ধি-মন-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। তাঁহার এইরূপ ত্রিগুণহীনতাই তাঁহার নির্গুণত্ব, ইহাই নিরূপিত হইল। কঠশ্রুতি অন্যরূপ ভাষার দ্বারা এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ কঠ ১।৩।১৫

—"যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নহেন; যিনি অব্যয়, নিত্য, অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত সত্য, এবং যিনি মহত্তত্ত্বের অর্থাৎ বুদ্ধির অতীত, সেই ঈশ্বরকে জানিলে মানব জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করে।" শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই সকল স্থষ্ট বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর কোনটীই নহেন, অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত ও ত্রিগুণময় বস্তু নহেন। ত্রিগুণময় বস্তু মাত্রেরই আদি অন্ত এবং ক্ষয় আছে; শ্রুতি ঈশ্বরকে অব্যয় অনাদি অনন্ত এবং নিত্য সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া জানাইলেন যে ঈশ্বর ত্রিগুণহীন এবং অপ্রাকৃত। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ও ঈশ্বরের নির্গুণত্বের স্বরূপটী ঐরূপই দিয়াছেন। এই উপনিষৎ ত্রিগুণময় বিশ্বের তিনটী অবস্থার পরিচয় প্রথমে দিয়াছেন, যথা, বহিষ্প্রজ্ঞ—জাগ্রদবস্থা, প্রজ্ঞানঘন-স্নুষুপ্তাবস্থা, অন্তঃপ্রজ্ঞ-স্বপ্নাবস্থা। তৎপরে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিতেছেন—

নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রাজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ॥ মাণ্ডূক্য। ৭

—"ঈশ্বর অন্তঃপ্রজ্ঞ, বহিষ্প্রজ্ঞ, অথবা প্রজ্ঞানঘন নহেন। তিনি কোন চেতন বা অচেতন স্থষ্ট বস্তু নহেন। তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েন না। তিনি বুদ্ধি ও মনের দ্বারা অনুপলব্ধব্য, অচিন্ত্য, এবং অনির্দ্দেশ্য। তিনি একাত্মপ্রত্যয়সার, অর্থাৎ, একাগ্র জীবাত্মার দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হয়েন। তিনি মায়াময় প্রপঞ্চের উপশমকারী, শান্ত, মঙ্গলময়, অদ্বিতীয়। তিনি চতুর্থ, অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত তুরীয় তত্ত্ব। তিনি আত্মা। তিনি বিশেষ-রূপে জ্ঞাতব্য।" ঈশ্বরের এই নির্গুণত্বের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি তাঁহাকে তুরীয় চতুর্থ তত্ত্ব আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরকে আত্মা বলিবার কারণ, স্থষ্ট জীবের ন্যায় ঈশ্বরের ত্রিগুণময় দেহ এবং ত্রিগুণবর্জ্জিত দেহীর অর্থাৎ আত্মার বিভেদ নাই; তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই আত্মা। ঈশ্বরের নির্গুণত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে সমগ্র শ্রুতি যেখানে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ের সারার্থ একমাত্র "আত্মা" শব্দে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই কারণে শ্রুতি বহু স্থানে আত্মা শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"—ঐতরেয়। ১।১। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ"-বৃহদারণ্যক। ১।৪।১। এই উভয় শ্রুতিবাক্যের একই অর্থ—"স্থষ্টির পূর্ব্বে বিশ্ব এক এবং অদ্বিতীয় আত্মা-স্বরূপেই ছিল।" আত্মা ত্রিগুণবর্জ্জিত এবং ত্রিগুণাতীত; সুতরং ঈশ্বর নির্গুণ। ঈশ্বর সগুণ, ইহাও শ্রুতির সিদ্ধান্ত।

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। শ্বেত ৬।২

—"এই সমগ্র বিশ্ব সর্ব্বদা ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ঈশ্বর জ্ঞানময়, কালস্রষ্টা, সগুণ, এবং সর্ব্বজ্ঞ।"

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ। ব্রহ্মসূত্র। ২।১।৩৭

—"ব্রহ্ম সর্ব্বগুণান্বিত, কারণ একমাত্র ব্রহ্মেরই সকল গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব।" ঈশ্বর সগুণ, ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর গুণী বা গুণবান, অর্থাৎ ঈশ্বর সকল সদ্গুণের অধিকারী। "ওঁ পূর্ণমদঃ", এই শ্রুতিবাক্যেরও অর্থ এই যে, ঈশ্বর রূপ গুণ এবং শক্তির দ্বারা পূর্ণ। শ্রুতি এবং স্মৃতি বলেন,

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ। বিশুদ্ধতা সতের, চেতনা চিতের, এবং আনন্দ আনন্দের স্বরূপগত গুণ। ঈশ্বরের এই তিনটী মূল স্বরূপগত গুণ হইতে তাঁহার অনন্ত সদ্‌গুণ উদ্ভূত হয়। ঈশ্বর 'সৎ' এইজন্য তিনি সত্য, সত্যসঙ্কল্প, সত্যব্রত, সত্যকর্ম্মা, নিত্য, পূর্ণ, অক্ষর, অপ্রাকৃত, নির্ম্মল। ঈশ্বর চিৎ, এইজন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী, অপাপবিদ্ধ, ধর্ম্মাবহ, পাপনুদ, শান্ত, শিব, প্রপঞ্চোপশম। ঈশ্বর আনন্দ, এইজন্য তিনি সুন্দর, মধুর, প্রেমময়, প্রাণারাম, ইচ্ছাময়, এবং লীলাময়। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বলিয়া তিনি অনন্ত, বৃহত্তম, পুরাণ, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, এবং সর্ব্বশক্তিমান। ঈশ্বরের অনন্ত সদ্‌গুণের উল্লেখ করা অসম্ভব, বিশেষ বিশেষ কতকগুলিরই উল্লেখ করা হইল। শ্রুতি ঈশ্বরের সগুণত্ব নিরূপণ করিতে তাঁহার যে সকল সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ নিম্নে করা হইতেছে। "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্"—শ্বেত। ৬।৬। "সর্ব্ব-ব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিব ঃ"—শ্বেত। ৩।১১। "এষ সর্ব্বজ্ঞঃ"—মাণ্ডূক্য। ৬। "প্রপঞ্চোশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্,"—মাণ্ডূক্য। ৭। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি"—মুণ্ডক। ২।২।৭। "স পর্য্যগাচ্ছুক্রম-ব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যাদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥"—ঈশ। ৮। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।"—কঠ। ১।২।১৮। "সত্যাত্মা প্রাণারামং মন-আনন্দম্। শান্তি-সমৃদ্ধমমৃতম্।"—তৈত্তিরীয়। ১।৬।২।—"ঈশ্বর ধর্ম্মের আধার, পাপনাশক, ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি"। "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ষড়ৈশ্বর্য্যবান, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, মঙ্গলময়।" "ঈশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ।" "ঈশ্বর প্রপঞ্চোপশমকারী, শান্ত, মঙ্গলময়, অদ্বিতীয়।" "ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানময়, সর্ব্বজ্ঞ, এবং তাঁহার মহিমা সর্ব্বব্যাপী।" "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, অপ্রাকৃতবিগ্রহ, ক্ষতবিহীন, প্রাকৃতশিরাবর্জ্জিত, শুদ্ধ, নির্ম্মল, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বদর্শী, মনীষী, সর্ব্বোত্তম এবং স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্যকালস্থায়ী এবং কর্ম্মবিধানকারী।" "ঈশ্বর জন্মহীন, শাশ্বত, আদ্যন্তহীন।" "ঈশ্বর সত্যাত্মা, প্রাণারাম, আনন্দময় মনোবিশিষ্ট, শান্ত, সমৃদ্ধ, এবং মৃত্যুহীন।" ঈশ্বরের এই সকল ত্রিগুণাতীত গুণ আছে বলিয়া তিনি সগুণ। ঈশ্বরের নির্গুণত্ব এবং সগুণত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বগুলি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার নির্গুণত্ব ও সগুণত্বের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা বিরুদ্ধভাব নাই, তাঁহার মধ্যে নির্গুণত্ব এবং সগুণত্বের ঐক্য সাধিত হইয়াছে,

এবং তিনি নিত্যই নির্গুণ এবং সগুণ। একটী নির্গুণ ঈশ্বর এবং অন্য একটী সগুণ ঈশ্বর, এইরূপ দুই প্রকারের দুইটী ঈশ্বর নাই। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর যুগপৎ নির্গুণ ও সগুণ। সুতরাং নির্গুণ ঈশ্বর বড় অথবা সগুণ ঈশ্বর বড়, নির্গুণ ঈশ্বরের ভজনা করা ভাল অথবা সগুণ ঈশ্বরের ভজনা করা ভাল, এরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে তাঁহার নির্গুণভাবের উপলব্ধি করিয়া পরে তাঁহার সগুণভাবের উপলব্ধি করিতে হয়।

১।৩।৯ ঈশ্বর নিরাকার এবং সাকার

ঈশ্বর নিরাকার এবং সাকার। এখানেও প্রশ্ন হইতে পারে: নিরাকারত্ব এবং সাকারত্ব পরস্পরবিরোধী; ঈশ্বর কিরূপে যুগপৎ নিরাকার এবং সাকার হইতে পারেন? উত্তর: ঈশ্বরের নিরাকারত্ব এবং সাকারত্ব কিরূপ তাহা বুঝিলে, তাঁহার নিরাকারত্ব এবং সাকারত্ব পরস্পরবিরোধী নহে, এবং তিনি নিত্যই নিরাকার ও সাকার, ইহাও বুঝা যাইবে। শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে ঈশ্বরকে অরূপ অর্থাৎ নিরাকারও বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের অরূপত্বের বা নিরাকারত্বের অর্থ রূপশূন্যতা বা আকারশূন্যতা নহে। ঈশ্বরের কোন রূপ বা আকারই নাই, ঈশ্বর আকাশকুসুমের ন্যায় শূন্য বস্তু, তাহা নহে। শ্রুতির এবং স্মৃতির সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরের রূপ অর্থাৎ আকার আছে। তথাপি শাস্ত্র ঈশ্বরকে কেন নিরাকার বলিয়াছেন, তাহার কারণ এখানে ব্যক্ত করা হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে ঈশ্বরের নির্গুণত্বের স্বরূপবিচারে পাওয়া গিয়াছে যে, ঈশ্বর সৃষ্ট বস্তু নহেন এবং তিনি ত্রিগুণবর্জ্জিত, ত্রিগুণাতীত, ও অপ্রাকৃত আত্মবস্তু বা চিদ্‌বস্তু। শাস্ত্র ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়াছেন। তাঁহার এই বিগ্রহ অর্থাৎ রূপ বা আকার মায়িক রূপ নহে, তাঁহার রূপ নির্গুণ এবং অপ্রাকৃত আত্মবস্তু বা চিদ্‌বস্তু; তাঁহার বিগ্রহ মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা গ্রাহ্য হয় না। এই কারণে শাস্ত্র ঈশ্বরকে অরূপ অর্থাৎ নিরাকার বলিয়াছেন। ঈশ্বর নিরাকার, ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বরের আকার বা রূপ সচ্চিদানন্দঘন আত্মবস্তু, তাহা মায়িক রূপ নহে, এবং তাহা মানবেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয় না। শূন্যবাদীগণ "অপানি"-শ্রুতি হইতে শূন্যবাদ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যই ঈশ্বরের নিরাকারত্বের অর্থ বুঝাইয়া তাঁহার সাকারত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।

অপাণিপাদো জবানো গ্রহিতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

শ্বেত ৩।১৯

এই শ্রুতিবাক্যটীর মর্ম্ম সুপরিস্ফুট করিবার জন্য প্রথমে প্রত্যেকটী শব্দের অর্থ দেওয়া হইতেছে। সঃ (তিনি, ঈশ্বর। এই পুরুষবাচক সর্ব্বনামপদের দ্বারা ঈশ্বরকে সাকারব্যক্তি এবং পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইল। শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে 'পুরুষং' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা এই অর্থ আরও সুপরিস্ফুট করা হইয়াছে।) অপাণিপাদঃ (হস্তপদশূন্য হইয়াও) জবানঃ (গমনকারী) গ্রহীতা (গ্রহণকর্ত্তা); অচক্ষুঃ (চক্ষুহীন হইয়াও) পশ্যতি (দর্শন করেন), অকর্ণ (কর্ণহীন হইয়াও) শৃণোতি (শ্রবণ করেন); সঃ (তিনি) বেদ্যম্ (জ্ঞেয়বস্তুকে) বেত্তি (জানেন), চ (এবং) তস্য (তাঁহার) বেত্তা (জ্ঞাতা) ন অস্তি (নাই); তম্ (তাঁহাকে) অগ্র্যম্ (সকলের মূল কারণ) মহান্তম্ (মহামহিময়) পুরুষম্ (পুরুষ) আহুঃ (বলেন, অর্থাৎ উপনিষৎসমূহ বলেন)। ব্যাখ্যাঃ—ঈশ্বর চরণহীন, কিন্তু গমন করেন। যখন তিনি গমন করিতে পারেন, তখন তাঁহার চরণ অবশ্যই আছে, কিন্তু তাঁহার চরণ অপ্রাকৃত এবং মানবেন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া তাঁহাকে চরণহীন বলা হইয়াছে। তিনি হস্তহীন, কিন্তু গ্রহণ করেন। তিনি যখন গ্রহণ করিতে পারেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার হস্ত আছে, কিন্তু তাঁহার হস্ত অপ্রাকৃত এবং মানবেন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া তাঁহাকে হস্তহীন বলা হইয়াছে। তিনি চক্ষুহীন কিন্তু দেখেন; তিনি কর্ণহীন কিন্তু শ্রবণ করেন। তিনি যখন দেখিতে ও শুনিতে পারেন, তখন তাঁহার চক্ষু ও কর্ণ অবশ্যই আছে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু ও কর্ণ অপ্রাকৃত এবং মানবেন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া তাঁহাকে চক্ষুহীন এবং কর্ণহীন বলা হইয়াছে। ঈশ্বর অনন্ত; তাঁহাকে কোন মানব সমগ্রভাবে জানিতে পারে না, তজ্জন্য শ্রুতি বলিলেন, "তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই।" "তিনি জ্ঞেয় বিষয় জানেন," ইহা বলিয়া শ্রুতি জানাইলেন যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট; ব্যক্তিই জ্ঞাতা এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন এবং শক্তির আধার শক্তিমান ব্যক্তিই হইতে পারেন; সুতরাং ঈশ্বর আকারবিশিষ্ট ব্যক্তি। এই তত্ত্বকে শ্রুতি আরও পরিস্ফুট করিলেন পরবর্ত্তী বাক্যের দ্বারা। "সকল উপনিষৎ বলেন, ঈশ্বর সকলের মূল কারণ, এবং মহামহিময় পুরুষ।"

ঈশ্বরকে মহামহিমময় পুরুষ বলিয়া শ্রুতি দৃঢ়রূপে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন যে, ঈশ্বর রূপ, গুণ, এবং শক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ ব্যক্তি। পুরুষ শব্দের দ্বারা ইহাও নিরূপিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর পুরুষমূর্ত্তিবিশিষ্ট। শ্রুতি ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাও নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 'অকায়', 'অরূপ', 'অমূর্ত্ত', 'অপাণিপাদ', 'নিরাকার' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যদি 'একেবারেই শূন্যবৎ রূপহীন' বুঝাইত, তাহা হইলে উক্ত শব্দগুলির ব্যবহারের দ্বারা শ্রুতিকর্ত্তৃক শূন্যবাদও নিরূপিত হইত। কিন্তু শ্রুতি কখনই দুইটী পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন না এবং তাহা করেনও নাই। ঈশ্বরকে সাকার ঘোষণা করিয়াও 'অরূপ', 'অবর্ণ', 'অমূর্ত্ত', প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার করিয়া শ্রুতি কেবল ইহাই জানাইয়াছেন যে, ঈশ্বরের আকার অর্থাৎ রূপ বা মূর্ত্তি, তাঁহার মূর্ত্তির বর্ণ, এবং তাঁহার করচরণাদি সমস্তই অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দ-ঘন, এবং মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ইহাই ঈশ্বরের নিরাকারত্ব এবং সাকারত্ব। এক্ষণে দেখা গেল যে, ঈশ্বরের নিরাকারত্ব এবং সাকারত্ব পরস্পরবিরোধী নহে, এবং তিনি নিত্যই নিরাকার ও সাকার। তিনি যে বিশ্বসৃষ্টির সময়ে বা পরে সাকার হইয়াছেন, তৎপূর্ব্বে সাকার ছিলেন না, তাহা নহে; তিনি নিত্য এবং তাঁহার সাকারত্বও নিত্য। এক্ষণে শ্রুতি হইতেই এই তত্ত্বের প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ।
বৃহদারণ্যক ১।৪।১

—"সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্ব একমাত্র আত্মার স্বরূপেই ছিল এবং তাঁহার মধ্যে তাঁহার সহিত একীভূত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। সেই আত্মা পুরুষের ন্যায়, অর্থাৎ পুরুষমূর্ত্তি ছিলেন। তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আপনাকে ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিলেন না।"

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। স ইমাল্লোঁকানসৃজত। ঐতরেয়। ১।১।১—২

—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র আত্মার স্বরূপেই বিদ্যমান ছিল। অন্য কোন বস্তুই তখন ছিল না। তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমি লোকসমূহ সৃজন করিব।' তিনি এই সকল লোক সৃজন করিলেন।"

সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৈত্তিরীয়। ২।৬

—"ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, 'আমি প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইব।' স্বীয় অনন্ত জ্ঞানশক্তির দ্বারা তিনি সমগ্র বিশ্বের পরিকল্পনা করিয়া স্থাবরজঙ্গমসহ বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন।" বেদান্তের এই উক্তিসমূহ হইতে আমরা পাইলাম যে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মা, ব্রহ্ম, বা ঈশ্বর ছিলেন, তিনি বহু হইবার কামনা করিয়াছিলেন, তিনি জ্ঞানশক্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, এবং বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে ব্রহ্ম এই সকল কর্ম্ম সৃষ্টির পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই সৃষ্টির পূর্ব্বেও সর্ব্বশক্তির আধার ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই নিরাকার শূন্য ছিলেন না, তিনি অবশ্যই সাকার সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি সৃষ্টির পরেও সাকার, তাঁহার সাকারত্ব নিত্য, এই তত্ত্বও বেদান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ শ্বেত ৩।৮
মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥ শ্বেত ৩।১২

—"মহামহিমময়, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট, অপ্রাকৃত এই পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রেয়োলাভের অন্য পন্থা নাই।" "এই পুরুষ মহামহিমান্বিত প্রভু, এবং তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য মানবের সাত্ত্বিক বুদ্ধিকে তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন। এই পুরুষই জ্যোতির্ম্ময় এবং অবিনাশী ঈশ্বর।" বেদান্তের এই উক্তি হইতে প্রমাণিত হইল যে, ব্রহ্ম সাকার পুরুষ, নিরাকার শূন্য নহেন। শ্রুতি বলেন :

রসো বৈ সঃ। তৈত্তিরীয় ২।৭

—"তিনি আনন্দস্বরূপ।" পুরুষবাচক 'সঃ' সর্ব্বনাম প্রয়োগের দ্বারা বেদান্ত ব্রহ্মকে সাকার পুরুষমূর্ত্তি বলিয়াই ঘোষণা করিলেন। বেদান্ত ব্রহ্মকে উপাসনা করিবারও উপদেশ দিয়াছেন।

(১) তজ্জালানিতি শান্ত উপাসীত। ছান্দোগ্য ৩।১৪।১
(২) আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। বৃহদারণ্যক ১।৪।৮

(৩) তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। তৈত্তিরীয় ৩।১০।৪

(৪) তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্‌। কেন ৪।৬

—(১) "ব্রহ্ম হইতে বিশ্বোৎপত্তি, ব্রহ্মের দ্বারা বিশ্বপালন, এবং ব্রহ্মে বিশ্ব বিলীন হয়। ইহা জানিয়া শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।" (২) "আত্মাকে প্রিয় জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।" (৩।৪) "ব্রহ্ম প্রাণীমাত্রেরই উপাস্য জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।" শূন্য ব্রহ্মের উপাসনা নিষ্ফল; বেদান্ত শূন্যের উপাসনার উপদেশ দিতে পারেন না, কারণ তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; উপাসনা সাকার ব্রহ্মেরই হইতে পারে। উপাসনার ফলে মানব ব্রহ্মের রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে, বেদান্ত তাহাও ঘোষণা করিয়াছেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্‌॥
কঠ ১।২।২৪, মু ৩।২।৩

—"এই আত্মাকে বেদ-বেদান্ত-পাঠ, মেধা, অথবা বহু শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারা লাভ করা যায় না। তিনি যাহাকে কৃপা করেন, সে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে এবং তিনি তাহাকে স্বীয় তনূ অর্থাৎ রূপ প্রদর্শন করেন।" সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয় করিয়া ব্রহ্মস্থত্রও পরব্রহ্মের এইরূপ যুগপৎ নিরাকারত্ব-সাকারত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।

অরূপবদেব হি, তৎপ্রধানত্বাৎ। ব্রহ্মস্থত্র ৩।২।১৪

—"ব্রহ্মের অরূপত্বের অর্থ রূপশূন্যতা নহে; তিনি অরূপবৎ, অর্থাৎ, তিনি অরূপের মত। তাঁহার রূপের ইন্দ্রিয়-অগোচরত্ব তাঁহার রূপের প্রধান বৈশিষ্ট বলিয়া তিনি অরূপবৎ।" ব্রহ্মের এই অরূপবৎ রূপ, এই নিরাকার-সাকার রূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর রূপ কেবল যে শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ তাহাই নহে, তাহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধও, এই তত্ত্বও ব্রহ্মস্থত্রে নিরূপিত হইয়াছে।

অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্‌। ব্রহ্মস্থত্র ৩।২।২৪

—"ব্রহ্মের অরূপবৎ রূপ যোগসাধনায় প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে, এইজন্য ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ। ইহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধও বটে, কারণ ব্রহ্মের অরূপবৎ রূপ যুক্তি ও বিচারের দ্বারাও প্রমাণিত হয়।" আমরা পাইলাম যে, ঈশ্বরের অরূপবৎ রূপ শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ, অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ, এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ।

ঈশ্বরের অরূপবৎ রূপই তাঁহার যুগপৎ নিরাকারত্ব এবং সাকারত্ব। আমরা দেখিলাম, ঈশ্বর নিত্যই নিরাকার এবং সাকার এবং তাঁহার নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব পরস্পরবিরোধী নহে।

১।৩।১০ ঈশ্বর সবিশেষ

ব্রহ্ম কখনই নির্ব্বিশেষ নহেন; তিনি নিত্যই সবিশেষ। নির্ব্বিশেষ শব্দের অর্থ, বৈশিষ্টহীন; সবিশেষ শব্দের অর্থ, বৈশিষ্টযুক্ত। আমরা পাইয়াছি যে, ঈশ্বর নিত্যই নির্গুণ-সগুণ, নিত্যই নিরাকার-সাকার। ঈশ্বরের নির্গুণত্বও তাঁহার বৈশিষ্ট, সগুণত্বও তাঁহার বৈশিষ্ট; নিরাকারত্বও তাঁহার বৈশিষ্ট, সাকারত্বও তাঁহার বৈশিষ্ট; কারণ তাঁহার ত্রিগুণহীনত্ব, অপ্রাকৃতত্ব প্রভৃতি কতকগুলি বৈশিষ্টকে সমগ্রভাবে তাঁহার নির্গুণত্ব বলা হয়, তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ব, জ্ঞানময়ত্ব, আনন্দময়ত্ব এবং ইহাদের হইতে উদ্ভূত অন্য কতকগুলি বৈশিষ্টকে সমগ্রভাবে তাঁহার সগুণত্ব বলা হয়, মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা তাঁহার অগোচরত্ব প্রভৃতি কতকগুলি বৈশিষ্টকে সমগ্রভাবে তাঁহার নিরাকারত্ব বলা হয়, এবং তাঁহার পুরুষবিধত্ব, চিন্ময়ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি বৈশিষ্টকে সমগ্রভাবে তাঁহার সাকারত্ব বলা হয়। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের রূপ; ঈশ্বরের রূপ বিশেষ্য; সেই রূপই ঈশ্বর; সকল বৈশিষ্টই সেই বিশেষ্যের বিশেষণ; ঈশ্বরের রূপ নিত্য এবং রূপের বিশেষণসমূহও নিত্য। এইজন্য ঈশ্বর নিত্যই সবিশেষ।

১।৩।১১ ঈশ্বর সর্ব্বকর্ম্মা

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, এবং প্রলয় সংক্রান্ত কর্ম্ম ঈশ্বর সম্পাদন করেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার এই বিরাট কর্ম্ম মানবের চিন্তার অতীত। ঈশ্বর এই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করেন বলিয়া শ্রুতি ঈশ্বরকে সর্ব্বকর্ম্মা বলিয়াছেন

সর্ব্বকর্ম্মা……এতদ্ ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য ৩।১৪।৪

—"এই ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা।" ঈশ্বরকে সর্ব্বকর্ম্মা বলিতে ইহাই বুঝায় যে ঈশ্বর অনন্তকর্ম্মা, অদ্ভুতকর্ম্মা, অচিন্ত্যকর্ম্মা। ঈশ্বর মায়াতীত বলিয়া তাঁহার আসক্তি বা কর্ম্মফললাভের কামনা নাই; তিনি কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়েন

না। বিশ্বের সকল প্রাপ্তব্য বস্তু তাঁহাতেই আছে বলিয়া বিশ্বে এমন কোন বস্তুই নাই যাহার প্রাপ্তিকামনায় তিনি কর্ম্ম করেন।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ গীতা ৩।২২

—কৃষ্ণ বলিতেছেন, "হে পার্থ, আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, কারণ ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য কোন বস্তুই নাই। তথাপি আমি নিয়ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকি।" তাহার কারণ,

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্॥ গীতা ৩।২৪

—"আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে সমুদয় লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।"

১।৩।১২ ঈশ্বর কর্ম্মফলবিধাতা

ঈশ্বর কর্ম্মফলবিধাতা। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, অথবা অশাস্ত্রীয় এবং অন্যায় কর্ম্ম, যেরূপ কর্ম্ম মানব সম্পাদন করে, ঈশ্বর তাহাকে তদ্রূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন। কর্ম্মানুসারে জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, জরা, দুঃখ, দারিদ্র্য, অশান্তি; আবার কর্ম্মানুসারেই সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, সম্পদ, শক্তি, সৌন্দর্য্য, আনন্দ, মুক্তি প্রভৃতি ঈশ্বরই প্রদান করেন।

(১) প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধনহেতুঃ। শ্বেত ৬।১৬

(২) একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। কঠ ২।২।১৩, এবং শ্বেত ৬।১৩

(১) "ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষের অধীশ্বর, সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের অধীশ্বর, এবং মোক্ষ, সংসারে স্থিতি, বন্ধন প্রভৃতি কর্ম্মফলের দাতা।" (২) "এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর সকল জীবের কর্ম্মফলবিধাতা।"

ফলমতঃ উপপত্তেঃ। ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩৮

—"ঈশ্বর হইতে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।" সর্ব্ব শাস্ত্রেই এই তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। কিরূপ কর্ম্মের জন্য ঈশ্বর কেমন ফল দেন, শাস্ত্র তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরবিদ্বেষীর কর্ম্মফল ঃ

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ গীতা ১৬।১৯

—কৃষ্ণ বলিতেছেন, "ঈশ্বরবিদ্বেষী ক্রূরস্বভাব নরাধমগণকে আমি বার বার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।" ঈশ্বরবিদ্বেষী বলিতে কেবল স্বয়ং ঈশ্বরকে

বিদ্বেষ করা বুঝায় না। জীবমাত্রকে বিদ্বেষ এবং হিংসা করিলেও ঈশ্বরকে বিদ্বেষ করা হয়, কারণ সকল জীবই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং সকল জীবেই ঈশ্বর অবস্থিত আছেন।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ গীতা ১৩।২৮

—"ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত আছেন ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি আপনাকেই আপনি হিংসা করে না, সে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।" সকল জীব ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন এবং ঈশ্বর সকল জীবে আত্মারূপে সমভাবে অবস্থিত। সুতরাং, সকল প্রাণীই পরস্পরের আপন; কেহই কাহারও পর নহে। অতএব, অন্যকে হিংসা করিলে আপনাকেই হিংসা করা হয় এবং ঈশ্বরকেও হিংসা করা হয়।

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্। ভাগবত ১১।৫।১৫

—"যাহারা অন্যকে দ্বেষ করে, তাহারা ঈশ্বর হরিকেই দ্বেষ করে, কারণ যে ঈশ্বর তাহাদের শরীরে আত্মারূপে বিদ্যমান আছেন সেই ঈশ্বরই পরের শরীরেও আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন।" এইজন্যই বলা হইয়াছে যে পরকে দ্বেষ করিলেও ঈশ্বরকে দ্বেষ করা হয়। প্রশ্ন হইতে পারে: যে আততায়ী হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীনির্য্যাতন প্রভৃতি অত্যাচার করিতে আসিতেছে, তাহাকে বধ করিলেও কি হিংসা হয়? উত্তর:—না, তাহাকে বধ করিলে হিংসা হয় না। বধ করা বা ব্যথা দেওয়াই হিংসা শব্দের অর্থ নহে; হিংসা শব্দের অর্থ, অসদুদ্দেশ্যে বধ করিবার বা ব্যথা দিবার ইচ্ছা। অসদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই ইচ্ছা হিংসা; সদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই ইচ্ছাই বীরত্ব। পরস্বাপহরণ, গৃহদাহ, নারীহরণ, প্রতিশোধগ্রহণ প্রভৃতি অসদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ইচ্ছার উদয় হইলে তাহা হিংসা; ঐরূপ দুষ্কর্ম্ম হইতে নিজেকে বা অপরকে রক্ষা করিবার জন্য আততায়ীগণকে বধ করিবার ইচ্ছা হিংসা নহে, কারণ বধ করা বা ব্যথা দেওয়াই সেখানে মূল ইচ্ছা নহে; ধনপ্রাণাদি রক্ষাই তথায় মূল ইচ্ছা। ধর্ম্ম-ধন-প্রাণাদি রক্ষার নিমিত্ত আততায়ী-বধ বীরত্বের কার্য্য; এইরূপ কার্য্যে অনিচ্ছা ও অক্ষমতা ক্লীবত্ব। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুন যখন রাজ্যাপহারী এবং আততায়ী কৌরবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অনিচ্ছা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন, তখন তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন:

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ গীতা ২।৩

—"হে পার্থ, ক্লীব হইও না ; ক্লীবত্ব তোমার পক্ষে অযোগ্য। হে পরন্তপ, তোমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও।" ভগবান রামচন্দ্রও আততায়ী রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যদি তিনি তাহা না করিতেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ না করাইতেন, তাহা হইলে ভগবানের ভগবত্ত্ব এবং মানবের মানবত্বও লুপ্ত হইত। ঈশ্বর দুষ্টগণকে ক্রূরকর্ম্মসাধনের জন্য অশুভ কর্ম্মফলরূপ যে দণ্ড দান করেন, তাহাতে তাঁহার হিংসা বা বিদ্বেষ নাই। পিতামাতা দুষ্কর্ম্মকারী সন্তানকে, অথবা রাজা দুষ্কর্ম্মকারী প্রজাকে যে দণ্ড দান করেন, তাহার মূলে হিংসা নাই। দুষ্কর্ম্মকারীর মঙ্গলের জন্যই তাহাকে দণ্ড দান করা হয়, কারণ দণ্ডিত ব্যক্তি ভীত, দুঃখিত, লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইয়া দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, এবং দুষ্কর্ম্মসাধনের যাহাদের প্রবৃত্তি আছে, দুষ্কর্ম্মের জন্য দণ্ডবিধান দেখিয়া তাহারাও দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয়। পিতামাতার ন্যায় ঈশ্বরও দুষ্টের কল্যাণের জন্যই তাহাকে অশুভ কর্ম্মফলরূপ দণ্ড দান করেন। ঈশ্বর বলিয়াছেন যে তিনি দুষ্ট নিধনের জন্য অবতীর্ণ হয়েন। এই দুষ্ট নিধনের মূলে হিংসা বা বিদ্বেষ নাই ; এতদ্দ্বারা তিনি দুষ্টগণের এবং তাহাদের দ্বারা নিপীড়িত সাধুগণের কল্যাণ করেন। এই যুগ্ম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে লঙ্কাকাণ্ড এবং কুরুক্ষেত্র করেন। লঙ্কাকাণ্ডে এবং কুরুক্ষেত্রে নিহত দুষ্টগণও ঈশ্বরের বিধানে সদ্গতি লাভ করে এবং তাহাদের নিধনের পর মানবজাতি ঈশ্বরবিহিত ধর্ম্মপথে চলিতে পারে। এইরূপ লঙ্কাকাণ্ডে এবং কুরুক্ষেত্রে এককালেই বহু দুষ্টের নিধন হয়, এইজন্য ইহা সমষ্টিগত লঙ্কাকাণ্ড এবং সমষ্টিগত কুরুক্ষেত্র। আবার, ভগবান মানবজীবনে ব্যক্তিগত কুরুক্ষেত্রও সংঘটিত করেন। ব্যক্তিগত কুরুক্ষেত্র ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। সমষ্টিগত কুরুক্ষেত্র বা ব্যক্তিগত কুরুক্ষেত্র ঈশ্বরের কল্যাণসাধনের ক্ষেত্র, হিংসাসাধনের ক্ষেত্র নহে। আমরা দেখিলাম যে, ঈশ্বর ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তিগণকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন। আবার, বৈদিক চতুর্ব্বর্গ সাধনার মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গের সাধনা যাঁহারা করেন, সেই সকল সকাম যজ্ঞকারীকে স্বর্গভোগ অথবা মর্ত্তে বিবিধসুখভোগ ঈশ্বরই প্রদান করেন। এই ত্রিবর্গের যজ্ঞ দেবতাদের উদ্দেশ্যে সাধিত

হয় এবং দেবতাদের নিকট হইতেই এই সকল যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ঈশ্বর তত্তৎ দেবতারূপে সেই যজ্ঞফল প্রদান করেন।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ গীতা ৭।২২

—কৃষ্ণ বলিতেছেন, "স্বর্গাদিভুক্তিকামনায় যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবতার অর্চ্চনা করে, আমারই বিধানমতে তাহারা সেই দেবতার নিকট হইতে বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে।" যাঁহারা মোক্ষ কামনায় ঈশ্বরের ভজনা করেন, তিনিই তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করেন।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ গীতা। ৮।১৫

—কৃষ্ণ বলিতেছেন: "পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন; দুঃখময় ও অনিত্য জন্ম তাঁহাদিগকে আর প্রাপ্ত হইতে হয় না।" যাঁহারা স্বর্গ কামনা এবং মোক্ষকামনাও ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকেই চাহেন, তাঁহাদের সেই ভজনার ফলে তিনি তাঁহাদিগকে আপনাকেই দান করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে এই উত্তম রহস্যটী প্রকাশ করিয়াছেন:

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ গীতা ১৮।৬৫

—"তুমি মদ্গতচিত্ত এবং আমার ভক্ত হইয়া আমার ভজনা এবং আমায় নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।" অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া মানবমাত্রকেই ঈশ্বর এই অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইরূপে, ঈশ্বর সর্ব্ববিধ কর্ম্মের যথাযোগ্য ফল প্রদান করেন।

১।৩।১৩ ঈশ্বর ভূমা

যিনি আদ্যন্তহীন ও অপরিচ্ছিন্ন, এবং যাঁহার সত্তা, চৈতন্য, আনন্দ এবং শক্তি অনন্ত, তিনি ভূমা। একমাত্র ঈশ্বরই ভূমা। যাহা কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, তৎসমুদয়ই পরিমিত পদার্থ। বিশ্বে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় এবং সমগ্র বিশ্বও ঈশ্বরের সহিত তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। এই সকল পরিমিত পদার্থের

আদি ও অন্ত আছে। একমাত্র ঈশ্বর আদ্যন্তহীন এবং অনন্ত। এই কারণে একমাত্র ঈশ্বরই ভূমা। শ্রুতিনির্ণীত ভূমালক্ষণ এইরূপ ঃ

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা। ছান্দোগ্য ৭।২৪।১

"—যুক্তযোগী যাঁহার মধ্যে অন্য কিছু দেখেন না, অন্য কিছু শুনেন না, এবং অন্য কিছু জানেন না, তিনি ভূমা।" ইহার দৃষ্টান্ত ঃ গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ঈশ্বরের অনন্তরূপে অর্জ্জুন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সমস্ত বস্তুই পাইলেন, যতক্ষণ এইরূপ দর্শন করিলেন ততক্ষণ তিনি অন্য কিছুই দেখিলেন না, শুনিলেন না, এবং জানিলেন না। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট এই বিশ্ব এতই বৃহৎ যে ইহা আমাদের নিকট অনন্ত বলিয়াই মনে হয়। ঈশ্বরের চতুষ্পাদ বিভূতির মধ্যে এই বিশাল বিশ্ব তাঁহার একপাদ বিভূতি মাত্র। পরব্যোম তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি, সুতরাং পরব্যোমের সীমা নির্ণয়ের অতীত। ঈশ্বর আপনাকে যে সকল রূপে বিস্তার করিয়াছেন, তৎসমুদয় সমগ্রভাবে তাঁহার চতুষ্পাদ বিভূতি বা মহিমা। চতুষ্পাদ বিভূতি ঈশ্বরের একাংশ, ঈশ্বরের সমগ্রতা নহে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মরূপা গায়ত্রী ঈশ্বরের মহিমার দ্যোতক এবং ইহা চতুষ্পাদ। তৎপরে বলিতেছেন ঃ

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ছান্দোগ্য ৩।১২।৬

—"এই চতুষ্পদা গায়ত্রীর মহিমা এই যে, চরাচরাত্মক প্রাকৃত বিশ্ব ইহার একপাদ মহিমা, এবং অপ্রাকৃত পরব্যোমে গোলক-বৈকুণ্ঠাদি পরমানন্দময় ধামসমূহ ইহার ত্রিপাদ মহিমা। ঈশ্বর এই গায়ত্রী অপেক্ষাও মহত্তর।" ঈশ্বর আপনাকে এই চতুষ্পাদ বিভূতিরূপে বিস্তার করিয়াছেন, আবার এই চতুষ্পাদ বিভূতি তাঁহার মধ্যেও আছে, কারণ তিনি অনন্ত। এইজন্য, ঈশ্বরের প্রাপ্তিতে সর্ব্বপ্রাপ্তি হয়। অতীতে, বর্ত্তমানে, এবং ভবিষ্যতে এই বিশ্বে যাহা কিছু ছিল, আছে, এবং থাকিবে, তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের মধ্যে নিত্যই বর্ত্তমান আছে। ইহলোক, পরলোক সমস্তই তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান। পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানবিশিষ্ট মানব যাহা কিছু মৃত অথবা বিনষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হয়, তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের মধ্যে নিত্য বিরাজমান। ঈশ্বরকে পাইলে কিছুই হারাইতে হয় না ; যাহা কিছু হারাইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তৎসমুদয়ই তাঁহার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রুতি ভূমার এইরূপ উপলব্ধিই বর্ণনা করিয়াছেন।

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোতদুঃখতাম্।
সর্ব্বং হি পস্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ॥ ছান্দোগ্য ৭।২৬।২

—"ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন এইরূপ যুক্তযোগী মৃত্যু দর্শন করেন না, অর্থাৎ সাধারণ মানবের নিকট মৃত্যু সর্ব্বহর হইলেও, যুক্তযোগীর নিকট নহে, কারণ তিনি ইচ্ছা করিলেই ঈশ্বরের মধ্যে মৃত ব্যক্তিগণকেও দেখিতে পান। তিনি রোগ দর্শন করেন না এবং দুঃখও দর্শন করেন না, কারণ ঈশ্বরে রোগ ও দুঃখ নাই। তিনি সমস্তই দর্শন করেন, কারণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের মধ্যে নিত্য বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বপ্রকারে সমস্তই লাভ করেন বলিয়া তাঁহার অপ্রাপ্ত কিছুই থাকে না।" আমরা পাইলাম, ঈশ্বরের সত্ত্বা অনন্ত এবং তিনি বৃহত্তম বস্তু। ঈশ্বরের চৈতন্য এবং জ্ঞান অনন্ত, ইহাও শ্রুতি নিরূপিত তত্ত্ব। জীবমাত্রেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং দেশকালাদির দ্বারা পরিছিন্ন, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান অনন্ত এবং অপরিচ্ছিন্ন। অতীত, ভবিষ্যৎ, এবং বর্ত্তমান, ত্রিকালের সকল বস্তুর সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান ঈশ্বরের মধ্যে অপরিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ গীতা। ৭।২৬

—কৃষ্ণ বলিতেছেন: "অতীত, ভবিষ্যৎ, এবং বর্ত্তমান, এই ত্রিকালবর্ত্তী সমস্ত ভূতগণের সকল বিষয় আমি জানি, কিন্তু আমাকে কেহ সমগ্রভাবে জানে না।" সমগ্র বিশ্বে যেখানেই চেতনা আছে, তাহা ঈশ্বরের অনন্ত চেতনার অংশ।

চেতনশ্চেতনানাম্।—শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩

—"ঈশ্বরের চেতনা সকল চেতন বস্তুর চেতনার কারণ।" ঈশ্বরের আনন্দও অনন্ত। বিশ্ববাসী জীবসমূহ নিত্য নিয়ত যে আনন্দ লাভ করে, তাহার পরিমাণ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। বিশ্বসৃষ্টির পর হইতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়ত এই যে বিপুল আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন ধারা প্রবহমান রহিয়াছে, সেই আনন্দের অদ্বিতীয়, অফুরন্ত, এবং চিরন্তন উৎস ঈশ্বর। ঈশ্বরের আনন্দ অনন্ত না হইলে ইহা সম্ভব হইত না। ঈশ্বরকে লাভ করিলেই ভূমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। ছান্দোগ্য ৭।২৩।১

—"যিনি ভূমা তিনিই সুখ। পরিমিত এবং ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখ নাই, অর্থাৎ পরিমিত বস্তুতে যে সুখ, তাহা তাহার নিজস্ব নহে, তাহা ভূমা ঈশ্বর হইতে

প্রাপ্ত। ভূমাই সুখ।” সকল শাস্ত্রই আনন্দলিপ্সু মানবকে ভূমা ঈশ্বরের তত্ত্ব জানাইয়া, তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দলিপ্সা সার্থক করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বরের সকল শক্তিও অনন্ত। যেখানে যাহা কিছু শক্তি আছে, তাহা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির অংশ।

১।৩।১৪ ঈশ্বর অক্ষর

অক্ষরের অর্থ, যাহার কোনক্রমেই কখনও ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। যাহা অনন্ত কেবল তাহাই অক্ষর হইতে পারে। যাহা অনন্ত, তাহা হইতে অনন্ত বিয়োগ করিলেও অনন্তই অবশিষ্ট থাকে, অনন্তের ক্ষয় হয় না; এবং অনন্তের সহিত অনন্ত যোগ করিলেও অনন্ত অনন্তই থাকে, অনন্তের বৃদ্ধি হয় না। ঈশ্বর ভূমা; তিনি বৃহত্তম ও অনন্ত। তাঁহার অনন্ত স্বরূপকে তিনি অনন্তরূপে বিস্তার করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষয় নাই। ইহা শ্রুতি-নিরূপিত তত্ত্ব।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ বৃহদারণ্যক।৫।১।১

যাহার সীমা আছে, তাহা পূর্ণ নহে; তাহা খণ্ড ও অপূর্ণ। যাহা অনন্ত তাহা অখণ্ড ও পূর্ণ। এইজন্য, এই শ্রুতি বাক্যের “পূর্ণ” শব্দের অর্থ অনন্ত। “অদঃ” শব্দের অর্থ “উনি” বা “তিনি” অর্থাৎ ঈশ্বর। “ইদম্” শব্দের অর্থ, ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত চতুষ্পাদ বিভুতিসহ অনন্ত অকাশ। সূত্রটীর অর্থ এই :— “ঈশ্বর অনন্ত। চতুষ্পাদ বিভুতিসহ এই আকাশ অনন্ত। অনন্ত হইতে অনন্ত উদ্ভূত হয়। অনন্ত হইতে অনন্ত বিয়োগ করিলেও অনন্ত অবশিষ্ট থাকে।” অঙ্কশাস্ত্র হইতেও এই তত্ত্বটী বুঝা যাইবে। অঙ্কশাস্ত্রে ০ অনন্তের প্রতীক। ০-হইতে যে কোন সংখ্যা অথবা ০ বিয়োগ করিলেও ০ অবশিষ্ট থাকে। যদি ০-র সহিত কোন সংখ্যা বা ০ যোগ করা যায়, যোগফল ০ হয়। সুতরাং অনন্ত ঈশ্বর আপনাকে অনন্তরূপে বিস্তার করিবার পরেও অনন্তই আছেন। তাঁহার কোন ক্ষয় নাই। অনন্তের বৃদ্ধিও নাই। অনন্তের সহিত অনন্ত যোগ করিলেও অনন্ত অনন্তই থাকে, অনন্তের বৃদ্ধি হয় না। ঈশ্বরের ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই। এইজন্য ঈশ্বর অক্ষর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

"পরমঃ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর পরাতত্ত্ব

২।১।১ পরাতত্ত্ব

"পরমঃ" শব্দের অর্থ, পরাতত্ত্ব। যাঁহার অধিক অথবা যাঁহার সমানও কেহ বা কিছু নাই, এবং যিনি পরমকারণ, তিনিই পরম বা পরাতত্ত্ব। আমাদের নির্ব্বাচিত ঈশ্বরসূত্রে ঈশ্বরকে পরাতত্ত্ব বলা হইয়াছে। ঈশ্বরই যে পরাতত্ত্ব, এক্ষণে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।৭

—"যিনি বৈকুণ্ঠস্থ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, স্বর্গস্থ দেবতাগণের পরম দেবতা, ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর, বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সেই স্বপ্রকাশ, পূজনীয় এবং মহামহিমময় পরাতত্ত্বকে আমরা বিশ্বের ঈশ্বর বলিয়া জানি।"

ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। শ্বেতাশ্বতর ৬।৮

—"তাঁহা অপেক্ষা অধিক অথবা তাঁহার সমানও কেহ দৃষ্ট হয় না।" আমরা শ্রুতির প্রমাণ পাইলাম যে ঈশ্বর পরাতত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপে পরাতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন:

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু যদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥

১১।৩।৩৫

—শ্রীপিপ্পলায়ন বলিতেছেন, "যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতু কিন্তু যিনি স্বয়ং অহেতু, যিনি স্বপ্নজাগরণসুষুপ্তিতে এবং ইহাদের অতীত অবস্থাতেও বর্ত্তমান, এবং দেহ, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ ও মন যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরম বা পরাতত্ত্ব বলিয়া জানিবে।" এখানে যে বস্তুকে পরাতত্ত্ব বলা হইল, পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে দেখা গিয়াছে যে ঈশ্বরই সেই বস্তু। ঈশ্বর পরম বলিয়া ঈশ্বরকেই পরমেশ্বর বলা হয়।

২।১।২ পরম বিজ্ঞান ও পরম আনন্দ

ঈশ্বর সকল তত্ত্বের মূল এবং তাঁহা হইতেই, অন্য যাহা কিছু তত্ত্ব আছে, তৎসমুদয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। সকল তত্ত্বের মূল উৎস পরাতত্ত্ব ঈশ্বরকে জানিলে সমস্তই জানা হয়, আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না।

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। শ্বেতাশ্বতর ১।১২

—"ঈশ্বরকে জানিবার পর অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না।" ঋষি পিপ্পলাদ শিষ্য গার্গ্যকে বলিতেছেন ঃ

বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি। প্রশ্ন ৪।১০

"হে সোম্য, যিনি ঈশ্বরকে জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ হয়েন, অপর সকল বিষয়েরই জ্ঞান তাঁহার অধিগত হয়।" ঈশ্বর পরম আনন্দ, এবং সকল আনন্দের মূল উৎস। তাঁহাকে পাইলে পরমানন্দ পাওয়া যায়। আমরা পাইয়াছি, "ভূমৈব সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি।"

২।১।৩ পরাতত্ত্বের ত্রিবিধ রূপে স্থিতি ঃ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান

ভাগবত পরাতত্ত্বকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নামেও অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে পরাতত্ত্বের স্থিতি ত্রিবিধ রূপে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥ ভাগবত ।১।১।১১

—"পরম ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, এই জ্ঞানই অদ্বয় জ্ঞান। তত্ত্ববিদ্‌গণ এই অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব অর্থাৎ সত্য জ্ঞান বলেন। এক এবং অদ্বিতীয় পরম ঈশ্বর

অদ্বয়জ্ঞানের বিষয়; এইজন্য তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরমেশ্বরই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এবং ভগবানরূপে অভিহিত হয়েন, অর্থাৎ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এবং ভগবান অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ত্রিবিধ রূপ।" সুতরাং, ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, এবং ভগবত্তত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত। ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান বলিতে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই বুঝায়, তথাপি ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, এবং ভগবত্তত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত কিরূপে হইতে পারে, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরাতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব ঃ "নেতি নেতি" ঃ অধ্যাস ও অপবাদ

২।২।১ ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত ব্রহ্মতত্ত্ব ঃ পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম বা কার্য্যব্রহ্ম

ব্রহ্মতত্ত্ব পরাতত্ত্ব-ঈশ্বরের অন্তর্গত। প্রশ্ন হইতে পারে ঃ—বেদান্তে যে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই পরাতত্ত্ব বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব যদি ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা ঈশ্বরতত্ত্ব কি বৃহত্তর বস্তু ? উত্তর ঃ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যিনি পরম কারণ, পরম সত্য, অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত আনন্দস্বরূপ, ভূমা, সর্ব্বশক্তিমান, জন্মমৃত্যুক্ষয়াদিহীন, যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হয়, যাঁহার দ্বারা বিশ্ব পালিত হয়, প্রলয়ে বিশ্ব যাঁহাতে বিলীন হয়, বেদান্ত তাঁহাকে ব্রহ্ম, আত্মা, এবং ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম একই, সুতরাং ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব একই এবং একটী অপরটীর অন্তর্গত হইতে পারে না। কিন্তু বেদান্তই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম রূপে স্থিতি ব্যক্ত করিয়াছেন।

পরং চাপরং চ ব্রহ্ম। প্রশ্ন। ৫।২

এই বেদান্তসূত্রের অর্থ এই যে, এই বিশ্ব অপর ব্রহ্ম, এবং অপর ব্রহ্ম যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তিনি পরব্রহ্ম ; অর্থাৎ পরমকারণ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম, এবং তাঁহা হইতে উদ্ভূত ব্রহ্ম অপরব্রহ্ম। অপরব্রহ্মবোধক দুইটী বেদান্তসূত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য।৩।১৪।১
সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম। মাণ্ডূক্য।২

উভয় সূত্রেরই অর্থ, "স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্ম।" বেদান্তে ব্রহ্ম শব্দই অপরব্রহ্ম অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে ; প্রকরণ এবং বাক্যের অভিপ্রায় অনুসারে অর্থটী বুঝিতে হয়। এই দুইটী সূত্রেই ব্রহ্ম শব্দ অপর ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অপর ব্রহ্মের অর্থ, যে ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম নহে। বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিশ্বও ব্রহ্ম, যেমন স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন কুণ্ডলও

স্বর্ণ। ব্রহ্ম বিশ্বের পরম কারণ; তাঁহার মায়াশক্তির কার্য্যাবস্থা এই বিশ্ব; এইজন্য বিশ্বকে কার্য্যব্রহ্মও বলা হয়। ঈশ্বর হইতে অপরব্রহ্ম উৎপন্ন, ঈশ্বরের অংশ, এবং ঈশ্বরেই আশ্রিত; এই কারণে ইহা ঈশ্বরের অন্তর্গত। এইজন্য বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত। এই বিশ্ব অপরব্রহ্ম এবং ইহাকে ঈশ্বরের বিরাট রূপ এবং বিশ্বরূপও বলা হয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন কোন বস্তুই স্বয়ং ঈশ্বর নহে বা হইতেও পারে না। এইজন্য, ঈশ্বরের অপর-ব্রহ্মরূপ, বিরাট রূপ, বা বিশ্বরূপ স্বয়ং ঈশ্বর নহে। বেদান্ত এই তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। "নেদং যদিদমুপাসতে"—"মনুষ্য যে সকল সৃষ্ট বস্তুর ভজনা করে তাহা ঈশ্বর নহে।" বেদান্ত উপদেশ দিয়াছেন, "নেতি নেতি" যুক্তি সহায়ে এই বিশ্বকে এবং বিশ্বস্থিত প্রত্যেকটী বস্তুকে অপর ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হইবার পর অপরব্রহ্মের অতীত, পরমসত্য এবং পরব্রহ্ম ঈশ্বরকে জানিতে পারা যাইবে।

অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্। বৃহদারণ্যক।২।৩।৬

—"অতঃপর 'ইহা নহে, ইহা নহে', এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভের আদেশ দেওয়া হইতেছে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন উপায় নাই। ঈশ্বরের নাম সত্যের সত্য, কারণ সকল সৃষ্ট বস্তুই সত্য এবং ঈশ্বর এই সকল সত্য বস্তুরও সত্য, অর্থাৎ এই সকল সত্য বস্তু যে চরম ও পরম সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ঈশ্বর।" এইরূপ "নেতি নেতি" সহায়ে বিচারকে অধ্যাস ও অপবাদ বলা হয়। কোন বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া মনে হইলে সেই ভ্রান্ত ধারণাকে অধ্যাস বলা হয়; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। বিশ্বস্থিত কোন সৃষ্ট বস্তুকে, অথবা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম হইলে তাহা অধ্যাস। "ইহা ঈশ্বর নহে, ইহা ঈশ্বর নহে" এইরূপে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধে বিচার করিয়া অধ্যাস ত্যাগ করিবার বিচারপন্থাকে অপবাদ বলা হয়। অপবাদের দ্বারা অনীশ্বরে ঈশ্বর ভ্রম দূর করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিলে অবশেষে পরমসত্য ঈশ্বরকে জ্ঞাত হওয়া যায়। এই পন্থার দ্বারা কিরূপে ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়, বেদান্ত তাহার দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে বরুণ স্বীয় পুত্র ভৃগুকে তপস্যার দ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইবার উপদেশ দিলেন। ভৃগু কিছুদিন তপস্যা করিয়া পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন, তিনি জানিয়াছেন যে অন্নই ঈশ্বর। অন্নে এই ঈশ্বরভ্রম ভৃগুর

অধ্যাস। বরুণ বলিলেন, "তপস্যা কর।" তাহার পর ভৃগু ক্রমান্বয়ে প্রাণ, মন, এবং বিজ্ঞানকে ঈশ্বররূপে জ্ঞাত হইয়া বরুণকে তাহা বলায় প্রতিবারেই তিনি ভৃগুকে তপস্যা করিতে বলিলেন। অপবাদের দ্বারা ভৃগুর অধ্যাস দূরীভূত হইবার পর, কোন সৃষ্টবস্তুই ঈশ্বর নহে, ঈশ্বর বিশ্বাতীত ভূমানন্দস্বরূপ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। আমরা দেখিলাম যে, ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত, ইহার অর্থ এই যে, অপরব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত। এই তত্ত্বটী শ্রুতি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন।

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ শ্বেত।৩।৭

—"সকল সৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম অপেক্ষাও অর্থাৎ অপরব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভূমা, বিবিধ নামরূপবিশিষ্ট সর্ব্বভূতের মধ্যে গূঢ়রূপে অবস্থিত, সমগ্র বিশ্বের পরিবেষ্টনকারী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে।"

ঈশা বাস্যমিদং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। ঈশ।১

—"নিখিল বিশ্বে যত ব্রহ্মাণ্ড আছে এবং যত স্থাবরজঙ্গম আছে, তৎসমুদয় ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।" এতদ্দারা শ্রুতি ইহাই নিরূপণ করিলেন যে ঈশ্বর বৃহত্তম বস্তু এবং আধার; বিশ্ব আধেয় এবং ঈশ্বরে অন্তর্নিহিত; সুতরাং অপরব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরাতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব

২।৩।১ ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত পরমাত্মতত্ত্ব ঃ "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"

ঈশ্বরকে আত্মাও বলা হয়। কেন তাঁহাকে আত্মা বলা হয়, তাহা পূর্ব্বেই নির্গুণতত্ত্বের বিচারের সময় বলা হইয়াছে। ঈশ্বর পরম বলিয়া যেমন তাঁহাকে পরমেশ্বর বলা হয়, তদ্রূপ, তিনি আত্মা এবং তিনিই পরম বলিয়া তাঁহাকে পরমাত্মাও বলা হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ঈশ্বরই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই ঈশ্বর, সুতরাং ঈশ্বরতত্ত্ব যাহা পরমাত্মতত্ত্বও তাহাই; ইহাদের একটী অন্যটীর অন্তর্গত হইতে পারে কিরূপে? উত্তর ঃ—যে পরমাত্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত, তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইতেছে। পরমাত্মা-পরমেশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মায়াশক্তিকে জড়-উপাদানভূতা প্রকৃতিতে পরিণত করিয়া সেই জড় উপাদান হইতে বিশ্বের যাবদীয় জড়দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। জড়দেহ একটী অচেতন যন্ত্রমাত্র। তদ্দ্বারা কোন কর্ম্মই সাধিত হইতে পারে না। জড় দেহ কর্ম্মক্ষম না হইলে বিশ্বের স্থিতিসাধনও হইতে পারে না। এই কারণে, ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করিয়া বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন।

সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ।
তৈত্তিরীয় ২।৬

এই শ্রুতিবাক্য হইতে আমরা পাইলাম যে ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। তিনি জীবাত্মারূপেও অনুপ্রবিষ্ট আছেন এবং পরমাত্মারূপেও অনুপ্রবিষ্ট আছেন।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ। ব্রহ্মসূত্র ১।২।১১

—"জড় দেহে যে দুইজন প্রবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন জীবাত্মা এবং অন্যজন পরমাত্মা।" প্রত্যেক জীবদেহে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের চিদানন্দের একটী কণিকা—একটী স্ফুলিঙ্গ, জীবাত্মা রূপে অনুপ্রবিষ্ট আছে। চৈতন্যময়

জীবাত্মার বিদ্যমানতার জন্য জড় ও অচেতন জীবদেহ চেতনা প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মা দেহরূপ পুরে অবস্থিত বলিয়া জীবাত্মাকে শাস্ত্রে পুরুষও বলা হইয়াছে। ত্রিগুণময় দেহের মধ্যে অবস্থিতির জন্য গুণসঙ্গবশতঃ জীবাত্মা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া নিজকে লিঙ্গদেহের সহিত অভিন্ন মনে করে। এইরূপ দেহাভিমানী জীবাত্মা ভোগবাসনার সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ হইয়া যায় এবং নিজে অমর হইলেও একটী স্থূলদেহের মৃত্যুর পর ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার এবং কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য লিঙ্গদেহকে আকর্ষণ করিয়া অন্য স্থূলদেহে গমন করে। এইরূপ জন্মমৃত্যুর অধীন জীবাত্মা অপরব্রহ্ম বিশ্বের অন্তর্গত হইয়া থাকে। অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা জীবাত্মা যখন মুক্তি লাভ করে, তখন আর তাহাকে জীবাত্মা বলা হয় না, আত্মা বলা হয়; এইরূপ মুক্ত আত্মা অপরব্রহ্মের অন্তর্গত থাকে না। বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট ঈশ্বরের পরমাত্মা-রূপটী জীবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশ্বের স্থিতিসাধনের জন্য বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, এবং বিশ্বনিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বের প্রত্যেকটী বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়াও ঈশ্বরের পক্ষে প্রয়োজন, কারণ এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি, প্রত্যেকটী বস্তুকে কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করিলে বিশ্বের স্থিতি সাধিত হইবে তাহা বুঝিয়া, তত্তৎ বস্তুকে তদ্রূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিশ্বের স্থিতি সাধন করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীয় অনন্ত চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তির একাংশকে সমগ্র বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করাইয়া রাখিয়াছেন। বিশ্বের মধ্যে ঈশ্বরের এই যে চৈতন্যময় জ্ঞান-শক্তিস্বরূপে স্থিতি, ইহাই তাঁহার বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট এবং বিশ্বব্যাপী পরমাত্মস্বরূপ।

সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ঐতরেয় ৩।১।৩

—"এই জগতের সকল স্থাবর ও জঙ্গম ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট জ্ঞানশক্তির দ্বারা সুবিজ্ঞাত, এবং তদ্দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্থাপিত হইয়া আছে। সমগ্র বিশ্বই ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট জ্ঞানশক্তির দ্বারা সুবিজ্ঞাত। ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট জ্ঞানশক্তি সমগ্র বিশ্বকে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরের এই বিশ্বব্যাপী জ্ঞানশক্তি তাঁহার প্রজ্ঞানস্বরূপ। ইহা বিশ্বব্যাপী এবং ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ইহাও ব্রহ্ম।" শ্রুতির এই "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" বিশ্বব্যাপী চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তি। ইহা সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের চিদংশে অধিষ্ঠিত অনন্ত চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তির অংশ। শক্তিমান এবং

তাঁহার শক্তি অভিন্ন ; এই কারণে, ব্রহ্মের বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট এই চৈতন্যময় জ্ঞানশক্তিস্বরূপকেও ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মহেশ্বর প্রভৃতি নামে শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্র আখ্যাত করিয়াছেন। ঈশ্বরই পরমাত্মা ; প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, অর্থাৎ বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট ঈশ্বরের এই চৈতন্যময় জ্ঞানশক্তিস্বরূপ এবং তিনি অভিন্ন বলিয়া ঈশ্বরের এই স্বরূপটীকেও পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয় ; ঈশ্বর পুরুষ বলিয়া তাঁহার এই স্বরূপটীকেও পুরুষ বলা হয়। জীবাত্মা জীবের স্বরূপ এবং প্রতি জীবদেহের জীবাত্মা ভিন্ন। কিন্তু পরমাত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ এবং প্রতি দেহে অবস্থিত পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন। জীবাত্মা জীবদেহের গুণে লিপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গুলির সহায়ে বিষয় ভোগ করে, কিন্তু এই পরমাত্মা প্রতি দেহে থাকিয়াও দেহের গুণে লিপ্ত হয়েন না ; তিনি শক্তিমাত্রত্ব হেতু নিত্য নির্ব্বিকার। ভোগবাসনা মিটাইবার জন্য জীবাত্মা একটী দেহের মৃত্যুর পর দেহান্তর গ্রহণ করে, কিন্তু পরমাত্মার ভোগবাসনাও নাই, দেহান্তরগ্রহণও নাই, এবং কর্ম্মফলভোগও নাই। পরমাত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া পরমাত্মাও অনাদি, অব্যয়, এবং নির্গুণ।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥

গীতা ১৩।৩১—৩২

—"এই পরমাত্মা অনাদি এবং নির্গুণ, এইজন্য ইহা অব্যয়। ইনি দেহে অবস্থান করিয়াও কিছুই করেন না, অর্থাৎ বিষয়ভোগাদি কোন কর্ম্মই করেন না এবং দেহের গুণে ও ধর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। যেমন, আকাশ সূক্ষ্ম বস্তু বলিয়া বিষ্ঠা চন্দনাদি সর্ব্বপ্রকার বস্তুতে থাকিয়াও কোন বস্তুরই গুণে এবং ধর্ম্মে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ পরমাত্মাও সূক্ষ্ম বস্তু বলিয়া অর্থাৎ শক্তিমাত্রত্ব হেতু, উত্তম ও অধম সর্ব্ববিধ বস্তুতে অবস্থিত থাকিয়াও কোন দেহেরই গুণে ও ধর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না।" এই নির্গুণ, নির্লিপ্ত, এবং নির্ব্বিকার পরমাত্মা জীবাত্মার প্রত্যেকটী কার্য্যের ও চিন্তার দ্রষ্টা এবং সাক্ষীরূপে, জীবাত্মার ভর্ত্তা এবং পালকরূপে, এবং জীবাত্মাকে শুভপ্রেরণাদাতা রূপে প্রতি দেহে অবস্থান করেন। এইজন্য পরমাত্মাকে অন্তর্য্যামীও বলা হয়।

অন্তর্য্যামী অধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যাপদেশাৎ। ব্রহ্মসূত্র ।১।২।১৮

—"মনুষ্য ও দেবতাগণের অন্তর্য্যামীরূপে যাঁহার গুণের উল্লেখ আছে, তিনি পরমাত্মা।"

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ গীতা ।১৩।২২

—"পরম পুরুষ পরমেশ্বর জীবদেহে জীবাত্মার সকল কার্য্যের ও চিন্তার দ্রষ্টা ও সাক্ষী, জীবাত্মার অনুগ্রাহক অর্থাৎ শুভপ্রেরণাদাতা, ভর্ত্তা এবং পালক মহেশ্বর রূপে অবস্থিত আছেন; তিনি পরমাত্মা নামেও উক্ত হয়েন।" জীবাত্মার এবং পরমাত্মার বিভিন্নতা এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইল, শ্রুতিও তাহাই নিরূপণ করিয়াছেন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ মুণ্ডক ।৩।১।১
শ্বেত ।৪।৬

—এই শ্লোকে শ্রুতি জীবদেহকে বৃক্ষরূপে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুইটী বন্ধুভাবাপন্ন পক্ষীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্লোকটীর অর্থ:—"সর্ব্বদা একই স্থানে অবস্থানকারী বন্ধুভারাপন্ন দুইটী পক্ষী একই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া আছে; তাহাদের মধ্যে একটী স্বাদু ফল ভোগ করে এবং অন্যটী ভোগ না করিয়া দর্শন করে।" যে স্বাদু ফল ভোগ করে সে জীবাত্মা; যিনি জীবাত্মার কার্য্য দর্শন করেন তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মা জীবাত্মাকে শুভপ্রেরণা দান করেন বলিয়া তিনি জীবাত্মার সখা। প্রত্যেক দেহে অবস্থানকারী এবং তত্তৎ দেহের ভিন্ন ভিন্ন বাসনাসংস্কারে বদ্ধ জীবাত্মাকে প্রত্যগাত্মা (Individual Soul) নামেও শ্রুতি অভিহিত করিয়াছেন, এবং পরমাত্মা প্রত্যগাত্মাকে শুভপ্রেরণা দান করেন বলিয়া পরমাত্মা প্রেরয়িতা নামেও অখ্যাত হইয়াছেন।

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ শ্বেত ।১।৬

—"সর্ব্ব প্রাণীর আধার ও আশ্রয় স্বরূপ এই ব্রহ্মচক্রে অর্থাৎ বিশ্বে ঈশ্বর পৃথগাত্মা এবং প্রেরিতা (প্রেরয়িতা) রূপে ভ্রমণ করিতেছেন। এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া পৃথগাত্মা যোগসাধনার দ্বারা প্রেরয়িতার সহিত যুক্ত হইতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ করে।" দেহাভিমানী জীবাত্মা যে দেহে অবস্থান করে, সেই

দেহটীর মৃত্যুকালে পরমাত্মাই তাহাকে সেই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া তাহার ভোগবাসনার এবং কর্ম্মফলভোগের উপযোগী দেহান্তর গ্রহণ করান, এই তত্ত্বও শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন।

তদ্ যথাহনঃ সুসমাহিতমুৎসর্জ্জদ্ যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাহন্বারূঢ় উৎসর্জ্জন যাতি যত্রৈতদূর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি। বৃহদারণ্যক।৪।৩।৩৫

—"যেমন চালক গুরুভারাক্রান্ত শকটের উপর আরূঢ় থাকিয়া উহাকে চালাইবার সময় উহা শব্দ করিতে করিতে গমন করে, তদ্রূপ বাসনাসংস্কারের এবং কর্ম্মফলের গুরুভারে আক্রান্ত শারীর আত্মার, অর্থাৎ লিঙ্গদেহের সহিত একত্রস্থিত জীবাত্মার, উপর আরূঢ় হইয়া পরমাত্মা উহাকে ঊর্দ্ধশ্বাসী এবং অসন্ন—মৃত্যু দেহ হইতে দেহান্তরে লইয়া যাইবার সময় উহা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গমন করে।" লিঙ্গদেহের সহিত অভিন্নতাবোধযুক্ত এবং লিঙ্গদেহের সহিত স্থূলদেহ হইতে উৎক্রামণকারী দেহাভিমানী জীবাত্মাকে এই সূত্রে শারীর আত্মা বলা হইয়াছে, এবং পরমাত্মা প্রজ্ঞানব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃষ্টজ্ঞানশক্তিস্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে প্রাজ্ঞ আত্মা বলা হইয়াছে। এই যে পরমাত্মার পরিচয় পাওয়া গেল, ইহা পূর্ণ শক্তিমান ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানশক্তির অংশমাত্র। সুতরাং অংশী ঈশ্বর অংশ পরমাত্মা অপেক্ষা মহত্তর এবং অংশ অংশীর অন্তর্গত। শাস্ত্রও ইহা নিরূপণ করিয়াছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ গীতা।১৫।১৬-১৭

—"এই বিশ্বে ক্ষর অর্থাৎ জীবাত্মা এবং অক্ষর অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিস্বরূপ পরমাত্মা নামক দুইটী পুরুষ আছে। সর্ব্ব জীবকে ক্ষর, এবং নির্ব্বিকার চৈতন্যময় জ্ঞানশক্তিস্বরূপকে অক্ষর বলা হয়। পরমাত্মা নামে খ্যাত যে অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকে আবিষ্ট থাকিয়া ত্রিলোককে ধারণ ও পালন করিতেছেন, তিনি কিন্তু অন্য, অর্থাৎ এই উভয় পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং তিনি পুরুষোত্তম।" পরিবর্ত্তনশীল জড়দেহ ক্ষর ভাব; ইহার মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাকে ক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে। নির্ব্বিকার পরমাত্মার কোন পরিবর্ত্তন নাই, এইজন্য তাঁহাকে অক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে। গীতা এই তত্ত্ব নিরূপণ করিলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বরই

পরমাত্মা ; বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট ঈশ্বরের চৈতন্যময় জ্ঞানশক্তিস্বরূপকেও পরমাত্মা বলা হয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ এবং তাহা পরাতত্ত্ব-ঈশ্বরের অন্তর্গত; এবং স্বয়ং ঈশ্বরই পুরুষোত্তম। শ্রুতিও এই তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্ নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

শ্বেত।১।১২

—"ঈশ্বর জ্ঞেয়। তিনি নিত্য আত্মারূপে অবস্থিত। তাঁহাকে জানিলে অন্য কিছু জানিতে অবশিষ্ট থাকে না। ভোক্তা অর্থাৎ জীবাত্মা, ভোগ্য অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি যাবদীয় বিষয়, এবং প্রেরিতা অর্থাৎ পরমাত্মা, এই তিনটীর সকলই ব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের ত্রিবিধ রূপ, ইহা শ্রুতি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।" এক্ষণে আমরা প্রাপ্ত হইলাম যে, শ্রুতির "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" যে পরমাত্মতত্ত্ব, তাহা পরাতত্ত্ব-ঈশ্বরের অন্তর্গত। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন মতবাদ অনুসারে ছান্দোগ্য শ্রুতির "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" পরব্রহ্মের স্বরূপ, অর্থাৎ পরব্রহ্ম কেবলই নির্ব্বিকার এবং নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ। এই মতবাদ অসার ও অসত্য। ছান্দোগ্য শ্রুতিই বলিয়াছেন যে সেই সৎ চিন্তা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন (ছা।৬।২।৩)। এই শ্রুতিই বলিয়াছেন যে ঈশ্বর ভূমানন্দ (ছা।৭।২৩।১)। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ (বৃ।৩।৯।২৮)। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন যে ঈশ্বর রসস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন যে ঈশ্বর আনন্দময় (ব্র।১।১।১২) সমগ্র শ্রুতি শাস্ত্র অনুসারে ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারেও তাহাই। ঈশ্বরকে কেবল জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া মনে করিলে তাঁহার সৎ ও আনন্দকে বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ নহে ; ইহা তাঁহার বিশ্বব্যাপী পরমাত্মস্বরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরাতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব

২।৪।১। ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত ভগবত্তত্ত্ব ঃ "সোঽহমস্মি" ঃ "সঃ" এবং "অহম্"-এর অভিন্নত্ত্ব এবং ভিন্নত্ত্ব

ভগ শব্দের অর্থ ষড়ৈশ্বর্য্য। যাঁহার এই ষড়ৈশ্বর্য্য আছে তিনি ভগবান।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ॥

—"সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, এবং বৈরাগ্য, এই ষড়ৈশ্বর্য্যকে ভগ বলা হয়।" এই সমগ্র ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী ঈশ্বর। ঈশ্বর চিদ্বস্তু; তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যও চিদ্বস্তু। তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যকে সমগ্রভাবে তাঁহার বিভূতি বলা হয় এবং মহিমাও বলা হয়। ষড়ৈশ্বর্য্য চিদ্বস্তু বলিয়া ইহাকে ঈশ্বরের চিদৈশ্বর্য্য বলা হয় এবং চিদ্বিভূতিও বলা হয়। একমাত্র ঈশ্বরই ষড়ৈশ্বর্য্যবান বলিয়া একমাত্র ঈশ্বরই স্বয়ং ভগবান; সুতরাং ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ভগবত্তত্ত্ব একই। এই কারণে বেদান্ত স্বয়ং ঈশ্বরকেই ভগবান বলিয়াছেন।

(১) সর্ব্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ। শ্বেত।৩।১১

(২) স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ। শ্বেত।৫।৪

—(১) "সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরই ভগবান; তিনি সর্ব্ববস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট এবং মঙ্গলময়।" (২) "সেই ঈশ্বরই ভগবান, পূজনীয়, এবং সকল জীবে অধিষ্ঠিত।" আমরা পাইলাম যে স্বয়ং ঈশ্বরই ভগবান। তথাপি ভগবত্তত্ত্ব কিরূপে ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত তাহা বিবৃত করা হইতেছে। লীলার নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীয় ভগবত্তার বিস্তার করেন।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম। মুণ্ডক।১।১।৮

—"লীলার নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীয় জ্ঞানশক্তির পরিচালনা করিয়া অর্থাৎ কিরূপে আপনাকে বিস্তার করিলে সুষ্ঠু লীলা হইবে তাহা জ্ঞানশক্তির দ্বারা স্থির করিয়া লইয়া, আপনার বিস্তার সাধন করেন।" বিস্তার করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর

একাকী ছিলেন। তিনি কেন এবং কিরূপে আপনাকে প্রথমে বিস্তার করিলেন, বেদান্ত তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন।

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যহরৎ। বৃহদারণ্যক ।১।৪।১

—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব পুরুষমূর্ত্তি আত্মার স্বরূপেই ছিল। সেই পুরুষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আপনাকে ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিলেন না। 'আমি হইতেছি তিনি', এই বাক্য তিনি সর্ব্বপ্রথমে উচ্চারণ করিলেন।" "আমি হইতেছি তিনি" এই বাক্যের অর্থ, "আমিই পুরুষমূর্ত্তি ঈশ্বর।" সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন অন্য কেহই বা কিছুই ছিল না, তখন ঈশ্বর "সোঽহমস্মি" বলিয়া স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। এই বাক্যে "অস্মি" শব্দের দ্বারা "সঃ" এবং "অহম্"-এর সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে। সেই নিণাত সম্বন্ধটী হইতেছে, "সঃ" এবং "অহম্"-এর অভিন্নত্ব এবং ভিন্নত্ব। এতদ্বারা নিরূপিত হইল যে (১) ঈশ্বর "সোঽহম্", এবং (২) সৃষ্টির পূর্ব্বে "সঃ" এবং "অহম্" অভিন্নভাবে অবস্থিত ছিল। অতঃপর বেদান্ত বলিয়াছেন যে, এই অবস্থায় ঈশ্বর আনন্দ না পাইয়া আনন্দের নিমিত্ত আপনাকে বিস্তার করিলেন।

স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নীশ্চ চাভবতাম্। বৃহদারণ্যক ১।৪।৩

—"ঈশ্বর একাকী থাকিয়া আনন্দ পাইলেন না; এইজন্য কেহ একাকী থাকিয়া আনন্দ পায় না। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। তিনি এই পরিমাণ হইলেন, যেমন পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষে হয়। তিনি এই আপনাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাহা হইতে পতি ও পত্নী উৎপন্ন হইল।" শ্রুতি কর্ত্তৃক ঘোষিত এই নিগূঢ় তত্ত্বটীর বিশ্লেষণ এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এখানে ঐ তত্ত্বটীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর একাকী থাকিয়া আনন্দ পাইলেন না; অর্থাৎ, "সঃ" এবং "অহম্"-এর একীভূত অবস্থায় সোঽহম্ ঈশ্বর আনন্দ পাইলেন না। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের আনন্দাংশ তাঁহার আনন্দাত্মা এবং অহম্। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাঁহার অহমের মধ্যে অধিষ্ঠিতা। ঈশ্বরের আনন্দাংশে অধিষ্ঠিতা ইচ্ছাশক্তিও আনন্দময়ী; এইজন্য তাঁহার ইচ্ছাশক্তিরই অন্য নাম

হ্লাদিনী শক্তি। আনন্দদিৎসা এবং আনন্দলিপ্সা হ্লাদিনী শক্তির স্বভাব। হ্লাদিনীর আনন্দদিৎসার সার্থকতায় আনন্দলিপ্সার সার্থকতা হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে সোঽহম্ ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই না থাকায় হ্লাদিনীর আনন্দদিৎসার সার্থকতা হইতে পারে নাই, এইজন্য আনন্দলিপ্সারও সার্থকতা হইতে পারে নাই। আনন্দদিৎসার এবং আনন্দলিপ্সার সার্থকতার জন্য দ্বিতীয়ের প্রয়োজন। সেই দ্বিতীয়ের মধ্যেও যদি আনন্দদিৎসা এবং আনন্দলিপ্সা থাকে এবং দিৎসার সার্থকতায় লিপ্সার সার্থকতার স্বভাবও থাকে, তবেই তাহার সহিত ঈশ্বরের অহম্-এর হ্লাদিনীর আনন্দদিৎসার ও আনন্দলিপ্সার পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা ঈশ্বর এবং তাঁহার দ্বিতীয়, পরস্পরকে আনন্দ দান করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। আনন্দদিৎসার সার্থকতার দ্বারা আনন্দলিপ্সার সার্থকতা হয়, এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট একমাত্র বস্তু, ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তি; সুতরাং স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিকেই মূর্ত্তিমতী দ্বিতীয়া রূপে প্রকাশ না করিলে ঈশ্বর আনন্দ পাইতে পারেন না। এই কারণে, ঈশ্বর যখন আনন্দসম্ভোগের ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তিকে আপনা হইতে ভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে ঘনীভূত করিয়া মূর্ত্তিমতী করিলেন। ঈশ্বরের হ্লাদিনীর এই মূর্ত্তিই ঈশ্বরের দ্বিতীয় হইলেন। শ্রীরাধা ঈশ্বরের সেই দ্বিতীয় মূর্ত্তি। এইরূপে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বর যুগলমূর্ত্তি হইলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঈশ্বরের সেই যুগলমূর্ত্তি। ঈশ্বর স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিকে রাধারূপে ভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং হ্লাদিনীশক্তিহীন হইলেন না। তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি অনন্ত; অনন্ত হইতে অনন্ত বিয়োগ করিলেও অনন্তই অবশিষ্ট থাকে। ঈশ্বরের হ্লাদিনীশক্তি অনন্ত বলিয়া তাঁহার অনন্ত হ্লাদিনী শক্তিকে রাধারূপে প্রকাশ করিবার পরেও তাঁহার মধ্যে অনন্ত হ্লাদিনী শক্তি বিদ্যমান রহিল। এখন রাধাকৃষ্ণ পারস্পরিক লীলার দ্বারা উভয়েই আনন্দ সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) আমরা পাইলাম যে, ঈশ্বর আনন্দের জন্য লীলা আরম্ভ করিলেন, আনন্দলীলার জন্য আপনাকে বিস্তার করিলেন, এবং শ্রীরাধা তাঁহার ভগবত্তার সর্ব্বপ্রথম বিস্তার। অতঃপর লীলার বিস্তারসাধনের নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীয় সন্ধিনী-শক্তিকে অপ্রাকৃত পরব্যোম, এবং পরব্যোমের ঊর্দ্ধতম দেশে গোলোক নামক শ্রীরাধাসহ স্বীয় আনন্দলীলার ধামরূপে প্রকাশ করিলেন। গোলোকে আনন্দ-

লীলার পরিপুষ্টিসাধনের জন্য ভগবতী শ্রীরাধা আপনাকে বিস্তার করিয়া তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ সখীবৃন্দকে প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও আপনাকে বিস্তার করিয়া তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ সখাবৃন্দকে প্রকাশ করিলেন। ইঁহারা গোলোকের নিত্যলীলার নিত্যপরিকর। অতঃপর ঈশ্বর স্বীয় সন্ধিনী শক্তিকেই পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠনামক বহু অপ্রাকৃত ধামরূপে প্রকাশ করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ স্বীয় ভগবত্তার বিস্তার সাধন করিয়া স্বয়ং বাসুদেব রূপে বৈকুণ্ঠে বিরাজমান হইলেন। বৈকুণ্ঠে বাসুদেবরূপে বিরাজমান হইয়াও গোলকেও কৃষ্ণ রহিলেন, কারণ অনন্ত হইতে অনন্ত গ্রহণ করিলেও অনন্ত অনন্তই থাকে। বাসুদেব হইতে আদিব্যূহের, আদিব্যূহ হইতে চতুর্ব্ব্যূহের, এবং তাহা হইতে আরও অনেক ব্যূহের প্রকাশ হইল। এইরূপে বৈকুণ্ঠধাম সমূহে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, কেশব, মাধব প্রভৃতি ঈশ্বরের লীলাবিলাসের বহু মূর্ত্তি বিরাজমান হইলেন। রাধাও আপনার বিস্তার সাধনের দ্বারা বহু লক্ষ্মী-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন ; এক-একটী লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠস্থ ভগবানগণের এক-একটীর লীলাসঙ্গিনী। বৈকুণ্ঠস্থ ভগবানগণ এবং লক্ষ্মীগণ কৃষ্ণের ভগবত্তার বিস্তার। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও ঈশ্বরের শক্তির যে মূর্ত্তিমতী স্বরূপ যোগমায়া, মহামায়া, বিষ্ণুমায়া, বৈষ্ণবীশক্তি, কাত্যায়ণী, চণ্ডী, উমা, গৌরী প্রভৃতি বহু নামে আখ্যাত হইয়াছেন, সেই ভগবতীও ঈশ্বরের ভগবত্তার বিস্তার এবং তাঁহারই ভগবৎস্বরূপ। বিষ্ণু, শিব, গণপতি, আদিত্য বা সূর্য্য, ইঁহারাও ঈশ্বরের ভগবত্তার বিস্তার এবং তাঁহারই ভগবৎস্বরূপ। অপ্রাকৃত ধামসমূহকে এবং তত্রত্য ভগবৎস্বরূপগণকে প্রকাশ করিবার পর ঈশ্বর "আপনাকেই দুইভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাহা হইতে পতি ও পত্নী উৎপন্ন হইল।" আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করার অর্থ, আপনি পুরুষ ও প্রকৃতি হইলেন। পুরুষ ও প্রকৃতি হইয়াও অনন্ত ঈশ্বর স্বীয় অনন্ত স্বরূপেই রহিলেন। পুরুষপ্রকৃতি হইতে পতি ও পত্নী উৎপন্ন হইল, ইহার অর্থ, পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে দেবতামনুষ্যাদি সকল জীবের পুরুষ ও নারী জাতি উৎপন্ন হইল। এইরূপে অসংখ্য স্থাবর-জঙ্গমময় ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ প্রাকৃত বিশ্বের উৎপত্তি হইল। প্রাকৃত বিশ্বের উৎপত্তির পর হইতে ঈশ্বর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্যবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, হইতেছেন, এবং হইবেন। এই সমস্ত অবতারগণ ঈশ্বরের ভগবত্তার বিস্তার এবং তাঁহারই ভগবৎস্বরূপ। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীয় এক এবং অদ্বিতীয়

৫

সচ্চিদানন্দরূপকে বহু রূপে প্রকাশ করিতে পারেন এবং করেন, এই তত্ত্ব বেদান্তেও নিরূপিত হইয়াছে।

(১) একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। কঠ ।২।২।১২

(২) স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা ভবতি সপ্তধা নবধা পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ শতশ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রানি চ। ছান্দোগ্য ।৭।২৬।২

—"এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীয় এক এবং অদ্বিতীয় রূপকে বহুরূপে প্রকাশ করেন।" (২) "ঈশ্বর এক প্রকার, আবার তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, নয় প্রকার, একাদশ প্রকার, একশত দশ প্রকার, এবং এক হাজার বিংশতি প্রকার হয়েন।" ঈশ্বর আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করেন, এরূপ শ্রুতিবাক্য আরো অনেক আছে। এই সকল শ্রুতিবাক্য ঈশ্বরের লীলা-বিলাসের মূর্ত্তিপ্রকাশ সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ববীজ; পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রে এই তত্ত্ববীজ পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন দেখা গেল যে, সকল ভগবানগণ এবং ভগবতীগণ স্বয়ং-ভগবান ঈশ্বরের ভগবত্তার বিস্তার, তাঁহারাই ভগবৎ-স্বরূপ, এবং তাঁহার সহিত অভিন্ন। এই কারণে বলা হইয়াছে যে, ভগবত্তত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত।

ঈশ্বরকে কেন "পরম" বলা হইয়াছে, তাহা আমরা পাইলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

"কৃষ্ণঃ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরমেশ্বর কৃষ্ণ

৩।১।১ কৃষ্ণ নামের প্রকাশ

এক্ষণে আমরা ঈশ্বরসূত্র হইতে পাইতেছি যে, পরমেশ্বর কৃষ্ণ। পরমেশ্বর কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ। প্রশ্ন হইতে পারে, বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে কে ঈশ্বরকে কৃষ্ণ নাম দিয়াছিলেন? উত্তর ঃ—কোন দেবতা, মনুষ্য, অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীব ঈশ্বরকে কৃষ্ণ নাম দেন নাই। লীলারম্ভের পূর্ব্বে ঈশ্বর যখন একাকী ছিলেন, তখন নাম তাঁহারই মধ্যে ছিল। লীলার নিমিত্ত, লীলারম্ভ-কালে ঈশ্বর আপনা হইতে নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং, কৃষ্ণ নাম ঈশ্বরের স্বয়ংকৃত। সকল নামই ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এই তত্ত্ব শ্রুতি হইতেই পাওয়া যায়।

আত্মতো নাম। ছান্দোগ্য ৭।২৬।১

—"ঈশ্বর হইতে নাম প্রকাশিত হইয়াছে।" এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ এই যে, ঈশ্বরের প্রকাশরূপসমূহের এবং পরিণামরূপসমূহের সকল নামই ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং, কৃষ্ণ নামও তাঁহা হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ মুণ্ডক ১।১।৯

—"ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদ্। তিনি স্বীয় অনন্ত জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, এবং প্রলয়রূপ তপস্যা অর্থাৎ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। ওঙ্কার, নাম,

রূপ এবং অন্ন তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হয়।" এখানেও শ্রুতি বলিলেন যে সমস্ত নামের প্রকাশ ঈশ্বর হইতে হইয়াছে। কিরূপে নামের প্রকাশ হইয়াছিল এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে।

৩।১।২ ঈশ্বর হইতে ওঙ্কারের প্রকাশ

লীলারম্ভের পূর্ব্বে ঈশ্বর যখন একাকী ছিলেন এবং দ্বিতীয় কিছুই ছিল না, তৎকালে নামের প্রকাশ থাকিবারও প্রয়োজন ছিল না। ঈশ্বর যখন লীলা আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প করিলেন তখনই তাঁহার অনন্ত জ্ঞানশক্তির দ্বারা অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত দ্বিবিধ লীলারই আনুপূর্ব্বিক পরিকল্পনা সমগ্রভাবে স্থির করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে যুগলমূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ হইলেন। হ্লাদিনীর রাধারূপ দর্শনে কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া তাঁহার পরিকল্পনা তাঁহার সঙ্কল্প অনুযায়ী হইয়াছে জানিয়া অনুজ্ঞা অর্থাৎ সম্মতি জ্ঞাপক "ওম্" শব্দ উচ্চারণ করিলেন। এইজন্য শ্রুতি "ওম্" শব্দকে অনুজ্ঞাক্ষর বলিয়াছেন এবং "ওম্" অনুজ্ঞাক্ষররূপে ব্যবহৃত হয়।

(১) ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বৈ। তৈত্তিরীয় ১।৮

(২) তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরম্। ছান্দোগ্য ১।১।৮

—"(১) ওম্, এই শব্দটী নিশ্চয়ই সম্মতিসূচক শব্দরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। (২) সেই ওঙ্কার সম্মতিসূচক অক্ষর।"

৩।১।৩ ওঙ্কার হইতে বেদের প্রকাশ

তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বানি পর্ণানি সংতৃন্নান্যেবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃন্নোঙ্কার এবেদং সর্ব্বমোঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্। ছান্দোগ্য ২।২৩।৩

—"যেমন শিরার দ্বারা বৃক্ষপত্রের সমগ্র অবয়বগুলি সন্নিবদ্ধ এবং পরিব্যাপ্ত, তদ্রূপ ওঙ্কারের দ্বারা সমগ্র শব্দরাশি সন্নিবদ্ধ এবং পরিব্যাপ্ত। ওঙ্কারই এই সমস্ত, ওঙ্কারই এই সমস্ত।" কৃষ্ণ ওঙ্কার হইতে শব্দরাশিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত ওঙ্কার হইতে তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত এই শব্দরাশিই বেদ বা শব্দব্রহ্ম। এইজন্য সমগ্র বেদ ওঙ্কারের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এইরূপে বেদ প্রকাশিত করিতে কৃষ্ণের দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় নাই; বেদ প্রকাশ তাঁহার একটী নিঃশ্বাসের কার্য্য।

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিঃশ্বসিতানি। বৃহদারণ্যক। ২।৪।১০

—"যেমন অগ্নিসংযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে পৃথক্ হইয়া ধূম্র নির্গত হয়, তদ্রূপ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, মন্ত্রসমূহ, সূত্রসমূহ, মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা, শব্দাদির ব্যাখ্যা, এই সমস্তই ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। এই সমস্তই তাঁহার নিঃশ্বাস।" শব্দব্রহ্ম বেদকে ঈশ্বরের একটী নিঃশ্বাস কেন বলা হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। লীলারম্ভের পূর্ব্বে ঈশ্বর সমগ্র লীলার যে পরিকল্পনা রচনা করিলেন, তাহাতেই অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত দ্বিবিধ লীলারই সকল বস্তুর নাম ছিল। ঈশ্বর সেই সকল নামের বীজ স্বরূপ "ওম্" শব্দ একটী নিঃশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করিয়া স্বীয় সৃষ্টি পরিকল্পনায় স্বীয় সম্মতি সূচনা করিলেন এবং তাঁহার অনন্ত জ্ঞানশক্তি সহায়ে তৎক্ষণাৎ শব্দরাশির বীজ "ওম্" হইতে শব্দব্রহ্ম বেদকে প্রকাশ করিলেন। এইজন্য বলা হইয়াছে যে বেদ ঈশ্বরের একটীমাত্র নিঃশ্বাস। বেদে পরমেশ্বর স্বীয় কৃষ্ণ নামও প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাইলাম, ঈশ্বর স্বয়ং কৃষ্ণ নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেদে কৃষ্ণ নামের প্রকাশ

৩।২।১। বেদোক্ত নাম নিত্য

বেদ নিত্য। আদিম সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আদিম সৃষ্টির পর হইতে বিশ্বের পুনঃ পুনঃ প্রলয় হইয়াছে এবং হইবে এবং প্রলয়ের পর বিশ্বের যথাপূর্ব্ব পুনরাবর্ত্তন হইয়াছে এবং হইবে। প্রলয়কালে বেদ ঈশ্বরে থাকে। বিশ্বের প্রতিবারের পুনরাবর্ত্তনের পূর্ব্বে ঈশ্বর বেদ প্রকাশ করেন এবং ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া বেদ শিক্ষা দেন। বেদ সম্বন্ধে এই সকল তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন:

অতএব চ নিত্যত্বম্। ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৯

—"অতএব বেদের নিত্যত্ব", অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কারণে বেদ নিত্য বলিয়া বেদোক্ত নামসমূহও নিত্য।

৩।২।২ বেদোক্ত কৃষ্ণ নাম নিত্য

পরমেশ্বর কৃষ্ণ, এই তত্ত্ব বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদে পরমেশ্বরের কৃষ্ণ নাম উল্লিখিত থাকায় পরমেশ্বরের কৃষ্ণ নাম নিত্য। প্রথমে সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যশ্রুতি হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণ নামের উল্লেখ প্রদর্শিত হইতেছে। নিম্নোদ্ধৃত ছান্দোগ্য-বাক্যে "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়" শব্দদ্বয়ের অর্থ বিশেষভাবে প্রণিধান করা আবশ্যক। চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহার করিয়া শ্রুতি জানাইলেন যে ঘোর মুণি কৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষভাবে কথা কহিতেছেন না; তাহা হইলে কৃষ্ণ "উক্ত্বা" এবং "উবাচ" ক্রিয়াদ্বয়ের কর্ম্ম হইত এবং কৃষ্ণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইত। চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার দ্বারা শ্রুতি জানাইয়াছেন যে ঘোর মুণি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। ঘোর মুণির উক্তিটী তাঁহার প্রার্থনা। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এই শ্রুতিবাক্যে কৃষ্ণ

অনুবাদ এবং দেবকীপুত্র তাঁহার বিধেয়। এই বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহা আলোচিত হইবে।

তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি॥ ছান্দোগ্য। ৩।১৭।৬

অন্বয় ও শব্দার্থ:—আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরসের বংশোদ্ভূত) ঘোরঃ (ঘোর নামক মুণি) কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় (কৃষ্ণ, যিনি দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে) তৎ হি এতৎ (পূর্ব্বোক্ত পুরুষযজ্ঞের এবং সেই যজ্ঞফলের বিষয়) উক্ত্বা (বলিয়া) উবাচ (বলিলেন), সঃ (তিনি, ঘোর মুণি) অন্তবেলায়াম্ (মৃত্যুকালে) এতৎ (এই) ত্রয়ম্ (ত্রিতত্ত্বের স্বরূপকে) প্রতিপদ্যেত (ধ্যান করিবেন) [ত্বম্ (তুমি, কৃষ্ণ)] অক্ষিতম্ (অক্ষর, ব্রহ্ম) অসি (হইতেছে) প্রাণসংশিতম্ (মহাপ্রাণরূপী পরমাত্মা) অসি (হইতেছ) অচ্যুতম্ (নিজ আনন্দময় এবং চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বরূপ হইতে অবিচ্যুত ভগবান) অসি (হইতেছে)। অর্থ:—অঙ্গিরসের বংশোদ্ভূত ঘোর নামক মুণি, যিনি দেবকী পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, সেই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বেদোক্ত পুরুষযজ্ঞের এবং তাহার ফলের বিষয় বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমি বেদোক্ত পুরুষযজ্ঞে এবং যজ্ঞফললাভে আসক্তিহীন হইয়াছি, কারণ ইহার দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। হে কৃষ্ণ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি পরমাত্মা, তুমি ভগবান। তোমার স্মরণেই মুক্তিলাভ হয়; এইজন্য, মৃত্যুকালে আমি ত্রিতত্ত্বের স্বরূপ তোমাকেই যেন ধ্যান করিতে পারি।" এই বেদবাক্যে কৃষ্ণ নামের এবং কৃষ্ণই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান, এই তত্ত্বেরও উল্লেখ আছে। বেদোল্লিখিত নাম এবং নাম ও নামীর তত্ত্ব নিত্য সত্য। সুতরাং, পরমেশ্বরের কৃষ্ণ নাম সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল, তাঁহার কৃষ্ণ নাম নিত্য, এবং কৃষ্ণ পরমেশ্বর এবং পরাতত্ত্ব। আমরা পাইলাম যে, "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়" এই বেদবাক্যের অর্থ "দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণকে" নহে; ইহার অর্থ, "যে কৃষ্ণ দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে।" এখানে কেহ হয়ত এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন যে বর্ত্তমান কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরযুগে দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ ঈশ্বরের নাম কৃষ্ণ, তৎপূর্ব্বে কৃষ্ণ নাম ছিল না; সুতরাং আঙ্গিরস ঘোর যে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কথা বলিলেন, তিনি দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণ। এরূপ

আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার কারণগুলি এই ঃ— ১। সৃষ্টির পর ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ আসে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদ আদিম সৃষ্টিরও পূর্ব্বে ছিল। বেদে পরমেশ্বরের কৃষ্ণ নামের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ নামের উৎপত্তি দ্বাপর যুগে হয় নাই, কৃষ্ণ নাম নিত্য এবং সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল। ২। উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে "দেবকীপুত্রায়" শব্দটী হইতে উক্তরূপ আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। "বর্ত্তমান কলি যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপর যুগে দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণ", এই অর্থে বেদে "দেবকীপুত্র" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় যদি ঐরূপ হইত, তাহা হইলে শ্রুতি "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়" না বলিয়া "দেবকীপুত্রায় কৃষ্ণায়" বলিতেন। কিন্তু বেদ তাহা বলেন নাই। "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়" বলিয়া বেদ যে তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এখানে বিবৃত করা হইতেছে। শাস্ত্রবাক্যে অনুবাদ এবং বিধেয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বেদ বাক্যের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য প্রথমেই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে তত্ত্ব প্রকাশ করা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়। কৃষ্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞাত তত্ত্ব, কারণ কৃষ্ণ আদিম সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন। এইজন্য কৃষ্ণ এই শ্রুতিবাক্যের অনুবাদ। কিন্তু আদিম সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি দেবকীপুত্র ছিলেন না, সৃষ্টির পরে দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন; এই কারণে, কৃষ্ণের দেবকীপুত্রত্ব তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তত্ত্ব। সেইজন্য শ্রুতিবাক্যে কৃষ্ণকে অনুবাদ করিয়া তাঁহার দেবকীপুত্রত্বকে তাঁহার বিধেয় করা হইয়াছে। এইরূপ অনুবাদ বা বিধেয় প্রয়োগের দ্বারা "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়", এই বেদবাক্য যে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই ঃ— পরমেশ্বর কৃষ্ণ সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন; তাঁহার কৃষ্ণ নাম নিত্য। পরমেশ্বর কৃষ্ণই দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি যে কেবল বর্ত্তমান কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরে এবং কেবল এই জগতেই দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা নহে। সৃষ্টির পর হইতে প্রতি কল্পের প্রতি দ্বাপরেই এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই তিনি দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া মথুরালীলা, বৃন্দাবনলীলা, প্রভৃতি সকল লীলাই করিয়া থাকেন, কারণ বেদোক্ত শব্দের দ্বারা নিরূপিত বস্তুমাত্রেরই প্রতিকল্পে যথাপূর্ব্ব আবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রতি দ্বাপরেই কৃষ্ণ দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া মথুরালীলা, বৃন্দাবনলীলা প্রভৃতি সকল লীলাই করিয়া থাকেন বলিয়া কৃষ্ণের দেবকীপুত্রত্ব এবং তাঁহার মথুরালীলা,

বৃন্দাবনলীলা প্রভৃতি সকল লীলাও নিত্য। কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য তাঁহার সম্বন্ধে আরও এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, এবং ভগবত্তত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্বের অন্তর্গত এবং কৃষ্ণ পরমেশ্বর ও পরাতত্ত্ব। এই যে তত্ত্ব আমরা সামবেদ হইতে প্রাপ্ত হইলাম, ইহা অথর্ব্ববেদেও ঘোষিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত গোপালতাপনী উপনিষৎ হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া আমরা এক্ষণে তাহা প্রমাণিত করিতেছি। গোপালতাপনী শ্রুতির পূর্ব্ব বিভাগের প্রথম সূত্র :—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥ গোঃ তাঃ। পূঃ ১

শব্দার্থ দিয়া এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে :—সচ্চিদানন্দরূপায় (একমাত্র পরমেশ্বরই মূল সচ্চিদানন্দ, এবং তাঁহার মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দঘন। পরমেশ্বরকে বুঝাইতে বেদ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।) কৃষ্ণায় (এই নাম উল্লেখ করিয়া বেদ জানাইয়াছেন যে, পরমেশ্বরের নাম কৃষ্ণ এবং তাঁহার কৃষ্ণনাম নিত্য।) অক্লিষ্টকারিণে (এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া বেদ পরমেশ্বর কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা এই :—তিনি বিনা পরিশ্রমে, সঙ্কল্পমাত্রেই যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং তিনিই জীবকে মুক্তি দিয়া সংসারের ত্রিতাপ ক্লেশ হইতে উদ্ধার করেন।) নমঃ (পরমেশ্বর কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বেদ ঘোষণা করিলেন যে কৃষ্ণ সমগ্র বিশ্বের সকল জীবের নমস্য ও ভজনীয়।) বেদান্তবেদ্যায় (এই শব্দের দ্বারা শ্রুতি ঘোষণা করিলেন যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম।) গুরবে (কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের সদ্‌গুরু।) বুদ্ধিসাক্ষিণে (কৃষ্ণ সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা।) গোপালতাপনী শ্রুতি উত্তর বিভাগে কৃষ্ণের নাম-মন্ত্রে বলিয়াছেন, "কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায়", "কৃষ্ণায় প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধায়", "কৃষ্ণায় রামায়" "কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়", "গোপালায় নিজরূপায়"। এই সকল মন্ত্রে শ্রুতি ঘোষণা করিলেন যে :—কৃষ্ণ মথুরায় দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া গোকুলে নন্দগৃহে নন্দ এবং যশোদা কর্ত্তৃক পালিত হয়েন। গোকুল-বৃন্দাবনে তিনি গোপরাজকুমারবেশে সখা-গণের সহিত গোষ্ঠলীলা করেন এবং রাধা ও তাঁহার সখীগণের সহিত কুঞ্জলীলা এবং রাসলীলা করেন। গোপবেশে গোচারণ করিয়া থাকেন বলিয়া কৃষ্ণের অন্য নাম গোপাল। কৃষ্ণের যাবদীয় বৃন্দাবনলীলা তাঁহার এই গোপাল

নামটির মধ্যে সংক্ষিপ্ত হইয়া আছে। গোপাল-কৃষ্ণকে বেদ "নিজরূপ" বলিলেন, তাহার কারণ এই যে, গোলোকে কৃষ্ণের যে মূর্ত্তি এবং বেশভূষা, ঠিক সেই মূর্ত্তিতে এবং বেশভূষায় গোলোকবিহারী কৃষ্ণ যশোদানন্দন কৃষ্ণ হইয়া বৃন্দাবনলীলা করেন। এই কারণে যশোদানন্দন ব্রজবিহারী কৃষ্ণকে স্বয়ংরূপ অবতারও বলা হয়। বৃন্দাবনের অন্তর্গত যে দ্বাদশ বন কৃষ্ণের লীলাস্থান, গোপালতাপনী শ্রুতি উত্তরবিভাগে সেই দ্বাদশ বনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা বেদের স্বতঃসিদ্ধ এবং অপৌরুষেয় প্রমাণ পাইলাম যে, পরমেশ্বরের কৃষ্ণ নাম নিত্য, কৃষ্ণের গোলকবিহারীত্ব, দেবকীপুত্রত্ব, এবং ব্রজ-বিহারীত্বও নিত্য।

৩।২।৩ স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণ

কৃষ্ণ নামের নিত্যতার প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রুতির প্রমাণই যথেষ্ট বলিয়া স্মৃতি হইতে অধিক প্রমাণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই কারণে আমরা স্মৃতিশাস্ত্র হইতে কয়েকটীমাত্র প্রমাণ দিতেছি। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে ঃ

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥ চণ্ডী

—"আদ্যাশক্তি মহামায়া নিত্যা, তথাপি, দেবকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহার আবির্ভাবকেই তাঁহার উৎপত্তি বলা হয়।" শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিতে মধুকৈটভবধের নিমিত্ত তাঁহার আবির্ভাবের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে তিনি বিষ্ণু হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। কৃষ্ণই বিষ্ণু, এবং এই আবির্ভাব বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে হইয়াছিল। সুতরাং কৃষ্ণ বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন। মধুকৈটভকে বধ করিয়া তাঁহার মধুসূদন নাম হইল। অতঃপর শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহিষাসুরবধের এবং শুম্ভনিশুম্ভবধের নিমিত্ত যে দুইটী দেবীযুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সত্যযুগে সংঘটিত হইয়াছিল। সৃষ্টির পর ক্রমান্বয়ে সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিযুগ আসিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা দেখাইতেছি যে সত্যযুগে উক্ত অসুরগুলির বধের নিমিত্ত ভগবতী মহামায়ার যে দুইবার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা কৃষ্ণ হইতেই হইয়াছিল। মহিষাসুরবধ-নামক মধ্যম চরিতে আছে যে, দেবগণের নিকট মহিষাসুরের অত্যাচারের

বিবরণ শ্রবণ করিয়া মধুস্থদন ক্রোধ প্রকাশ করিলেন ; তখন তাঁহার দেহ হইতে মহাশক্তি নির্গত হইল ; শম্ভুর এবং দেবতাগণের দেহ হইতেও শক্তি নির্গত হইল এবং সেই শক্তি মধুস্থদনের শক্তির সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া নারী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল ; সেই নারীরূপই ভগবতী আদ্যাশক্তির রূপ। আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে কৃষ্ণই মধুস্থদন। এখানে আমরা পাইলাম যে মধুস্থদন হইতে ভগবতী আদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইল। কৃষ্ণই মধুস্থদন, তাহা তাঁহার কৃষ্ণ নামের উল্লেখের দ্বারা শ্রীশ্রীচণ্ডী স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্তরূপে সমুৎপন্না ভগবতীকে অস্ত্রদান-বর্ণনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে ঃ

চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ। চণ্ডী।

—"স্বীয় চক্র হইতে একটী চক্র উৎপাদন করিয়া কৃষ্ণ ভগবতীকে দান করিলেন।" এই ভগবতী আদ্যাশক্তিই শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিয়াছিলেন তাহাও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। আমরা পাইলাম যে, সত্যযুগেও পরমেশ্বরের কৃষ্ণ নাম ছিল। স্থতরাং, দ্বাপরে দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ ঈশ্বরের কৃষ্ণ নাম ছিল, তৎপূর্ব্বে তাঁহার কৃষ্ণ নাম ছিল না, তাহা নহে। দ্বাপর যুগে দেবকীপুত্ররূপে কৃষ্ণের যে অবতার হইয়াছিল, তাহা ছিল তাঁহার স্বয়ং-রূপ অবতার, অর্থাৎ গোলোকবিহারী কৃষ্ণ নিজ নাম, রূপ, গুণ, শক্তিসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গর্গ মুণি বস্থদেবের দ্বারা নন্দালয়ে প্রেরিত হইয়া কৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায় যে তিনি কৃষ্ণ নাম স্বষ্টি করেন নাই, স্বয়ং কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্থতরাং তাঁহার নাম কৃষ্ণ, এই তত্ত্বটী সঙ্কেতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিলে নন্দ যদি ইহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতেন এবং ইহা কংসের কর্ণ-গোচর হইত, তাহা হইলে কংস উপদ্রব করিত। নন্দরাজার গোশালায় নির্জ্জনে কেবল নন্দেরই নিকট গর্গ যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ভাগবত ১০।৮।১৩

এই উক্তির যে অর্থ নন্দ বুঝিলেন তাহা এই, "তাঁহার পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে শুক্ল, লোহিত এবং পীত বর্ণের শরীরবিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান জন্মে কৃষ্ণবর্ণ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন।" "বর্ণাস্ত্রয়ো" এবং "কৃষ্ণতা" শব্দদ্বয়ের ব্যবহার হইতে

নন্দ কেবল গাত্রবর্ণের বিচারেই উক্তরূপ ধারণা করিলেন। কিন্তু গর্গ এই উক্তির মধ্যে যে তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন তাহা এই :—ইনি গোলোকবিহারী কৃষ্ণ। প্রতি কল্পের সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিযুগে ইনি তত্তৎ যুগের উপযোগী শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। এক্ষণে দ্বাপরযুগে ইনি কৃষ্ণতা স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" গর্গ মুণি কেবল গাত্রবর্ণ বুঝাইতে "কৃষ্ণতা" শব্দ ব্যবহার করেন নাই। যেমন, "মানবতা" শব্দের দ্বারা মানবের রূপ গুণ শক্তি স্বভাব নাম এবং কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত লইয়া মানবের পরিপূর্ণ স্বরূপটী বুঝায়, তদ্রূপ, "কৃষ্ণতা" শব্দের দ্বারা কৃষ্ণের রূপ গুণ শক্তি স্বভাব নাম এবং লীলা প্রভৃতি সমস্ত লইয়া কৃষ্ণের পরিপূর্ণ স্বরূপটী বুঝায়। সুতরাং, "ইনি 'কৃষ্ণতাং গতঃ'," এই বাক্যের মধ্যে গর্গ যে তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন তাহা এই : "স্বয়ং গোলোকবিহারী কৃষ্ণ স্বীয় নাম রূপ গুণ শক্তি স্বভাব লীলা প্রভৃতি সমস্ত লইয়া স্বীয় পরিপূর্ণ স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তজ্জন্য ইঁহার নাম কৃষ্ণ।" এই কারণেই দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণকে স্বয়ংরূপ অবতার বলা হয়। আমরা পাইলাম যে, কৃষ্ণ নাম গর্গের সৃষ্ট নহে; গর্গ নামকরণ করিলেন না, সঙ্কেতে কৃষ্ণ নাম প্রকাশ করিলেন মাত্র। ভাগবতে স্বয়ং কৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছেন :

মাং বিধত্তেহভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ। ভাগবত ১১।২১।৪৩

—"বেদ কর্ম্মকাণ্ডে আমাকেই যজ্ঞ এবং দেবতা রূপে বিধান করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে অধ্যাস ও অপবাদের দ্বারা আমাকেই পরব্রহ্ম রূপে স্থাপন করিয়াছে। সমগ্র বেদের ইহাই তাৎপর্য্য।" কৃষ্ণ বলিলেন যে বেদ-বেদান্ত তাঁহাকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণ বেদ-প্রকাশের পূর্ব্বেও ছিলেন এবং কৃষ্ণ নাম নিত্য। গীতায়ও কৃষ্ণ বলিয়াছেন :

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। গীতা ১০।৮

—"যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তৎসমুদয়ের পরমকারণ আমি, এবং আমা হইতেই তৎসমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে।"

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্। গীতা ১৫।১৫

—"সমগ্র বেদ-বেদান্তের দ্বারা আমিই জ্ঞেয়; আমিই বেদান্তের স্রষ্টা; আমিই বেদার্থবেত্তা।" গীতা হইতেও প্রমাণিত হইল যে কৃষ্ণ হইতে বেদ-

বেদান্তের এবং বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং পরমেশ্বরের কৃষ্ণ নাম নিত্য।

৩।২।৪ কৃষ্ণ নাম নিত্য প্রকাশমান

বেদোক্ত নামসমূহ নিত্য, কিন্তু নামীসমূহের স্বরূপানুসারে নামসমূহের নিত্য স্থিতি দ্বিবিধ। অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর প্রকাশ নিত্য; তাহাদের প্রলয় ও পুনরাবৃত্তি নাই; তাহাদের নামসমূহও প্রলয়হীন, পুনরাবৃত্তিহীন, এবং নিত্য প্রকাশমান। পরমেশ্বর নিত্যসত্য এবং নিত্য প্রকাশমান, তাঁহার প্রলয় নাই এবং পুনরাবৃত্তিও নাই। এইজন্য পরমেশ্বরের কৃষ্ণ নামও নিত্য প্রকাশমান, প্রলয়হীন, এবং পুনরাবৃত্তিহীন। গোলক-বৈকুণ্ঠ ধামসমূহ অপ্রাকৃত, প্রলয়হীন, এবং পুনরাবৃত্তিহীন; তথায় অবস্থিত কৃষ্ণের ভগবৎস্বরূপগণও নিত্য প্রকাশমান, প্রলয়হীন, এবং পুনরাবৃত্তিহীন। এইজন্য ঐ সকল ধামের ও ভগবৎস্বরূপগণের নামসমূহও প্রলয়হীন, পুনরাবৃত্তিহীন, এবং নিত্য প্রকাশমান। প্রাকৃত বিশ্বের প্রলয় ও পুনরাবৃত্তি আছে; প্রলয়ে বিশ্বের নামসমূহের এবং তদ্দ্বারা নির্ণীত বস্তুসমূহের প্রকাশ বিলুপ্ত হয়, কিন্তু তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, বীজাকারে কৃষ্ণের মধ্যে থাকে, বিশ্বের পুনরাবৃত্তিতে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয়। এইজন্য, এই সকল নাম নিত্য হইলেও নিত্য প্রকাশমান নহে। সুতরাং, কৃষ্ণ নামের নিত্যতা হইতে প্রাকৃত বিশ্বের নামসমূহের নিত্যতার প্রভেদ এই যে, কৃষ্ণ নাম প্রলয়হীন, পুনরাবৃত্তিহীন, এবং নিত্য প্রকাশমান; কিন্তু প্রাকৃত বিশ্বের নামসমূহের প্রলয় আছে, পুনরাবৃত্তি আছে, এবং তাহারা নিত্য প্রকাশমান নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাম ও নামী অভিন্ন

৩।৩।১ নাম রূপের, রূপ নামী

প্রাকৃত জগতে ঈশ্বরসৃষ্ট বিবিধ প্রাকৃত রূপ আছে এবং প্রত্যেকটী প্রাকৃত রূপের ওঙ্কার হইতে প্রকাশিত নাম আছে। নাম পরিবর্ত্তনহীন; তাহা না হইলে রূপের পরিচয় পাওয়া এবং দেওয়া অসম্ভব হইত। যে রূপের যে নাম, সেই রূপটী সেই নামের নামী। রূপ শব্দের অর্থ, মূর্ত্তি, আকৃতি, দেহ, শরীর, কলেবর। প্রাকৃত জগতের সকল রূপই জড় বস্তু, এইজন্য সকল নামও প্রাকৃত নাম। যেমন: মানব একজাতীয় প্রাণীর নাম। মানব বলিতে মানবীয় রূপ বা দেহকে বুঝায়; এইজন্য মানবীয় রূপই মানব নামের নামী, এবং মানব নামটী মানবরূপকে অন্য সকল রূপ হইতে পৃথকভাবে বুঝাইয়া দেয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে:— কেবল দেহই মানব নহে। মানবদেহে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত আছে এবং তদ্দ্বারা দেহ সপ্রাণ ও সচেতন হয়। জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিলে দেহটী থাকেনা, বিশ্লেষিত হইয়া যায়। সুতরাং, মানবের দেহ এবং জীবাত্মা, এই দুই অংশের মধ্যে জীবাত্মাই প্রধান। মানবের প্রধান অংশ জীবাত্মা মানব নামের নামী না হইয়া অপ্রধান অংশ দেহ কিরূপে নামী হইতে পারে? উত্তর:— মানবদেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মা মানব নামের নামী নহে, ইহা বুঝিবার জন্য জীবাত্মার স্বরূপটী এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের চিৎ এবং আনন্দের অতি ক্ষুদ্র অংশ দেহে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকে।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। গীতা ১৫।৭

কৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমারই অবিনশ্বর অংশ প্রতি জীবদেহে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছে।" ইহা অতি ক্ষুদ্র অংশ।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ শ্বেত ৫।৯

—"একটী কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একটী

ভাগকে আবার শতভাগে বিভক্ত করিলে যে এক-একটী ভাগ হয়, জীবাত্মা তাহারই মত সূক্ষ্ম। এই অণুপরিমাণ জীবাত্মাই অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইলে অনন্ত শব্দের বাচ্য হইতে পারে।" জীবাত্মার লিঙ্গভেদ নাই।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥ শ্বেত ৫।১০

—"জীবাত্মা স্ত্রী, পুরুষ, বা নপুংসক নহে। ইহা যে যে শরীর গ্রহণ করে, সেই সেই শরীরের দ্বারা রক্ষিত হয়, অর্থাৎ শরীর জীবাত্মার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র।"

স্থূলাণি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি॥ শ্বেত ৫।১২

—"জীবাত্মা সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের দ্বারা আবৃত হইয়া কখনও (হস্তীদেহের মত) স্থূল এবং কখনও (পিপীলিকা-দেহের মত) ক্ষুদ্র বহু রূপ গ্রহণ করে।" যে দেহগুলি জীবাত্মার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, তাহাদের জন্ম এবং মৃত্যু আছে, কিন্তু জীবাত্মা জন্মমৃত্যুহীন, অবিনশ্বর।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। গীতা ২।২০

—"জীবাত্মার জন্ম নাই; ইহা নিত্য, শাশ্বত, এবং পুরাতন। দেহের বিনাশে ইহার বিনাশ হয় না।"

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥ গীতা ২।২৪

—"জীবাত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, চিন্তার অর্থাৎ বুদ্ধির ও মনের অবিষয়, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহেরও অবিষয় বলিয়া উক্ত হয়।" জীবাত্মার জন্ম নাই; জন্ম দেহেরই হয়। একটী দেহের মৃত্যুর পর জীবাত্মা অন্য দেহ গ্রহণ করে। জীবাত্মার এইরূপ দেহান্তরগ্রহণকেই তাহার পুনর্জন্ম বলা হয়।

তদ্‌ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি এবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্য আত্মানমুপসংহরতি। বৃহদারণ্যক। ৪।৪।৩

—"জোঁক তৃণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সে যেমন অন্য একটী তৃণকে অবলম্বন করিয়া তাহার আশ্রয়-তৃণটী হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া সেই নূতন তৃণটীকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ জীবাত্মাও অধিষ্ঠিত দেহটীকে ত্যাগ করিয়া উহাকে মৃত করিয়া অন্য দেহকে অবলম্বন এবং আশ্রয়

করে।" গীতাও বলিয়াছেন যে, (গীতা। ২।২২), মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ জীবাত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহে গমন করে। এক্ষণে আমরা পাইলাম যে :— (১) জীবাত্মা ঈশ্বরের চিদানন্দের অংশ, চিদ্বস্তু, জড়াতীত, অতি সূক্ষ্ম, জন্মহীন, মৃত্যুহীন, নিত্য, অবিনশ্বর, বুদ্ধি ও মনের অগোচর এবং ইন্দ্রিয়গণের অবিষয়। কিন্তু রূপ (অর্থাৎ দেহ) প্রাকৃত, ত্রিগুণময়, জড়, জন্মের এবং মৃত্যুর অধীন, নশ্বর, এবং বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়। অতএব, জীবাত্মা এবং রূপ দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। রূপের নাম জীবাত্মার নাম হইতে পারে না। (২) জীবাত্মা রূপের অধিষ্ঠাতা, রূপ জীবাত্মার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। যেমন মানবের অধিষ্ঠানক্ষেত্রের "গৃহ" নামটী মানবের নাম হইতে পারে না, জলৌকার অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের "তৃণ" নামটী জলৌকার নাম হইতে পারে না, তদ্রূপ জীবাত্মার অধিষ্ঠানক্ষেত্র রূপের নামটী জীবাত্মার নাম হইতে পারে না। আবার মানবের পরিধেয় বস্তুর বস্ত্র নামটী মানবের নাম হইতে পারে না, সুতরাং, গীতার উপমা অনুসারে, জীবাত্মার পরিধেয় বস্তু রূপের নামটী জীবাত্মার নাম হইতে পারে না। (৩) আজ যে জীবাত্মা মানব দেহে অধিষ্ঠিত আছে, গুণকর্ম্মানুসারে সেই জীবাত্মাই কল্য দেবতাদেহে অথবা হস্তীদেহে, ব্যাঘ্রদেহে, পিপীলিকা দেহে, অথবা মশকদেহে অবস্থান করিতে পারে। যদি দেহের নামই জীবাত্মার নাম হইত, তবে যতপ্রকার দেহের মধ্যে জীবাত্মা অবস্থান করে, ততগুলি দেহের নামই জীবাত্মার নাম হইত। কিন্তু একই বস্তুর ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন নাম হইতে পারে না, কারণ নাম পরিবর্ত্তন-হীন। সুতরাং, রূপের নাম জীবাত্মার নাম হইতে পারে না। (৪) জীবাত্মার স্ত্রীপুরুষাদি লিঙ্গভেদ নাই, কিন্তু দেহের এইরূপ লিঙ্গভেদ আছে। সুতরাং জীবাত্মা দেহ নহে এবং দেহের নাম জীবাত্মার নাম হইতে পারে না। যদি তাহা হইত, তবে যে জীবাত্মা পুরুষদেহে অবস্থান করিতেছে তাহার পুরুষলিঙ্গ হইত। পুরুষদেহ ত্যাগ করিয়া সেই জীবাত্মাই স্ত্রীদেহেও অবস্থান করিতে পারে ; তখন সেই জীবাত্মাই স্ত্রীলিঙ্গ হইত। কিন্তু লিঙ্গহীন জীবাত্মা ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গযুক্ত এবং তত্তৎ লিঙ্গসূচক ভিন্ন ভিন্ন নামযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং রূপের নাম জীবাত্মার নাম হইতে পারে না। আমরা পাইলাম যে, মানব বলিতে জীবাত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত মানব-রূপকে বুঝায়। বস্তুতঃ, মানব নামটী মানবীয় রূপের নাম, জীবাত্মার নাম নহে। এখন দেখা গেল যে,

মানবীয় রূপ মানব নামের নামী। প্রাকৃত জগতের সকল রূপই প্রাকৃত এবং এই সকল প্রাকৃত রূপ নিজ নিজ নামের নামী। এইজন্য প্রাকৃত রূপের নামও প্রাকৃত নাম।

৩।৩।২ অপ্রাকৃত নাম ও অপ্রাকৃত নামী

কৃষ্ণ নামের নামী স্বয়ং পরমেশ্বর। পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই পরমেশ্বর। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অপ্রাকৃত এবং জড়াতীত চিদ্বস্তু। পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ রূপ প্রাকৃত রূপ নহে। মানব অথবা অন্য যে কোন প্রাণীর দেহের মধ্যে দেহাতীত এবং অপ্রাকৃত জীবাত্মা অবস্থান করে। জীব অর্থাৎ জীবাত্মা দেহ ও নাম হইতে ভিন্ন, কিন্তু পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ রূপের মধ্যে ঐরূপ স্বতন্ত্র আত্মার অধিষ্ঠান নাই। পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই আত্মা; এইজন্য পরমেশ্বরকে আত্মা এবং পরমাত্মাও বলা হয়। পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ রূপের নাম কৃষ্ণ। যেহেতু পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু এবং যেহেতু সেই অপ্রাকৃত চিদ্বস্তুর নাম কৃষ্ণ, পরমেশ্বরের কৃষ্ণ নামও অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু। পরমেশ্বর অপ্রাকৃত নামী; কৃষ্ণ তাঁহার অপ্রাকৃত নাম। কৃষ্ণের সকল নাম সম্বন্ধেই এই তত্ত্ব সমভাবে প্রযুজ্য। কৃষ্ণনাম এবং প্রাকৃত নাম সম্বন্ধে আরও একটী জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত সকল নামই কৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ রূপ কৃষ্ণ নাম প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও ছিল এবং কৃষ্ণ নাম তাঁহার মধ্যে ছিল; কিন্তু প্রাকৃত নাম সমূহ প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই নাম সমূহের দ্বারা নির্ণীত রূপসমূহ নাম প্রকাশের পরে সৃষ্ট হইয়াছিল। অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ রূপের সৃষ্টি হয় নাই, তাহা নিত্য বিদ্যমান; এইজন্য কৃষ্ণনাম প্রকাশিত হইবার পরে কৃষ্ণরূপের প্রকাশ নহে। আমরা পাইলাম যে কৃষ্ণ নাম অপ্রাকৃত; এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণ নামের নামী।

৩।৩।৩ পরমেশ্বর এবং তাঁহার কৃষ্ণ নাম অভিন্ন

শাস্ত্র বলিয়াছেন:

নাম চিন্তাম : কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর

—"যেহেতু নাম ও নামী অভিন্ন, সেইজন্য পূর্ণ শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং তাঁহার কৃষ্ণ নাম অভিন্ন। কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি, অর্থাৎ সর্ব্বাভিষ্ট-প্রদ।" ঈশ্বরের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অপ্রাকৃত কৃষ্ণ নাম প্রকাশের পূর্ব্বেও ছিল এবং সেই রূপের স্বরূপ কৃষ্ণনামের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। যাহার দ্বারা যে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বারা সেই বস্তুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্য, কৃষ্ণ নাম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পরিচায়ক অকল্পিত প্রতীক। যে বস্তু যাহার স্বরূপ প্রকাশকারী পরিচয়, সেই বস্তু তাহার সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণ নাম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের স্বরূপপ্রকাশকারী অকল্পিত পরিচায়ক ও প্রতীক বলিয়া কৃষ্ণ নাম ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অভিন্ন। বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা অগ্রহনীয় এবং অপ্রত্যক্ষীকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের চিন্তা ও ধ্যান তাঁহার স্বরূপপ্রকাশকারী পরিচায়ক নাম অবলম্বনে করিতে হয়। কৃষ্ণ নামের চিন্তা ও ধ্যান করিলে কৃষ্ণেরই চিন্তা ও ধ্যান করা হয়। কৃষ্ণের রূপের বর্ণনা পড়িয়া বা শুনিয়া তাঁহার যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করা হয়, তাহা কৃষ্ণমূর্ত্তির কল্পিত প্রতীক। কল্পিত প্রতীক অবলম্বনে কৃষ্ণের ধ্যান অবিধেয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরমেশ্বরের কৃষ্ণত্ব

•

৩।৪।১ পরমেশ্বর কৃষ্ণ

কৃষ্‌ধাতুর অর্থ, আকর্ষণ করা। ঈশ্বর আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। লীলার নিমিত্ত ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বের স্বীয় অনন্ত সচ্চিদানন্দকে আকর্ষণ করিয়া সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইয়াছিলেন। তাঁহার আকর্ষণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। সৃষ্টির ব্যাপারে :—যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় তিনি আপনা হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আপনা হইতে স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীরাধা রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আপনার সচ্চিদানন্দের অংশ আকর্ষণ করিয়া বহু ভগবান ও ভগবতী স্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় সন্ধিনী শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া অপ্রাকৃত গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় মায়াশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি রূপে এবং আপন চিদানন্দকে আকর্ষণ করিয়া পুরুষ রূপে প্রকাশ করিয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি স্বীয় চিদানন্দের অংশ আকর্ষণ করিয়া সকল জীবে জীবাত্মা রূপে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া পরমাত্মা রূপে সমগ্র বিশ্বের প্রতি পদার্থে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। এইরূপে, সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপারটী ঈশ্বরের আকর্ষণের কর্ম্ম। স্থিতির ব্যাপারে :—ঈশ্বর স্বীয় শক্তির দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই গ্রহতারকাদি আকর্ষণশক্তিযুক্ত হইয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া নিজ নিজ কক্ষে আবর্ত্তন করে ; আবার প্রত্যেকটী পরমাণুও পরস্পকে আকর্ষণ করে। তাঁহার আকর্ষণের প্রভাবেই সমস্ত স্থাবরজঙ্গম পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে ; পুরুষ স্ত্রীর প্রতি, স্ত্রী পুরুষের প্রতি, পিতামাতা সন্তানের প্রতি এবং সন্তান পিতামাতার প্রতি, ভ্রাতাভগ্নী পরস্পরের প্রতি, প্রভু-ভৃত্য পরস্পরের প্রতি, বন্ধুগণ পরস্পরের প্রতি, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর

প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। তিনি জীবের পাপ আকর্ষণ করিয়া লইয়া পুণ্য, অজ্ঞানতা আকর্ষণ করিয়া জ্ঞান, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক, জরা-দুঃখ আকর্ষণ করিয়া মুক্তির অমৃতত্ব প্রদান করেন। তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যের দ্বারা জীবকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া স্বীয় চরণতলে আনিয়া জীবাত্মার প্রেমের বিকাশ করিয়া অনন্ত আনন্দ দান করেন। তিনি আপনা হইতে চেতনা, জ্ঞান, আনন্দ, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য আকর্ষণ করিয়া সমগ্র বিশ্বকে তদ্দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে, অশেষ প্রকারে ঈশ্বরের আকর্ষণ বিশ্বের স্থিতি সাধন করিতেছে। প্রলয়ের ব্যাপারে ঃ—ঈশ্বর যখন বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া আপনার মধ্যে উপসংহৃত করিয়া লয়েন, তখন তাঁহার মধ্যে বিশ্ব প্রলীন হইয়া থাকে ; সুতরাং, ঈশ্বরের আকর্ষণেই প্রলয় হয়। আমরা দেখিতেছি যে, "ঈশ্বর" এবং "পরম" শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে সকল ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং ঈশ্বরসূত্রের অন্য শব্দগুলি হইতেও যে তত্ত্বসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, কৃষ্ণ নাম তৎসমুদয়ের বোধক এবং পরিচায়ক। সুতরাং, কৃষ্ণ, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, এবং পরমাত্মা, এই সকলই একার্থক। ইহাই পরমেশ্বরের কৃষ্ণত্ব। পরমেশ্বর কৃষ্ণ কেন, তাহা আমরা পাইলাম। পরমেশ্বর কৃষ্ণ বলিয়া শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন যে কৃষ্ণ পরমেশ্বর (পূর্ব্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৩।১৭।৬) (এবং গোপালতাপনী। পূঃ। বিঃ।১)। ভাগবত বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ পরমেশ্বর (পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাগবত ১১।২১।৪৩)। গীতা বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ পরমেশ্বর (পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতা ১০।৮ এবং ১৫।১৫)। অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন। স্বয়ং পরমেশ্বরই স্বয়ং ভগবান, তাহাও আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি। যেহেতু কৃষ্ণ স্বয়ং পরমেশ্বর, সেই হেতু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং অন্য সকল ভগবান এবং ভগবতীগণ কৃষ্ণের অংশ। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।" ভাগবত ১।৩।২৮

৩।৪।২ পরমেশ্বরের কৃষ্ণ নাম সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বভৌমিক

আমরা পাইয়াছি যে পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত কৃষ্ণ নাম নিত্য, এবং কৃষ্ণ নাম হইতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্য পরমেশ্বরের কৃষ্ণত্ব সার্ব্বকালিক। যেহেতু এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর নিখিল বিশ্বেরই পরমেশ্বর, সেই হেতু পরমেশ্বরের কৃষ্ণত্ব সার্ব্বভৌমিক। এই

কারণে, কৃষ্ণ নামে পরমেশ্বরের উপাসনায় সাম্প্রদায়িকতা নাই এবং থাকিতে পারে না। যিনি কৃষ্ণ নামে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহেন। এই জগতের অথবা এই বিশ্বের যে কোন ব্রহ্মাণ্ডের যে কেহ পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি কৃষ্ণ নামে অথবা অন্য যে কোন নামে পরমেশ্বরের ভজনা করুন, তিনি কৃষ্ণেরই ভজনা করেন। যদি বৈষ্ণব বিষ্ণু নামে, শাক্ত শক্তি নামে, সৌর সূর্য্য নামে, শৈব শিব নামে, গাণপত্য গণপতি নামে পরমেশ্বরের ভজনা করেন, তাঁহারা কৃষ্ণেরই ভজনা করেন। যাঁহারা এই সকল নামে অথবা অন্যান্য নামে পরমেশ্বরের ভজনা করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই ভজনা করেন বলিয়া, তাঁহাদের সহিত, কৃষ্ণ নামে পরমেশ্বরের ভজনাকারীগণের কোনই বিরোধ থাকিতে পারে না।

৩।৪।৩ কৃষ্ণ নাম স্বপ্রকাশ

শ্রুতি এবং স্মৃতি, সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন যে ঈশ্বর স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ, তিনি স্বেচ্ছায় আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে প্রকাশ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। স্বপ্রকাশ কৃষ্ণ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া জীবকে স্বীয় তত্ত্ব জ্ঞাত করিয়াছেন, নতুবা তাঁহার তত্ত্ব কেহই জ্ঞাত হইতে পারিত না। স্বপ্রকাশ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যাঁহাকে দর্শন দান করেন, তিনিই তাঁহার দর্শন লাভ করেন; তিনি কৃপা করিয়া দর্শন না দিলে কেবল স্বীয় চেষ্টায় কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। কৃষ্ণ স্বয়ংই বিধান করিয়াছেন যে তাঁহার নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, এবং ধ্যান করিলে তাঁহার কৃপা এবং দর্শন লাভ করা যায়। পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত কৃষ্ণ নাম যদি অপ্রাকৃত গোলোকধামে গোপনেই থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণের স্বারাই বিহিত নামসাধনা জীবের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। জীব যাহাতে নামসাধনা করিয়া তাঁহার কৃপা ও দর্শন লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য স্বপ্রকাশ কৃষ্ণ যেমন কৃপা করিয়া আপনাকে মায়িক জগতে অবতার রূপে প্রকাশ করিয়া স্বীয় রূপকে সকলের দৃষ্টিগোচর করেন, তদ্রূপ, কৃপা করিয়া তিনি তাঁহার অপ্রাকৃত কৃষ্ণ নামকেও মায়িক বিশ্বে প্রকাশ করিয়া সকলের কর্ণ, বাক্, বুদ্ধি, এবং মনের গোচর করিয়াছেন। এই কারণে, জীবগণ

মায়িক প্রাকৃত নামসমূহের ন্যায় কৃষ্ণ নামকেও বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারণ, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, এবং বুদ্ধি ও মনের দ্বারা চিন্তা করিতে পারে। মায়িক ও প্রাকৃত নামের ন্যায় উচ্চারিত, শ্রুত, এবং চিন্তিত হইলেও কৃষ্ণ নাম মায়িক ও প্রাকৃত নাম নহে। এই তত্ত্বটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও ঘোষণা করিয়াছেন।

অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ চৈঃ চঃ। মধ্য। ১৭শ পরিচ্ছেদ

৩।৪।৪ কৃষ্ণ নামই নামব্রহ্ম

সচ্চিদানন্দবিগ্রহই ঈশ্বর; ঈশ্বরই ব্রহ্ম; ব্রহ্মের নাম কৃষ্ণ; নাম ও নামী অভিন্ন; এইজন্য কৃষ্ণ নামই নামব্রহ্ম। যেমন ঈশ্বরের ব্যাপকতা তাঁহার ব্রহ্মত্বের অন্যতম কারণ, তদ্রূপ কৃষ্ণ নামের ব্যাপকতা কৃষ্ণ নামের নামব্রহ্মত্বের অন্যতম কারণ। কৃষ্ণ আপনার বহু নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণের সকল নামই কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ নাম সমগ্র বিশ্বের সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। কৃষ্ণ নামের ইহাই ব্যাপকতা। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণের দ্বারা প্রকাশিত; এইজন্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের অকল্পিত সত্য প্রতীক। সুতরাং, নামব্রহ্ম কৃষ্ণের অকল্পিত সত্য প্রতীক। অনেকে কৃষ্ণের মৃন্ময়, শিলাময়, অথবা ধাতুময় বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা এবং পূজা করেন। এরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণমূর্ত্তির সত্য প্রতীক নহে, কারণ ইহাতে বিগ্রহ-নির্ম্মাতার কল্পনাও আছে। প্রতীকজ্ঞানে এইরূপ বিগ্রহের পূজা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, কিন্তু বিগ্রহ কল্পিত প্রতীক বলিয়া বিগ্রহের ধ্যান অবিধেয়; নামব্রহ্ম অকল্পিত সত্য প্রতীক বলিয়া নামব্রহ্মই ধ্যেয়। নামব্রহ্ম অকল্পিত সত্য প্রতীক বলিয়া অনেকে নামব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং পূজা করেন। সদ্‌গুরু দীক্ষাদানকালে যে কৃষ্ণনাম প্রদান করেন, তাহা ইষ্টনাম। ইষ্টনাম জপ ও ধ্যান মূল নামসাধনা। এই মূল নামসাধনা নাম-ব্রহ্মের মূল উপাসনা।

চতুর্থ অধ্যায়

"সৎ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দ নিত্য নিরবচ্ছিন্ন পরমকারণ

৪।১।১ সচ্চিদানন্দ পরমকারণ

সকল শাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে ঈশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সৎ, চিৎ, আনন্দ কি বস্তু তাহা না জানিলে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। সৎ, চিৎ, আনন্দ মূল বস্তু, ইহা শ্রুতিনিরূপিত তত্ত্ব। (১) সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। ছান্দোগ্য ৬।২।১। (২) বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮। (৩) রসো বৈ সঃ। তৈত্তিরীয় ২।৭। (৪) আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ। ব্রহ্মসূত্র ১।১।১২।—"(১) হে সোম্য, বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় সৎস্বরূপেই বিদ্যমান ছিল। (২) ব্রহ্ম বিজ্ঞান এবং আনন্দ। (৩) ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। (৪) শ্রুতি বারম্বার বলিয়াছেন যে ঈশ্বর আনন্দময়; অতএব ঈশ্বর আনন্দময়।" ঈশ্বর সৎ, চিৎ, আনন্দ, তাহা এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে, সৃষ্টির পূর্ব্বেও পুরুষরূপবিশিষ্ট ঈশ্বর একাকী ছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন: (১) সোঽহমস্মি। বৃহদারণ্যক। (২) অহং ব্রহ্মাস্মি। বৃহদারণ্যক। এই দুইটী বাক্য মানবতত্ত্বপ্রকাশক নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর স্বয়ং এই দুইটী বাক্য উচ্চারণ করিয়া স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই উভয় বাক্যের "অহম্" ঈশ্বরের আনন্দাংশ; তাঁহার আনন্দাংশই তাঁহার আনন্দাত্মা, যাহার স্বভাব এবং প্রেরণাবশতঃ ঈশ্বর আপনাকে বিস্তার করিয়া লীলা করেন। প্রথম বাক্যের "সঃ" এবং দ্বিতীয় বাক্যের "ব্রহ্ম" শব্দদ্বয়ের দ্বারা, আনন্দাত্মার দ্বারা অনুস্যূত, প্রভাবিত, এবং পরিচালিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পুরুষমূর্ত্তি ঈশ্বর সূচিত হইয়াছেন। অপ্রাকৃত পরব্যোমে যাহা কিছু অপ্রাকৃত বস্তু আছে তাহা ঈশ্বরের প্রকাশ; প্রাকৃত বিশ্বে যাহা কিছু প্রাকৃত বস্তু আছে তৎসমুদয় ঈশ্বরের পরিণাম। ঈশ্বরের প্রকাশ ও পরিণাম সচ্চিদানন্দেরই প্রকাশ ও

পরিণাম, স্থতরাং, সৎ-চিৎ-আনন্দ মূল বস্তু; এইজন্য এই তিনটী মূলবস্তু মূলসত্য ও পরমকারণ।

৪।১।২ সৎ, চিৎ, আনন্দ নিত্য অবিচ্ছিন্ন

সৎ, চিৎ, আনন্দ কখনই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না। সৎ অথবা সতের প্রকাশ বা পরিণাম, চিৎ এবং আনন্দের আধার। সৎ, চিৎ, আনন্দ কখনই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না বলিয়া সতের ক্রিয়াশক্তি, চিতের জ্ঞানশক্তি, এবং আনন্দের হ্লাদিনীশক্তিও কখনই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না। ঈশ্বরের লীলার প্রয়োজন অনুসারে তাঁহার প্রকাশরূপসমূহের মধ্যে কোনটীতে কোন একটীর প্রাধান্য থাকে, অর্থাৎ, তাঁহার কোন ভগবান-স্বরূপে বা ভগবতীস্বরূপে চিৎ ও আনন্দ অপেক্ষা ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট সৎ প্রধান, কোনটীতে সৎ ও আনন্দ অপেক্ষা জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট চিৎ প্রধান, এবং কোনটীতে সৎ ও চিৎ অপেক্ষা হ্লাদিনীশক্তিবিশিষ্ট আনন্দ প্রধান। বিশ্বের সকল প্রাকৃত বস্তুতে চিৎ এবং আনন্দ অপেক্ষা সতের মায়াশক্তির পরিণামভূত অবিদ্যাশক্তি-বিশিষ্ট ত্রিগুণ প্রধান।

৪।১।৩ সচ্চিদানন্দ বাক্য ও মনের অগোচর

সৎ চিৎ আনন্দ জড়াতীত অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু। ইহা বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ। কেন ১।৩

বাক্য ও মনের অগোচর সচ্চিদানন্দকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। ইহা অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা উপলব্ধব্য। যিনি উক্ত উপায়ে উপলব্ধি করেন, তিনিও তাহা যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পান না। তথাপি, যাঁহারা উক্ত উপায়ে উপলব্ধি করেন নাই, ভাষার দ্বারা যথাসম্ভব বর্ণনাই তাঁহাদিগকে জানাইবার একমাত্র উপায়। ভাষার দ্বারা যতদূর প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহারই প্রয়াস করা যাইতেছে। সৎ চিৎ আনন্দ নিত্য অবিচ্ছিন্ন, কেবল এই তিনটী মূল বস্তুকে যথাসম্ভব বর্ণনা করিবার জন্য ইহাদের সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইতেছে। পৃথকভাবে আলোচিত হইলেও, সৎ সম্বন্ধে আলোচনা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা, চিৎ সম্বন্ধে এবং আনন্দ সম্বন্ধেও তাহাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শুদ্ধ সত্ত্বা

৪।২।১ সৎ—শুদ্ধ বস্তু

সৎ একটী মূল বস্তু। ইহার গুণ শুদ্ধতা। এইজন্য সৎ শুদ্ধ বস্তু বা সত্ত্বা। শুদ্ধ শব্দের অর্থ, যাহা কোন কারণের কার্য্যাবস্থা নহে এবং যাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণবর্জ্জিত। ত্রিগুণ উপাদানমায়া। ত্রিগুণের মধ্যে অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ, এবং কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য আছে বলিয়া ত্রিগুণ অশুদ্ধ সত্ত্বা। ত্রিগুণ কারণের কার্য্যাবস্থা বলিয়া উহাতে উক্ত বস্তুগুলি আছে। সৎ কারণের কার্য্যাবস্থা নহে; ইহা জড়াতীত বস্তু; ইহাতে ত্রিগুণ নাই, সুতরাং পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা এবং ষড়রিপুও নাই। যাহা কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, উপাদানমায়া অর্থাৎ প্রকৃতি তৎসমুদয়ের উপাদানকারণ; সুতরাং সৃষ্টবস্তু মাত্রেই মায়াময়, প্রাকৃত, জড়, ষড়বিকারযুক্ত অশুদ্ধ সত্ত্বা। সৎ প্রকৃতি হইতে জাত নহে, এইজন্য সৎ মায়াতীত, অপ্রাকৃত, জড়াতীত, এবং সতে জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়বিকার নাই। সৎ কারণের কার্য্যাবস্থা নহে বলিয়া ইহার কারণে প্রলীনতা অর্থাৎ প্রলয় নাই। অশুদ্ধ সত্ত্বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, কিন্তু সৎ ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। সৎ বা শুদ্ধ সত্ত্বা আত্মবস্তু, সুতরাং চিদ্বস্তু।

৪।২।২ সৎ নিত্য

সৎ কোন কারণের কার্য্যাবস্থা নহে বলিয়া সতের উৎপত্তি নাই এবং বিনাশও নাই; এইজন্য সৎ নিত্য বস্তু। "অসম্ভবস্তু সতঃ অনুপপত্তেঃ।" ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৯।—"সতের উৎপত্তি থাকা অসম্ভব, কারণ তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ।" আমরা পাইলাম, সৎ উৎপত্তিহীন। "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" গীতা ২।১৬।—"সতের বিনাশ নাই।" উৎপত্তিহীন এবং বিনাশহীন সৎ বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও

ছিল। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" ছান্দোগ্য ৬।২।১। আমরা পাইলাম যে সৎ নিত্য বস্তু।

৪।২।৩ সৎ সত্যের সত্য এবং অনন্ত

সৎ অনন্ত, পরম সত্য, এবং সত্যের সত্য। ঈশ্বর পরম অর্থাৎ পরাতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার সৎ পরম সত্য। তিনি অনন্ত বলিয়া তাঁহার সৎ অনন্ত। সৎ সকল সত্যের মূল সত্য; এইজন্য সৎ সত্যের সত্য।

অস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি বুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্থ সত্যম্। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্। বৃহদারণ্যক ২।১।২০

—"ঈশ্বর হইতে সকল ইন্দ্রিয়, সকল ব্রহ্মাণ্ড, সকল দেবতা, এবং সকল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়। সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব এই যে, তিনি সত্যের সত্য। ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন সকল ভূতবর্গ সত্য এবং তিনি সত্যের সত্য।" যাহা সত্যের সত্য, তাহা মূল সত্য এবং পরম সত্য।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তৈত্তিরীয় ২।১।৩

সৎ অনন্ত বলিয়া সৎ অব্যয়, অক্ষর, নিত্যপূর্ণ।

৪।২।৪ সৎ, চিৎ এবং আনন্দের আধার

সত্যমায়তনম্। কেন ৪।৮

—"সত্য অর্থাৎ সৎ ঈশ্বরের চিদানন্দের আধার।" সৎ, চিৎ এবং আনন্দের আধার। চিৎ এবং আনন্দ যেখানেই আছে সেখানেই সৎ তাহাদের আধার। সতের মধ্যে চিৎ এবং চিতের মধ্যে আনন্দ অবস্থান করে। সৎ প্রথম কোশ। এই প্রথম কোশের মধ্যে অবস্থিত, দ্বিতীয় কোশ চিৎ। চিতের মধ্যে অবস্থান করে আনন্দ। এইরূপেই সৎ চিৎ আনন্দের একত্র অবস্থিতি হয়। এইরূপে একত্র অবস্থিত পূর্ণতম সচ্চিদানন্দের এক এবং অদ্বিতীয় পূর্ণতম রূপ হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ।

৪।২।৫ অপ্রাকৃত আধার

অপ্রাকৃত ধামসমূহ সতে অধিষ্ঠিত সন্ধিনী শক্তির প্রকাশরূপ। চিন্ময় শব্দটী অপ্রাকৃত শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। অপ্রাকৃত পরব্যোম এবং

তত্রত্য গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ চিন্ময় বস্তু। এই সকল ধামে অবস্থিত ভগবৎস্বরূপগণ এবং মুক্ত আত্মাসমূহ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। চিৎ এবং আনন্দের সকল অপ্রাকৃত আধারই সৎ। সকল অপ্রাকৃত আধারই সতের অপ্রাকৃত বিস্তার।

৪।২।৬ প্রাকৃত আধার

প্রাকৃত বিশ্ব ও তত্রত্য সকল স্থাবর ও জঙ্গমের দেহমাত্রেই চিৎ ও আনন্দের প্রাকৃত আধার। সকল প্রাকৃত আধারই জড় দেহ। বিশ্বের সকল জড় দেহেই চিৎ এবং আনন্দ জীবাত্মা রূপে অধিষ্ঠিত আছে। সকল জড়দেহই ত্রিগুণময়; ত্রিগুণ সতে অধিষ্ঠিত মায়াশক্তির পরিণাম অর্থাৎ কার্য্যাবস্থা। সৎ এবং সতে অধিষ্ঠিত মায়াশক্তি অভিন্ন; সুতরাং সকল জড়দেহও সতের পরিণাম। এক্ষণে দেখা গেল যে, চিৎ এবং আনন্দের সকল প্রাকৃত আধারও সতের পরিণাম অর্থাৎ মূলতঃ সৎ। সকল প্রাকৃত আধারই সতের প্রাকৃত বিস্তার। প্রাকৃত আধারসমূহের মধ্যে জঙ্গমদেহে চিদানন্দের বিদ্যমানতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু স্থাবরদেহে পারে না। জঙ্গমদেহে চিদানন্দের কার্য্য অভিব্যক্ত হয় বলিয়া জঙ্গমকে ব্যক্তচৈতন্য, এবং স্থাবরদেহে হয় না বলিয়া স্থাবরকে অব্যক্তচৈতন্য বলা হয়। স্থাবরদেহেরও প্রতি পরমাণুতে চিদানন্দের কার্য্য হয়। প্রাকৃত আধারে যতদিন চিদানন্দ থাকে ততদিন তাহা জীবিত থাকে। ঈশ্বরের বিধান অনুসারে প্রাকৃত আধার হইতে চিদানন্দ উৎক্রামণ করে এবং তখন প্রাকৃত আধারের মৃত্যু হয়। ঈশ্বরের বিধান অনুসারেই মৃত প্রাকৃত আধার চিদানন্দবর্জ্জিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সতের পরিণাম নিত্য ও সত্য

৪।৩।১ সতের পরিণামও নিত্য

সৎ নিত্য বস্তু। স্থাবরজঙ্গমময় এই বিশ্ব সতের পরিণাম। নিত্যবস্তুর পরিণামও নিত্য বস্তু। এইজন্য, স্থাবরজঙ্গমময় এই বিশ্বও নিত্য বস্তু। বিশ্বে দ্বিবিধ বস্তু আছে, জড় এবং চেতন। দেহমাত্রেই জড় বস্তু; আত্মা চেতন বস্তু। আত্মার ধ্বংস নাই। জড়বস্তুরও ধ্বংস নাই। দেহ যে সকল উপাদানে গঠিত, মৃত্যুর পর দেহটী বিশ্লেষিত হইলে সেই উপাদানগুলি ভিন্ন রূপে অবস্থান করে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এইরূপে, সংসারে কোন বস্তুরই ধ্বংস নাই, কেবল রূপান্তর হইয়া থাকে। যে বস্তুর বিনাশ নাই তাহা নিত্য বস্তু; বিশ্বের কোন বস্তুরই বিনাশ নাই; সুতরাং বিশ্বের সকল বস্তুই নিত্য। যতদিন বিশ্বের প্রলয় না হয়, তাবৎকাল বিশ্বের প্রতিদিনের প্রতিমূহুর্ত্তের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ কিছুদিন মানবেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত থাকিয়া পরে বিশ্বের মধ্যেই মানবেন্দ্রিয়ের অগোচর অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। জড়বিজ্ঞানের কয়েকটী আবিষ্কারের ফলে এই সত্যটীর উপলব্ধি সহজসাধ্য হইয়াছে। বেতারযন্ত্র আবিষ্কারের দ্বারা শব্দ সম্বন্ধে এই তত্ত্ব উপলব্ধ হইয়াছে যে শব্দ বহু সহস্র ক্রোশ দূর হইতে আসিয়া বেতারযন্ত্রে ধৃত এবং শ্রুত হইয়াও লয়প্রাপ্ত হইতেছে না; তাহা আকাশে অনন্তকাল থাকিয়া যাইতেছে। বেতার আবিষ্কারের দ্বারা যেমন শব্দের নিত্যবিদ্যমানতা প্রমাণিত হইয়াছে, টেলিভিসান আবিষ্কারের দ্বারা রূপেরও নিত্যবিদ্যমানতা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা গেল যে, বিশ্বের স্থিতিকালের মধ্যে বিশ্বস্থিত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের ধ্বংস হয় না। মহাপ্রলয়েও বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, কেবল তাহার বাহ্য প্রকাশ থাকে না। ঈশ্বরের যে মায়াশক্তি স্থাবরজঙ্গমময় বিশ্বের বীজ, মহাপ্রলয়ে বিশ্ব ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহার সেই মায়াশক্তিতে বিলীন হইয়া থাকে, নূতন সর্গারম্ভে বিশ্বের এবং সেই ভূতবর্গেরই পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ গীতা ৮।১৯

—"হে পার্থ, বিশ্বের প্রলয়ের পূর্ব্বে যে সকল স্থাবর ও জঙ্গমাদি বস্তু বর্ত্তমান থাকে, সেই সকল ভূতবর্গই পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার রাত্রিকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে বিলীন হয় এবং তাঁহার দিবসাগমে অর্থাৎ নূতন কল্পারম্ভে অবশ হইয়া অর্থাৎ নিজ নিজ সংস্কারবশে পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়।" এইরূপে অনাদি এবং অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। আমরা পাইলাম যে, প্রত্যগ্‌রূপ (Individual Form) বিশ্বের স্থিতিকালে কিছুদিন বাহ্যদৃষ্টির গোচর থাকিয়া পরে অগোচর অবস্থায় বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এবং প্রলয়কালে বীজরূপে ঈশ্বরে বিলীন থাকে, আবার কল্পারম্ভে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মসূত্রের ১।৩।৩০ সংখ্যক সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে যে জগতের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তী কল্পের জাতিরূপ (Species Form) এবং প্রত্যগ্‌রূপও (Individual Form) প্রতি পরবর্ত্তী কল্পে পুনরাবর্ত্তিত হয়। প্রত্যগ্‌রূপও প্রতি কল্পেই পুনরাবর্ত্তন করে। জগতের সর্ব্বপ্রকারের জাতিরূপ নিত্য। যেমন ঃ—মানবদেহ এক প্রকারের জাতিরূপ, হস্তীদেহ অন্য আর এক প্রকারের জাতিরূপ, ইত্যাদি। জগতের স্থিতিকালে অসংখ্য প্রকারের জাতিরূপ বিদ্যমান থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী কল্পের জগতের প্রলয়ে এই সকল জাতিরূপ ঈশ্বরে বিলীন হইয়া বীজাকারে থাকে। নূতন কল্পারম্ভে পূর্ব্ব কল্পের প্রত্যেকটী জাতিরূপ পুনঃ প্রকাশিত হইয়া জগতের স্থিতিকালে বিদ্যমান থাকে। জাতিরূপ পুনঃ প্রকাশিত না হইলে তজ্জাতীয় প্রত্যগ্‌রূপের পুনঃ প্রকাশ হইতে পারিত না। জাতিরূপ নিত্য বলিয়াই জড়বৈজ্ঞানিক তৎসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হইতেছেন, সেই বিজ্ঞান নিত্য, অর্থাৎ সার্ব্বকালিক সত্য। শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। উহাদেরও নিত্যতা উহাদের সম্বন্ধে নিত্য সত্য বিজ্ঞানের ভিত্তি।

৪।৩।২ সতের পরিণামও সত্য

বিশ্ব সতের পরিণাম। সৎ সত্য বস্তু। সত্যের পরিণাম অবশ্যই সত্য; যেমন স্বর্ণের পরিণাম কুণ্ডল অবশ্যই স্বর্ণ। মায়াবাদী বলেন, জগৎ মিথ্যা, অস্তিত্বহীন; কেবল ভ্রমবশতঃ ইহার অস্তিত্ব কল্পিত হয়। মায়াবাদীর এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া সকল বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ঘোষণা করিয়াছেন।

বেদান্ত জগতকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে উদ্ধৃত বাক্যে আমরা পাইয়াছি যে পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন ভূতবর্গ সত্য এবং তিনি সত্যের সত্য বা মূল সত্য। "এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্।" ছান্দোগ্য ৮।১।৫।—"এই ব্রহ্মপুর সত্য।" ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন পুর, অথবা ব্রহ্মের দ্বারা অধিষ্ঠিত পুর, এই উভয় অর্থেই ব্রহ্মপুর শব্দের দ্বারা প্রত্যেক স্থাবরকে, প্রত্যেক জঙ্গমকে, সমগ্র জগতকে এবং সমগ্র বিশ্বকেও বুঝান হইয়াছে। সুতরাং, বেদান্ত অনুসারে জগৎ সত্য। জড়বিজ্ঞানের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে যে জগৎ সত্য। জগতের সকল বস্তুই সত্য; সকল বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধও সত্য; জগতের প্রাকৃতিক নিয়মসকলও সত্য; তাহা না হইলে বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও আবিষ্কার কিছুই সম্ভব হইত না। জগৎ সত্য বলিয়াই জগতকে উপলব্ধি করিয়া জড় বস্তুর তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মসূত্রও জগতকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। "নাভাবঃ, উপলব্ধেঃ।" ব্রহ্মসূত্র ২।২।২৭।—"জগতের অস্তিত্ব নাই, তাহা নহে; কারণ জগতকে উপলব্ধি করা যায়।" সুতরাং সতের পরিণামও সত্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সৎ অবিকারী, একায়তন, একরূপ

৪।৪।১ সৎ অবিকারী

যাহা অনন্ত, নিত্য, নিত্যপূর্ণ, এবং অক্ষর, তাহার বিকার নাই এবং থাকিতে পারে না। আমরা পাইয়াছি যে, ঈশ্বর বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াও অব্যয়, অক্ষর, নিত্যপূর্ণ, এবং অনন্ত থাকেন এবং আছেন। সুতরাং, বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াও ঈশ্বরের বিকার হয় না, অর্থাৎ ঈশ্বর অবিকারী এবং নিত্যই স্বরূপে স্থিত। ইহা ঈশ্বরের বিশ্বাতীত পুরুষোত্তম স্বরূপ। ঈশ্বরের এই স্বরূপ পরম ভাব। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বর অবিকারী; এইজন্য তাঁহার সৎ অবিকারী। মায়াবাদী আপত্তি করেন যে পরিণামবাদ গ্রহণ করিলে ঈশ্বরে বিকারিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহা মায়াবাদীর ভ্রম। ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় ভাবিয়া বিচার করিলেই এইরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয়। মনুষ্য সীমাবদ্ধ জীব তাহার ক্ষয় আছে এবং ক্ষয়ের ফলে তাহার বিকার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্য নহেন; তাঁহার সহিত মনুষ্যের তুলনাই হয় না। তাঁহার শক্তি অনন্ত, অচিন্ত্য, এবং তর্কাতীত, ইহা বেদান্তও ঘোষণা করিয়াছেন। "অতর্ক্যম্।" কঠ ১।২।৮। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" কঠ ১।২।৯।—"ঈশ্বর তর্কের অতীত। তর্কের দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি।" ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১। "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ।" মহাভারত।—"তর্কের স্থিরতা নাই; তর্কের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।" তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির ধারণাও করা যায় না। বারাণসীর বিখ্যাত বৈদান্তিক মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ এবং পুরীর প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত বেদান্ততত্ত্ববিচারের কালে এই আপত্তি করিয়াছেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে বেদান্তে এবং ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদই নিরূপিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের অবিকারীত্বও ঘোষিত হইয়াছে।

৪।৪।২ সৎ একায়তন

পরমেশ্বর হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, সৎ তৎসমুদয়ের একায়তন। অর্থাৎ, সৎ তৎসমুদয়ের সার্ব্বকালিক অদ্বিতীয় আধার ও আশ্রয়। উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও সৎ তৎসমুদয়ের একমাত্র আধার ও আশ্রয়, স্থিতিকালেও তাহাই, এবং প্রলয়ান্তেও তাহাই। বিশ্ব উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের সদংশে মায়াশক্তিরূপে বর্ত্তমান ছিল; সুতরাং, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ বিশ্বের আধার ও আশ্রয়। উৎপন্ন হইবার পর হইতে প্রলয়পর্য্যন্ত সমগ্র স্থিতিকালেও সৎ বিশ্বের একমাত্র আধার ও আশ্রয়। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, বিশ্ব ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের মধ্যে রহিয়াছে, কারণ জড় বিশ্ব জড়াতীত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের মধ্যে থাকিতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে, মায়াশক্তির পরিণাম বিশ্ব মায়াশক্তিরই মধ্যে এবং আশ্রয়ে অবস্থিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের অনন্ত মায়াশক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নানারূপে কার্য্য করিয়া বিশ্বকে ধারণ, পালন, এবং রক্ষা করিতেছে। যে আকাশের মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা মায়াশক্তির পরিণাম। যে কাল বিশ্বের সমুদয় বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, মৃত্যু, রূপান্তরগ্রহণ প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, তাহা মায়াশক্তির কার্য্যকারী প্রবাহ। বিশ্বের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল পদার্থের ভিতরে ও বাহিরে মায়াশক্তি নানাপ্রকারে কার্য্য করিয়া বিশ্বকে ধারণ ও পালন করিতেছে। "ঈশত ঈশনীভিঃ," "ঈশা বাস্যমিদং" প্রভৃতি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে এই তত্ত্ব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। "গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।" গীতা ১৫।১৩।—কৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমি শক্তির দ্বারা বিশ্বকে বেষ্টিত করিয়া ভূত-বর্গকে ধারণ করিয়া আছি।" বিশ্ব স্থিতিকালে এইরূপে মায়াশক্তির দ্বারা ধৃত, রক্ষিত এবং পালিত হয়। এইজন্য শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ভগবতী মহামায়ার স্তুতিতে আছেঃ (১) আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা। শ্রীশ্রীচণ্ডী। (২) বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী।—(১) "একমাত্র তুমি জগতের আধার, অর্থাৎ ধারণকর্ত্রী এবং আশ্রয়।" (২) "তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী, বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। তুমি বিশ্বব্যাপিনী হইয়া বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছ।" সৎ মায়াশক্তির আধার এবং সৎ ও মায়াশক্তি অভিন্ন বলিয়া মায়াশক্তিকে বিশ্বের আধার ও আশ্রয় বলিলে বুঝিতে হইবে যে সৎ বিশ্বের আধার ও আশ্রয়। ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তিও সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত

থাকিয়া মায়াশক্তির কার্য্যকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। প্রলয়ে বিশ্ব ঈশ্বরের মায়াশক্তির মধ্যে বিলীন হইয়া থাকে। মায়াশক্তির আধার সৎ; সুতরাং, প্রলয়েও সৎ অব্যক্ত বিশ্বের আধার ও আশ্রয়। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বরের সৎ সর্ব্বকালেই বিশ্বের একমাত্র আধার ও আশ্রয়। অপ্রাকৃত ধামসমূহ সতের অন্তর্গত সন্ধিনীশক্তির প্রকাশরূপ। এই সকল ধামও প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সতের মধ্যে ছিল; প্রকাশিত হইবার পর সন্ধিনীশক্তির দ্বারা ধৃত, রক্ষিত, এবং পালিত হইতেছে। সুতরাং, সৎ অপ্রাকৃত ধামসমূহেরও একমাত্র আধার ও আশ্রয়। সৎ সকলের শাশ্বত একায়তন।

৪।৪।৩ সৎ একরূপ : সদংশে ক্রিয়াশক্তি

অতীতে যাহা কিছু ছিল, বর্ত্তমানে যাহা কিছু আছে, এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু থাকিবে, তৎসমুদয় কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের মধ্যে একীভূত অবস্থায় এক এবং অদ্বয় রূপে নিত্য বিদ্যমান আছে। সৎকে জানিলে ত্রিকালের সকল বস্তুকে জানা যায়; সৎকে পাইলে ত্রিকালের সকল বস্তুকে পাওয় যায়।

তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ। প্রশ্ন ৪।১১

—"হে সোম্য, যিনি অক্ষরকে জানেন, তিনি সমস্তই জানেন এবং নিখিল বস্তুতে প্রবেশ করেন।" অক্ষর সৎ ত্রিকালের সকল বস্তুর একরূপ সত্ত্বা বলিয়া শ্রুতি বলিলেন যে, অক্ষরকে জানিলে সমস্তই জানা যায় এবং নিখিল বস্তুতে প্রবেশ করা যায়। কৃষ্ণের সদংশে মায়াশক্তি বিদ্যমান আছে। এই মায়াশক্তি অনন্ত এবং নিত্যপূর্ণই আছে। বিশ্বে অতীতে যাহা কিছু ছিল, বর্ত্তমানে যাহা কিছু আছে, এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু থাকিবে, মায়াশক্তি তৎসমুদয়ের অব্যয় বীজ। সেই বীজ সদংশে নিত্য বিদ্যমান থাকায়, ত্রিকালের সকল বস্তু বীজরূপে সদংশে নিত্য বিদ্যমান আছে। এই বীজরূপটী বিশ্বের ত্রিকালের সকল বস্তুর নিত্য বিদ্যমান এক এবং অদ্বয় রূপ। আবার, অপ্রাকৃত পরব্যোম এবং তত্রত্য গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ ঈশ্বরের সদংশের সন্ধিনী শক্তির প্রকাশরূপ। ঐ সকল অপ্রাকৃত ধামে প্রকাশিত হইয়াও ঈশ্বরের সদংশের সন্ধিনীশক্তি অনন্ত এবং নিত্যপূর্ণই আছে। সন্ধিনীশক্তি অপ্রাকৃত ধামসমূহের বীজ। সুতরাং, ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সদংশে অপ্রাকৃত ধামসমূহও বীজরূপে নিত্য বিদ্যমান আছে। মায়াশক্তি এবং সন্ধিনীশক্তি সদংশে অদ্বয়

ক্রিয়াশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত আছে। অতএব, সকল অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত বস্তু ঈশ্বরের সদংশে এক ও অদ্বয় বীজরূপে নিত্য বিদ্যমান আছে। যাহা কৃষ্ণের সদংশে অব্যয় এবং অদ্বয় বীজরূপে নিত্য বিদ্যমান আছে, তাহাই অতীতে বিশ্ব এবং বিশ্বের স্থাবরজঙ্গমাদি রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে হইবে। এইজন্য শ্রুতি বলেন ঃ

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। কঠ ২।১।১০

—"যাহাই এখানে আছে তাহা সেখানে আছে ; যাহা সেখানে ছিল তাহাই পরে এখানে আছে।" ইহার অর্থ এই যে, যাহা কিছু অপ্রাকৃত ধাম আছে এবং বিশ্ব ও বিশ্বে যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গমাদি রূপে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের মধ্যে বীজরূপে বিদ্যমান আছে, এবং যাহা ঈশ্বরের মধ্যে বীজরূপে বিদ্যমান আছে তাহাই অপ্রাকৃত ধামরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং বিশ্ব ও বিশ্বের স্থাবরজঙ্গমাদি রূপে ব্যক্ত হইয়াছিল, হইতেছে, এবং হইবে। পরমেশ্বর কৃষ্ণের সৎ একরূপ বলিয়া তাহাতে নানাত্ব নাই।

নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন। কঠ ২।১।১১ এবং বৃহ ৪।৪।১৯

—"পরমেশ্বরের মধ্যে কিছুমাত্র নানাত্ব নাই, অর্থাৎ পরব্যোমে ও বিশ্বে বিবিধ নামরূপবিশিষ্ট অশেষবিধ বস্তু আছে, কিন্তু পরমেশ্বরের মধ্যে এইরূপ নানাত্ব নাই।" একরূপ পরমেশ্বর বহু রূপে পরিণত হয়েন, এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। কঠ ২।২।১২

—"পরমেশ্বর স্বীয় একরূপকে বহুধা, অর্থাৎ বহু প্রকারের রূপে প্রকাশিত করেন।" কিন্তু এই বহির্ব্যক্ত নানাত্ব পরমেশ্বরে নাই বলিয়া শ্রুতি এই নির্দ্দেশও দিয়াছেন যে, পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবম্। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২০

—"অপ্রমেয় (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অতীত) কিন্তু ধ্রুব (নিত্য সত্য) পরমেশ্বরকে একধা (একরূপ) বলিয়া জানিতে হইবে।" পরব্যোমে ও ব্যক্ত বিশ্বে বহুধা হইলেও পরমেশ্বর কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নিত্য একধা, শ্রুতি এই তত্ত্বই ঘোষণা করিলেন। পরমেশ্বর কৃষ্ণের মায়াশক্তির কিয়দংশ বিশ্বরূপে পরিণত হইলেও তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের মধ্যে তাঁহার অনন্ত মায়াশক্তি নিত্যপূর্ণ থাকায়, তিনি তাঁহার মধ্যে অবস্থিত বিশ্ববীজ-মায়াশক্তির

দ্বারা আপন শরীরেই বহির্ব্যক্ত বিশ্বের ত্রিকালের সকল বস্তুই দেখাইতে পারেন। তিনি বিশ্ববীজ-মায়াশক্তির যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা স্বীয় অঙ্গে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার অঙ্গে দৃষ্ট সেই রূপ জড় রূপ নহে এবং জড় চক্ষুর গোচর হয় না। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বীয় অঙ্গে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন ঃ

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ গীতা ১১।৭-৮

—"হে অর্জ্জুন, আমার দেহে একস্থ অর্থাৎ একরূপে অবস্থিত স্থাবরজঙ্গমপূর্ণ সমগ্র জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছা কর, অদ্য তুমি তৎসমুদয় দর্শন কর। কিন্তু তোমার ঐ জড় চক্ষুর দ্বারা আমায় অর্থাৎ আমার অঙ্গে বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমায় দিব্যদৃষ্টি দিতেছি, তদ্দ্বারা আমার ঐশ্বরীয় যোগ দর্শন কর।" কৃষ্ণের উক্তি হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, বিশ্ব তাঁহার মধ্যে একরূপে অবস্থিত আছে, এবং তিনি স্বীয় অঙ্গে যে বিশ্বরূপ দর্শন করাইতেছেন, তাহা তাঁহার ঐশ্বরীয় যোগ। ঐশ্বরীয় যোগের অর্থ, ঈশ্বরের অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তির ক্রিয়া। ইহা বিশ্ববীজ মায়াশক্তিকে বহির্ব্যক্ত বিশ্বের রূপে প্রকটীকরণ। এইরূপ উদ্ভাসনের দ্বারা ঈশ্বর স্বীয় অঙ্গে ত্রিকালের সকল বস্তু প্রদর্শন করিতে পারেন। ইহা তাঁহার যৌগিক ক্রিয়া। ঐশী শক্তির এই যৌগিক ক্রিয়া অবিচিন্ত্য, অবিতর্ক্য, এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এই কারণে, তাঁহার অঙ্গে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই ঐরূপ যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা স্বীয় অঙ্গে প্রাকৃত বিশ্ব এবং তত্রত্য ত্রিকালের সকল রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন। আবার, কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে অপ্রাকৃত গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহকেও সন্ধিনী শক্তির যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারেন। ভাগবতে দেখা যায়, কৃষ্ণ অক্রূরকে এবং ব্রজবাসী গোপগণকে অপ্রাকৃত ধামসমূহ দর্শন করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে এইরূপ যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারাই প্রেমিক ভক্তকে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম দর্শন করাইতে পারেন। যেরূপে তিনি মায়াশক্তির যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ

দর্শন করাইয়াছিলেন, সেইরূপেই তিনি সন্ধিনীশক্তির যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামও দর্শন করান। যিনি কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ত্রিকালের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকেন। তিনি নিজ গূঢ় প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছায়ও কখনও কাহাকে গোলোকাদি ধাম অথবা বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন পাইলেই যে তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে পরব্যোম অথবা বিশ্ব দেখা যাইবে, তাহা নহে ; ভক্তের এবং তাঁহার ইচ্ছায় দর্শন হইতে পারে। যশোদা কৃষ্ণের মুখাভ্যন্তর প্রত্যহ কতবারই দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখাভ্যন্তরে বিশ্বরূপ দর্শন করেন নাই। কৃষ্ণ যখন ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি যশোদাকে স্বীয় মুখাভ্যন্তরে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। অর্জ্জুনও সর্ব্বদাই কৃষ্ণের সহিত একত্রে থাকিয়াও তাঁহার দেহে বিশ্বরূপ কখনও দেখেন নাই। কুরুক্ষেত্রে যখন তিনি বিশ্বরূপ দেখাইবার জন্য কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন।

কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সতের একরূপত্ব সম্বন্ধে এই আলোচনার প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, "নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন", এই শ্রুতিবাক্য কৃষ্ণের বিশ্বরূপ সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। জগতে মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদি যে অশেষ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, তৎসমুদয় সতের পরিণাম এবং মূলতঃ সৎ। প্রত্যেক রূপের মধ্যে যে প্রত্যগাত্মা আছে, তাহা কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ। এইজন্য, বাহ্যিক ভিন্নতা স্বত্ত্বেও জগতের রূপসমূহের মৌলিক একরূপত্ব আছে এবং এইজন্যই কৃষ্ণের বিশ্বরূপ মূলতঃ একরূপ এবং তাহাতে মৌলিক নানাত্ব নাই। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ জগতে রূপগত ভেদ ও নানাত্বের মধ্যেও মৌলিক একরূপত্ব উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

"চিৎ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানশক্তিযুক্ত মূল চৈতন্য

৫।১।১ অনন্ত ও অক্ষর চৈতন্য

চিৎ একটী মূল বস্তু। ইহার গুণ চৈতন্য বা চেতনা। এইজন্য চিৎকে চৈতন্যও বলা হয়। ইহাও শুদ্ধ বস্তু। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, সৎ একটী মূল বস্তু এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ও অদ্বিতীয় সৎ ছিল। ইহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সৎ চিৎ আনন্দ সর্ব্বদা একত্র অবস্থিত থাকে। সুতরাং, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সৎ ছিল তাহাতে চিৎ এবং আনন্দও অবশ্যই ছিল। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ও অদ্বিতীয় সৎ ছিল, ইহা বলিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। ছান্দোগ্য ৬।২।৩

—"সেই সৎ চিন্তা করিলেন, আমি বহু হইব, প্রজারূপে উৎপন্ন হইব।" এতদ্দ্বারা শ্রুতি ঘোষণা করিলেন যে, সতের মধ্যে চিৎ বিদ্যমান ছিল, কারণ চেতনা না থাকিলে চিন্তা করা সম্ভব হইত না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের এই চিৎ মূল চৈতন্য। অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত যাহা কিছু চেতন বস্তু আছে, কৃষ্ণের চিৎ হইতে তৎসমুদয় চেতনা প্রাপ্ত হইয়াছে।

চেতনশ্চেতনানাম্। কঠ ২।২।১৩ এবং শ্বেত ৬।১৩

এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে, ঈশ্বরের চিৎ বা চৈতন্যই মূল চৈতন্য এবং যাহা কিছু চেতন বস্তু আছে, তৎসমুদয় এই মূল চৈতন্য হইতে চেতনা প্রাপ্ত হইয়াছে। সতের ন্যায় চিৎ ও অনন্ত, অব্যয়, অক্ষর, এবং নিত্যপূর্ণ।

৫।১।২ চিতে জ্ঞানশক্তি

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের চিদংশে জ্ঞানশক্তি অধিষ্ঠিত। জ্ঞানশক্তির অন্য নাম সম্বিৎ শক্তি। চিৎ ও তাহার জ্ঞানশক্তি অভিন্ন। চিতের জ্ঞানশক্তি চৈতন্যময়ী। শক্তি ব্যতীত কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞাত হওয়া একটী কর্ম্ম। যে শক্তির দ্বারা চিৎ জ্ঞান লাভ করে তাহা চিতের জ্ঞানশক্তি। জ্ঞানলাভের জন্য দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, উচ্চারণ, স্মরণ, মনন, বিচার, ধ্যান, এবং ধারণার প্রয়োজন। এই সমস্তই এক-একটী কর্ম্ম। চিৎ স্বীয় চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তির দ্বারা উক্ত সমুদয় কার্য্য করিয়া থাকে। এইজন্য, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্পর্শনশক্তি, আঘ্রাণশক্তি, আস্বাদনশক্তি, বাক্‌শক্তি, স্মরণশক্তি, মননশক্তি, বিচারশক্তি, ধ্যানশক্তি, এবং ধারণাশক্তি, এই সমস্তই জ্ঞানশক্তির বিবিধ কার্য্যকরী রূপ। প্রাণশক্তিও জ্ঞানশক্তির অন্য একটী কার্য্যকরী রূপ। চিৎ প্রাণশক্তির দ্বারা শরীরের সর্ব্বাংশকে প্রাণময় এবং সক্রিয় রাখিয়া উক্ত কার্য্যগুলি করিয়া থাকে। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ কেন ১।২

—"ঈশ্বর, অর্থাৎ তাঁহার চিতের জ্ঞানশক্তিই কর্ণের শ্রবণশক্তি, মনের মননশক্তি বাক্-যন্ত্রের বাক্‌শক্তি, প্রাণবন্তের প্রাণশক্তি, এবং চক্ষুর দর্শনশক্তি রূপে কার্য্য করে। তাঁহাকে এইরূপে জ্ঞাত হইয়া মায়ামুক্ত হইলে মানব ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ।
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্। বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৮

—"যিনি প্রাণবন্তের প্রাণশক্তি, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি, কর্ণের শ্রবণশক্তি, মনের মননশক্তি, তাঁহাকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা শাশ্বত এবং অনাদি ঈশ্বরকেই জানিয়াছেন।"

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি। ঐতরেয় ৩।১।২

—"হৃদয়ং (অনুভবশক্তি) মনঃ (মননশক্তি) সংজ্ঞানং (দেহের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত চেতনাশক্তি) আজ্ঞানং (প্রভুত্ব করিবার শক্তি) বিজ্ঞানং (বিজ্ঞান লাভ করিবার শক্তি) প্রজ্ঞানং (আপনি আপনাকে জানিবার শক্তি) মেধা (বিচার-শক্তি) দৃষ্টিঃ (দৃষ্টিশক্তি) ধৃতিঃ (ধারণাশক্তি) মতিঃ (বিবেচনাশক্তি) মনীষা (বুঝিবার শক্তি) জুতিঃ (মনের বেগে গমনের শক্তি) স্মৃতিঃ (স্মরণশক্তি) সঙ্কল্পঃ (উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ় থাকিবার শক্তি) ক্রতুঃ (অধ্যবসায়শক্তি) কামঃ (কর্ম্মের প্রেরণাশক্তি) বশঃ (নিয়ন্ত্রণশক্তি)—এই সমস্তগুলিই প্রকৃষ্ট জ্ঞান-শক্তির নাম।" এই শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে আমরা পাইলাম যে, যে সকল শক্তির দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞাত হওয়া যায় তৎসমুদয় জ্ঞানশক্তিরই বিবিধ কার্য্যকারী রূপ। ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি অনন্ত অক্ষর এবং নিত্যপূর্ণ। ঈশ্বরের চিৎ মূল চৈতন্য বলিয়া তাঁহার চিতের এই জ্ঞানশক্তিও মূল জ্ঞানশক্তি।

৫।১।৩ ঈশ্বরের চিৎ সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞাতা

শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞাতা।

অদৃষ্টো দ্রষ্টাহশ্রুতঃ শ্রোতাহমতো মন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা।

বৃহদারণ্যক ৩।৭।২৩

—"ঈশ্বর অন্যের দ্বারা দৃষ্ট হয়েন না, কিন্তু তিনি সমস্তই দেখিতেছেন। তিনি অন্যের দ্বারা শ্রুত হয়েন না, কিন্তু তিনি সমস্তই শুনিতেছেন। তিনি অন্য কাহারও মনের দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন না, কিন্তু সমস্তই তাঁহার মনন-গ্রাহ্য। অন্য কেহ তাঁহাকে সম্যকরূপে জানিতে পারে না, কিন্তু তিনি বিজ্ঞাতা, অর্থাৎ তিনি সমগ্রভাবে আপনাকেও বিজ্ঞাত আছেন।" বৃহদারণ্যকের ৩।৮।১১ সূত্রেও এই তত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে। স বেত্তি বেদ্যং। শ্বেত ৩।১৯।—"ঈশ্বর সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে জানেন।" শাস্ত্র ঈশ্বরকে সর্ব্ববিদ্ এবং সর্ব্বজ্ঞও বলিয়াছেন। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্। মুণ্ডক ২।২।৭। এবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ। মাণ্ডূক্য।৬। আমরা পাইলাম যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞাতা। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞাতা বলিতে ইহাই বুঝায় যে তাঁহার চিৎ সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞাতা। ঈশ্বর এবং তাঁহার চিৎ অভিন্ন, এইজন্য, চিৎ সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞাতা না বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞাতা বলা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞেয় ও জ্ঞান

৫।২।১ সচ্চিদানন্দ জ্ঞেয়

সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞাতা চিতের জ্ঞেয় বস্তু তাঁহারই সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর জ্ঞেয় বস্তু, তাহা শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। এতজ্ জ্ঞেয়ম্। শ্বেত ১।১২। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং। গীতা ১৩।৩৭। সৎ এবং সতের অন্তর্গত সন্ধিনীশক্তি ও মায়াশক্তি এবং উক্ত শক্তিদ্বয়ের সকল প্রকাশ ও পরিণামও চিতের জ্ঞেয় বস্তু এবং চিৎ তৎসমুদয়ের বিজ্ঞাতা। আনন্দ এবং আনন্দের অন্তর্গত হ্লাদিনীশক্তি এবং হ্লাদিনীর সর্ব্ববিধ প্রকাশ ও পরিণামও চিতের জ্ঞেয় বস্তু এবং চিৎ তৎসমুদয়ের সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞাতা। জ্ঞানশক্তির দ্বারা চিৎ স্বীয় সত্তা ও স্বরূপ এবং অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সর্ব্ববিধ বস্তুর মধ্যে স্বীয় বিস্তারের বিজ্ঞাতা। ঈশ্বরের চিৎ তাঁহার ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং ভগবান, এই ত্রিবিধ প্রকাশেরই বিজ্ঞাতা। স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদ। শ্বেত ৬।১৬।—"ঈশ্বর আপনা হইতে সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন এবং আপনা হইতে প্রকাশিত সকল বস্তুকেই তিনি জানেন।" কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এবং তাঁহার সৎ, চিৎ, ও আনন্দ যত কিছু রূপে, ভাবে, এবং সত্তায় প্রকাশিত এবং পরিণত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই সমগ্রভাবে সচ্চিদানন্দতত্ত্ব; এই সমগ্র সচ্চিদানন্দতত্ত্ব ঈশ্বরের চিতের জ্ঞেয় বস্তু এবং ঈশ্বরের চিৎ তৎসমুদয়কেই জ্ঞাত আছেন। এই সমগ্র সচ্চিদানন্দতত্ত্বের অধিক আর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই।

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। শ্বেত। ১।১২

৫।২।২ জ্ঞাত সচ্চিদানন্দতত্ত্ব জ্ঞান

চিৎ বা চৈতন্য জ্ঞান বা বিজ্ঞান নহে। চৈতন্য থাকিলে জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করা যায়, কারণ চৈতন্যই স্বীয় জ্ঞানশক্তির দ্বারা জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করে। অচেতন বস্তু জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জ্ঞাতা চিৎ জ্ঞানশক্তির

দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধে যে তত্ত্ব জ্ঞাত হয়, তাহা জ্ঞান। আমরা পাইয়াছি যে, সচ্চিদানন্দ জ্ঞেয় বস্তু। সুতরাং, ঈশ্বরের চিৎ কর্ত্তৃক জ্ঞাত তাঁহারই সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব তাঁহার জ্ঞান। শ্রুতি বলিয়াছেন, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বেই আপনাকে আপনি জানিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি।
তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ। বৃহদারণ্যক ১।৪।১০

—"এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে, একমাত্র ব্রহ্মরূপেই ছিল। ব্রহ্ম আপনাকে আপনি জানিলেন এবং আপনাকে জানিয়া বলিলেন, 'আমি ব্রহ্ম।' আপনাকে জানিয়া তিনি, যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ের রূপে প্রকাশিত ও পরিণত হইলেন।" তাঁহার অনন্ত সৎ, অনন্ত চিৎ, এবং অনন্ত আনন্দ, এবং অনন্ত শক্তিত্রয়ের সত্ত্বা ও স্বরূপ, এবং তিনি শক্তিত্রয়ের ক্রিয়ার দ্বারা আপনাকে যে সকল অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত রূপে প্রকাশিত ও পরিণত করিবেন, তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া তিনি লীলা আরম্ভ করিলেন, কারণ, এই জ্ঞান ব্যতীত লীলা হইতে পারে না। লীলারম্ভের পূর্ব্বে ঈশ্বরের স্বীয় ক্রিয়া, জ্ঞান, এবং ইচ্ছা, এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে কোনটীরই কার্য্য ছিল না; সকল শক্তিই তাঁহার মধ্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। ঈশ্বরের শক্তির ক্রিয়াই তাঁহার লীলা। আমরা বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত ১।৪।১ সূত্রে পাইয়াছি যে ঈশ্বর "সোঽহমস্মি" বলিয়া স্বীয় আনন্দাত্মার ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং সেই শক্তিকে নানারূপে কার্য্যকারী করিয়া আনন্দলীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সচ্চিদানন্দতত্ত্বকে সমগ্রভাবে বিজ্ঞাত না হইয়া তিনি লীলা বিস্তার করিতে পারেন না। এইজন্য তিনি জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া স্বীয় সচ্চিনানন্দ-তত্ত্বকে সমগ্রভাবে বিজ্ঞাত হইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণ করিলেন। এক-মাত্র কৃষ্ণই স্বীয় সমগ্র সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বিজ্ঞাতা। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিয়াছেন:

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম। গীতা ১০।১৫

—"হে পুরুষোত্তম, কেবল তুমিই তোমাকে জান।" ত্রিকালের সকল বস্তুকেই কৃষ্ণ জানেন, তাহা তিনিও ঘোষণা করিয়াছেন।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ গীতা ৭।২৬

—"হে অর্জ্জুন, অতীতের, বর্ত্তমানের, এবং ভবিষ্যতের সকল অপ্রাকৃত

এবং প্রাকৃত বস্তুকেই আমি জানি, কিন্তু আমাকে কেহই সমগ্রভাবে জানে না।" কেবল কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে প্রত্যক্ষ করিলেই সমগ্র সচ্চিদানন্দতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে এবং সৎ, চিৎ, ও আনন্দের সকল প্রকারের সমুদয় বিস্তারকেও জানিলে সমগ্র সচ্চিদানন্দতত্ত্বকে জ্ঞাত হওয়া যায়। ত্রিকালের সকল অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত বস্তুই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের প্রকাশ ও পরিণাম এবং তৎসমুদয়ের জ্ঞানও সচ্চিদানন্দতত্ত্বের জ্ঞান। এক্ষণে দেখা গেল, জ্ঞাত সচ্চিদানন্দতত্ত্ব জ্ঞান। কৃষ্ণের চিৎ জ্ঞানশক্তির দ্বারা এই যে জ্ঞান লাভ করে তাহা পরোক্ষ জ্ঞান নহে; তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। এইজন্য শ্রুতি কৃষ্ণকে বিজ্ঞাতা বলিয়াছেন। যিনি স্বয়ং সমগ্র সচ্চিদানন্দতত্ত্ব, কেবল তিনিই সমগ্র সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বিজ্ঞাতা হইতে পারেন। একমাত্র কৃষ্ণই সমগ্র সচ্চিদানন্দতত্ত্ব; এইজন্য কেবল তিনিই আপনাকে আপনি জানেন। তাঁহার এই বিজ্ঞান সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই আছে, কারণ স্বীয় অনন্ত জ্ঞানশক্তির দ্বারা আপনার সম্বন্ধে সম্যক বিজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "অহং ব্রহ্মাস্মি।" তিনি আপনাকে যে সকল অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত নামে ও রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বেও তৎসমুদয় তাঁহার মধ্যে ছিল এবং তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানও জানিতে পারেন, এইজন্য তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেই স্বীয় অনন্ত জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ করিতেই তৎসমুদয় সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন, "অহং ব্রহ্মাস্মি।" কোন জীবই সমগ্র সচ্চিদানন্দতত্ত্ব নহে, এবং সমগ্র সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সম্যক্ বিজ্ঞাতা হইতে পারে না, এইজন্য কোন জীবই "সোঽহমস্মি" এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিতে পারে না। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি কৃষ্ণকে সমগ্রভাবে জানেন না।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো!।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ভাগবত ১০।১৪।৩৮

—ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "যাহারা বলে যে তোমার মহিমা জানে, তাহারা জানুক্; আমি জানি যে তোমার মহিমা আমার মন ও বাক্যের অগোচর।" এইজন্য শ্রুতি বলেন: ন চ তস্যাস্তি বেত্তা। শ্বেত ৩।১৯। —"ঈশ্বরকে সমগ্রভাবে জানে এমন কেহ নাই।" গীতার পূর্ব্বোদ্ধৃত ৭।২৬ শ্লোকে কৃষ্ণও এই তত্ত্বই ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, "মান্তু বেদ ন কশ্চন।"

কোন জীবই কৃষ্ণের অনন্ত বিস্তারের সম্যক্ বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্র ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা যে জীবাত্মা মুক্ত হইয়াছে, সেই মুক্তাত্মা কৃষ্ণকে লাভ করিয়া কৃষ্ণের সমান আনন্দ প্রাপ্ত হয়, এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানও লাভ করে, কিন্তু কৃষ্ণের মত অনন্ত বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেনা এবং সৃষ্টিকার্য্যও করিতে পারে না, অর্থাৎ, কৃষ্ণের ন্যায় আপনাকে অনন্তরূপে প্রকাশ ও পরিণত করিতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ ঃ জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান

৫।৩।১ ঈশ্বরের চিৎ তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ

আমরা পাইয়াছি যে, কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এবং তাঁহার সৎ চিৎ আনন্দের সর্ব্বপ্রকারের সকল বিস্তার সমগ্র সচ্চিদানন্দতত্ত্ব, এবং জ্ঞাত সচ্চিদানন্দতত্ত্বই জ্ঞান। সুতরাং, জ্ঞাত কৃষ্ণতত্ত্বই জ্ঞান। কৃষ্ণের চিতে এই যে জ্ঞান আছে, তাহা কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান। কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান কৃষ্ণের জ্ঞানস্বরূপ। কৃষ্ণের এই জ্ঞানস্বরূপ তাঁহারই চিতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান আছে। এইজন্য চিৎ এবং জ্ঞানস্বরূপ অভিন্ন। ঈশ্বর এবং তাঁহার চিৎ অভিন্ন। এইজন্য শাস্ত্র ঈশ্বরের চিৎকে জ্ঞানস্বরূপ না বলিয়া ঈশ্বরকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি বা স্মৃতি কোন শাস্ত্রই ঈশ্বরকে কেবলই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বলেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে, সকল শাস্ত্রই ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। সকল শাস্ত্রই ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর অনন্ত ক্রিয়াশক্তির, ইচ্ছাশক্তির, এবং ষড়ৈশ্বর্য্যেরও অধীশ্বর। অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট, ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে শ্রুতি বা স্মৃতি কোন শাস্ত্রই কেবলই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বলেন নাই, বলিলে পরস্পরবিরুদ্ধ তত্ত্ব প্রকাশ করা হইত, কিন্তু শাস্ত্র তাহা করিতে পারেন না এবং করেনও নাই। শাস্ত্র যেখানেই ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার চিতের সহিত অভিন্নভাবে বিদ্যমান পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানস্বরূপকেই বুঝাইয়াছেন।

৫।৩।২ ঈশ্বর জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এবং জ্ঞান। জ্ঞাতা চিৎ স্বীয় জ্ঞানশক্তির দ্বারা নিজকেও জ্ঞাত হয় এবং সৎ ও আনন্দকেও জ্ঞাত হয়। ঐতরেয় শ্রুতি পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩।১।২ সূত্রে আপনাকে আপনি জানিবার জ্ঞানশক্তিকে "প্রজ্ঞানম্" নাম দিয়াছেন। প্রজ্ঞান জ্ঞানশক্তিরই একটী রূপ। আবার, মূল জ্ঞানশক্তিকেও ঐতরেয় শ্রুতি উক্ত বাক্যেই প্রজ্ঞান নাম দিয়াছেন। আপনাকে আপনি জানিবার জ্ঞানশক্তিকেও প্রজ্ঞান বলা হইয়াছে, কারণ এই প্রজ্ঞান মূল জ্ঞানশক্তির, অর্থাৎ প্রজ্ঞানেরই একটী কার্য্যকারী রূপ এবং ইহার সহিত অভিন্ন। ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বের সকল পদার্থে এই চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তিকে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছেন; ইহাকে পরমাত্মা নামে, প্রজ্ঞান নামে এবং প্রজ্ঞানব্রহ্ম নামেও শ্রুতি অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রজ্ঞান সহায়ে কৃষ্ণ সমগ্র বিশ্বের সর্ব্ব পদার্থকে জানেন। কৃষ্ণ স্বীয় অনন্ত প্রজ্ঞানের দ্বারা আপনি সমগ্রভাবে আপনাকে জ্ঞাত আছেন। এই প্রজ্ঞানই শাস্ত্রোক্ত জ্ঞাননেত্র বা তৃতীয় নয়ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিতের বিস্তার

৫।৪।১ অপ্রাকৃত বিস্তার

অপ্রাকৃত পরব্যোমে কৃষ্ণের যে সকল ভগবান ও ভগবতী স্বরূপ আছেন, তাঁহারা কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দের বিস্তার, সুতরাং চিতেরও বিস্তার। পরমাত্মা, অর্থাৎ প্রজ্ঞান নামে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তিও কৃষ্ণের চিতের জ্ঞানশক্তির বিস্তার। সমগ্র বিশ্বের সকল স্থাবর ও জঙ্গমের মধ্যেও কৃষ্ণের চিতের অংশ বিদ্যমান আছে। জীবাত্মা চিদানন্দের বিস্তার, সুতরাং চিতেরও বিস্তার। জীবাত্মার চিদংশেও জ্ঞানশক্তি আছে এবং এই জ্ঞানশক্তির প্রজ্ঞান, জ্ঞাননেত্র, বা তৃতীয় নয়ন নামক আপনাকে আপনি বিজ্ঞাত হইবার এবং ঈশ্বরকেও বিজ্ঞাত হইবার কার্য্যকারী রূপও আছে। চিতের বিস্তারের দ্বারা কৃষ্ণ সমগ্র বিশ্বের সকল পদার্থকে সচেতন করিয়াছেন।

৫।৪।২ প্রাকৃত বিস্তার

প্রাকৃত বিশ্বে সূর্য্য চন্দ্র তারকা বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি যে সকল বস্তুর জ্যোতি আছে, সেই জ্যোতি তাহাদের নিজস্ব জ্যোতি নহে। তাহাদের জ্যোতি কৃষ্ণের চিদংশের জ্ঞানশক্তির পরিণাম।

(১) ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ মুণ্ডক ২।২।১০ ; কঠ ২।২।১৫ ; শ্বেত ৬।১৪

(২) জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্। মুণ্ডক ২।২।৯

—"(১) সূর্য্য ঈশ্বরকে প্রকাশ করে না ; চন্দ্রতারকাগণও তাঁহাকে প্রকাশ করে না ; এই বিশ্বে বিদ্যমান বিদ্যুৎসমূহও তাঁহাকে প্রকাশ করে না ; অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে ? ইহাদের জ্যোতি জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের অধীন জ্যোতি ; ইহারা তাঁহারই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। (২) ঈশ্বর সকল জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর জ্যোতি।" সূর্য্য-চন্দ্রাদির মধ্যে কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ বিদ্যমান আছে ; সেই চিতের মধ্যে জ্ঞানশক্তি আছে ; সেই জ্ঞানশক্তি জ্যোতিতে পরিণত হইয়া উহাদিগকে জ্যোতিষ্মান করিয়াছে। সূর্য্যচন্দ্রাদির জ্যোতি জ্ঞানশক্তির কার্য্যাবস্থা, অর্থাৎ পরিণাম। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের সৎ চিৎ আনন্দ তিনই জ্যোতির্ম্ময় বস্তু, কিন্তু অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দের জ্যোতিও অপ্রাকৃত জ্যোতি। সেই জ্যোতি কার্য্যাবস্থা অর্থাৎ পরিণামভূত জ্যোতি নহে ; ইহা প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হয় না ; যোগীগণের জীবাত্মা ধ্যানযোগে জ্ঞাননেত্রে তাহা দর্শন করেন। এই জ্যোতিও চিদ্বস্তু। শ্রুতি এই অপ্রাকৃত জ্যোতিকে উত্তম জ্যোতি বলিয়াছেন।

জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি। ছান্দোগ্য। ৩।১৭।৭

কৃষ্ণের যে শক্তিই কার্য্যাবস্থায় পরিণত হয়, শক্তির সেই পরিণামভূত কার্য্যাবস্থামাত্রেই প্রাকৃত জড় বস্তু। সূর্য্যচন্দ্রাদির জ্যোতি পরিণামভূত জ্যোতি বলিয়া তাহা প্রাকৃত এবং জড় জ্যোতি এবং তাহা প্রাকৃত চক্ষুর গোচর হয়। উত্তাপ এইরূপ পরিণামভূত এবং প্রাকৃত জ্যোতির একটী গুণ, এইজন্য, সূর্য্যাদির জড় জ্যোতির সহিত উত্তাপও আছে।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ গীতা। ১৫।১২

এখানে তেজ শব্দে উত্তাপযুক্ত জ্যোতি সূচিত হইয়াছে। কৃষ্ণ এবং তাঁহার জ্ঞানশক্তি অভিন্ন বলিয়া উত্তাপ ও জ্যোতি কৃষ্ণ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের জ্যোতি কার্য্যাবস্থা নহে বলিয়া তাহাতে উত্তাপ নাই ; এই উত্তম জ্যোতি স্নিগ্ধ জ্যোতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"আনন্দ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

মূল আনন্দ

৬।১।১ চিন্ময় রস

আনন্দ একটী মূল বস্তু। ইহার গুণেরও নাম আনন্দ। ইহাও শুদ্ধ বস্তু। শ্রুতি ঈশ্বরকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়াছেন। প্রাকৃত তরল বস্তু বা রস-তন্মাত্রা বুঝাইতে "রসঃ" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। রস-তন্মাত্রা প্রাকৃত তরল বস্তুসমূহের সূক্ষ্ম রূপ হইলেও জড় বস্তু। এখানে "রসঃ" আনন্দ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা প্রাকৃত জড় বস্তু নহে, অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু। অতএব, আনন্দ চিন্ময় রস। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের আনন্দই মূল আনন্দ। যেখানেই আনন্দ আছে, তাহা এই মূল আনন্দের বিস্তার।

৬।১।২ অনন্ত

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের সৎ এবং চিৎ অনন্ত এবং আনন্দও অনন্ত। শ্রুতি এই আনন্দকে ভূমা সুখ, অর্থাৎ ভূমানন্দ বলিয়াছেন।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। ছান্দোগ্য ৭।২৩।১

—"যাহা ভূমা তাহাই সুখ। অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ"। সুখ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ক্ষেত্রের অর্থাৎ জড়দেহের অংশ এবং জড় বস্তু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, এবং গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বাবিংশতিতম শ্লোকে ঘোষিত হইয়াছে যে এই দৈহিক সুখ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে লব্ধ হয়, ইহা আদ্যন্তবন্ত এবং দুঃখের কারণ। ছান্দোগ্য শ্রুতি যে সুখের

বিষয় বলিলেন তাহা ভূমা অর্থাৎ অনন্ত। অনন্তের আদি ও অন্ত নাই ; সুতরাং, এই ভূমা সুখ গীতার ১৩।৬ শ্লোকে উক্ত দৈহিক সুখ নহে। এইজন্য, ছান্দোগ্য শ্রুতির ভূমা সুখের অর্থ ভূমানন্দ। কৃষ্ণের আনন্দ অনন্ত বলিয়া ইহা অব্যয়, অক্ষর, এবং নিত্যপূর্ণ।

৬।১।৩ আনন্দাত্মা

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ সোঽহম্। সোঽহম্ কৃষ্ণের আনন্দাংশই তাঁহার আনন্দাত্মা। তাঁহার আনন্দাত্মাই তাঁহার অহম্। সুতরাং কৃষ্ণের আনন্দাংশই তাঁহার অহম্। কৃষ্ণ সোঽহমতত্ত্ব ; তাঁহার আনন্দাংশ তাঁহার অহম্‌তত্ত্ব। প্রাকৃত জীবদেহে যে দৈহিক অহম্ আছে তাহাও প্রাকৃত। কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ত্রিগুণাতীত এবং অপ্রাকৃত। এইজন্য তাঁহার অহম্ অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত অহম্ আত্মিক অহম্। মানবের দৈহিক অহম্ বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শজাত সুখ ভোগ করিতে চাহে। কৃষ্ণের আত্মিক অহম্ কেবল আপনারই ভাব রস গুণ সম্ভোগ করিতে চাহে।

৬।১।৪ আত্মিক অহমের প্রেরণায় লীলা : লীলার অর্থ

লীলার অর্থ, আনন্দ দান করিয়া আনন্দ লাভের জন্য আনন্দময় ক্রীড়া। কৃষ্ণ লীলা করেন, তাঁহার আত্মিক অহমের, অর্থাৎ আনন্দাত্মার প্রেরণায়। তাঁহার আত্মিক অহম্ প্রাকৃত বিষয়ভোগের সুখ চাহে না, এইজন্য তাঁহার লীলার উদ্দেশ্য প্রাকৃত বিষয়ভোগ নহে। কেবল আনন্দের জন্য তিনি লীলা করেন। ব্রহ্মা ও দেবগণ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন :

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভাগবত ১০।২।৩৯

—"হে ঈশ্বর, তুমি জন্মহীন ; তথাপি তুমি আপনাকে নানারূপে প্রকাশ কর, আনন্দ ব্যতীত তাহার অন্য কারণ যুক্তি ও বিচারের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" ব্রহ্মসূত্রও এই তত্ত্বই নিরূপণ করিয়াছেন।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্। ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩

—"ঈশ্বরের লৌকিক কর্ম্ম বা কর্ম্মফলভোগ নাই, কিন্তু তিনি কেবল আনন্দের জন্যই লীলা করেন, অর্থাৎ আনন্দময় ক্রীড়া করেন।"

৬।১।৫ সর্ব্বরস ঃ পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর

"রসো বৈ সঃ"—কৃষ্ণের রস পঞ্চবিধ, শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস, মধুর রস। আত্মস্বরূপকে জানিয়া আত্মস্বরূপে স্থিতি হইতে যে আনন্দ তাহা শান্তরস। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হইতে যে আনন্দ তাহা দাস্যরস। সখার সহিত সখার সম্পর্ক হইতে যে আনন্দ তাহা সখ্যরস। পালক ও পাল্যের সম্পর্ক হইতে যে আনন্দ তাহা বাৎসল্যরস। কান্ত ও কান্তার সম্পর্ক হইতে যে আনন্দ তাহা মধুর রস। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের আনন্দাংশে এই পঞ্চবিধ রস আছে বলিয়া তাঁহার আনন্দ সর্ব্বরস, সুতরাং কৃষ্ণ সর্ব্বরস, কারণ কৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দাত্মা অভিন্ন। উক্ত পঞ্চবিধ রসের মধ্যে যিনি যে রস কৃষ্ণের নিকট হইতে পাইতে চাহেন, তিনি সেই রসই প্রাপ্ত হয়েন। কৃষ্ণের রস উক্ত পঞ্চবিধ রসের সমাহার বলিয়া, শ্রুতি বলিয়াছেন যে ঈশ্বর সর্ব্বরস।

সর্ব্বরসঃ। ছান্দোগ্য। ৩।১৪।২

৬।১।৬ আনন্দের বিস্তার

কৃষ্ণ আপনাকে যে সকল ভগবান এবং ভগবতী স্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দের অংশ; তাঁহাদের আনন্দাংশ কৃষ্ণের আনন্দের বিস্তার। প্রাকৃত বিশ্বের সকল জীবদেহে যে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত আছে, তাহা কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ; জীবাত্মার আনন্দাংশ কৃষ্ণের আনন্দের বিস্তার। এই বিস্তারসমূহ অপ্রাকৃত বিস্তার; ইহারা আনন্দের প্রকাশরূপ, পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা নহে। প্রাকৃত বিশ্বের সকল সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য, সকল সুস্বাদু বস্তুর সুস্বাদ, সকল সুগন্ধ বস্তুর সৌরভ, সকল স্নিগ্ধস্পর্শ বস্তুর স্নিগ্ধতা, এবং সকল শ্রুতিমধুর বস্তুর অর্থাৎ শব্দের মাধুর্য্য কৃষ্ণের আনন্দাংশের হ্লাদিনীশক্তির বিস্তার; এই বিস্তারসমূহ হ্লাদিনীশক্তির পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা; শক্তির পরিণামমাত্রেই প্রাকৃত ও জড় বস্তু; এইজন্য এই বিস্তারসমূহ প্রাকৃত ও জড় বস্তু এবং ইহারা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গ্রহণীয় হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হ্লাদিনী শক্তি

৬।২।১ আনন্দাংশে ইচ্ছাশক্তি

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের আনন্দাংশে ইচ্ছাশক্তি অধিষ্ঠিতা। কৃষ্ণের আনন্দাংশই তাঁহার আনন্দাত্মা এবং অহম্; সুতরাং তাঁহার আনন্দাত্মায় ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান। আনন্দাত্মার ইচ্ছাশক্তিও আনন্দময়ী, এইজন্য ইচ্ছাশক্তির অন্য নাম হ্লাদিনীশক্তি। হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণকে স্বীয় আনন্দ সম্ভোগ করাইবার এবং করিবার ইচ্ছাযুক্ত করে এবং হ্লাদিনীই কৃষ্ণকে স্বীয় আনন্দ সম্ভোগ করায়। কৃষ্ণের স্বীয় আনন্দ সম্ভোগ করাইবার এবং করিবার শক্তি এই হ্লাদিনী। শক্তি ভিন্ন কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে না। আনন্দ-দান এবং আনন্দ-সম্ভোগও কর্ম্ম। কৃষ্ণ হ্লাদিনীশক্তির দ্বারা এই যুগ্ম কর্ম্ম সম্পাদন করেন। কৃষ্ণ স্বীয় আনন্দের শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস, এবং মধুর রস সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, হ্লাদিনীর প্রেরণায়। হ্লাদিনীই কৃষ্ণকে উক্ত পঞ্চবিধ রস অশেষ-বিশেষ প্রকারে সম্ভোগ করান। আনন্দ সম্ভোগ করিবার ইচ্ছাই আনন্দলিপ্সা; আনন্দ সম্ভোগ করাইবার ইচ্ছাই আনন্দদিৎসা। কৃষ্ণের আনন্দদিৎসা এবং আনন্দলিপ্সা তাঁহার হ্লাদিনীতেই আছে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের চিৎ যেমন জ্ঞানশক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ করে, সেই জ্ঞান চিতে সঞ্চিত হয় এবং চিৎ-ই লব্ধ জ্ঞানের আধার, তদ্রূপ তাঁহার আনন্দ হ্লাদিনীশক্তির দ্বারা আনন্দ লাভ করে, সেই লব্ধ আনন্দ আনন্দেই সঞ্চিত হয়, এবং আনন্দই সেই আনন্দের আধার।

৬।২।২ আনন্দাংশে প্রেম

হ্লাদিনীর আনন্দদিৎসার সার্থকতায় আনন্দলিপ্সার সার্থকতা হয়। আনন্দদিৎসার সার্থকতা সাধন দ্বারা আনন্দলিপ্সার সার্থকতা সাধন হ্লাদিনীর স্বভাব। হ্লাদিনীর এই স্বভাবের নাম প্রেম। সুতরাং, প্রেম আনন্দ দান

করিলে তবে আনন্দ প্রাপ্ত হয়। অতএব, প্রেমের আনন্দলিপ্সা স্বার্থসাধিকা নহে, অর্থাৎ প্রেম কেবল আপনার জন্য আনন্দ চাহে না ; প্রেম কৃষ্ণকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ রস সম্ভোগ করাইয়া আনন্দ লাভ করে। হ্লাদিনীশক্তি এবং তাঁহার প্রেম নামক স্বভাব অভিন্ন বলিয়া হ্লাদিনী প্রেমময়ী ; কৃষ্ণের আনন্দাত্মা এবং হ্লাদিনী অভিন্ন বলিয়া কৃষ্ণের আনন্দাত্মা প্রেমময় ; কৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দাত্মা অভিন্ন বলিয়া কৃষ্ণ প্রেমময়। কৃষ্ণের আনন্দাত্মার প্রেম অনন্ত, অব্যয়, অক্ষর, এবং নিত্যপূর্ণ।

৬৷২৷৩ আনন্দাংশের প্রেম অপ্রাকৃত কাম

কৃষ্ণের আনন্দাংশের প্রেমই তাঁহার কাম ; কিন্তু ইহা অপ্রাকৃত কাম, প্রাকৃত কাম নহে। মনবাদি জীবদেহ ত্রিগুণময় ; ত্রিগুণ হইতে যে কাম উদ্ভূত হয়, তাহা প্রাকৃত কাম। প্রাকৃত কামও ত্রিগুণময় জড় বস্তু। কৃষ্ণের বিগ্রহে ত্রিগুণ নাই ; সুতরাং তাঁহার মধ্যে প্রাকৃত কাম নাই। তাঁহার যে আনন্দাংশে প্রেম বিদ্যমান, তাহা অপ্রাকৃত চিন্ময় রস, এবং প্রেম অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। প্রাকৃত কাম প্রাকৃত জড় বস্তুর সহিত সংযোগের দ্বারা সুখ চাহে ; প্রেম অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর সহিত সংযোগের দ্বারা আনন্দ চাহে। প্রাকৃত কাম আপনারই জন্য সুখ চাহে, অন্যকে সুখ দিয়া সুখ চাহে না, অন্যকে দুঃখ দিয়াও সুখ চাহে ; প্রেম আনন্দ দান করিয়া আনন্দিত হইতে চাহে, এবং আনন্দ দান না করিলে আনন্দ লাভ করে না। এইজন্য, প্রেম অপ্রাকৃত কাম, প্রাকৃত কাম নহে। ভাগবতে কৃষ্ণের এবং রাধার যে কামের উল্লেখ আছে, তাহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত কাম—পরস্পরকে আনন্দ দান করিয়া আনন্দিত হইবার ইচ্ছা, অর্থাৎ প্রেম। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ে আছে, কৃষ্ণ রাসলীলা করিবার জন্য যে বংশীধ্বনি করিলেন, তাহা "অনঙ্গবর্দ্ধনং" =কামবর্দ্ধক ; ৩০শ অধ্যায়ে কৃষ্ণকে, "ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ" =শ্রীরাধাকে বহন করিবার কালে তাঁহার ভারে পীড়িত কামী, বলা হইয়াছে ; এই অধ্যায়েই কৃষ্ণকে কামী এবং রাধাকে কামিনী বলা হইয়াছে, "কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্"—কামী (কৃষ্ণ) কর্ত্তৃক কামিনীর (রাধার) কেশপ্রসাধন কৃত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "সোহকাময়ত বহু স্যাং"—তিনি কামনা করিলেন যে তিনি বহু হইবেন। শাস্ত্রে কৃষ্ণের কাম সম্বন্ধে আরও উক্তি

আছে। যেখানেই তাঁহার কামের উল্লেখ আছে, সেখানেই কামের অর্থ, অপ্রাকৃত কাম বা প্রেম। প্রেমের প্রেরণাতেই কৃষ্ণ সৃষ্টির পূর্ব্বে যুগলমূর্ত্তি হইয়াছেন। প্রেমের প্রেরণাতেই তিনি বহু হইয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ববাসী সকলকেই আনন্দ দান করিয়া আনন্দ পাইবার জন্য এবং বিশ্ববাসী সকলেই তাঁহাকে আনন্দ দান করিয়া আনন্দ পাইবে বলিয়া কৃষ্ণ জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কৃষ্ণের সকল লীলার মূলেই তাঁহার প্রেম, এবং তাঁহার প্রেমই তাঁহার অপ্রাকৃত কাম।

৬।২।৪ প্রেমের পঞ্চবিধ ভাব—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর

কৃষ্ণের সর্ব্বরস আনন্দের মধ্যে যে পঞ্চবিধ আনন্দের সমাহার আছে, সেই পঞ্চবিধ আনন্দ কৃষ্ণকে পৃথক পৃথক ভাবে সম্ভোগ করাইবার জন্য প্রেমে পঞ্চবিধ ভাবের সমাহার আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এবং মধুর, এই পাঁচটী প্রেমের ভাব। প্রেমের শান্তভাব শান্তরস, দাস্যভাব দাস্যরস, সখ্যভাব সখ্যরস, বাৎসল্যভাব বাৎসল্যরস, এবং মধুরভাব মধুর রস কৃষ্ণকে সম্ভোগ করায়। কৃষ্ণের প্রেমের পঞ্চবিধ রসের প্রত্যেকটী এবং পঞ্চবিধ ভাবেরও প্রত্যেকটী অনন্ত, অব্যয়, অক্ষর, এবং নিত্যপূর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরাধা

৬।৩।১ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ

২।৪।১ অনুচ্ছেদে পরাতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।৩ সূত্র হইতে আমরা পাইয়াছি যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সোঽহম্ ঈশ্বর যখন একাকী ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার অহমের অভিন্নতাহেতু তিনি আনন্দ না পাইয়া আনন্দ পাইবার জন্য যুগলমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, এবং শ্রীরাধা সেই দ্বিতীয় মূর্ত্তি। আমরা ইহাও পাইয়াছি যে, রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনীর মূর্ত্তি। আনন্দ আদান-প্রদানের জন্য কৃষ্ণ কেন স্বীয় হ্লাদিনীকে

রাধারূপে মূর্তিমতি করিয়াছিলেন, তাহাও তথায় বিবৃত হইয়াছে। আনন্দ-লীলার জন্য কৃষ্ণ এবং রাধা কিরূপে আপনাদিগকে বিস্তার করিয়াছেন, তাহাও তথায় উক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ স্বীয় হ্লাদিনীশক্তির স্বভাব, প্রেমের সার্থকতার জন্য স্বীয় আনন্দাত্মাকেই রাধারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্ত হ্লাদিনী, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পঞ্চবিধ ভাব, এবং অনন্ত পঞ্চবিধ রস সহ ঘনীভূত আনন্দাংশের মূর্তি রাধা। রাধা হ্লাদিনীশক্তিপ্রধানা বলিয়া রাধাকে হ্লাদিনীর মূর্তি বলা হয়; আমরাও রাধাকে হ্লাদিনীর মূর্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি এবং করিব। বস্তুতঃ, রাধা সোঽহম্তত্ত্ব-কৃষ্ণের অহম্তত্ত্ব। প্রেম আনন্দাত্মার স্বভাব বা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি কৃষ্ণের পরাপ্রকৃতি। আনন্দাত্মা এবং পরা-প্রকৃতি অভিন্ন। এইজন্য, আনন্দাত্মার মূর্তি রাধা কৃষ্ণের পরাপ্রকৃতির মূর্তি। কৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দাত্মা অভিন্ন; এইজন্য রাধা এবং কৃষ্ণ অভিন্ন। কৃষ্ণ এবং রাধা অভিন্ন বলিয়া কৃষ্ণ বলিতে রাধাকৃষ্ণ এবং রাধা বলিতেও রাধাকৃষ্ণ বুঝায়। রাধা কৃষ্ণের অন্তরে ছিলেন, অভিন্নভাবে আনন্দাত্মারূপে। লীলার নিমিত্ত কৃষ্ণ অন্তরের আনন্দাত্মাকে বাহিরে ভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্ত হইতে অনন্ত বিয়োগ করিলেও অনন্তই অবশিষ্ট থাকে; কৃষ্ণের অন্তরের আনন্দাত্মা অনন্ত; সেই অনন্ত আনন্দাত্মাকে রাধা রূপে ভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশ করিবার পরেও তাঁহার অন্তরের অনন্ত আনন্দাত্মা অনন্তই রহিল; আবার বাহিরেও অনন্ত আনন্দাত্মার মূর্তি রাধা রহিলেন। রাধাকৃষ্ণের লীলা, কৃষ্ণের আপনার সহিত আপনার লীলা। তাই ভাগবত বলিয়াছেন ঃ

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভক স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ। ভাগবত ১০।৩৩।১৭

—"বালক যেমন দর্পণাদিতে আপন প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, কৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সহিত যে ক্রীড়া করিলেন, তাহাও তদ্রূপ।"—কারণ, রাধা এবং তাঁহার কায়ব্যূহ গোপীগণ কৃষ্ণেরই পরাপ্রকৃতি এবং কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন, যেমন বালক ও তাহার প্রতিবিম্ব অভিন্ন। বালক এবং তাহার প্রতিবিম্ব অভিন্ন হইলেও প্রতিবিম্বের, বালক হইতে পৃথকভাবে স্থিত ভিন্ন সত্ত্বাও আছে। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও রাধার, কৃষ্ণ হইতে পৃথকভাবে স্থিত ভিন্ন মূর্তি আছে। কৃষ্ণের লীলা নিত্য, তাঁহার এই মূর্তিভেদস্বীকারও নিত্য, এবং রাধা নিত্যা। নিত্যলীলায় কৃষ্ণ রাধার নিত্যপতি, কান্ত, বল্লভ; রাধা কৃষ্ণের নিত্যা বধূ, কান্তা, বল্লভা। রাধাকৃষ্ণের পতিপত্নী সম্বন্ধের স্বরূপটী না বুঝিলে

তাঁহাদের লীলার স্বরূপও বুঝা যাইবে না। ত্রিগুণময় দেহ মাত্রই অধিভূত ক্ষর ভাব। এইজন্য, জগতের নর-নারী মাত্রই ক্ষর ভাব। প্রাকৃত লিঙ্গভেদ এবং লিঙ্গভেদজ্ঞান ক্ষরভাবেই আছে। বেদবিধি অনুসারে বিবাহিত হইলে নর-নারীর মধ্যে পতিপত্নী সম্বন্ধ হয়, এবং বেদবিধি লঙ্ঘন করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে উপপতি-উপপত্নী সম্বন্ধ হয়। বেদবিহিত পতিপত্নী সম্বন্ধ অথবা বেদবিগর্হিত উপপতি-উপপত্নী সম্বন্ধ, দুই-ই অধিভূত ক্ষর ভাবের ভূমির লিঙ্গভেদের এবং লিঙ্গভেদজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতদৈহিক সম্বন্ধ। প্রাকৃত দেহের এই দ্বিবিধ সম্বন্ধই প্রাকৃত সম্বন্ধ, এবং ক্ষর ভাবের ভূমির সম্বন্ধ। সচ্চিদানন্দ ক্ষর ভাবের অতীত ভাব। ক্ষর ভাবকে ভাব এবং ক্ষর ভাবের অতীত ভাবকে ভাবাতীত ভাব বলা হয়। ভাবাতীত ভাবই পরম ভাব। কৃষ্ণ পরম ভাব (গীতা ৭।২৪ এবং ৮।২০)। কৃষ্ণ পরম ভাব বলিতে ইহাই বুঝায় যে কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম ভাব, কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই কৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ পরম ভাব বলিয়া আনন্দাত্মা, পঞ্চবিধ রস, হ্লাদিনী, প্রেম বা পরাপ্রকৃতি, এবং প্রেমের পঞ্চবিধ ভাব, এই সমস্তই পরম ভাব। অপ্রাকৃত পরম ভাবে প্রাকৃত লিঙ্গভেদ এবং এইরূপ লিঙ্গভেদজ্ঞান নাই। পরমভাবে শান্তদাস্যাদি রসের এবং শান্তদাস্যাদি ভাবের ভেদ আছে। পরম ভাবের এই ভেদও পরম ভাব। কৃষ্ণ স্বীয় আনন্দ সম্ভোগ করাইয়া সম্ভোগ করিবার জন্য ভাব ও রসের ভেদের ভিত্তিতে ভেদস্বীকার করিয়া স্বয়ং যুগলমূর্ত্তি-রাধাকৃষ্ণ হইয়াছেন। রাধা কৃষ্ণের আনন্দাত্মার মূর্ত্তি, এইজন্য রাধাও পরম ভাব। পরমভাবে প্রাকৃত লিঙ্গভেদ এবং লিঙ্গভেদজ্ঞান না থাকায়, কৃষ্ণের এবং রাধার যে পতিপত্নীত্ব, তাহা লিঙ্গভেদ এবং লিঙ্গভেদজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃত দৈহিক সম্বন্ধ নহে; সুতরাং, এই পতিপত্নীত্ব বেদবিহিত পতিপত্নী সম্বন্ধ নহে এবং বেদবিরুদ্ধ উপপতি-উপপত্নী সম্বন্ধও নহে। বেদবিধি ক্ষর ভাবের ভূমির জন্য, ভাবাতীত ভাবের ভূমির জন্য নহে। রাধার সহিত কৃষ্ণের যে লীলা, তাহা ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে পরম ভাবের সহিত পরম ভাবের লীলা; এই লীলায় রাধা এবং কৃষ্ণ পরস্পরের আরাধনা করেন। কৃষ্ণকে আনন্দ দান করাই রাধার কৃষ্ণারাধনা; রাধার কৃষ্ণারাধনা অনুপম; এইজন্য তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের প্রীতি সর্ব্বাধিক; তাঁহার কৃষ্ণারাধনার এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁহার নাম রাধা।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ভাগবত ১০।৩০।২৮

—রাসলীলার সময় কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ কৃষ্ণানুসন্ধানকালে বলিতেছেন, "ইঁহারই দ্বারা ভগবান হরি ঈশ্বর গোবিন্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠভাবে আরাধিত হয়েন, যেহেতু তিনি তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া আমাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া একেলা তাঁহাকেই নির্জ্জন স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।" এই শ্লোকে ভাগবত বিবৃত করিয়াছেন যে, রাধার কৃষ্ণারাধনার বৈশিষ্ট তাঁহার রাধা নামের কারণ। কৃষ্ণ এবং রাধা কান্ত এবং কান্তা রূপে নিত্য সম্পর্কিত; এইজন্য রাধার আরাধনা প্রধানতঃ মধুরভাবের আরাধনা এবং রাধা কৃষ্ণকে প্রধানতঃ মধুর রসই সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। কিন্তু, যেহেতু রাধা প্রেমেরই মূর্ত্তি এবং প্রেমে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর, এই পঞ্চবিধ ভাবই আছে, সেইজন্য রাধার মধুর ভাব উক্ত পঞ্চবিধ ভাবের সমাহার, রাধার আরাধনা প্রধানতঃ মধুর ভাবের হইলেও তাহাতে পঞ্চবিধ ভাবেরই আরাধনা আছে, এবং রাধার আরাধনা হইতে কৃষ্ণ পঞ্চবিধ রসই প্রাপ্ত হয়েন। কৃষ্ণও রাধাকে আনন্দ দান করেন; ইহাই তাঁহার রাধার আরাধনা। তিনিও রাধাকে মধুরভাবে আরাধনা করিয়া মধুর রস সম্ভোগ করান। এইরূপ পারস্পরিক আরাধনার দ্বারা কৃষ্ণ এবং রাধা পারস্পরিক নিত্য সম্বন্ধের সম্ভোগ করেন। পারস্পরিক সেবা ব্যতীত পারস্পরিক প্রেমারাধনা হইতে পারে না। এই কারণে, রাধা আপনাকে কৃষ্ণের দাসী, এবং কৃষ্ণ আপনাকে রাধার দাস জ্ঞানে পারস্পরিক প্রেমারাধনা করেন। ভাগবতে রাধার উক্তি হইতে তাঁহার দাসীজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার উদ্দেশ্যে রাধা বলিতেছেন:

দাস্যাস্তে কৃপণয়া মে সখে! দর্শয় সন্নিধিম্। ভাগবত ১০।৩০।৪০

—"হে সখে, আমি তোমার দাসী; তোমাকে না দেখিয়া আমি দীনদশাগ্রস্থ হইয়াছি; তুমি নিকটে আসিয়া আমায় দর্শন দাও।" ভাগবতে দেখা যায়, কৃষ্ণ রাধাকে এবং গোপীগণকে আনন্দ দিবার জন্য তাঁহাদের সহিত রাসলীলা করিয়াছেন এবং এই লীলায় তিনি তাঁহাদের বিবিধ প্রকারের সেব করিয়াছেন। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণের উক্তি আছে,

দেহি পদপল্লব মুদারম্। গীতগোবিন্দ

কৃষ্ণ রাধার পদপল্লব পাইবার প্রার্থনা করিয়া জানাইলেন যে তিনি আপনাকে রাধার দাস জ্ঞান করেন। রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং পারস্পরিক আরাধনা নিত্য।

৬।৩।২ উক্ত সম্বন্ধের সম্ভোগ এবং আনন্দ

রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত নিত্য সম্বন্ধের সম্ভোগ হইতে প্রাপ্ত আনন্দ কিরূপ এবং সেই সম্ভোগ কিরূপ, তাহা বোধগম্য করা অতীব কঠিন। তাঁহাদের সম্ভোগ-লীলা ভাবাতীত ভাবের ভূমির অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু; সম্ভোগ হইতে প্রাপ্ত আনন্দও চিন্ময় রস; কোনটীই মানবের প্রাকৃত বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে; এইজন্য, প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না, কেবল তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারা যায়। প্রাকৃত নার-নারী প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা প্রাকৃত কামের ক্রিয়া কিরূপ তাহা জানে। এইজন্য প্রাকৃত কামের ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়াকালে প্রাপ্ত আনন্দের উপমার দ্বারা প্রাকৃত নর-নারীগণকে রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক সম্ভোগ এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত আনন্দ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। নর-নারী পরস্পরের মিলন হইতে সর্ব্বাধিক আনন্দ লাভ করে, সুরতক্রিয়াকালে। কিন্তু সুরতক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে সুরতক্রিয়ায় আনন্দ নাই, পরন্তু, উহা দুঃখদায়ক। তাহার কারণ এই: প্রথমতঃ, সুরতক্রিয়া একটী কর্ম্ম, ইহাতে পরিশ্রম আছে, পরিশ্রম দুঃখদায়ক। দ্বিতীয়তঃ, সুরতক্রিয়ায় শরীরের মূল ধাতুর ক্ষয় হয়; শাস্ত্র বলেন, "মরণং বিন্দুপাতেন", অর্থাৎ উক্তরূপ ক্ষয় মৃত্যুর কারণ; সুতরাং ইহা অনিষ্টকর এবং দুঃখদায়ক। তৃতীয়তঃ, সুরতক্রিয়ার ফলে গর্ভধারণ, প্রসব-বেদনা, সন্তান-পালন প্রভৃতি আশববিধ দুঃখ নর-নারীকে সহ্য করিতে হয়। চতুর্থতঃ, সুরতক্রিয়াকালে শরীরের সর্ব্বাপেক্ষা বীভৎস এবং অপবিত্র স্থানের সংস্পর্শ হয়; কামের মোহ এই বীভৎসতার এবং অপবিত্রতার বোধকে আচ্ছাদিত করে; নিষ্কাম চিত্তে উক্ত স্থান কেহ স্পর্শও করে না, দৈবাৎ অথবা কোন প্রয়োজনে স্পর্শ করিলে হস্ত ধৌত করিয়া হস্ত শুদ্ধ করে। এইরূপ বীভৎস এবং অপবিত্র স্থানের সহিত সংস্পর্শ দুঃখদায়ক। এখন দেখা দেখা গেল যে, সুরতক্রিয়ায় সুখ বা আনন্দ নাই। কিন্তু সুরতক্রিয়াকালে নরনারী আনন্দ প্রাপ্ত হয়। এই যে আনন্দ তাহারা প্রাপ্ত হয়, ইহা মধুর

রস। এই মধুর রস পরম ভাব। নর-নারীর দেহ এই মধুর রস পরস্পরকে দান করে না এবং নর-নারীর দেহ এই মধুর রস সম্ভোগ করে না, কারণ দেহ ভাব, মধুর রস পরম ভাব, দেহে পরম ভাব নাই, দেহ পরম ভাব দিতে পারে না এবং সম্ভোগও করিতে পারে না। নর-নারীর দেহের মধ্যে যে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত আছে তাহা কৃষ্ণের চিদানন্দের অতি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও তাহা পরম ভাব। জীবাত্মার আনন্দাংশে পঞ্চবিধ রস, হ্লাদিনী, প্রেম ও পঞ্চবিধ ভাব আনন্দাংশের পরিমাণ অনুরূপ আছে। সুরতক্রিয়াকালে নরের জীবাত্মার আনন্দাংশ নারীর জীবাত্মার আনন্দাংশকে, এবং নারীর জীবাত্মার আনন্দাংশ নরের জীবাত্মার আনন্দাংশকে মধুর রস দান করে; এইরূপ আদান-প্রদানের দ্বারা সুরতক্রিয়াকালে নরের জীবাত্মার আনন্দাংশ এবং নারীর জীবাত্মার আনন্দাংশ মধুর রস প্রাপ্ত হয়। ইহা অতি স্বল্পপরিমাণ এবং ইহার সম্ভোগও স্বল্পকালস্থায়ী, কিন্তু কৃষ্ণ স্বীয় সৃষ্টি রক্ষার এবং সৃষ্টির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিধান করিয়াছেন যে সুরতক্রিয়াকালে নর-নারীর জীবাত্মা উক্তরূপে মধুর রস প্রাপ্ত হইবে। ইহা ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী হইলেও ইহারই লোভে নর-নারী সুরতক্রিয়া করে এবং তাহারই ফলে সন্তানোৎপত্তি এবং সৃষ্টিরক্ষা হয়। মানব যদি দেহকে এবং দৈহিক সুরতক্রিয়াকে বাদ দিয়া এবং দেহ ও দৈহিক সুরতক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এই মধুর রসটীকে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে সে মধুর রসের স্বরূপটী বুঝিতে পারে। কিন্তু দেহাভিমানী মানব তাহা পারে না, এইজন্য দৈহিক সুরতক্রিয়া এবং তৎকালে প্রাপ্ত আনন্দের উপমার দ্বারাই তাহাকে রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক সম্ভোগ এবং সেই সম্ভোগ হইতে প্রাপ্ত আনন্দের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের আনন্দাংশে পঞ্চবিধ রস আছে এবং প্রত্যেকটী রস অনন্ত। তাঁহার আনন্দাত্মার মূর্ত্তি রাধাতেও পঞ্চবিধ রস আছে, এবং প্রত্যেকটী রস অনন্ত। কৃষ্ণ সর্ব্বরস, রাধাও সর্ব্বরস। প্রাকৃত নর-নারীর লিঙ্গভেদের ভিত্তিতে প্রাকৃত কামক্রিয়ার দ্বারা পারস্পরিক সম্ভোগের ন্যায় রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক সম্ভোগ নহে। তাঁহাদের মধ্যে প্রাকৃত কাম নাই এবং তাঁহাদের পারস্পরিক সম্ভোগে প্রাকৃত কামক্রিয়াও নাই। যিনি যে ভাব লইয়া সর্ব্বরস কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েন, তিনি সেই ভাবের রস কৃষ্ণ হইতে প্রাপ্ত হয়েন। যেমন অগ্নি হইতে তাপ চতুর্দ্দিকে

বিকীর্ণ হয়, যে অগ্নির নিকটে যায় সে তাপ অনুভব করে, তদ্রূপ, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে আনন্দ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর, এই পঞ্চবিধ ভাবের মধ্যে যিনি যে ভাব লইয়া কৃষ্ণের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়েন, কৃষ্ণের সর্ব্বরস আনন্দ হইতে বিকীর্ণ তজ্জাতীয় আনন্দ তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দিত করে। যে অগ্নিকে স্পর্শ করে, অত্যধিক তাপ তাহাকে যেমন অভিভূত করে, তদ্রূপ, যিনি যে ভাব লইয়া কৃষ্ণকে স্পর্শ করেন, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণের সর্ব্বরস আনন্দ হইতে তজ্জাতীয় আনন্দ তাঁহার মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে অভিভূত করে। রাধা এবং তাঁহার কায়ব্যূহ গোপীগণ মধুরভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করেন ; তাঁহারা সেই ভাব লইয়া কৃষ্ণের নিকটবর্ত্তী হইলেই কৃষ্ণ হইতে তজ্জাতীয় আনন্দ, অর্থাৎ মধুর রস, তাঁহাদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া তাঁহাদিগকে অতিশয় আনন্দিত করে ; তাঁহারা কৃষ্ণকে অথবা কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবামাত্র কৃষ্ণ হইতে মধুর রস এতই অধিক পরিমাণে তাঁহাদের মধ্যে সংক্রামিত হয় যে, সে আনন্দের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। একজন প্রাকৃত নারীর যদি অসংখ্য বল্লভ থাকিত এবং সে তৎসমুদয় বল্লভের সহিত এককালে রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে সেই নারী যে পরিমাণ আনন্দ প্রাপ্ত হইত, রাধা এবং গোপীগণ কৃষ্ণাঙ্গের স্পর্শমাত্র হইতে ততোধিক আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। আবার, কোন প্রাকৃত পুরুষের যদি অসংখ্য বল্লভা থাকিত এবং যদি সে তাহাদের সকলের সহিত এককালে রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে সেই পুরুষ যে পরিমাণ আনন্দ পাইত, রাধাঙ্গের স্পর্শমাত্র হইতে কৃষ্ণ ততোধিক আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। কৃষ্ণ, রাধা, এবং গোপীগণ পরস্পর দর্শন এবং স্পর্শন মাত্র হইতে উক্তরূপ অপরিমেয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। রাধাকৃষ্ণের পরম লীলা আলিঙ্গন ; তাঁহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া একে অন্যকে অনন্ত আনন্দ দান করিয়া অন্যের নিকট হইতে অনন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। যে আনন্দ অনন্ত তাহার অধিক বা সমান আনন্দ নাই বা থাকিতে পারে না। যে লীলা অনন্ত আনন্দ দেয়, তাহার অধিক আনন্দ দিতে পারে এমন অন্য লীলা নাই বা থাকিতে পারে না। এইজন্য, আলিঙ্গন পরম লীলা। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।৩ সূত্র হইতে আমরা পাইয়াছি যে কৃষ্ণ আনন্দলীলার নিমিত্ত দ্বিতীয় ইচ্ছা করিয়া স্বীয় হ্লাদিনীকে রাধারূপে প্রকাশ করিয়াই স্ত্রীপুরুষে যেমন

আলিঙ্গনবদ্ধ হয়, রাধার সহিত তদ্রূপ আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়াছিলেন। ভাগবতেও দেখা যায় যে, রাসলীলার সময় কৃষ্ণ যত গোপী তত মূর্ত্তি হইয়া প্রত্যেক গোপীর সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং, আলিঙ্গনই রাধাকৃষ্ণের প্রথম লীলা এবং পরম লীলা। পরস্পরকে আলিঙ্গনই রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের সহিত পূর্ণতম রমণ, পূর্ণতম মিলন, এবং অনন্ত আনন্দ সম্ভোগের লীলা।

৬।৩।৩ রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তারসাধনের জন্য প্রাকৃত লীলা

কৃষ্ণ প্রেমের প্রেরণায় আনন্দের অদান-প্রদানের জন্যই এই প্রাকৃত লীলা করিয়াছেন। সমগ্র বিশ্বের সকল ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবদেহে কৃষ্ণ স্বীয় চিদানন্দের অংশকে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। জীবাত্মায় আনন্দের অংশ থাকায় জীবাত্মার আনন্দাংশে হ্লাদিনীও আছে এবং প্রেমও আছে। জীবাত্মার প্রেম রাধাস্বরূপ; সেই প্রেম কৃষ্ণকে আনন্দ দান করিয়া আনন্দিত হইতে চাহে। ত্রিগুণসঙ্গহেতু জীবাত্মার চিদংশ যতদিন অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং দেহাভিমানী থাকে, ততদিন জীবাত্মার আনন্দাংশের প্রেমের বিকাশ হয় না। জীবাত্মার চিতের অজ্ঞানাচ্ছন্নতা এবং দেহাভিমান দূর হইলে জীবাত্মার প্রেমের—রাধাস্বরূপের—বিকাশ হয়। তখন জীবাত্মা রাধার অংশস্বরূপে কৃষ্ণকে সেবা ও আরাধনার দ্বারা আনন্দ দান করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মা যখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সে-ও নিত্যলীলার পরিকর। তখন কৃষ্ণ তাহার সহিতও আলিঙ্গনলীলা করেন। রাধাকৃষ্ণলীলারই বিস্তারসাধনের জন্য কৃষ্ণ এই প্রাকৃত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন।

৬।৩।৪ রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তারসাধনের জন্য অপ্রাকৃত লীলা

কৃষ্ণের মধুর রস কৃষ্ণকে অশেষবিশেষ প্রকারে সম্ভোগ করাইবার জন্য রাধা আপনাকে অসংখ্য গোপীরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং এই নিত্যলীলার জন্য নিত্য গোলকধাম প্রকাশিত হইয়াছে। রাধার এবং গোপীগণের সহিত লীলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কৃষ্ণ আপনা হইতে সখাগণের বিস্তার করিয়াছেন। কৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যেরও অধীশ্বর। তাঁহাকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সহিত মধুর রস সম্ভোগ করাইবার জন্য রাধা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণকে আপনা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ, কেশব, মাধব, নারায়ণ প্রভৃতি বহু ঐশ্বর্য্যময় রূপে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণের সহিত লীলা করিতেছেন। রাধাকৃষ্ণলীলারই বিস্তারসাধনের জন্য কৃষ্ণ গোলক-বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত লীলা করিতেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

"সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

সান্দ্র সচ্চিদানন্দ

৭।১।১ বিগ্রহ নিত্য

বিগ্রহের অর্থ রূপ, আকার, শরীর, কলেবর। পরমেশ্বরের বিগ্রহ আছে বলিলেই বুঝায় যে তাঁহার রূপ বা আকার আছে, অর্থাৎ তিনি সাকার। ১।৩।৯ অনুচ্ছেদে সাকার ও নিরাকার তত্ত্বের আলোচনকালে পূর্ব্বই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর যুগপৎ সাকার ও নিরাকার, এবং এইরূপ বলিবার কারণও বিবৃত করা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি কেবল স্থষ্টিলীলার জন্য স্থষ্টিকাল হইতেই যে বিগ্রহবান হইয়াছেন, তাহা নহে; স্থষ্টির পূর্ব্বেও তিনি বিগ্রহবান ছিলেন। স্থষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার বিগ্রহ ছিল অনন্ত; লীলার জন্য তাঁহার সেই অনন্ত বিগ্রহকে তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ করিয়াছেন।

৭।১।২ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ

সৎ, চিৎ, এবং আনন্দ অনন্ত। এই তিনটী অনন্ত বস্তুর সমবায় পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ পুরুষমূর্ত্তি। স্থষ্টির পূর্ব্বে তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তখন তাঁহার অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিই ছিল। যখন তিনি লীলা করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি সান্দ্র সচ্চিদানন্দ হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত সৎ চিৎ আনন্দকে ঘনীভূত করিয়া মানবমূর্ত্তির যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ হইলেন। ইহাই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণ। "স বৈ নৈব রেমে—" এই যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে এই সান্দ্রীকরণতত্ত্বটী প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের মধ্যে আছে, "স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুংমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ।"—"তিনি সেই পরিমাণ হইলেন, যেমন পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষ।" আমরা পাইলাম যে, স্থষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের পুরুষমূর্ত্তি অনন্ত ছিল; লীলার নিমিত্ত তিনি সৎ চিৎ আনন্দকে ঘনী-

ভূত করিয়া মানবমূর্ত্তির যে পরিমাণ, স্বীয় মূর্ত্তিকে সেই পরিমাণ করিলেন এবং স্বীয় হ্লাদিনীকেও মানবমূর্ত্তির যে পরিমাণ, সেই পরিমাণের মূর্ত্তি দিয়া তাঁহার সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন।

৭।১।৩ সান্দ্রীকরণের প্রয়োজন

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর ছিলেন, তিনি পুরুষমূর্ত্তি ছিলেন, এবং সেই পুরুষমূর্ত্তি অনন্ত ছিল। তিনি আনন্দলীলা করিবার ইচ্ছা করিলেন। অনন্ত পুরুষমূর্ত্তি ধারণার এবং কল্পনারও অতীত; সেই মূর্ত্তিতে লীলা হইতে পারে না। একাকীও লীলা হইতে পারে না। সেইজন্য তিনি বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তখন অদ্বিতীয় অনন্ত পুরুষমূর্ত্তির অতিরিক্ত কিছুই ছিল না, সুতরাং স্থানও ছিল না। ঈশ্বর আপনাকে যে বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন, তাহাদের অবস্থানের জন্য, তাহাদের সহিত লীলা করিবার জন্য, এবং তত্তৎরূপে লীলা করিবার জন্য স্থানের প্রয়োজন। কিন্তু তখন অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিই ছিলেন সমগ্র স্থান। ঈশ্বর যদি স্বীয় সৎ চিৎ আনন্দকে সান্দ্রীকরণের দ্বারা তাঁহার অনন্ত মূর্ত্তিকে মানব পরিমাণ না করিতেন, তাহা হইলে স্থানের উৎপত্তি হইত না। সুতরাং দেখা গেল যে, অনন্ত মূর্ত্তিতে লীলা হয় না, একাকী লীলা হয় না, বহু না হইলে লীলা হয় না, স্থান না থাকিলে লীলা হয় না, অনন্ত মূর্ত্তিকে ক্ষুদ্রাকার না করিলে স্থানের উৎপত্তি হয় না বলিয়া অনন্ত মূর্ত্তির সান্দ্রীকরণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্থান ও আকাশ

৭।২।১ সন্দ্রীকরণের ফলে স্থানের উৎপত্তি

ঈশ্বর অনন্ত সৎ চিৎ আনন্দের সান্দ্রীকরণের দ্বারা অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিকে মানবপরিমাণ করিলে তাঁহার অনন্তপুরুষমূর্ত্তি হইতে স্থানের উৎপত্তি হইল। এইরূপে উৎপন্ন স্থান প্রথমে শূন্য ছিল। এই শূন্য স্থান হইতে আকাশ অথবা

অন্য কোন বস্তুরই উৎপত্তি হয় নাই। শূন্যবাদীগণ বলেন যে শূন্য (Nothingness) হইতে বিশ্বোৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। শূন্যবাদ ভ্রান্ত। সৃষ্টির পরে এই শূন্য স্থানেই আকাশ অবস্থিত হইয়াছে। অনন্ত স্থান ঈশ্বরে ছিল এবং ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিয়া গীতার ৯।১৮ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তিনিই স্থান।

৭।২।২ সৃষ্টির পূর্ব্বের পুরুষমূর্ত্তি ও আকাশ পরস্পরের অনন্তত্বের প্রমাণ

আকাশ ঈশ্বরের সৃষ্টির পূর্ব্বের অনন্ত পুরুষমূর্ত্তির অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে বলিয়া আকাশ অনন্ত। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের পুরুষমূর্ত্তি অনন্ত ছিল বলিয়াই স্থান অনন্ত এবং অনন্ত স্থানব্যাপী আকাশ অনন্ত। আকাশ অনন্ত বলিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের পুরুষমূর্ত্তি অবশ্যই অনন্ত ছিল। সৃষ্টির পূর্ব্বের ঈশ্বরের পুরুষমূর্ত্তি এবং আকাশ পরস্পরের অনন্তত্বের প্রমাণ।

৭।২।৩ আকাশ ঈশ্বরের অনন্তত্বের প্রতীক : মহাকাশ : ভূতাকাশ

সান্দ্রীকরণের ফলে উৎপন্ন স্থান প্রথমে শূন্য ছিল। লীলার জন্য সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ হইয়া ঈশ্বর সেই শূন্য স্থানের মধ্যে সন্ধিনীশক্তির বিস্তারের দ্বারা অপ্রাকৃত পরব্যোম প্রকাশ করিলেন। ইহাকে ঈশ্বরের ত্রিপাদ বিভূতি বলা হয়। ত্রিপাদ বিভূতির প্রকাশের পর শূন্য স্থানের মধ্যেই মায়াশক্তির পরিণামভূত বিস্তারের দ্বারা প্রাকৃত বিশ্বের সৃষ্টি করিলেন। পরব্যোম গোলোক-বৈকুণ্ঠাদিধামের আকাশ ; ইহা সন্ধিনীশক্তির প্রকাশরূপ বলিয়া ইহা চিন্ময় চিদ্বস্তু। এই ব্যোম অর্থাৎ আকাশ প্রকৃতির পর অর্থাৎ অতীত বলিয়া ইহার নাম পরব্যোম ; ইহাকে মহাকাশও বলা হয়। প্রাকৃত বিশ্বের আকাশ মায়াশক্তির পরিণাম বলিয়া ইহা প্রাকৃত জড় বস্তু ; ইহাকে ভূতাকাশ এবং স্বল্পাকাশও বলা হয়। স্থান এবং আকাশ একই বস্তু নহে। স্থান সৃষ্ট বস্তু নহে ; আকাশ সৃষ্ট বস্তু। সৃষ্টির পর হইতে আর শূন্য স্থান নাই। সকল শূন্য স্থান মহাকাশ ও ভূতাকাশের দ্বারা পূর্ণ। সৃষ্টির পরের এই সমগ্র আকাশ সৃষ্টির পূর্ব্বের ঈশ্বরের অনন্ত পুরুষরূপের প্রতীক। এই কারণে বেদান্ত ঈশ্বরকে আকাশ নামেও অভিহিত করিয়াছেন। আকাশ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা। ছান্দোগ্য ৮।১৪।১।—"যিনি সমস্ত নাম ও রূপের

অভিব্যক্তি করিয়াছেন তাঁহার নাম আকাশ।" বৃহদারণ্যকও বলিয়াছেন: খং ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক। ৫।১।১ এবং ছান্দোগ্য ৪।১০।৪।—"খ অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্ম।" বেদান্ত ঈশ্বরকেই আকাশ নাম দিয়াছেন, আকাশকে ঈশ্বর বলেন নাই, তাহা বেদান্ত হইতেই প্রমাণিত হয়। ইহা ব্রহ্মসূত্রেও নিরূপিত হইয়াছে। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ। ব্রহ্মসূত্র ১।১।২২।—"আকাশ ঈশ্বরের লিঙ্গ (=প্রতীক), অর্থাৎ অনন্তত্বের প্রতীক বলিয়া বেদান্ত ঈশ্বরকে আকাশ নামে অভিহিত করিয়াছেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দ

৭।৩।১ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের সৎ চিৎ আনন্দ অনন্ত

সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দ অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিতে ছিল, লীলার ইচ্ছার উদয় হইবামাত্র ঈশ্বর স্বীয় অমোঘ সঙ্কল্পের বলে এবং অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সেই অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দকে ঘনীভূত করিয়া সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ হইলেন। তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের সৎ-চিৎ-আনন্দও অনন্ত। অনন্তকে তিনি কিরূপে ঘনীভূত করিয়া মানবপরিমাণ মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার ঘনীভূত সচ্চিদানন্দের মানবপরিমাণ মূর্ত্তির সৎ-চিৎ-আনন্দ কিরূপে অনন্ত হইতে পারে, ইহা বিস্ময়জনক ব্যাপার হইলেও অসম্ভব নহে। জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, মানবও স্বীয় সীমাবদ্ধ শক্তির প্রভাবে বহুস্থানব্যাপী জড়বস্তুকে ঘনীভূত করিয়া ক্ষুদ্রাকারে রাখিতে পারিয়াছে। এই প্রাকৃত জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, সকল স্থাবরের এবং জঙ্গমের দেহের অব্যবহিত কারণরূপগুলি অতি ক্ষুদ্র আকারের ঘনীভূত বস্তু। একটী অতি ক্ষুদ্র বটবীজ একটী বিশাল বটবৃক্ষের অব্যবহিত কারণ; সেই কারণরূপটী ঘনীভূত বস্তু, এবং সেই ঘনীভূত ক্ষুদ্রাকার কারণরূপটীর নাম বীজ। পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত বটবৃক্ষটী ঘনীভূত অবস্থায় অতিক্ষুদ্র বীজরূপে থাকে। একটী অতি ক্ষুদ্র অণুপরিমাণ শুক্রকীট একটী মনুষ্য, একটী হস্তী, বা অন্য যে কোন প্রাণীর

দেহের অব্যবহিত কারণ ; সেই কারণরূপটী ঘনীভূত বস্তু, এবং সেই ঘনীভূত বস্তুটীরও নাম বীজ। পূর্ণাবয়ব মনুষ্যের, হস্তীর, অথবা অন্য প্রাণীর দেহ সেই ক্ষুদ্র বীজরূপেই থাকে। ইহাও দৃষ্ট হয় যে, মানব যোগসাধনার দ্বারা অণিমা-সিদ্ধি লাভ করিয়া যোগশক্তির দ্বারা স্বীয় জড়দেহকেও অণুপরিমাণ ক্ষুদ্র করিতে পারে ; তখন, যিনি যোগেশ্বর এবং অণিমাসিদ্ধি যাঁহার অনন্ত যোগৈশ্বর্য্যের কণিকামাত্র, সেই পরমেশ্বর যে স্বীয় অচিন্ত্য যোগশক্তির প্রভাবে অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দকে ঘনীভূত করিয়া মানবপরিমাণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, ইহাতে অসম্ভব কিছু নাই। বিশেষতঃ, জড়বস্তু স্থানের ও কালের অধীন ; তবুও জড়বস্তুকে যদি ঘনীভূত করিয়া ক্ষুদ্রাকারে রাখা সম্ভব হয়, তবে স্থান ও কালের অধীন নহে এমন যে চিদ্বস্তু সৎ-চিৎ-আনন্দ, তাহাকেও ঘনীভূত অবস্থায় ক্ষুদ্রাকারে রাখা সম্ভব হইতে পারে। জড়বস্তুর ন্যায় চিদ্বস্তু স্থান ও কালের অধীন নহে বলিয়া জড়বস্তু অপেক্ষা চিদ্বস্তুকে সান্দ্রীকরণের দ্বারা, যত ক্ষুদ্র করিবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন, তত ক্ষুদ্রই করা যাইতে পারে এবং সেই আকারকে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। শ্রুতিও বলেন যে ঈশ্বর "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—শ্বেত। ৩।২০ এবং কঠ ১।২।২০—"ঈশ্বর অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং মহান্ হইতে মহত্তর।" এতদ্দ্বারা শ্রুতি ঘোষণা করিলেন যে অনন্ত ঈশ্বর স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইতে পারেন।

৭।৩।২ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ অব্যয় পরমবীজ

আমরা দেখিলাম যে, সকল বস্তুরই অব্যবহিত কারণটীও ক্ষুদ্রাকারে থাকে এবং সেই ক্ষুদ্রাকার কারণরূপটীকে বীজ বলা হয়। কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত সকল বস্তুরই পরমকারণরূপ। এই পরমকারণ-রূপটী প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত সকল বস্তুরই পরমবীজ। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তিনি সকল সৃষ্ট বস্তুর "বীজমব্যয়ম্" (গীতা ৯।১৮)। বৃক্ষদেহের বা প্রাণীদেহের অব্যবহিত কারণরূপ যে বীজ, তাহার সহিত এই অব্যয় পরমবীজের প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত বীজ প্রাকৃত এবং তাহা দেহে পরিণত হইলে পর তাহার বীজরূপটী আর থাকে না ; কিন্তু অব্যয় পরমবীজ অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু এবং অক্ষর ; অনন্ত বিস্তার সত্ত্বেও তাহার বিকার, বিনাশ, অথবা ক্ষয় হয় না ; তাহার স্বরূপটী নিত্য অবিকৃত এবং অক্ষুণ্ণ থাকে ও আছে। কৃষ্ণের

সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের সৎ-চিৎ-আনন্দ যদি অনন্ত না হইত, তাহা হইলে সেই বিগ্রহ অব্যয় পরমবীজ হইতে পারিত না। কৃষ্ণ হইতে যে সকল প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অনন্ত। এই অনন্ত বিস্তার কেবল-মাত্র অনন্ত বস্তুরই হইতে পারে, এবং এই অনন্ত বিস্তারের পর কেবলমাত্র অনন্ত বস্তুই অব্যয়, অক্ষর অবস্থায় থাকিতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহের সৎ-চিৎ-আনন্দ অনন্ত এবং এই বিগ্রহ অব্যয় পরমবীজ।

৭।৩।৩ ঈশ্বরের একাকী অবস্থানের কালনির্ণয় অসম্ভব

ঈশ্বর লীলার নিমিত্ত সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইবার পূর্ব্বে কত কাল একাকী অনন্ত পুরুষরূপে ছিলেন, তাহা বলা সম্ভব নহে। মায়াশক্তির গতিই কাল। প্রাকৃত সৃষ্টিলীলার আরম্ভ হইতে মায়াশক্তির প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং তখন হইতেই কালের আরম্ভ হইয়াছে। প্রাকৃত সৃষ্টিলীলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কাল ছিল না। এই তত্ত্ব বেদান্তেও ঘোষিত হইয়াছে।

ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস। বৃহদারণ্যক ১।২।৪

—"প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বে সংবৎসর, অর্থাৎ কাল ছিল না।" সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কাল ছিলই না, তখন সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর কত কাল একাকী অনন্ত পুরুষরূপে থাকিয়া সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইলেন, তাহা বলা সম্ভব নহে।

৭।৩।৪ সৃষ্টির পরের অনন্তরূপ

সৃষ্টির পর, চতুষ্পাদ বিভূতির দ্বারা পূর্ণ অনন্ত আকাশ ঈশ্বরের অনন্তরূপ। তাঁহার অনন্ত রূপের মধ্যে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ তিনিও আছেন, তাঁহার ভগবৎ-স্বরূপগণ সহ অপ্রাকৃত পরব্যোমও আছে, এবং স্থাবরজঙ্গম সহ প্রাকৃত বিশ্বও আছে। আবার, এই বাহিরের অনন্তরূপ কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের মধ্যেও বীজরূপে বিদ্যমান আছে, কারণ কৃষ্ণ ইহার অব্যয় পরমবীজ। ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলার পূর্ব্ববর্ত্তী অনন্ত পুরুষরূপ লীলার নিমিত্ত সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ হইয়াছেন এবং সৃষ্টির পরে অনন্ত আকাশ হইয়াছে তাঁহার অনন্তরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের স্বরূপ

৭।৪।১ চিচ্ছক্তিও সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহে ঘনীভূত

সদংশের অনন্ত ক্রিয়াশক্তি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের ঘনীভূত সদংশে ঘনীভূত অবস্থায় বিদ্যমান আছে ; চিদংশের অনন্ত জ্ঞানশক্তি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের ঘনীভূত চিদংশে ঘনীভূত অবস্থায় বিদ্যমান আছে ; এবং আনন্দাংশের অনন্ত ইচ্ছাশক্তি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের ঘনীভূত আনন্দাংশে ঘনীভূত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। শক্তিকে ঘনীভূত অবস্থায় রাখা যে সম্ভব, তাহাও জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বর যে স্বীয় অনন্ত শক্তিত্রয়কে সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহে ঘনীভূত করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব।

৭।৪।২ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ কৃষ্ণ

অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দ পরমেশ্বরের স্বরূপ। অনন্ত ক্রিয়াশক্তি-জ্ঞানশক্তি-ইচ্ছাশক্তি তাঁহার স্বরূপের শক্তি। আমরা পাইয়াছি যে, ঘনীভূত সৎ-চিৎ-আনন্দের এবং অনন্ত ক্রিয়াশক্তি-জ্ঞানশক্তি-ইচ্ছাশক্তির রূপই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। আমরা পাইলাম যে স্বীয় স্বরূপের এবং শক্তির ঘনীভূত রূপই পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের নাম কৃষ্ণ। নাম ও নামী অভিন্ন। সুতরাং, কৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপের এবং শক্তির ঘনীভূত বিগ্রহ। সৃষ্টির পূর্ব্বের অনন্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের এবং লীলার নিমিত্ত সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের মধ্যে স্বরূপগত এবং শক্তিগত কোন প্রভেদ নাই। সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ অনন্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইতে উৎপন্ন নহে ; অনন্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ।

৭।৪।৩ পারমাত্মিক বিগ্রহ

সৎ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের প্রথম কোশ, চিৎ দ্বিতীয় কোশ, চিতের মধ্যে

আনন্দ অধিষ্ঠিত। প্রথম কোশ পুরুষের আকার। প্রথম কোশ সৎকে, এবং আনন্দকে চৈতন্যময় করিয়া, প্রথম কোশের অভ্যন্তরে আছে, দ্বিতীয় কোশ চিৎ। চিৎ সতের আকার অনুসারে পুরুষের আকার। প্রথম ও দ্বিতীয় কোশদ্বয়কে আনন্দময় করিয়া দ্বিতীয় কোশের অভ্যন্তরে আনন্দ অবস্থিত। পুরুষশরীরবিশিষ্ট সৎ চিদ্বস্তু অর্থাৎ আত্মবস্তু বলিয়া প্রথম কোশ কৃষ্ণের "শারীর আত্মা"। চিৎ ও আত্মবস্তু বলিয়া দ্বিতীয় কোশ কৃষ্ণের "বিজ্ঞানাত্মা"। দ্বিতীয় কোশের অভ্যন্তরে অবস্থিত আনন্দও আত্মবস্তু বলিয়া আনন্দ কৃষ্ণের "আনন্দাত্মা"। তিনটীই আত্মবস্তু বলিয়া কৃষ্ণের বিগ্রহের অন্য নাম "আত্মা", এবং কৃষ্ণ পরাতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার বিগ্রহের অন্য নাম "পরমাত্মা"। এইজন্য, কৃষ্ণের বিগ্রহ পারমাত্মিক বিগ্রহ।

৭।৪।৪ পারমাত্মিক বিগ্রহে দেহদেহী ভেদ নাই

কৃষ্ণের পারমাত্মিক বিগ্রহে দেহ-দেহীভেদ নাই। মানবের দেহ ত্রিগুণময় জড়বস্তু; তাহার দেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মাকে দেহী বলা হয়; দেহী চিদ্বস্তু। এইজন্য, মানবের দেহ ও দেহী বিভিন্ন। কৃষ্ণের পারমাত্মিক বিগ্রহে কোন ত্রিগুণময় জড়বস্তু নাই তাঁহার বিগ্রহে মানবদেহের ন্যায় অস্থি-মাংস-মেদ প্রভৃতি জড়বস্তু নাই।

ন সত্যপ্রকৃতামূর্ত্তির্ম্মাংসমেদাস্থিসংভবা।
যোগাচ্চৈব মহেশানি সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহম্॥ রাধাতন্ত্র। ২১।৪

—"কৃষ্ণের দেহ মাংস-মেদ-অস্থি প্রভৃতির দ্বারা গঠিত প্রাকৃত দেহ নহে। সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ যোগশক্তির প্রভাবে নিত্য সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন।" কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহই আত্মা বলিয়া তাহাতে দেহদেহীভেদ নাই।

৭।৪।৫ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের সর্ব্বাংশ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত

কৃষ্ণের পারমাত্মিক বিগ্রহের প্রথম কোশ সৎ মানবদেহের অন্নময় কোশের ন্যায় স্থূল ত্রিগুণময় বস্তু নহে। ত্রিগুণময় স্থূলদেহ জীবাত্মার চিৎ এবং আনন্দকে আবৃত এবং পরিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। কিন্তু চিদ্বস্তু সৎ স্বীয় অভ্যন্তরস্থ চিৎ এবং আনন্দকে আবৃত এবং পরিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে না। কৃষ্ণের বিগ্রহের সৎ, চিতের এবং আনন্দের দ্বারা অনুস্যূত এবং চিৎ আনন্দের দ্বারা অনুস্যূত।

আনন্দ চিতের দ্বারা অনুস্যূত। এইরূপে অনুস্যূত সৎ-চিৎ-আনন্দ পরস্পরের মধ্যে থাকিলেও একটী সম্মিলিত বস্তু। এইজন্য, কৃষ্ণের বিগ্রহের সর্ব্বাংশেই জ্ঞানশক্তিযুক্ত চিৎ এবং হ্লাদিনীশক্তিযুক্ত আনন্দ আছে এবং তাঁহার সকল অঙ্গ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত ; অর্থাৎ যে জ্ঞানশক্তির দ্বারা জীবগণের প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ দর্শনশ্রবণাদি করে, তাহা কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গেই বিদ্যমান থাকায় তিনি হস্তপদাদির দ্বারাও দর্শনশ্রবণাদি করিতে পারেন, এবং যে হ্লাদিনীশক্তির দ্বারা কৃষ্ণ আনন্দ দান করেন তাহা কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যমান থাকায় তাঁহার হস্তপদাদি যে কোন অঙ্গ স্পর্শ করিলেই, মধুর অথবা যে জাতীয় ভাব লইয়া স্পর্শ করা হয়, স্পর্শকারীর মধ্যে তজ্জাতীয় আনন্দই সংক্রামিত হয়। এইজন্য, মধুরভাবে ভজনাকারিণী গোপীগণ কৃষ্ণের হস্তের, চরণের এমনকি কর-চরণের নখের স্পর্শ পাইলেই অপরিসীম মধুর রস প্রাপ্ত হয়েন।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ব্রহ্মসংহিতা ৪১

—"যাঁহার জ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের সকল অঙ্গই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত এবং প্রত্যেক অঙ্গই দর্শন, পালন, রক্ষণ, এবং লীলার অনুরূপ সর্ব্ববিধ ব্যবহার করিতে পারে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

৭।৪।৬ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহে প্রাকৃত বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয় নাই

মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাকৃত, ত্রিগুণময়, জড় বস্তু। কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহে চক্ষুকর্ণাদি এবং হস্তপদাদি সকল অবয়বই আছে, কিন্তু তাঁহার চক্ষুকর্ণাদি এবং কর-চরণাদি প্রাকৃত এবং জড় নহে। তাঁহার অপ্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদির দ্বারা তিনি দর্শনশ্রবণাদি করেন, অপ্রাকৃত করের দ্বারা গ্রহণ এবং অপ্রাকৃত চরণের দ্বারা গমন করেন। তাঁহার চক্ষুকর্ণাদি এবং কর-চরণাদি অপ্রাকৃত এবং মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়াই পূর্ব্বোদ্ধৃত "আপণি-পাদ……" সূত্রে শ্রুতি বলিয়াছেন যে তাঁহার চরণ নাই তবু গমন করেন, হস্ত নাই তবু গ্রহণ করেন, চক্ষু নাই তবু দর্শন করেন, ইত্যাদি। কৃষ্ণের বিগ্রহে চক্ষুকর্ণাদি সকল অবয়বই আছে এবং তদ্দ্বারা তিনি দর্শনশ্রবণাদি করেন ; আবার, তাঁহার বিগ্রহের সর্ব্বাংশ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত হওয়ায় তিনি বিগ্রহের যে কোন অবয়বের দ্বারাও দর্শনশ্রবণাদি করিতে পারেন। কৃষ্ণের বিগ্রহে প্রাকৃত

বুদ্ধি ও মন নাই ; কিন্তু তাঁহার চিদংশে অনন্ত জ্ঞানশক্তি থাকায় অনন্ত বিচারশক্তি এবং অনন্ত মননশক্তি আছে। কৃষ্ণের বিগ্রহে জীবদেহের মত প্রাকৃত প্রাণবায়ু নাই, কিন্তু অনন্ত প্রাণশক্তি আছে। তাঁহার অনন্ত বিচারশক্তি, মননশক্তি, প্রাণশক্তি অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু। এইজন্য শ্রুতি বলেন: অপ্রাণো হ্যমনা : শুভ্র :।—মুণ্ডক ২।১।২—"জীবদেহে যেমন প্রাকৃত প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয় আছে, ঈশ্বরের মধ্যে তাহা নাই ; জীবদেহে যেমন প্রাকৃত বুদ্ধি ও মন আছে, ঈশ্বরের মধ্যে তাহা নাই ; ঈশ্বরের বিগ্রহে ত্রিগুণ না থাকায় তাহা শুভ্র অর্থাৎ নির্ম্মল এবং শুদ্ধ।" সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। শ্বেত ৩।১৭ এবং গীতা ১৩।১৪—"সকল জীবের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশক, ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ; কিন্তু ঈশ্বরের বিগ্রহে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই।"

৭।৪।৭ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ সমস্তই দেখিতে ও শুনিতে পারেন।

কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে জ্ঞানশক্তি অনন্ত বলিয়া গোলোকে থাকিয়াও তিনি সমগ্র বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু দেখিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাহা দেখিতে ও শুনিতে পারেন। মানবের জ্ঞানশক্তি সীমাবদ্ধ এবং অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মানব এককালে একের অধিক বিষয়ে চিন্তা বা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না ; কিন্তু কৃষ্ণের চিৎ এবং জ্ঞানশক্তি অনন্ত বলিয়া তিনি এককালে অসংখ্য বিষয়ে চিন্তা এবং জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এককালে সমগ্র বিশ্বের সকল বস্তুকে দেখিবার এবং সকল শ্রোতব্য বিষয় শুনিবার জন্য তিনি তাঁহার অনন্ত জ্ঞানশক্তির একাংশকে সমগ্র বিশ্বের সর্ব্ব বস্তুতে প্রজ্ঞান বা পরমাত্মা রূপে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার এই প্রজ্ঞানস্বরূপের দ্বারা তিনি সমস্তই দেখিতে ও শুনিতে পারেন। সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ভক্তগণ তাঁহাকে যখনই প্রণাম করেন, যখনই স্তুতি করেন, যখনই তাঁহার নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করেন, যখনই যে কোনরূপ কৃষ্ণারাধনা করেন, গোলোকে থাকিয়াও কৃষ্ণ তখনই তাহা শ্রবণ করেন। সমগ্র বিশ্বের সকল ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন জীব কৃষ্ণের নিকট যখনই যে প্রার্থনা করে, গোলোকে থাকিয়াও কৃষ্ণ তখনই তাহা শ্রবণ করেন। রোগী যেমন কুপথ্য চাহে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন দেহাভিমানী মানবও তদ্রূপ অনেক সময় অমঙ্গলজনক বস্তুর জন্য কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করে ; প্রার্থনাকারীর মঙ্গল কিসে হইবে তাহা সর্ব্বজ্ঞ

কৃষ্ণ জানেন, সেইজন্য, পিতামাতা যেমন রুগ্ন সন্তান কুপথ্য চাহিলেও দেন না, তদ্রূপ কৃষ্ণও অমঙ্গলজনক বস্তুর জন্য প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। প্রার্থনা পূর্ণ না করিলেই যে তিনি প্রার্থনা শুনিতে পান নাই, তাহা নহে।

৭।৪।৮ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ যোগেশ্বর ; একালে সর্ব্বত্র অবস্থান

কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী অনন্ত চিচ্ছক্তি তাঁহার যোগমায়া। তিনি যোগমায়ার অধীশ্বর বলিয়া তিনি যোগেশ্বর। সমগ্র বিশ্বের সকল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানেই যে কেহ ভক্তিযোগে তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে দর্শনদান, তাঁহাদের সহিত আলাপন, এবং তাঁহাদের নিবেদিত অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে যোগেশ্বর কৃষ্ণ যোগমায়া অবলম্বনে আপনাকে এককালে বহু কৃষ্ণমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। ইহা কৃষ্ণের ঐশ্বরিক যোগ—"যোগমৈশ্বরম্"। ভাগবতে পাওয়া যায়, রাসলীলার সময়ে অসংখ্য গোপীকে, এবং দ্বারকায় ষোড়শ সহস্র মহিষীকে আনন্দ দিবার জন্য একই কৃষ্ণ এককালে অসংখ্য কৃষ্ণ হইয়াছিলেন। শ্রুতি এবং স্মৃতি, সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন যে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া স্বীয় ভক্তগণকে দর্শন দান করেন (কঠ ১।২।২৩ মুণ্ডক ৩।২।৩ গীতা ১১।৫৪ প্রভৃতি); শাস্ত্র ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভক্তের দ্বারা নিবেদিত পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করেন (গীতা ৯।২৬)। যদিও তিনি প্রাকৃত বিশ্ব হইতে বহু দূরে গোলোকে থাকেন, তথাপি তিনি এককালে সকল ব্রহ্মাণ্ডের সকল ভক্তগণের নিকট উপস্থিত থাকিয়া দর্শনদান এবং অর্ঘ্যগ্রহণ করেন। এইজন্য শ্রুতি কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহকে অচিন্ত্য রূপ বলিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে অচিন্ত্যরূপ কৃষ্ণ এককালে দূরে এবং নিকটেও থাকেন।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।

দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ মুণ্ডক ৩।১।৭

—"ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ বৃহৎ, অর্থাৎ ঘনীভূত হইলেও অনন্ত। সেই বিগ্রহ দিব্য, অর্থাৎ অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট। সেই বিগ্রহ অচিন্ত্যরূপ অর্থাৎ মানবের চিন্তার অতীত। সেই বিগ্রহ সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর বহু রূপে প্রকাশ পান। যদিও তিনি দূরে থাকেন, তথাপি এই বিশ্বে তাঁহাকে দর্শনকারী সকলের অন্তরেও তিনি অবস্থান করেন।"

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ঈশ। ৫

—"ঈশ্বর চলেন এবং চলেন না, অর্থাৎ তিনি স্বধামে থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন। তিনি দূরে অর্থাৎ গোলকে, এবং নিকটে অর্থাৎ সকল ভক্তের নিকটে। তিনি সকলের অন্তরে, আবার সকলের বাহিরেও আছেন।" এইরূপে, কৃষ্ণ এককালে সর্ব্বত্র অবস্থান করেন। অনেক ভক্ত কৃষ্ণকে প্রণাম অথবা অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে দেখেন, অনেকে দেখিতে পান না; দেখিতে না পাইলেও কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রণাম ও অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত যে কেহ ভক্তিযোগে পরমেশ্বরের ভজনা করেন, কৃষ্ণই তাঁহাদিগকেও তাঁহাদের নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তিতে দর্শন দান করেন।

৭।৪।৯ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ পরব্রহ্ম

কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের সৎ সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে সৎ মূল শুদ্ধ সত্ত্বা, সকল শুদ্ধসত্ত্বাময় অপ্রাকৃত বস্তু কৃষ্ণের সদংশের সন্ধিনী শক্তির প্রকাশরূপ, এবং সকল ত্রিগুণময় প্রাকৃত বস্তু তাঁহার সদংশের মায়া-শক্তির পরিণাম। কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ বেদান্তে উল্লিখিত সত্যের সত্য। বেদান্ত "যতো বা ইমানি জাতানি" সূত্রে এবং ব্রহ্মসূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে সর্ব্বনাম শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যে বিশেষ্যকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ কৃষ্ণ সেই বিশেষ্য এবং বেদান্তের পরব্রহ্ম।

৭।৪।১০ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ পরমাত্মা

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের চিৎ সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে তাঁহার চিৎ মূল চৈতন্য; যাহা কিছু চেতন বস্তু আছে, তাঁহার চিতের অংশ থাকায় তৎসমুদয় চেতন হইয়াছে; চিৎ চৈতন্যময়ী অনন্ত জ্ঞানশক্তির আধার; জ্ঞাতা চিৎ অনন্ত জ্ঞানের আধার এবং চিৎ কৃষ্ণের জ্ঞানস্বরূপ; বিশ্বে ব্যাপ্ত যে পরমাত্মা বেদান্তের "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", তাহা কৃষ্ণের চিতের চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তির অংশ; জীবাত্মাতে চিতের অংশ আছে, সকল ভাগবৎস্বরূপগণেও চিতের

অংশ আছে। কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহই পরমাত্মা এবংবেদান্তের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

৭।৪।১১ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের আনন্দ সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা জানিয়াছি যে, হ্লাদিনীশক্তির প্রেরণাতেই ঈশ্বর লীলা করেন এবং তাঁহার জ্ঞানশক্তিকে ও ক্রিয়াশক্তিকে কার্য্যে নিয়োজিত করেন; এইজন্য আনন্দাত্মা প্রধান আত্মা; শারীর আত্মা সৎ এবং বিজ্ঞানাত্মা চিৎ আনন্দাত্মার প্রেরণায় স্ব স্ব শক্তিকে ক্রিয়াশীল করে। আনন্দাত্মা প্রধান বলিয়া কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ পরমানন্দস্বরূপ। এইজন্য বেদান্ত পরমেশ্বরকে "রসো বৈ সঃ" এবং "কং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য ৪।১০।৪) বলিয়াছেন। ক-শব্দের অর্থ আনন্দ। পরমানন্দস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণকে পাইলে পরম আনন্দ লাভ করা যায়।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা। কঠ ১।২।১২

—"আনন্দস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হইলে মানব আনন্দ লাভ করে।"

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। তৈত্তিরীয়। ২।৯

—"যিনি ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন, তিনি কোন কিছু হইতেই ভীত হয়েন না।" সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, সোঽহম্।

৭।৪।১২ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ "সত্য-শিব-সুন্দর" এবং "অস্তি-ভাতি-প্রিয়"

কৃষ্ণের সৎ সত্যের সত্য। তাঁহার চিৎ শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, কারণ চিতেই জ্ঞান এবং জ্ঞানে অনর্থ নিবারণ ও পরম মঙ্গল। তাঁহার আনন্দ সুন্দর কারণ সকল সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য আনন্দেই আছে। এইজন্য কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ সত্য-শিব-সুন্দর। আবার সৎ-ই সত্য বলিয়া সৎ অস্তি, কারণ "অস্তীতি সত্যম্"। চিৎ প্রকাশক এবং জ্ঞাতা, এইজন্য চিৎ ভাতি। আনন্দ প্রিয়, কারণ আনন্দের সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষক প্রিয়বস্তু। এইজন্য কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ অস্তি-ভাতি-প্রিয়। সত্য-শিব-সুন্দর এবং অস্তি-ভাতি-প্রিয়, এই দুইটীই কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের নামান্তর। যাঁহারা পরমেশ্বরকে সত্য-শিব-সুন্দর রূপে অথবা অস্তি-ভাতি-প্রিয় রূপে উপাসনা করেন, তাঁহারাও সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণেরই উপাসনা করেন।

৭।৪।১৩ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ পুরুষোত্তম

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ পরমেশ্বর এবং স্বয়ং ভগবান। ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মা-তত্ত্ব, এবং ভগবত্তত্ত্ব তাঁহার অন্তর্গত। কৃষ্ণ অনন্ত বলিয়া, আপনাকে এই ত্রিবিধরূপে বিস্তার করিয়া, বিস্তারের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন নাই। এই ত্রিবিধ বিস্তার সমষ্টিভাবে কৃষ্ণের একাংশ এবং ব্যষ্টিভাবে কৃষ্ণের এক একটী অংশ। কৃষ্ণ এই সমস্ত অংশের অংশী। অংশী কৃষ্ণ আপনা হইতে ঐ সকল অংশকে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যেমন অনন্ত সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ ছিলেন, প্রকাশ করিয়াও তদ্রূপ আছেন। এই অংশ সমূহের মধ্যে কোন একটী অথবা সমস্তও যদি না থাকে, তথাপি তিনি তদ্রূপই থাকিবেন। ইহা কৃষ্ণের পরমভাব স্বরূপ।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ গীতা ৮।২০

—কৃষ্ণ বলিতেছেন, "যে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে প্রাকৃত বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইতে পৃথক অন্য যে অপ্রাকৃত পরম ভাব আছে, সমগ্র ভূতবর্গের বিনাশ হইলেও তাহার বিনাশ হয় না।" অনন্ত অংশী, অথচ অংশাতিরিক্ত এবং অংশ-সমূহ হইতে পৃথকস্থিত, নিত্যসত্য, অব্যয়, অক্ষর, পরমভাবস্বরূপে নিত্য বিদ্যমান সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ পরমপুরুষ।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। গীতা ৮।২২

—"তিনি (অর্থাৎ কৃষ্ণ) পরম পুরুষ; অনন্যা ভক্তির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়।" সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের অনন্তত্ব, অংশীত্ব, অংশাতিরিক্তত্ব, অংশসমূহ হইতে নিত্য পৃথকবিদ্যমানত্ব, অব্যয়ত্ব, অক্ষরত্ব, পরমভাবত্ব, এবং পরমপুরুষত্ব তাঁহার পুরুষোত্তমত্ব। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ পুরুষোত্তম।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মিলোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ গীতা ১৫।১৮

—কৃষ্ণ বলিতেছেন, "যাহার প্রলয় ও পুনরাবৃত্তি হয় তাহা ক্ষর; যাহার হয় না তাহা অক্ষর। স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাকৃত বিশ্ব, অর্থাৎ অপরব্রহ্ম, ক্ষর। প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা অক্ষর। পরব্যোম, তত্রত্য অপ্রাকৃত ধামসমূহ এবং ভগবান ও ভগবতীগণ অক্ষর। যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম, সেইহেতু লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত

হইয়াছি।" কৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার পুরুষোত্তমতত্ত্ব "গুহ্যতমং শাস্ত্রম্"—গীতা ১৫।২০, অর্থাৎ, শ্রুতি ও স্মৃতি সকল শাস্ত্রের নিগূঢ়তম তত্ত্ব। কৃষ্ণের পুরুষোত্তমত্বের এই গুহ্যতম তত্ত্বটী বেদান্তও নিগূঢ়ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন জগতের সকল পদার্থে অগ্নি এবং বায়ু আছে, অথচ সকল পদার্থের বাহিরেও অগ্নি এবং বায়ুর পৃথক সত্ত্বাও আছে, তদ্রূপ, সকল অংশের বাহিরে কৃষ্ণের পৃথক পুরুষোত্তমস্বরূপ নিত্য বিদ্যমান আছে। এই দৃষ্টান্ত দিয়া বেদান্ত বলিয়াছেন ঃ

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। কঠ ২।২।৯—১০ —"এই শ্রুতি বাক্যের মর্ম্ম ঃ "অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত যত কিছু রূপ আছে, এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর কৃষ্ণই আপনাকে সেই সকল রূপে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্বভূতের মধ্যে অন্তরাত্মারূপেও বিদ্যমান আছেন। এই সমস্তই কৃষ্ণের অংশ; কৃষ্ণ এই সমস্ত অংশের অংশী। অংশী কৃষ্ণ আপনাকে এই সকল অংশরূপে প্রকাশ করিয়া এবং সকল অংশের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও সকল অংশের বাহিরেও পৃথকভাবে স্বীয় অব্যয় এবং অনন্ত স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান আছেন।" ঈশোপনিষৎ ও এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। ঈশ। ৫

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের যে মর্ম্ম এবং অভিপ্রায়, এই শ্রুতি বাক্যেরও তাহাই। ইহাই বেদান্ত-নিরূপিত পুরুষোত্তমতত্ত্ব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির পরে সমুদয় অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত সৃষ্টি কৃষ্ণের অনন্তরূপ এবং তিনিও তাঁহার অনন্তরূপের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। কৃষ্ণ যে রূপে তাঁহার এই অনন্ত রূপের মধ্যে অথচ তাহা হইতে পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকিয়া নিত্যলীলা করিতেছেন, তাহা তাঁহার এই সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম রূপ। পুরুষোত্তম কৃষ্ণই এক এবং অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর, সর্ব্বভূতরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, সর্ব্বভূতের মধ্যে অন্তরাত্মারূপেও বিদ্যমান আছেন, এবং মানবাত্মা স্বীয় অভ্যন্তরে পুরুষোত্তমকে প্রত্যক্ষ করিলে শাশ্বত আনন্দ পায়, নতুবা নহে, এই তত্ত্বও বেদান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

কঠ ২।২।১২

—"পুরুষোত্তম কৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনিই স্বীয় এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষোত্তমরূপকে বহু প্রকারের রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা আধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা আপনাদের মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারাই শাশ্বত আনন্দ লাভ করিতে পারেন, অন্য কেহই পারে না।" বেদান্তের এই গুহ্যতম পুরুষোত্তমতত্ত্বটী কৃষ্ণ গীতার পূর্ব্বোদ্ধৃত ১৫।৮ শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। কঠোপনিষদের ২।২।১২ শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের তত্ত্বটীও কৃষ্ণ গীতায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ গীতা ১৫।১৯

—"যিনি নিঃসংশয়ভাবে আমাকে পুরুষোত্তম জানিয়া আমার ভজনা করেন, তিনি সমস্ত জানিয়া আমার সকল ভাবের সহিত আমার ভজনা করেন।" তিনি সমস্ত জানেন, কারণ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ মূল তত্ত্ব এবং অন্য যাহা কিছু আছে, তিনি তৎসমুদয়ের মূল উৎস। তাঁহার ভজনা করিলে তাঁহার সকল ভাবেরও ভজনা হয়, যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে শাখাপ্রশাখাপল্লবকেও জল দেওয়া হয়। এইজন্য গীতার উপসংহারে চরম ও পরম উপদেশে কৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। গীতা ১৮।৬৫

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীতা ১৮।৬৬

এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব সকল শাস্ত্রের গুহ্যতম তত্ত্ব; অন্য সকল তত্ত্ব এই পুরুষোত্তমতত্ত্বে অন্তর্নিহিত। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এবং ভগবান, এবং পরাতত্ত্ব, ইহা জানিলেই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং পরিসমাপ্তি; তখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে মতভেদ এবং ব্রহ্মোপাসনায় সাম্প্রদায়িকতা থাকে না। এই পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে ধর্ম্মজগতে মতভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হইয়াছে।

৭।৪।১৪ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য

কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার ভাষা নাই, এবং শক্তিও কাহারও নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের কিছু ধারণা হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইতেছে। কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি স্বীয় অনন্ত সৌন্দর্য্যের এবং মাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠাংশ কৃষ্ণের বিগ্রহের সর্ব্বাংশে সমন্বিত করিয়া-

ছেন। তিনি কৃষ্ণের বপুতে বয়োমাধুর্য্যের সার চির-কৈশোর হইয়া থাকিয়া কৃষ্ণকে করিয়াছেন চিরকিশোর। তিনি কৃষ্ণের বপুতে সুমধুর শ্যামবর্ণ হইয়া থাকিয়া কৃষ্ণকে করিয়াছেন শ্যামসুন্দর। তিনি কৃষ্ণের বপুতে স্নিগ্ধতা হইয়া থাকিয়া কৃষ্ণকে করিয়াছেন পরম স্নিগ্ধ। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গের সকল সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য হইয়া থাকিয়া কৃষ্ণকে করিয়াছেন সকল সৌন্দর্য্যের এবং মাধুর্য্যের সার, "ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈকপদং বপু" (ভাগবত ১০।৩২।১৪)। কৃষ্ণের সন্ধিনীশক্তি হইয়া আছেন, কৃষ্ণের পীতবাস, উত্তরীয়, চন্দনানুলেপন, বৈজয়ন্তীমালা, উপবীত, কিরীট, কুণ্ডল, কেয়ূর, নূপুর, এবং মুরলী। কৃষ্ণের জ্ঞানশক্তি স্বীয় সর্ব্বোদ্ভাসক জ্যোতির সারাংশ দিয়া কৃষ্ণের বক্ষের কৌস্তুভ হইয়া আছেন, এবং জ্ঞানশক্তিই তাঁহার গতিজ্ঞাপক তদীয় চরণতলের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন হইয়া আছেন, যে চরণচিহ্ন দেখিয়া গোপী তাঁহার অন্বেষণ করেন। কৃষ্ণের মায়াশক্তি হইয়া আছেন, কৃষ্ণের হস্তে সুদর্শন নামক কালচক্র। হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণের অধর হইতে মুরলীর মধ্য দিয়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, "ইতররাগবিস্মারণং" (ভাগবত ১০।৩১।১৪) মূর্চ্ছনা হইয়া ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইতেছেন; যিনি সেই মুরলীধ্বনি শুনিতেছেন, তিনিই কৃষ্ণের চরণকমলের দিকে ধাবিত হইতেছেন। যিনি তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, তিনি আনন্দে এবং বিস্ময়ে বাক্‌হীন হইয়া বর্ণনায় অশক্ত হইতেছেন। বিখ্যাত ভক্ত কবি বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকে দর্শন করিবার পূর্ব্বে কল্পনার দ্বারা কৃষ্ণরূপের মনোরম বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণের দর্শন পাইবার পরে তিনি আর কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে পারেন নাই; আত্মহারা বিল্বমঙ্গল সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যকে প্রকাশ করিতে মধুর শব্দটীর বারম্বার ব্যবহার করিয়াছেন।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্॥
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত

রাসলীলার সময় গোপীগণ কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন:

কা স্ত্র্যঙ্গ! তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ভাগবত ১০।২৯।৪০

—"হে প্রিয়তম, ত্রিলোকের মধ্যে এমন কে নারী আছে যে তোমার

মুরলীর মধুর মূর্চ্ছনা শুনিয়া এবং ত্রিলোকের সকল সৌন্দর্যের এবং মাধুর্য্যের সার তোমার এই রূপ দেখিয়া, তোমাকে পাইবার জন্য চিরাচরিত আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট ধাবিত না হয়? বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণও তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়েন। মনুষ্য দেবতাদি দূরে থাক্, গো, পক্ষী, বৃক্ষলতা এবং পশুগণও তোমাকে দেখিয়া আনন্দাতিশায্যে নিজ নিজ অঙ্গে রোমাঞ্চাদি পুলকচিহ্ন ধারণ করিতেছে।" কৃষ্ণের যে সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য দেখিয়া পশুপক্ষী এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণও আনন্দে অঙ্গে পুলকচিহ্ন ধারণ করে, সেই সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য বর্ণনা করিবার সাধ্য কাহার থাকিতে পারে? সনক, সনাতন, শুকদেব প্রভৃতি মহাজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণও কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণভজনা করিয়াছেন। কত মায়াবাদীও কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের বিষয় পড়িয়া বা শুনিয়া কৃষ্ণভজনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইহার প্রমাণ, শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর উক্তি ঃ

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গেপবধূবিটেন॥

—"আমরা আমদিগকেই পরব্রহ্ম ভাবিয়া সেই ভাবনার আনন্দকে সিংহাসন করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট থাকিয়া অদ্বৈতপন্থী মায়াবাদীগণের পূজালাভে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এখন, যিনি গোপীবশীকরণে সুনিপুণ, সেই অতি চতুর কৃষ্ণ স্বীয় সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের দ্বারা বলপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার দাসী করিয়াছেন।" যিনি ব্রহ্মা, শিব, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকলের মনকে মথিত করেন, কৃষ্ণকে দেখিয়া সেই মন্মথেরও মন মথিত হয়; এইজন্য কৃষ্ণকে মন্মথমন্মথ এবং মন্মথমথন বা মদনমোহন বলা হয়। "সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" ভাগবত ১০।৩২।২। যাঁহার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য জগন্মোহন কন্দর্পের মনকেও মথিত করে, তাঁহার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য কে বর্ণনা করিতে পারিবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাধার বিগ্রহ

৭।৫।১ অনন্ত মহাভাব এবং আংশিক সৎ ও চিৎ : সূদ্দীপ্ত ভাব : ভাবালঙ্কার : রাধাভাব

রাধাকৃষ্ণ পরমেশ্বরের যুগলমূর্ত্তি। রাধার বিগ্রহ কিরূপ জানিলে কৃষ্ণকে সম্যক জানা যাইবে। রাধা কৃষ্ণের আনন্দাত্মার ঘনীভূত মূর্ত্তি। অনন্ত আনন্দাত্মায় অনন্ত হ্লাদিনী, অনন্ত প্রেম, এবং অনন্ত শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর ভাব আছে। অনন্ত আনন্দত্মার সান্দ্রীকরণে অনন্ত হ্লাদিনীর এবং অনন্ত পঞ্চবিধ ভাব সহ অনন্ত প্রেমের সান্দ্রীকরণ হইয়াছে। অনন্ত হ্লাদিনী অনন্ত পঞ্চভাববিশিষ্ট অনন্ত প্রেম সহ সন্দ্রীকৃত হইয়া মহাভাব রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্য, রাধাকে আনন্দাত্মার মূর্ত্তি, হ্লাদিনীর মূর্ত্তি, প্রেমের মূর্ত্তি, এবং মহাভাবের মূর্ত্তি বলা হয়। প্রেমময়ী হ্লাদিনী কৃষ্ণের পরাপ্রকৃতি বলিয়া রাধাকে পরাপ্রকৃতিও বলা হয়। রাধার মহাভাবে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর, প্রেমের এই পঞ্চভাবই ঘনীভূত হইয়া আছে। সৎ, চিৎ, আনন্দ, এবং ইহাদের শক্তিত্রয় কখনও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না। ক্রিয়াশক্তিযুক্ত সৎ রাধার বিগ্রহের প্রথম কোশ। এই প্রথম কোশ নারীমূর্ত্তি। ইহার অভ্যন্তরে জ্ঞানশক্তিযুক্ত চিৎ দ্বিতীয় কোশ ; ইহা প্রথম কোশের আকারবিশিষ্ট, অর্থাৎ নারীমূর্ত্তি। দ্বিতীয় কোশের অভ্যন্তরে মহাভাব সহ আনন্দ অধিষ্ঠিত। মহাভাব ঘনীভূত হ্লাদিনী ; আনন্দাংশের হ্লাদিনী আনন্দ হইতে স্বতন্ত্র থাকে না ; এইজন্য, দ্বিতীয় কোশের অভ্যন্তরে আনন্দ সহ মহাভাব আছে। রাধার বিগ্রহের সৎ এবং চিৎ কৃষ্ণের অনন্ত সতের এবং চিতের অংশ, সুতরাং অনন্ত নহে ; কিন্তু আনন্দ এবং মহাভাব অংশ নহে, অনন্ত এবং পূর্ণ। রাধার বিগ্রহের আংশিক এবং অপূর্ণ সৎ ও চিৎ ঘনীভূত ; অনন্ত এবং পূর্ণ আনন্দ এবং হ্লাদিনী তাহা অপেক্ষা অধিক ঘনীভূত ; এইজন্য রাধার বিগ্রহের ঘনীভূত আংশিক ও অপূর্ণ চিৎ ও সতের

মধ্যে অধিকতর ঘনীভূত অনন্ত আনন্দ এবং হ্লাদিনী অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। কৃষ্ণ আনন্দময় নিত্যলীলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য রাধার বিগ্রহে আংশিক ও অপূর্ণ সৎ ও চিৎ এবং অনন্ত ও পূর্ণ আনন্দ ও হ্লাদিনী দিয়া রাধার বিগ্রহকে প্রধানতঃ মহাভাবের বিগ্রহ করিয়াছেন। রাধার অনন্ত মহাভাব কৃষ্ণকে অনন্ত আনন্দ দান করে, কিন্তু রাধার আংশিক চিৎ তাঁহার দত্ত আনন্দের অনন্ততা উপলব্ধি করিতে পারে না; এইজন্য, কৃষ্ণকে অনন্ত আনন্দ দান করিয়াও রাধার জ্ঞান এই যে, তিনি কৃষ্ণকে অনন্ত আনন্দ দান করিতে পারেন নাই। এইরূপ জ্ঞানের জন্য রাধা কৃষ্ণকে নিত্য পুনঃ পুনঃ অনন্ত আনন্দ দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন না; তাঁহার অনন্ত হ্লাদিনীর স্বভাববশে তিনি নিয়তই কৃষ্ণকে অনন্ত আনন্দ দান করিতে থাকেন, তথাপি তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না। তিনি নিয়ত কৃষ্ণকে অশেষবিশেষপ্রকারে আনন্দ দিবার জন্য স্বীয় অনন্ত মহাভাবকে নানারূপে প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত এই সকল মহাভাবের রূপ প্রকাশিত হইবামাত্র কৃষ্ণের অনন্ত সতের ও চিতের অংশ প্রাপ্ত হইয়া গোপীরূপ ধারণ করিয়াছে; এই সকল গোপী রাধার কায়ব্যূহ। রাধা স্বীয় কায়ব্যূহ সহ কৃষ্ণকে নিয়ত অনন্ত আনন্দ দান করিতেছেন, তথাপি তাঁহার পরিতৃপ্তি নাই। বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণের অসংখ্য ভগবানস্বরূপগণকে আনন্দ দিয়া কৃষ্ণকে আনন্দ সম্ভোগ করাইবার জন্য তিনি আপনাকে অসংখ্য লক্ষ্মীরূপে বিস্তার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার পরিতৃপ্তি নাই। প্রাকৃত বিশ্বের জীবদেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মার প্রেমের বিকাশ হইলে তাহাদিগকেও নিত্যলীলায় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণকে অনন্ত আনন্দ দিতেছেন, তথাপি তাঁহার পরিতৃপ্তি নাই। এই পরিতৃপ্তি পাইবার আশায় রাধার কৃষ্ণারাধনার অন্ত নাই এবং তিনি নিত্য কৃষ্ণকে অনন্ত আনন্দ দান করিয়া কৃষ্ণের আনন্দময় নিত্যলীলার উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করিতেছেন। আবার, কৃষ্ণ রাধাকে অনন্ত আনন্দ দান করেন, কিন্তু রাধার আংশিক চিৎ সেই আনন্দের অনন্ততা উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া তিনি কৃষ্ণের নিকট হইতে নিত্যই অনন্ত আনন্দ পাইয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না এবং নিত্য নিয়ত কৃষ্ণের সহিত সংযোগলীলা চাহেন। রাধার অনন্ত হ্লাদিনী অনন্ত আনন্দ দান করিতে চাহে এবং করে, এবং অনন্ত আনন্দ পাইতে চাহে এবং প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দত্ত এবং প্রাপ্ত অনন্ত আনন্দের অনন্ততার অনুপলব্ধিহেতু রাধার মধ্যে গর্ব্ব, ভয়,

মান, নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি মহাভাবের ক্রিয়া হয়। মহাভাবের এই ক্রিয়াসমূহ মহাভাবেরই প্রকাশরূপ। সংযোগ লীলায় কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে রাধার অপূর্ণ চিতে সৌভাগ্যবোধ হয়, এবং ইহার ফলে তখন মহাভাব গর্ব্বরূপে প্রকাশ পায়। রাধা জন্মমৃত্যুহীন হইলেও বিয়োগ-কালে রাধার অপূর্ণ চিতে "আমার মৃত্যু হইবে এবং মৃত্যু হইলে আমি কৃষ্ণকে হারাইব", এইরূপ বোধ হয়; তখন রাধার মহাভাব ভয়রূপে প্রকাশ পায়। বিয়োগকালে রাধা কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করেন; এই ব্যাকুলতাও মহাভাবের প্রকাশরূপ। এরূপ সময়ে কৃষ্ণ দর্শন দিতে বিলম্ব করিলে রাধার মহাভাব ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়; ক্রোধের সময় রাধা কৃষ্ণকে তিরস্কারও করেন; এই তিরস্কারও রাধার মহা-ভাবের ক্রিয়া বলিয়া কৃষ্ণ এইরূপ তিরস্কারে আনন্দ লাভ করেন এবং এইরূপ তিরস্কার পাইতে চাহেন। মহাভাব পরম ভাব; মহাভাবের এই প্রকাশরূপ-সমূহও পরম ভাব; ইহাদিগকে সুদ্দীপ্ত ভাব বলা হয়। রাধার এই সুদ্দীপ্ত ভাবসমূহ কৃষ্ণকে পরমানন্দ দান করে। রাধার বিগ্রহের আংশিক ও অপূর্ণ সৎ তাঁহার অনন্ত মহাভাবের সুদ্দীপ্ত ভাব সমূহকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে না পারিয়া নানা ভঙ্গিতে উদ্বেলিত হয়; এই ভঙ্গিসমূহ সুদ্দীপ্ত ভাবসমূহের অনুরূপ হয়; সুদ্দীপ্ত ভাবপ্রকাশক এই ভঙ্গিসমূহকে রাধাঙ্গের ভাবালঙ্কার বলা হয়। কৃষ্ণ রাধাঙ্গের ভাবালঙ্কার দেখিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। রাধার এই বৈশিষ্ট্যসমূহকে সমগ্রভাবে রাধাভাব বলা হয়। রাধার বিগ্রহের অনন্ত আনন্দ ও মহাভাব ও আংশিক সৎ ও চিৎ রাধাভাবের হেতু। কৃষ্ণের বিগ্রহে সৎ, চিৎ, আনন্দ, তিনটীই অনন্ত এবং পূর্ণ বলিয়া কৃষ্ণের বিগ্রহে রাধাভাব নাই। রাধাভাব রাধারই বৈশিষ্ট; ইহা কৃষ্ণেরও বিস্ময়ের বস্তু; কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাধাভাবে আপনি আপনারই আরাধনা করিয়া রাধাভাবকে জানিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৭।৫।২ রাধার বিগ্রহের সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য

রাধার বিগ্রহের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য বর্ণনার অতীত। যে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য মন্মথ-মথন কৃষ্ণকেও মুগ্ধ করে, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারিবে? সুতরাং, আমরা সে চেষ্টা করিব না, সঙ্কেত মাত্র দিবার প্রয়াস করিব। রাধার বিগ্রহের

সদংশের সন্ধিনীশক্তি তাঁহার অঙ্গের কুঙ্কুমপ্রলেপ, নীল বসন ও উত্তরীয়, গুঞ্জা-মালা প্রভৃতি হইয়া আছেন; সন্ধিনীশক্তিই তাঁহার অঙ্গে বিবিধ বিচিত্র ভাবালঙ্কার প্রকটিত করেন; সন্ধিনীশক্তিই বিবিধ আনন্দলীলার কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করেন। রাধার বিগ্রহের চিদংশের জ্ঞানশক্তি নিয়ত কৃষ্ণের স্মরণ, মনন, ধ্যান করেন; জ্ঞানশক্তিই দত্ত এবং প্রাপ্ত আনন্দের অপূর্ণতার জ্ঞান ও পরিতৃপ্তির অভাববোধ করিয়া নিত্য নিয়ত আনন্দদানের নিমিত্ত নানাবিধ আনন্দলীলার পরিকল্পনা স্থির করেন। জ্ঞানশক্তি নিয়ত কৃষ্ণচিন্তার দ্বারা চিৎকে কৃষ্ণময় করিয়া রাধার কৃষ্ণময়ী চেতনায় কৃষ্ণের সহিত তদেকাত্মতা অর্থাৎ অভেদভাব বা অদ্বৈত ভাব সৃষ্টি করেন। রাধার বিগ্রহের হ্লাদিনীশক্তি বিগ্রহের নিত্যকৈশোর এবং বিগ্রহের সর্ব্বাংশে অতুলনীয় এবং অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য হইয়া রাধাকে মদনমোহন কৃষ্ণেরও মোহিনী করিয়াছেন; হ্লাদিনী শক্তিই গর্ব্ব মান ক্রোধ নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি সুদ্দীপ্ত ভাব রূপে প্রকাশ পায়; হ্লাদিনীশক্তিই কৃষ্ণের সহিত রধার মিলনকালে রাধাঙ্গের শোভার এবং বিরহকালে রাধাঙ্গের বৈকল্যের কারণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যুগলমূর্ত্তি

৭।৬।১ যুগলমূর্ত্তি—প্রাণবান্তর্গত পরালিঙ্গিত কৃষ্ণ

কৃষ্ণেরই পরাপ্রকৃতির মূর্ত্তি রাধা; রাধা কৃষ্ণের পরাপ্রকৃতি। রাধার দ্বারা আলিঙ্গিত কৃষ্ণমূর্ত্তি—স্বীয় পরাপ্রকৃতির দ্বারা আলিঙ্গিত কৃষ্ণমূর্ত্তি—পরালিঙ্গিত কৃষ্ণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরালিঙ্গিত কৃষ্ণ যখন ওঁ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন সেই ওঁ শব্দমাত্র ছিল, ওঁ এই অক্ষর ছিল না, কারণ তখনও বর্ণমালার প্রকাশ হয় নাই। ওঁ উচ্চারণ করিয়াই পরালিঙ্গিত কৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গজ্যোতিকে ওঁ অক্ষরের আকার দিয়া সেই প্রণবাকার অঙ্গজ্যোতির মধ্যে অবস্থিত হইলেন। প্রণবান্তর্গত, পরালিঙ্গিত, দ্বিভুজ, মুরলীধর, শ্যামসুন্দর, চিরকিশোর কৃষ্ণ পর-মেশ্বর এবং পুরুষোত্তম। এই লীলাময় যুগলমূর্ত্তি লীলার জন্য অশেষবিধ প্রকারে অবস্থান করেন।

৭।৬।২ যুগলমূর্ত্তি তুরীয় ঃ ওঙ্কারের চারিপদ ঃ মাত্রাহীন চতুর্থ পদ তুরীয়

যুগলমূর্ত্তি তুরীয়, অর্থাৎ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিনটী মায়াময় অবস্থার অতীত। প্রণবাকার অঙ্গজ্যোতিও তুরীয় এবং যুগলমূর্ত্তির সহিত অভিন্ন। বেদান্ত ওঙ্কারের চারি পদ নিরূপণ করিয়াছেন।

পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। প্রশ্ন। ৫।২

—"ওঙ্কার পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম উভয়েরই প্রতীক।" যে ওঙ্কার অপর-ব্রহ্মের প্রতীক, তাহা তিনটী মাত্রাবিশিষ্ট। প্রথম মাত্রা অ=জাগ্রদবস্থা; দ্বিতীয় মাত্রা উ=স্বপ্নাবস্থা; তৃতীয় মাত্রা ম=সুষুপ্তাবস্থা। এই তিন মাত্রা বিশিষ্ট ওঙ্কার প্রাকৃত বিশ্বের প্রতীক (মাণ্ডূক্য। ৮-১১)। ওঙ্কারের আর একটী মাত্রাহীন চতুর্থ পদ আছে। তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে বেদান্ত বলিয়াছেন ঃ

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্য প্রপঞ্চোপশম শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব।

মাণ্ডূক্য। ১২

—"মাত্রাহীন ওঙ্কার চতুর্থ, অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির অতীত, অর্থাৎ তুরীয়। ইহা ব্যবহারাতীত, অর্থাৎ মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অতীত। ইহা প্রপঞ্চোপশম, অর্থাৎ ইহাকে প্রাপ্ত হইলে বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়। ইহা শিব, অর্থাৎ অবিমিশ্র মঙ্গলময়। ইহা অদ্বৈত, অর্থাৎ ইহা পর-ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। এইরূপ ওঙ্কার আত্মাই বটে।" ইহাই তুরীয় ওঙ্কার। আমরা পূর্ব্বেই বেদান্ত হইতে এই তত্ত্ব পাইয়াছি যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষমূর্ত্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না; সেই পর-মেশ্বর আত্মা; সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যুগলমূর্ত্তি হইয়াছিলেন। সুতরাং, যুগল-মূর্ত্ত কৃষ্ণ আত্মা এবং তাঁহার অঙ্গজ্যোতি আত্মজ্যোতি। মাণ্ডূক্য শ্রুতি বলিলেন যে তুরীয় ওঙ্কার আত্মাই বটে। ইহার অর্থ এই যে, যুগলমূর্ত্তি স্বীয় অঙ্গ-জ্যোতিকে যে ওঙ্কার-রূপ দিয়া তন্মধ্যে বিরাজমান হইয়াছেন, সেই ওঙ্কাররূপী আত্মজ্যোতিই তুরীয় ওঙ্কার। ইহাই শ্রুতি কথিত ওঙ্কারের বিশ্বাতীত, তুরীয়, চতুর্থ মাত্রাহীন পদ। শ্রুতি আত্মজ্যোতিকে তুরীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, আত্মাও তুরীয়, অর্থাৎ যুগলমূর্ত্ত কৃষ্ণও তুরীয়। আমরা বেদান্ত হইতেই পাইয়াছি যে আত্মা কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। তিনি এবং তাঁহার জ্যোতি, অর্থাৎ ওঙ্কাররূপী আত্মজ্যোতি, নিত্য অভিন্নভাবে অবস্থিত, সুতরাং পরমব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। এইজন্য শ্রুতি বলিলেন যে তুরীয় ওঙ্কার পরব্রহ্মের

প্রতীক। কৃষ্ণ এবং রাধা তুরীয় বলিয়া, সৃষ্টজীবের ন্যায় তাঁহাদের জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি নাই। যুগলমূর্ত্তি নিত্যচেতন। কৃষ্ণের আনন্দকে প্রাপ্ত হইয়া জীব জীবন ধারণ করিতে পারে বলিয়া কৃষ্ণ জীবের জন্য সুষুপ্তির বিধান করিয়াছেন। রাধা এবং কৃষ্ণ জন্মমৃত্যুহীন এবং পরস্পর আলিঙ্গিত রাধাকৃষ্ণ উভয়েই অনন্ত কৃষ্ণানন্দ প্রাপ্ত হয়েন ; এইজন্য আনন্দলাভের নিমিত্ত তাঁহাদের সুষুপ্তির প্রয়োজনও নাই। যুগলমূর্ত্তি তুরীয় বলিয়া, কৃষ্ণ এবং রাধা কৃপা করিয়া দর্শন না দিলে কোন জীবই আপন ক্ষমতায় তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পারে না।

৭।৬।৩ যুগলমূর্ত্তি কৃষ্ণ আত্মারাম-রাধারমণ ঃ রাধা কৃষ্ণের আনন্দাত্মার মূর্ত্ত রূপ

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের আনন্দাংশই তাঁহার আনন্দাত্মা। কৃষ্ণ কোন অনাত্মবস্তুতে রমণ করেন না, অর্থাৎ কোন অনাত্মবস্তু হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন না। তিনি স্বীয় আনন্দাত্মাতেই রমণ করেন ; এইজন্য তাঁহার অন্য নাম আত্মারাম। রাধা কৃষ্ণের আনন্দাত্মার মূর্ত্ত রূপ। কৃষ্ণ রাধাতে রমণ করেন বলিয়া তাঁহার অন্য নাম রাধারমণ। সুতরাং, কৃষ্ণের আত্মারাম এবং রাধারমণ নামদ্বয় একার্থক ; কৃষ্ণের রাধারমণত্বই তাঁহার আত্মারামত্ব।

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ।
আত্মারামতয়া চাপ্তৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ ॥ স্কন্দপুরাণ

—"রাধা কৃষ্ণের আত্মা। কৃষ্ণ রাধার সহিত রমণ করেন বলিয়া গূঢ়তত্ত্ববিৎ আপ্তকাম ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে আত্মারাম বলেন।"

অষ্টম অধ্যায়

"অনাদিঃ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরমকারণ কারণহীন

৮।১।১ কৃষ্ণের কারণ নাই

কৃষ্ণ অনাদি বলিতে ইহাই বুঝায় যে, তাঁহার পূর্ব্বে আর কিছু ছিল না, সুতরাং তাঁহার কোন কারণ নাই, এবং কোন কারণ হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয়

নাই। ইহাই ঈশ্বরসূত্রের অনাদি শব্দের অর্থ। কৃষ্ণের কারণ নাই, কারণ হইতে উৎপত্তিও নাই, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা ছিলেন, এইজন্য তিনি অনাদি। কৃষ্ণ সমস্তেরই কারণ, কিন্তু তাঁহার কারণ নাই। বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ের কারণ, এবং সেই কারণগুলিরও পূর্ব্ববর্ত্তী কারণসমূহের অন্বেষণ করিতে করিতে যে মূল কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অনন্ত ক্রিয়াশক্তি-জ্ঞানশক্তি-ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ পরমেশ্বর পুরুষোত্তম কৃষ্ণ। এই পরম কারণে উপস্থিত হইলে কারণঅনুসন্ধিৎসা নিবৃত্ত হয়, যেহেতু কৃষ্ণের কোন কারণ নাই।

স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ শ্বেত ৬।৯

—"পরমেশ্বর সকলের কারণ। জীবদেহের ইন্দ্রিয়সকলের অধিপতি যে জীবাত্মা, তিনি তাহারও অধিপতি, অর্থাৎ জীবাত্মা তাঁহার অংশ এবং তিনি জীবাত্মার নিয়ন্তা। তাঁহার জন্মদাতা বা অধিপতি কেহ নাই।" পরম-কারণেরও যদি কারণ থাকিত, তাহা হইলে কারণ অনুসন্ধিৎসা অনন্তকাল বৃত্তপথে ঘুরিতে থাকিত, কখনও মূল কারণ খুঁজিয়া পাইত না। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন:

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। সাংখ্যসূত্র ১।৬৭

—"যাহা সকলের মূল কারণ, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না।"

পারম্পর্য্যেহপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্। সাংখ্যসূত্র ১।৬৮

—"কারণপরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা এমন একটী পরম কারণে উপস্থিত হই, যেখানে কারণানুসন্ধিৎসার পরিসমাপ্তি হয়; তাহাই পরম কারণ এবং তাহার কোন কারণ নাই। এই কারণহীন পরম-কারণ স্বীকার না করিলে অনবস্থা দোষ (Regressus ad infinitum) ঘটে। এই কারণহীন পরমকারণকে ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর, প্রভৃতি যে কোন সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম দেওয়া হউক্, তাহাতে দোষ নাই।"

যে বস্তুরই কারণ আছে, স্বীয় কারণ হইতে তাহার প্রকাশ অথবা কার্য্যা-বস্থাপ্রাপ্তি অবশ্যই আছে। পরমেশ্বর কৃষ্ণের কারণ নাই বলিয়া তাঁহার উৎপত্তি বা জন্ম নাই।

অসম্ভবস্তু সতঃ, অনুপপত্তেঃ। ব্রহ্মসূত্র। ২।৩।৯

—"সতের অর্থাৎ মূল সত্তার উৎপত্তি থাকা অসম্ভব, কারণ তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ।"

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥ গীতা। ১৩।১২.

—"পরব্রহ্ম অনাদি, সুতরাং তিনি সৎ ও নহেন, অসৎ ও নহেন।" এই শ্লোকের সৎ সচ্চিদানন্দের সৎ নহে। এখানে অসৎ শব্দের অর্থ কারণাবস্থা এবং সৎ শব্দের অর্থ কার্য্যাবস্থা। সৃষ্টবস্তুমাত্রেই নিজ নিজ অব্যবহিত কারণের কার্য্যাবস্থা; তাহাদের সেই অব্যবহিত কারণাবস্থাগুলিকে অসৎ বলা হয়। কৃষ্ণ কোন কারণের কার্য্যাবস্থা নহেন। তিনি পরম কারণ, কিন্তু কারণাবস্থা নহেন। কৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ গীতা ১০।৩

—"যিনি নিঃসংশয়চিত্তে সর্ব্বলোকের পরমেশ্বর আমাকে অজ অর্থাৎ জন্মহীন এবং অনাদি অর্থাৎ কারণহীন পরমকারণ বলিয়া জানেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন।"

অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ। শ্বেত ২।১৫

—"যিনি জন্মহীন, নিত্য বিরাজমান, যাঁহার বিগ্রহে চতুর্ব্বিংশতি ত্রিগুণময় তত্ত্ব না থাকায় যিনি বিশুদ্ধ, সেই পরমেশ্বরকে জানিয়া মানব সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।"

৮।১।৩ কৃষ্ণ নিত্য, অব্যয়, অবিকারী, বিনাশহীন

বিশ্বের সকল বস্তুরই কারণ আছে, কারণ হইতে জন্ম হয়, এবং জন্মিবার পর হইতে বিবিধ বিকারের মধ্য দিয়া গিয়া নির্দ্দিষ্টকাল থাকিয়া স্ব স্ব কারণে লীনতাপ্রাপ্তি হয়। কারণে নীলতাপ্রাপ্তিই তাহাদের মৃত্যু, বিনাশ, বা অন্ত। কৃষ্ণ অনাদি; তাঁহার কারণ নাই; তাঁহার জন্মও নাই; এইজন্য কৃষ্ণের কোন বিকার নাই; তাঁহার স্থিতি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নহে, অনন্তকাল তাঁহার স্বরূপে স্থিতি; তাঁহার অন্ত বা বিনাশ নাই; সুতরাং তিনি অব্যয়, অবিকারী, এবং নিত্য।

নবম অধ্যায়

"আদিঃ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রকাশ ও পরিণাম

৯।১।১ কৃষ্ণ প্রথম সত্ত্বা

আদি শব্দের অর্থ প্রথম। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় কৃষ্ণই ছিলেন, দ্বিতীয় কোন বস্তুই ছিল না। কৃষ্ণই প্রথম, অর্থাৎ প্রথম সত্ত্বা ; এইজন্য, ঈশ্বরসূত্রে কৃষ্ণকে আদি বলা হইয়াছে। ঈশ্বরসূত্র কৃষ্ণকে আদি বলিয়া ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন যে, কৃষ্ণের যে সকল ভগবান এবং ভগবতী স্বরূপ আছেন, কৃষ্ণই তৎসমুদয় হইয়াছেন, এবং গোলোকবৈকুণ্ঠাদি যে সকল অপ্রাকৃত ধাম আছে, কৃষ্ণই তৎসমুদয় হইয়াছেন। কৃষ্ণের ভগবান এবং ভগবতী স্বরূপগণের প্রাকৃত বিশ্বের ন্যায় উৎপত্তি হয় নাই, তাঁহারা কৃষ্ণের পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা নহেন, কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের কারণকার্য্যাবস্থা-সম্বন্ধ নহে, তাঁহারা কৃষ্ণের প্রকাশ। কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ভেদ নাই, তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন। স্বয়ং কৃষ্ণই আপনাকে ঐ সকল ভগবান ও ভগবতী রূপে প্রকাশ করিয়া লীলা করিতেছেন, এই কারণে কৃষ্ণকে তাঁহার ভগবান এবং ভগবতী স্বরূপ-গণের আদি বলা হইয়াছে। সকল শাস্ত্রই কৃষ্ণকে আদি বলিয়াছেন।

আদিঃ সঃ। শ্বেত ৬।৫

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ। ভাগবত ১০।১৪।২৩

৯।১।২ প্রকাশ ও পরিণামে প্রভেদ

কৃষ্ণ লীলার নিমিত্ত আপনাকেই যে সকল অপ্রাকৃতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন তৎসমুদয় কৃষ্ণের প্রকাশ, পরিণাম নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে

যে গোলোকবৈকুণ্ঠস্থ ভগবান্ এবং ভগবতীগণ কৃষ্ণের প্রকাশ, পরিণাম নহে। পরব্যোম এবং তত্রত্য গোলোকবৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ধামসমূহও কৃষ্ণের প্রকাশ, পরিণাম নহে। কৃষ্ণের মায়াশক্তি যেমন ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃত বিশ্বে পরিণত হইয়াছে, কৃষ্ণের সন্ধিনীশক্তি তদ্রূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহে পরিণত হয় নাই। সন্ধিনীশক্তি আপনাকেই গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধামরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণের সন্ধিনীশক্তি অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি ; শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন ; এইজন্য, কৃষ্ণের সন্ধিনীশক্তির প্রকাশরূপ কৃষ্ণেরই প্রকাশ-রূপ। কৃষ্ণের মায়াশক্তিও চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তিও পরিণাম অর্থাৎ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই জড় বস্তুতে পরিণত হয়, কিন্তু চিচ্ছক্তি যদি কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া স্বয়ংই বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়, সেই সকল প্রকাশরূপ জড় বস্তু নহে, তাহারাও চিন্ময় বস্তু বা চিদ্বস্তু। এইজন্য, মায়াশক্তির পরিণাম এই বিশ্ব জড় বস্তু, কিন্তু সন্ধিনীশক্তির প্রকাশরূপ পরব্যোম এবং তত্রত্য গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ জড় বস্তু নহে, চিদ্বস্তু। কার্য্যাবস্থা কারণে লীনতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রকাশরূপ কার্য্যাবস্থা নহে বলিয়া কোন প্রকাশরূপেরই কারণে লীনতাপ্রাপ্তি হয় না। পরমকারণ কৃষ্ণ প্রকাশরূপসমূহেরও কারণ, কিন্তু তাহারা কার্য্যাবস্থা নহে বলিয়া প্রলয়হীন এবং নিত্য। এইজন্য, পরব্যোম এবং তত্রত্য ধামসমূহ নিত্য, তাহাদের প্রলয় নাই। কৃষ্ণ যেমন, যখন যেখানে এবং যে রূপে ইচ্ছা তখন সেখানেই এবং সেই রূপে আপনাকে বিদ্যমান করিতে পারেন, তদ্রূপ, গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহকে যখন যেখানে ইচ্ছা তখন সেখানেই প্রকাশ করিতে পারেন। ইহার দৃষ্টান্ত, তিনি স্বয়ংরূপে যে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা করেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডে গোলোকধামকে বৃন্দাবনধামরূপে প্রকাশ করেন ; আবার, ভক্তের অন্তরেও তিনি গোলোকধামকে প্রকাশিত করিতে পারেন এবং করেন। কৃষ্ণকে অপ্রাকৃত গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহের আদি বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, লীলারম্ভের পূর্ব্বে একমাত্র কৃষ্ণই ছিলেন, সেই পরমকারণ কৃষ্ণই উক্ত ধামসমূহরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন কৃষ্ণের সৃষ্টি নাই, তদ্রূপ, তাঁহার কোন প্রকাশরূপেরও সৃষ্টি নাই। সুতরাং, এরূপ বলা যায় না যে অপ্রাকৃত ধামসমূহের সৃষ্টি আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ধামসমূহের আদি

৯।২।১ অপ্রাকৃত ধামসমূহের অস্তিত্ব সকল শাস্ত্রে স্বীকৃত

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ধামসমূহের আদি। সকল শাস্ত্রই উক্ত ধামসমূহের অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। বেদান্তে বিবৃত হইয়াছে যে অপ্রাকৃত পরব্যোম আছে এবং তথায় ভগবানগণ বিরাজমান আছেন।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ শ্বেত। ৪।৮

—"যে অক্ষর, অর্থাৎ নিত্য এবং শাশ্বত, পরব্যোমে, বেদসকল এবং ভগবানগণ অধিষ্ঠিত আছেন, সেই নিত্যধামকে যে জানে না, সে বেদের দ্বারা কি করিবে? যাহারা সেই নিত্যধামকে জানে তাহারা কৃতার্থ হয়।" পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠকে শস্ত্রে ব্রহ্মলোক নামেও অভিহিত করা হইয়াছে, কারণ এই ধামে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ অবস্থান করেন। কঠশ্রুতি ১।২।১৭, ১।৩।১৬, এবং ২।৩।৫ সূত্রে বলিয়াছেন যে মুক্ত আত্মাগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। প্রশ্নোপনিষৎ ১।১৫ এবং ৫।৫ সূত্রে ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। মুণ্ডক শ্রুতি ১।২।৬ এবং ৩।২।৭ সূত্রে ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৩।৬।১, ৪।৪।২৩ এবং ৬।২।১৫ সূত্রে ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি ৮।৫।৪ সূত্রে বলিয়াছেন যে মুক্ত আত্মা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ৪।১৫।৫ এবং ৫।১০।২ সূত্রদ্বয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মলোক হইতে একজন "অমানব পুরুষ" আসিয়া মুক্ত আত্মাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, মুক্ত আত্মা তথায় অনন্তকাল পরমানন্দে অবস্থান করেন, এবং আর তাঁহার জন্ম হয় না। ৮।৫।৩ সূত্রে ছান্দোগ্য শ্রুতি ব্রহ্মলোকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়াছেন। এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, ব্রহ্মার অধিষ্ঠান যে লোকে, তাঁহার নামানুসারে সেই লোকটীরও নাম ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক পরব্যোমের অন্তর্গত অপ্রাকৃত ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠ নহে; ইহা প্রাকৃত বিশ্বের অন্তর্গত। এক ব্রহ্মার আয়ুঃ-

শেষে মহাপ্রলয় হইলে এই ব্রহ্মলোকেরও অস্তিত্ব থাকে না, এবং নূতন সর্গারম্ভে বিশ্বের পুনরাবর্ত্তনের সহিত এই ব্রহ্মলোকেরও পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। গীতা ৮।১৬

—"হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মভুবন, অর্থাৎ ব্রহ্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত তদীয় ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বের সকল লোকের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় এবং পুনরাবর্ত্তন হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আমার নিত্যধাম হইতে কাহারও পুনর্জন্ম হয় না।" মুক্তাত্মাগণ পরব্যোমের অপ্রাকৃত ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে গমন করেন না। স্বর্গ বা সত্যলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক প্রভৃতিও প্রাকৃত বিশ্বের অন্তর্গত। এই সমস্ত প্রাকৃত লোকেও মুক্তাত্মাগণ গমন করেন না।

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। গীতা ৮।২১

—"যাহা প্রাপ্ত হইলে মুক্তাত্মাকে পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তাহা আমার পরমধাম।" পরব্যোমস্থ গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ এই পরমধাম। পরব্যোম এবং তত্রত্য ধামসমূহের স্থিতি এইরূপ :—প্রাকৃত বিশ্ব মায়াময়। ইহা সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত। ইহার আকাশকে ভূতাকাশ এবং স্বল্পাকাশও বলা হয়। প্রাকৃত বিশ্বের ঊর্দ্ধে কারণাব্ধি। ইহার পরপারে পরব্যোম। এইজন্য ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন যে ব্রহ্মলোক বিশ্ব হইতে তৃতীয় (ছাঃ ৮।৪।৩)। পরব্যোমের আকাশকে মহাকাশ বলা হয়। বৈকুণ্ঠ নামক অনেক ধাম আছে এবং তদূর্দ্ধে গোলোক। এই সকল ধাম একটী বহুদলবিশিষ্ট প্রস্ফুটিত পদ্মের আকার। পদ্মের মধ্যস্থানে যেমন একটী কর্ণিকা (বীজকোশ) থাকে এবং তাহা দলগুলির ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তদ্রূপ সেই পদ্মের মধ্যস্থলেও দলগুলি হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থিত কর্ণিকার আকারের একটী উচ্চ স্থান আছে; ইহাই গোলোক-ধাম। গোলোক মাধুর্য্যময়। ইহা রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার ধাম। পদ্মের অসংখ্য দলগুলির প্রত্যেকটী বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্য্যময়। অসংখ্য বৈকুণ্ঠের প্রত্যেকটীতে এক একজন ভগবান বিরাজ করেন। মুক্ত আত্মাগণ নিজ সাধনানুযায়ী কোন-না-কোন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরের নিত্য পার্ষদরূপে বিরাজ করেন। এই সকল ধামে মায়ার সংস্পর্শও নাই; জন্মমৃত্যু, শোকদুঃখ,

রোগ জরা প্রভৃতি এখানে নাই। প্রাকৃত বিশ্বের ন্যায় পরব্যোমের মহাকাশে প্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্র উদিত হয় না।

ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন। ছান্দোগ্য ৩।১১।২

—"অপ্রাকৃত ধামসমূহে সূর্য্য কখনও অস্তগমন করেনা কখন উদিতও হয় না।" এতদ্দ্বারা বেদান্ত ঘোষণা করিলেন যে, অপ্রাকৃত ধামসমূহ বিশ্বের সূর্য্য-মণ্ডলের গ্রহাদির ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে অবর্ত্তন করেনা, তাহারা স্ব স্ব স্থানে স্থিরভাবে বিদ্যমান আছে; এরূপ আবর্ত্তন না থাকায় সেখানে শীতগ্রীষ্মাদি দুঃখদায়ক ঋতু নাই, সেখানের ঋতু নিত্য সুখদায়ক; সন্ধিনীশক্তি স্বয়ংই পর-ব্যোমের সকল ধামকে যখন যেরূপ প্রয়োজন তখন সেইরূপ অবস্থায় রক্ষা করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ ভগবান এবং ভগবতীগণের আদি

৯।৩।১ আদি ব্যূহ: বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ

স্বয়ং কৃষ্ণই বাসুদেবরূপে সমগ্র পরব্যোমের এবং সকল বৈকুণ্ঠের অধিশ্বর হইয়া বৈকুণ্ঠে বিরাজমান আছেন। গোলোকের লীলায় কৃষ্ণ কেবলই মাধুর্য্য-ময়, কিন্তু বৈকুণ্ঠে বাসুদেব রূপে তাঁহার লীলা পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যময়। বাসুদেব রূপে কৃষ্ণের অনন্ত ষড়ৈশ্বর্য্যের এবং সর্ব্ববিধ অনন্ত শক্তির প্রকাশ। বাসুদেব রূপেই কৃষ্ণ বিশ্বের নিয়ন্তা এবং নিয়ামক। স্বয়ং কৃষ্ণই বাসুদেব বলিয়া বাসুদেব কৃষ্ণের অংশ নহেন। বাসুদেব পূর্ণতত্ত্ব। কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে বাসুদেবরূপে বিরাজমান হইয়া স্বীয় অংশে ত্রিমূর্ত্তি হইলেন। এই ত্রিমূর্ত্তির নাম সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। লীলার প্রয়োজন অনুসারে কৃষ্ণ এই ত্রিমূর্ত্তির প্রত্যেককে এক একটী শক্তির প্রাধান্য দিলেন। সঙ্কর্ষণ ক্রিয়াশক্তি প্রধান, প্রদ্যুম্ন জ্ঞানশক্তি প্রধান, অনিরুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি প্রধান। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চারিমূর্ত্তির ব্যূহকে কৃষ্ণের আদিব্যূহ বলা হয়। কৃষ্ণ বাসুদেব রূপে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর হইয়া রহিলেন বলিয়া গোলোক কৃষ্ণশূন্য হইল না, কারণ, অনন্ত হইতে অনন্ত গ্রহণ করিলেও অনন্তই অবশিষ্ট থাকে।

৯।৩।২ আদিবূ্যহের বিস্তার ঃ আদিচতুর্ব্ব্যূহ

লীলার প্রয়োজনে আদিব্যূহের নায়ক বাস্থদেব, এবং সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নিজ নিজ অংশে ত্রিমূর্ত্তি হইয়া চারিটী ব্যূহ রচনা করিলেন। বাস্থদেব যে নিজ ব্যূহ রচনা করিলেন, তাহাতে তিনি নারায়ণ, কেশব, মাধব নামে ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; বাস্থদেব, নারায়ণ, কেশব, মাধব, এই চারি মূর্ত্তি লইয়া বাস্থদেবব্যূহ রচিত হইল। অনিরুদ্ধ যে নিজ ব্যূহ রচনা করিলেন, তাহাতে তিনি হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, এবং দামোদর নামে ত্রিমূর্ত্তি হইলেন; অনিরুদ্ধ, হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, এবং দামোদর, এই চারি মূর্ত্তি লইয়া অনিরুদ্ধব্যূহ রচিত হইল। প্রদ্যুম্ন যে নিজব্যূহ রচনা করিলেন, তাহাতে তিনি ত্রিবিক্রম, শ্রীধর, এবং বামন নামে ত্রিমূর্ত্তি হইলেন; প্রদ্যুম্ন, ত্রিবিক্রম, শ্রীধর, বামন, এই চারি মূর্ত্তি লইয়া প্রদ্যুম্নব্যূহ রচিত হইল। সঙ্কর্ষণ যে নিজব্যূহ রচনা করিলেন, তাহাতে তিনি মধুস্থদন, বিষ্ণু, গোবিন্দ, নামে ত্রিমূর্ত্তি হইলেন; সঙ্কর্ষণ, মধুস্থদন, বিষ্ণু, গোবিন্দ, এই চারি মূর্ত্তি লইয়া সঙ্কর্ষণব্যূহ রচিত হইল। কৃষ্ণের অন্য নাম গোবিন্দ; সঙ্কর্ষণব্যূহের গোবিন্দ স্বয়ং কৃষ্ণ নহেন; ইনি অন্য গোবিন্দমূর্ত্তি। আদিব্যূহের বিস্তার এই চারিটী ব্যূহকে আদিচতুর্ব্ব্যূহ বলা হয়। আদিব্যূহ এবং আদিচতুর্ব্ব্যূহ, এই পাঁচটী ব্যূহের বিংশতি মূর্ত্তি সকলেই ঐশ্বর্য্যপ্রধান। কৃষ্ণ এই সকল মূর্ত্তিতে ঐশী কার্য্য সম্পাদন করেন।

৯।৩।৩ আদিচতুর্ব্ব্যূহের বিস্তর

আদিচতুর্ব্ব্যূহের প্রত্যেকটীর নায়ক নিজ নিজ অংশে ত্রিমূর্ত্তি হইয়া চতুর্ব্ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। এই সকল ব্যূহের নায়কগণ নিজ নিজ অংশে ত্রিমূর্ত্তি হইয়া চতুর্ব্ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। এইরূপে কৃষ্ণ বহু ব্যূহ এবং বহু মূর্ত্তি হইয়াছেন। এই সকল মূর্ত্তিই বাস্থদেবরূপী কৃষ্ণের অনন্ত সচ্চিদানন্দের অংশ।

৯।৩।৪ চতুর্ব্বিংশতি প্রধান মূর্ত্ত

আদিব্যূহের প্রত্যেক মূর্ত্তির দুইটী করিয়া বিলাসমূর্ত্তি আছে। বাস্থদেবের বিলাসমূর্ত্তি অধোক্ষজ এবং পুরুষোত্তম। স্বয়ং কৃষ্ণই পরমপুরুষ এবং পুরুষোত্তম; কিন্তু এই পুরুষোত্তম নামক মূর্ত্তি স্বয়ং কৃষ্ণ নহেন; ইনি বাস্থদেবরূপী কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি উপেন্দ্র এবং অচ্যুত।

প্রদ্যুম্নের বিলাসমূর্ত্তি নৃসিংহ এবং জনার্দ্দন। অনিরুদ্ধের বিলাসমূর্ত্তি হরি এবং কৃষ্ণ। স্বয়ং কৃষ্ণেরও নাম হরি, কিন্তু এই হরি অন্য মূর্ত্তি এবং এই কৃষ্ণও স্বয়ং কৃষ্ণ নহেন, ইনি অন্য মূর্ত্তি। আদিচতুর্ব্যূহের ষোড়শ মূর্ত্তি এবং এই অষ্ট বিলাসমূর্ত্তি, এই চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তিই আদিব্যূহের মধ্যে প্রধান।

৯।৩।৫ বৈকুণ্ঠস্থ ভগবতীগণ

উক্ত সকল ভগবানগণ পরব্যোমে নিজ নিজ বৈকুণ্ঠে বিরাজমান আছেন। রাধা বহু লক্ষ্মীমূর্ত্তি হইয়া উক্ত ভগবানগণের প্রত্যেকের লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা আছেন। এই লক্ষ্মীগণ সকলেই ভগবতী।

৯।৩।৬ যোগমায়া এবং মহামায়া

যোগেশ্বর কৃষ্ণের সমগ্র চিচ্ছক্তি তাঁহার যোগমায়া। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলায় তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার জন্য তিনি তাঁহার যোগমায়াকে মূর্ত্ত করেন। চিচ্ছক্তির মূর্ত্ত রূপের নামও যোগমায়া। মহামায়া মায়াশক্তি-প্রধান; তিনি কৃষ্ণের প্রাকৃত মায়াময় লীলায় কৃষ্ণের ইচ্ছায় কার্য্য করেন। মায়াশক্তিও চিচ্ছক্তি; এইজন্য মহামায়া শাস্ত্রে যোগমায়া নামেও অভিহিত হইয়াছেন।

৯।৩।৭ ভগবৎস্বরূপগণের অস্তিত্বসম্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণ

এই সমস্ত ভগবানগণ এবং ভগবতীগণ কৃষ্ণের অংশ, তাঁহারই লীলা-বিলাসের মূর্ত্তি, এবং তাঁহার সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণ এই সকল রূপে স্বীয় ঐশী কার্য্য সম্পাদন করেন বলিয়া ইঁহাদিগকেও ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বলা হয়। কেবল যে স্মৃতিশাস্ত্রেই এই ভগবৎস্বরূপগণের নামোল্লেখ আছে তাহা নহে, বেদে এবং বেদান্তেও আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে আমরা পাইয়াছি যে পরব্যোমস্থ ঐশী ধামসমূহের অস্তিত্ব বেদান্তে ঘোষিত হইয়াছে। মুক্ত আত্মা-গণকে ঐ সকল ধামে লইয়া যাইবার জন্য অমানব পুরুষ ঐ সকল ধামে আছেন, এবং ঈশ্বরের অবস্থানের জন্য অপ্রাকৃত পুরীও তথায় আছে, ইহাও বেদান্ত বলিয়াছেন (ছান্দোগ্য ৮।৫।৩)। ঐ সকল ঐশী ধাম ও ঐশী পুরী শূন্য পড়িয়া আছে এবং তথায় ঈশ্বর নাই, ইহা হইতে পারে না। শ্বেতাশ্বতর

শ্রুতি হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত ৪।৮ সূত্রে আমরা পাইয়াছি যে ঐ সকল ধামে ভগবানগণ অধিষ্ঠিত আছেন। গোপালতাপনী শ্রুতিতে কৃষ্ণের আদিব্যূহের ভগবৎস্বরূপগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ওঁ কৃষ্ণায় প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধায় ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুর্বঃ স্ব স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

ওঁ কৃষ্ণায় রামায় ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুর্বঃ স্ব স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

গোপালতাপনী। উঃ। বিঃ

৯।৩।৮ কৃষ্ণের স্বাংশ স্বরূপ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাসুদেব কৃষ্ণের অংশ নহেন। বৈকুণ্ঠস্থ অন্য সকল ভগবানগণ এবং ভগবতীগণ কৃষ্ণের লীলাময় প্রকাশরূপ, কিন্তু এই সকল রূপে কৃষ্ণ আপনাকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করেন নাই, আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য ইঁহাদিগকে কৃষ্ণের স্বাংশ স্বরূপ বলা হয়। ইঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; লীলার প্রয়োজন অনুসারে কাহারও মধ্যে কোন শক্তির প্রাধান্য আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ত্রিধামের পারস্পরিক সম্বন্ধ

৯।৪।১ গোলোক অন্তঃপুর

কৃষ্ণ আনন্দের জন্য লীলা করিতেছেন এবং লীলার জন্য অপ্রাকৃত গোলোক ধাম এবং বৈকুণ্ঠধাম প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রাকৃত বিশ্বধাম উৎপন্ন করিয়াছেন। গোলোক কৃষ্ণের অন্তঃপুর। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম, অন্য দুইটী ধামের প্রাণ, এবং ইহারই সত্ত্বায় অন্য দুইটী ধাম সত্ত্বাবান। কৃষ্ণের গোলোকধাম মাধুর্য্যময়। তাঁহার এই ধামের লীলাও মাধুর্য্যময়। এখানে তিনি আপনাকেই পিতা, মাতা, কান্তা, সখা, দাসদাসীরূপে বিস্তার করিয়া লীলা করিতেছেন। রাজা স্বীয় অন্তঃপুরে রাজার মত থাকেন না, এবং রাজশক্তিরও প্রকাশ করেন না। অন্তঃপুরে রাজা পিতামাতার নিকট কেবলই পুত্র, সখাগণের নিকট কেবলই

সখা, এবং কান্তাগণের নিকট কেবলই কান্ত। তদ্রূপ, কৃষ্ণ গোলোকে সর্ব্বেশ্বররূপে ঐশ্বর্য্যের এবং শক্তির প্রকাশ করেন না। এখানে তিনি পিতামাতার নিকট কেবলই পুত্র, সখাগণের নিকট কেবলই সখা, এবং কান্তাগণের নিকট কেবলই কান্ত। রাজার অন্তঃপুরের দাসদাসীগণ রাজার যে সেবা করে তাহা রাজদরবারের ভৃত্যগণের সেবার মত নহে, তাহা অন্তঃপুরের যোগ্য সেবা। তদ্রূপ, অন্তঃপুর গোলোকের দাসদাসীগণ কৃষ্ণের যে সেবা করেন, তাহা অন্তঃপুরের সেবা, সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় পরমেশ্বরের সেবা নহে। রাজার অন্তঃপুরের পরিজনগণ রাজাকে রাজা বলিয়া জানে, কিন্তু রাজা বলিয়া সেবা করে না, স্ব স্ব সম্বন্ধ অনুযায়ী সেবা করে। তদ্রূপ, গোলোকের নিত্যলীলার পরিকরগণ কৃষ্ণকে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর বলিয়া জানেন, কিন্তু পরমেশ্বর বলিয়া সেবা করেন না, কেবল স্ব স্ব সম্বন্ধ অনুযায়ী সেবা করেন। গোলোকের লীলায় কৃষ্ণের সর্ব্বাধিক আনন্দ। গোলোকে কৃষ্ণ নিত্য পরমানন্দস্বরূপ। জগতের যে সকল নরনারী দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মধুরভাবে কৃষ্ণের ভজনা করিয়া কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের দেহত্যাগের পর কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বীয় অন্তঃপুর-গোলকের মাধুর্য্যময় নিত্যলীলায় নিত্য পরিকররূপে গ্রহণ করেন। ইহাই জীবের পরম প্রাপ্তি; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি আর কিছুই নাই। এই তত্ত্ব বেদান্তেও ঘোষিত হইয়াছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥ তৈত্তিরীয় ২।১।৩

—"পরব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত আনন্দ স্বরূপ। পরব্যোমের গুহায়, অর্থাৎ পরব্যোমের নিভৃততম ধাম গোলোকে যিনি তাঁহাকে জ্ঞাত হয়েন অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সকল কামনা পরব্রহ্মের দ্বারা পূর্ণীকৃত হয়।"

৯।৪।২ বৈকুণ্ঠ ঐশী কার্য্যালয়

বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণের ঐশী কার্য্যালয়। তথায় কৃষ্ণ সৃষ্টিপরিচালনার নিমিত্ত বাসুদেব রূপে বিরাজ করিতেছেন। বাসুদেব রূপে তাঁহার ঐশীশক্তির এবং ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ হয়। বৈকুণ্ঠের ভগবানগণ কৃষ্ণের ঐশী প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টিপরিচালনার কার্য্য করিতেছেন। এখানে যে সকল ভৃত্য আছেন, তাঁহাদের সেবা অন্তঃপুর গোলোকের ভৃত্যদের সেবার ন্যায় নহে। তাঁহাদের

সেবা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তার সেবা। রাজা ও রাণী যখন রাজদরবারে অবস্থান করেন, তখন তাঁহারা অন্তঃপুরের ন্যায় কেবলই কান্তকান্তারূপে অবস্থান করেন না, রাজারাণীরূপেও অবস্থান করেন এবং তখন তাঁহারা নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য ও মহিমার দ্বারা পরস্পরকে আনন্দ দান করেন। প্রত্যেক বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর এবং তাঁহার লক্ষ্মী তদ্রূপ কেবলই কান্তকান্তারূপে অবস্থান করেন না ; তথায় তাঁহারা নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য এবং মহিমার দ্বারা পরস্পরকে আনন্দ দান করেন। যে সকল নরনারী শান্তভাবে অথবা ঐশ্বর্য্যমিশ্র দাস্যভাবে কৃষ্ণের ভজনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, দেহত্যাগের পর তাঁহারা বৈকুণ্ঠ-সমূহের কোন একটীতে সেই বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরের নিজ নিজ ভাবানুযায়ী নিত্য পার্ষদরূপে অনন্তকাল বিরাজ করেন।

৯।৪।৩ প্রাকৃত বিশ্ব রাজ্য

বৈকুণ্ঠে বাসুদেবরূপে এবং ভগবান ও ভগবতীরূপে বিরাজমান থাকিয়া কৃষ্ণ যে স্বীয় রাজ্য পালন করিতেছেন, এই প্রাকৃত বিশ্ব তাঁহার সেই রাজ্য। এই বিশ্বের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকারের স্থাবর ও জঙ্গম আছে, তাহা সংখ্যাতীত। এই সমস্তই কৃষ্ণের প্রজা, অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে প্রকৃষ্টরূপে জাত। শ্রুতি বলেন :

সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। তৈত্তিরীয় ২।৬

—"পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, প্রজারূপে উৎপন্ন হইব।" কৃষ্ণই প্রজারূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, আবার কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন বিশ্ববাসী সকল জীবই কৃষ্ণেরই প্রজা। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন :

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমা প্রজাঃ॥ গীতা ৩।২৪

—"যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে এই লোকসকল অর্থাৎ অসংখ্য ব্রাহ্মাণ্ডগণ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, ধর্ম্মলোপহেতু বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির কারণ আমিই হইব, এবং আমিই এই প্রজাগণের বিনাশ সাধন করিব।" আমরা পাইলাম যে, বিশ্ববাসী সকল জীবই কৃষ্ণের প্রজা, এবং কৃষ্ণ নিয়ত কর্ম্ম করিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য প্রজাগণকে পালন এবং রক্ষা করিতেছেন। বৈকুণ্ঠে বাসুদেব এবং ভগবান ও ভগবতীগণরূপে বিরাজমান থাকিয়া কৃষ্ণ অশেষবিশেষপ্রকারে

প্রজাপালন ও প্রজারক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণ সুযোগ্য প্রজাগণকে বিশ্বাতীত করিয়া বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে নিত্য পরিকর রূপে গ্রহণ করিতেছেন।

৯।৪।৪ কৃষ্ণ সকল দেবগণের আদি

প্রজাপতিগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, এবং ইন্দ্র-বরুণাদি সকলকেই সাধারণভাবে দেবতা বলা হয়। ইঁহারা বৈকুণ্ঠের অধিবাসী নহেন; ইঁহাদের নিবাসস্থান এই প্রাকৃত বিশ্বের মধ্যেই। বিশ্বের পালন এবং রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ কার্য্য করাইবার জন্য কৃষ্ণ ইঁহাদিগকে আপন শক্তির অংশ দিয়া ইঁহাদিগকে দেবতা করিয়াছেন। শ্রুতি কৃষ্ণকে "দেবানাঞ্চ পরমং দৈবতম্" বলিয়াছেন। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ। গীতা ১০।২

—"আমি সকল দেবতাগণের এবং সকল মহর্ষিগণের আদি" আমরা পাইলাম যে, কৃষ্ণ ঈশ্বর নামে খ্যাত সকল ভগবানের, ঈশ্বরী নামে খ্যাত সকল ভগবতী-গণের, সকল দেবতাগণের, এবং সকল মহর্ষিগণের আদি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ সকল অবতারগণের আদি

৯।৫।১ কৃষ্ণ অবতারী

কৃষ্ণ স্বয়ং অথবা তাঁহার বৈকুণ্ঠস্থ ভগবৎস্বরূপগণের মধ্যে কেহ যখন প্রাকৃত বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাকে অথবা তাঁহার সেই ভাগবৎস্বরূপকে অবতার বলা হয়। কোন বিশেষ কর্ম্ম সম্পাদন করাইবার জন্য জগতের কোন সুযোগ্য মহাপুরুষে কৃষ্ণ সেই কর্ম্মসাধনের উপযোগী স্বীয় শক্তির আবেশ করেন; কৃষ্ণের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট সেই মহাপুরুষও অবতার; এইরূপ অবতারকে কৃষ্ণের আবেশাবতার বলা হয়। আবেশাবতারে কৃষ্ণের শক্তি অবতীর্ণ হয়েন। প্রয়োজনানুসারে কখনও কখনও কৃষ্ণ স্বয়ংই কোন মহাপুরুষে পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়েন। সৃষ্টির পর হইতে অসংখ্য অবতার আসিয়াছেন।

অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাহবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ভাগবত ১।৩।২৬

—"হে দ্বিজগণ, যেমন ক্ষয়হীন সরোবর হইতে সহস্র সহস্র নির্ঝর প্রবাহিত হয়, সেইরূপ স্বত্ত্বনিধি অর্থাৎ অনন্তসত্ত্বা কৃষ্ণের অসংখ্য অবতার হয়।" কৃষ্ণের স্বয়ংরূপ অবতার ব্যতীত অন্য সকল অবতার কৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ভাগবত ১।৩।২৮

—"কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। অন্য সকল অবতারগণ কৃষ্ণের অংশ এবং কলা। তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়া দানবপীড়িত জগতকে রক্ষা করিয়া আনন্দ দান করেন।" বৈকুণ্ঠস্থ ভগবানগণ কৃষ্ণের অংশ; তাঁহাদের অবতারত্বগ্রহণে কৃষ্ণেরই অবতারত্ব গ্রহণ করা হয়। এইজন্য কৃষ্ণ অবতারী, ইহার অর্থ এই যে, কৃষ্ণই যুগে যুগে সকল অবতাররূপে আপনাকে সকল ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ করেন। এইজন্য কৃষ্ণ সকল অবতারগণের আদি।

৯।৫।২ ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত কৃষ্ণের অবতার

কৃষ্ণ জগতে ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য অবতীর্ণ হয়েন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ গীতা ৪।৭-৮

—"হে অর্জ্জুন, যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি আমাকে সৃষ্টি করি, অর্থাৎ, আমাকে জগতে অবতাররূপে প্রকাশ করি। সাধুগণের রক্ষা, দুষ্টগণের বিনাশ, এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" কৃষ্ণ যখন আপনাকে জগতে প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার সেই প্রকাশকে আবির্ভাব, অবতীর্ণহওয়া, অবতারত্ব গ্রহণ প্রভৃতি বলা হয় এবং তাঁহার সেই প্রকাশরূপকে তাঁহার অবতার বলা হয়। তাঁহার এই প্রকাশরূপ তাঁহার পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা নহে। তাঁহার এইরূপ প্রকাশও দিব্য প্রকাশ। কৃষ্ণের সকল প্রকাশরূপই নিত্য বস্তু। যে সকল অবতাররূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহারাও কৃষ্ণের প্রকাশরূপ বলিয়া তাঁহারাও নিত্য। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া অবতারগণ ব্রহ্মাণ্ডে করণীয় কার্য্য সমাধান করিয়া স্ব স্ব অবতাররূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। সকল অবতারগণই বৈকুণ্ঠে বিরাজ-

মান আছেন ও থাকেন। আমরা পাইলাম যে, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন। ইঁহাদিগকে কৃষ্ণের যুগাবতার বলা হয়। "যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হই", ইহা বলিয়া কৃষ্ণ জানাইলেন যে, তিনি যে কেবল চারিযুগের প্রতি যুগে মাত্র একবার অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম স্থাপন করেন, তাহাই নহে ; প্রতি যুগেই যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া যে ধর্ম্ম তিনি স্থাপন করেন, কালক্রমে তাহা ম্লান হইলে সেই স্থাপিত ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তও তিনি সেই যুগেই আবশ্যকমত পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হয়েন। এই অবতারগণ যুগাবতার নহেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম

৯।৬।১ আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণই ধর্ম্ম : সুষুপ্তিতে মিলনানন্দ

যাহা জীবগণের জীবনকে ধারণ করিয়া রাখে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা জীবগণ জীবন ধারণ করে, তাহাই জীবের ধর্ম্ম। আনন্দের দ্বারা জীবগণ জীবন ধারণ করে। আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণই আনন্দ। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্য এবং অন্য সকল প্রাণীও সেই আনন্দ প্রাপ্ত না হইলে বাঁচিতে পারে না। জগতে যাহা কিছু হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও কৃষ্ণের হ্লাদিনী হইতেই প্রাপ্ত,কিন্তু ক্ষুদ্র বস্তু হইতে প্রাপ্ত সেই ক্ষুদ্র এবং ক্ষণিক আনন্দের দ্বারা জীব বাঁচিতে পারে না। এখন এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে :—অধিকাংশ মনুষ্য এবং পশুগণ কৃষ্ণের ভজনা করে না এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, তথাপি সকলে কিরূপে জীবিত আছে? উত্তর :—মনুষ্যাদি সকল প্রাণীর দেহেই যে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত আছে তাহা কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণেরও যেমন আনন্দাংশই প্রধান, তদ্রূপ জীবাত্মারও আনন্দাংশই প্রধান ; আনন্দাংশের স্বভাবই প্রাণীমত্রেরই অধ্যাত্ম অর্থাৎ স্বভাব। কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দ দান করিয়া আনন্দ লাভ করা জীবাত্মার আনন্দাংশের স্বভাব। এই স্বভাবহেতু জীবাত্মা উক্তরূপে আনন্দ প্রাপ্ত না হইলে দেহে থাকিতে পারে না। জীবাত্মার দেহত্যাগই

মৃত্যু ; সুতরাং জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার আনন্দ না পাইলে কোন প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে পারে না। সকল প্রাণীগণই যোগসাধনার দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আনন্দ লাভ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহার আনন্দ না পাইলে প্রাণীগণ বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না এবং তাঁহার সৃষ্টিও রক্ষা পাইবে না ; কৃষ্ণও আনন্দ দান করিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্য সৃষ্টিলীলা করিয়াছেন ; তাঁহার চিদানন্দের অংশ জীবাত্মাকে আনন্দ দান করা তাঁহারও হ্লাদিনীর স্বভাব এবং সৃষ্টিলীলার উদ্দেশ্য। যাহাতে সকল প্রাণীর জীবাত্মাসমূহ প্রতিদিন তাঁহার সহিত মিলিত হইতে এবং তিনিও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দের পারস্পরিক আদানপ্রদান করিতে পারেন, সেইজন্য কৃষ্ণ প্রাণীমাত্রকেই সুষুপ্তাবস্থা দিয়াছেন। সুষুপ্তাবস্থাটী দেহের, জীবাত্মার নহে। জীবাত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত। কৃষ্ণের সহিত মিলিত জীবাত্মার পরমানন্দলাভের অবস্থায় জীবের দেহের সুষুপ্তাবস্থা বা সুষুপ্তি হয়, কিন্তু জীবাত্মা সুষুপ্ত অর্থাৎ নিদ্রিত হয় না। সুষুপ্তিতে মনুষ্যাদি সকল প্রাণীর জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রাণীগণ জীবন ধারণ করিতে পারে। মনুষ্য বা অন্য প্রাণীর জীবত্মা যদি দু'এক দিন সুষুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-পুত্র-সখা প্রভৃতির সঙ্গ, বিষয়ভোগ, অধ্যয়ন, জ্ঞানানুশীলন প্রভৃতি কোন বস্তু হইতে সে আনন্দ প্রাপ্ত হয় না ; সে তখন সুষুপ্তি পাইবার জন্যই অস্থির হইয়া পড়ে। এই যে তত্ত্ব বিবৃত হইল, এক্ষণে শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইহা প্রমাণ করা হইতেছে।

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। তৈত্তিরীয় ৩।৬

—"জাত হইয়া প্রাণীগণ আনন্দের দ্বারা জীবন ধারণ করে।" এই আনন্দ যে বিষয়ভোগের আনন্দ নহে, কৃষ্ণই সেই আনন্দ, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন।

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি। তৈত্তিরীয় ২।৭

—"ঈশ্বর আনন্দ। জীব সেই আনন্দকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। যদি ঈশ্বর আনন্দ না হইতেন, তবে কে-ই বা জীবিত থাকিত? ঈশ্বরই আনন্দিত করেন।"

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। ছান্দোগ্য ৭।২৩।১

—"যিনি ভূমা তিনিই অর্থাৎ কৃষ্ণই আনন্দ। ক্ষুদ্র বস্তুতে আনন্দ নাই। ভূমা কৃষ্ণই আনন্দ।"

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা। কঠ ১।২।১৩

—"আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণকে লাভ করিলেই মানব আনন্দ লাভ করে।" আমরা পাইলাম যে, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণই আনন্দ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবগণ আনন্দ লাভ করে, এবং সেই আনন্দের দ্বারা জীবগণ জীবন ধারণ করে। সুষুপ্তিতে জীবগণের জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝিবার জন্য সুষুপ্তির ব্যবস্থাটী কিরূপ তাহা প্রথমে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। মনুষ্য এবং অন্য সকল প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে যে হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড আছে, জীবাত্মা সেই হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত। শ্রুতি হৃদয়কে জীবাত্মার বাসের গুহা বলিয়াছেন।

হৃদি হ্যেষ আত্মা। প্রশ্ন ৩।৬

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোহন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়। মুণ্ডক ২।২।২৭

আত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্য জন্তোঃ। শ্বেত ৩।২০

—"হৃদয়ের মধ্যে এই জীবাত্মা অবস্থান করে।" জীবাত্মা মননশক্তিযুক্ত, প্রাণ এবং শরীরের নেতা, এবং অন্নময় কোশের অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।" "সকল জীবের হৃদয়গুহায় জীবাত্মা অবস্থিত।" যে হৃদয়রূপ গুহার অভ্যন্তরে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত, সেই হৃদয়ের মধ্যেই অন্তরাকাশ নামক একটী ক্ষুদ্র আকাশ আছে। সকল জীবের অন্তরাকাশে কৃষ্ণ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বামনরূপে অবস্থান করেন।

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোহস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। ছান্দোগ্য ৮।১১

—"ব্রহ্মপুরে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন প্রাণীদেহের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্ম নামক গৃহ আছে। সেই হৃদয়ের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ আছে। সেই অন্তরাকাশে যিনি বিরাজমান আছেন তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে এবং বিশেষরূপে জানিতে হইবে।" এখানে ছান্দোগ্য শ্রুতি অন্তরাকাশে বিরাজমান যাঁহাকে জ্ঞাত হইবার নির্দ্দেশ দিলেন, তিনি বামনরূপী কৃষ্ণ, তাহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ব্যক্ত করিয়াছেন।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। শ্বেত ৩।১৩

—"পরমেশ্বর অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অন্তরাত্মা-পুরুষরূপে সর্ব্বদা প্রাণীগণের হৃদয়ে

অবস্থিত আছেন।" ইহা কৃষ্ণের বামনরূপ। কঠশ্রুতি ও ২।১।১২, ২।১।১৩, এবং ২।৩।১৭ সূত্রে জীবহৃদয়ে বামনরূপী কৃষ্ণের অবস্থিতি ঘোষণা করিয়াছেন। কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা ১৮।৬১

—"হে অর্জ্জুন, সূত্রধার যেমন যন্ত্রারূঢ় পুতুলকে আপন ইচ্ছামত নৃত্য করায়, তদ্রূপ ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া দেহাভিমানী সকল প্রাণীগণকে স্ব স্ব কর্ম্মপথে ঘুরাইতেছেন।" পুতুল জানে না যে সে সূত্রে বদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছে এবং সূত্রধার তাহাকে নৃত্য করাইতেছে। তদ্রূপ, দেহাভিমানী জীবগণও জানে না যে কৃষ্ণ বামনরূপে তাহাদের অন্তরাকাশে অবস্থিত থাকিয়া মায়াসূত্রে বদ্ধ তাহাদিগকে মায়ার কার্য্য করাইতেছেন। কিন্তু জীবগণ অহরহ মায়াকার্য্যের দুঃখভোগ করিলে বাঁচিতে পারিবে না বলিয়া বামনরূপী কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রতিদিন সুষুপ্তাবস্থায় মায়াকার্য্য হইতে কিছু সময়ের জন্য বিরতি দিয়া স্বীয় আনন্দ সম্ভোগ করাইতে এবং তদ্দ্বারা স্বয়ংও আনন্দ পাইতে আপনার সহিত জীবাত্মাকে মিলিত করেন। সুষুপ্তিতে কৃষ্ণের সহিত মিলনলাভ মানবের ইচ্ছা বা চেষ্টার দ্বারা লভ্য নহে, বিশ্বলীলার বিধান অনুসারে মানব ইহা প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণেরই বিধান অনুসারে অত্যন্ত দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সুষুপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অশেষ দুঃখভোগ করে, কেহ উন্মাদ হইয়া যায়, কেহ বা উৎকট-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। "Macbeth hath murdered sleep, therefore Macbeth shall sleep no more", ইহা নিছক কবি-কল্পনা নহে। এই সুষুপ্তির ব্যবস্থাও মায়াময় বিশ্বলীলার অন্তর্গত। সুষুপ্তা-বস্থায় মায়াকার্য্যের সাময়িক বিরতি হইলেও ইহা বিশ্বমায়ার অন্তর্গত ব্যবস্থা। কিরূপে এই অবস্থায় জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত মিলন প্রাপ্ত হয়, এক্ষণে তাহা বিবৃত করা হইতেছে। দেহের মধ্যে যে পঞ্চ প্রাণবায়ু আছে, উদান তাহাদের অন্য-তম। কৃষ্ণের দ্বারা সৃষ্ট সুষুপ্তাবস্থা অনুসারে, জীবাত্মার চেতনা সমগ্র দেহ এবং সকল ইন্দ্রিয় হইতে জীবাত্মাতেই উপসংহৃত হয় এবং জীবাত্মা তখন স্বরূপে স্থিত হয় ; তখন দেহ সুষুপ্ত হয়। তৎকালে জীবাত্মা বিশ্বমায়ার প্রথম দুইটী পদ, জাগ্রদবস্থাকে এবং স্বপ্নাবস্থাকে অতিক্রম করিয়া উদানবায়ুর দ্বারা হৃদয়-হইতে অন্তরাকাশে উত্থিত হইয়া তথায় বামনরূপী কৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়।

এইরূপে, দেহের সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত মিলন লাভ করে। এই সুষুপ্তাবস্থা বিশ্বলীলার অন্তর্গত তৃতীয় পদ বা অবস্থা।

এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে তানি যদা গৃহ্ণাত্যথ হৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্ গৃহীত এব প্রাণো ভবতি গৃহিতা বাগ্ গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ। বৃহদারণ্যক ২।১।১৭

—"এই চৈতন্যময় পুরুষ, অর্থাৎ জীবাত্মা, স্বীয় চৈতন্যের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের চেতনাকে আপনাতে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের অন্তর্গত অন্তরাকাশে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করে। যখন জীবাত্মা ইন্দ্রিয়সকলের চেতনাকে আপনাতে উপসংহৃত করিয়া উক্তরূপে অবস্থান করে, তখন ইহার সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহা 'স্বপিতি'। তখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয় এবং মনের চেতনাও জীবাত্মায় উপসংহৃত হইয়া থাকে।" স্বম্ = আত্মাকে = ঈশ্বরকে, অপিতি = প্রাপ্ত হয়, ইহাই 'স্বপিতি'র অর্থ। জীবাত্মা সুষুপ্তিকালে অন্তরাকাশে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করে, শ্রুতি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইষ্টফলমেবোদানঃ। স এনং যজমানমহরহ ব্রহ্ম গময়তি। প্রশ্ন ৪।৪

—"উদানবায়ু ইষ্টফল। ইহা স্বীয় যজমান এই জীবাত্মাকে প্রতিদিন কৃষ্ণকে প্রাপ্ত করায়।" উদানবায়ুর দ্বারা জীবাত্মা হৃদয়গুহা হইতে অন্তরাকাশে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হয় বলিয়া শ্রুতি উদানবায়ুকে পুরোহিত এবং জীবাত্মাকে তাহার যজমান বলিয়া উপমা দিয়াছেন। সুষুপ্তিতে জীবাত্মার আনন্দলাভের তত্ত্বও শ্রুতি ব্যক্ত করিয়াছেন।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পদঃ। মাণ্ডূক্য।৫

—"সুপ্ত ব্যক্তি যখন কোন জাগতিক কাম্য বস্তু পাইবার কামনা করে না এবং স্বপ্নও দেখে না, তখন তাহা সুষুপ্তি। সুষুপ্তাবস্থায় জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত একীভূত হয়। একীভূত হওয়ার অর্থ বিলীনতাপ্রাপ্তি নহে; ইহার অর্থ মিলিত হওয়া। যদি জীবাত্মা সুষুপ্তিকালে কৃষ্ণে বিলীন হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত এবং অভিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে, স্বতন্ত্র সত্ত্বার অভাববশতঃ

জীবাত্মা তখন আনন্দভুক্ হইতে পারে না। কিন্তু পরে বলা হইয়াছে যে সুষুপ্তিতে জীবাত্মা আনন্দভুক্ অর্থাৎ আনন্দভোক্তা এবং প্রাজ্ঞ হয়। তাহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা না থাকিলে সে আনন্দভুক্ এবং প্রাজ্ঞ হইতে পারে না; সুতরাং সুষুপ্তিতে জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে। অতএব, একীভূত হওয়ার অর্থ এরূপ নহে যে জীবাত্মার সত্ত্বা কৃষ্ণের সত্ত্বায় সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায় এবং তাহার নিজের স্বতন্ত্র সত্ত্বাই থাকে না। এই কারণে, এখানে একীভূত হওয়ার অর্থ মিলিত হওয়া। এইরূপ মিলিত অবস্থায় জীবাত্মা প্রজ্ঞানঘন হয়, অর্থাৎ জীবাত্মার চিদংশের চেতনা বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গ এবং সর্ব্বশরীর হইতে জীবাত্মার চিতেই উপসংহৃত হইয়া থাকে। সুষুপ্তাবস্থায় জীবাত্মা আনন্দময় হয় এবং আনন্দভুক্ হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ায় জীবাত্মা আনন্দময় হয় এবং পরমানন্দ ভোগ করে। সুষুপ্তাবস্থায় জীবাত্মা চেতোমুখ হয় এবং প্রাজ্ঞ হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ায় জীবাত্মার চেতনা এবং জ্ঞানশক্তি বাহ্যবিষয়ে না গিয়া তাহারই মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। এই সুষুপ্তি জীবের তৃতীয় পদ।" সুষুপ্তিতে কৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার এই মিলনকে স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতি সুষুপ্তির একীভূত অবস্থা যে বিলীন অবস্থা নহে, মিলনের অবস্থা, তাহা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্। বৃহদারণ্যক ৪।৩।২১

—"এখানে 'পুরুষ' শব্দ জীবাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জীবাত্মাকে পুরুষ বলিবার অর্থ এরূপ নহে যে জীবাত্মা পুংলিঙ্গ, কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন যে জীবাত্মা পুরুষ, স্ত্রী, অথবা নপুংসক নহে (শ্বেত ৫।১০)। নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ পুরে শয়ান অর্থাৎ অবস্থিত বলিয়া জীবাত্মাকে পুরুষ বলা হইল। এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এইরূপ :— প্রিয়া পত্নীর দ্বারা আলিঙ্গিত ব্যক্তি যেমন দেহের ভিতরের বা বাহিরের কোন বিষয়ই জানে না, তদ্রূপ, সুষুপ্তিতে জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার অর্থাৎ বামনরূপী কৃষ্ণের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া দেহের বাহিরের এবং ভিতরের বিষয় কিছুই জানে না। এই যে কৃষ্ণের সহিত মিলিত অবস্থা, ইহাই জীবাত্মার আপ্তকাম রূপ, অর্থাৎ এই অবস্থায় পরমানন্দপ্রাপ্তিহেতু

জীবাত্মার আনন্দকামনার পরিপূর্ণতা হয়। ইহাই জীবাত্মার আত্মকাম রূপ, অর্থাৎ জীবাত্মার আনন্দাংশের কৃষ্ণের সহিত মিলনলাভের দ্বারা তাঁহার আনন্দ প্রাপ্ত হইবার যে স্বভাবজ কামনা, সেই কামনার পূর্ণতার অবস্থা। ইহাই জীবাত্মার অকাম রূপ, অর্থাৎ জীবাত্মার আনন্দকামনা পূর্ণ হওয়ায় তাহার আর কোন কামনা না থাকায় ইহা তাহার কামনাশূন্য অবস্থা। ইহাই জীবাত্মার শোকহীন রূপ, অর্থাৎ পরমানন্দপ্রাপ্তিহেতু কোন শোক-দুঃখই থাকে না। আমরা শ্রুতি হইতে পাইলাম যে, স্বামীস্ত্রী আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায় যেমন পরস্পরে বিলীন না হইয়া স্বতন্ত্রই থাকে, কিন্তু মিলনা-নন্দে মগ্ন থাকিয়া ভিতরের বা বাহিরের কিছুই জানে না, তদ্রূপ, সুষুপ্তিতে জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে শ্রুতি হইতেই প্রমাণ দেওয়া হইতেছে যে, সুষুপ্তিতে জীবগণ এই আনন্দ লাভ করে বলিয়াই জীবন ধারণ করিতে পারে।

এষোহস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩৩

—"এই সুষুপ্তিতেই জীবাত্মার পরম আনন্দ। মানবেতর প্রাণীগণও এই পরমানন্দের কিয়ৎ পরিমাণ সুষুপ্তিতে প্রাপ্ত হয় বলিয়া জীবন ধারণ করে।" এক্ষণে আমরা পাইলাম যে, কেবল মানবই নহে, সকল প্রাণীই সুষুপ্তিতে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় বলিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহা শরীর বিজ্ঞানেরও একটী পরীক্ষিত সত্য যে মনুষ্য বা অন্য কোন প্রাণী দুই সপ্তাহের অধিক কাল বিনিদ্র অবস্থায় থাকিলে, প্রাণধারণোপযোগী আহার করিলেও তাহার মৃত্যু হয়, অথবা উন্মাদগ্রস্থ হইয়া কিছুদিন থাকিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বর্ত্তমান যুগের সদ্‌গুরু-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একাদশ বর্ষ কাল শয়ন এবং নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন। সদ্‌গুরু-অবতার ভগবান; তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব। মানবের পক্ষে শয়ন এবং সুষুপ্তি ত্যাগ অসম্ভব। এখন আমরা পাইলাম যে, আনন্দের দ্বারা জীবগণ জীবন ধারণ করে, কৃষ্ণই আনন্দ, সুতরাং কৃষ্ণই ধর্ম্ম। সুষুপ্তিতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ক্ষণস্থায়ী এবং সেই আনন্দও ক্ষণস্থায়ী। ইহা পাইলেও জীবের দুঃখের অবসান হয় না। কৃষ্ণকে নিত্যপ্রাপ্তি হইলে অনন্ত কালের জন্য সকল দুঃখের অবসান হয় এবং অনন্ত আনন্দও প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বয়ং কৃষ্ণ এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ গীতা ১৪।২৭

—"ব্রহ্ম আমাতে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। অব্যয় আনন্দ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত, আর্থাৎ আমি অনন্ত আনন্দ। সনাতন ধর্ম্ম আমাতে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ আমিই সনাতন ধর্ম্ম। ঐকান্তিক সুখ অর্থাৎ যে সুখ পাইলে আর কখনও কোন প্রকার দুঃখ পাইতে হয় না, তাহা আমাতে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ আমিই ঐকান্তিক সুখ।" আমরা গীতা হইতেও পাইলাম যে, কৃষ্ণই ধর্ম্ম; সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানই ধর্ম্মজ্ঞান, কৃষ্ণকে লাভই ধর্ম্মলাভ।

৯।৬।২ সুষুপ্তি ও সমাধি

এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে:—যোগীগণের জীবাত্মা সমাধির অবস্থায় ভগবানের সহিত মিলিত হয়েন; মৃত্যুর পর তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয় না। সুষুপ্তিতেও যখন সকল জীবের জীবাত্মা ভগবানের সহিত মিলিত হয়, তখন সুষুপ্তি ও সমাধিতে কোন প্রভেদ দেখা যাইতেছে না। যখন সুষুপ্তিতে সকল প্রাণীই ভগবানের সহিত মিলিত হয়, তখন সকল প্রাণীরই মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করা উচিত। তবে মুক্তির জন্য যোগসাধনার বা ভগবানের ভজনার প্রয়োজন কি? উত্তর:—সমাধি যোগসাধনার ফলে লব্ধ অবস্থা। যোগীগণ সাধনার ফলে ভগবদ্দর্শন করিয়া মায়ামুক্ত হয়েন; সমাধিভঙ্গের পরেও তাঁহাদের দেহে অবস্থিত জীবাত্মার দেহাভিমান থাকে না। যোগীগণ সমাধিতেই দেহত্যাগ করেন; মৃত্যুকালেও তাঁহাদের বাসনাসংস্কার থাকে না। এইজন্য সমাধি-লব্ধ যোগীগণের মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয় না। সুষুপ্তি যোগসাধনার ফলে বা কোন চেষ্টার ফলে লব্ধ অবস্থা নহে। জীবগণ যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং সৃষ্টি রক্ষা পায়, এইজন্য সুষুপ্তি মায়াময় সৃষ্টিলীলার অন্তর্গত একটী অবস্থা এবং ব্যবস্থা। সাধারণ মানবের জীবাত্মা দেহাভিমানী এবং বাসনাসংস্কারের বশবর্ত্তী। এইজন্য সুষুপ্তিভঙ্গমাত্রেই জীবাত্মার দেহাভিমান এবং বাসনাসংস্কার ফিরিয়া আসে। সুষুপ্তি বিশ্বমায়ার অন্তর্গত বলিয়া সুষুপ্তাবস্থায় মৃত্যু হইলেও মানব বিশ্বমায়ার মধ্যেই থাকিয়া যায় এবং তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সুষুপ্তি বিশ্বমায়ার তৃতীয় পদ, কিন্তু সমাধি বিশ্বমায়াতীত, তুরীয় চতুর্থ পদ। ইহা ভাবাতীত ভাবের ভূমির, অর্থাৎ পরম ভাবের ভূমির অবস্থা।

সুষুপ্তিতে কৃষ্ণের সহিত যে মিলন, তাহা সৃষ্টিলীলার ব্যবস্থানুসারে হৃদয়ের মধ্যে অন্তরাকাশে হয়। কৃষ্ণের ভজনার দ্বারা মায়াতীত হইয়া মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধভাগে সহস্রারে কৃষ্ণের সহিত অধ্যাত্মযোগে জীবাত্মার যে মিলন হয়, তাহা সমাধি। জীবাত্মা যেন বলি রাজা। সত্ত্বগুণ স্বর্গ, রজোগুণ মর্ত্ত, তমোগুণ পাতাল। জীবাত্মা দেহের অধীশ্বর; ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত দেহ জীবাত্মার স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল। পাতালের হৃদয়রূপ প্রাসাদে অবস্থান করিয়া জীবাত্মা স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালের রাজ্যসুখ ভোগ করিতেছে। জীবাত্মাকে মুক্তি দিয়া আপনার সহিত চিরমিলনের পরমানন্দ সম্ভোগ করাইবার জন্য কৃষ্ণ বামনরূপে তাহার হৃদয়-প্রাসাদের দ্বারে অন্তরাকাশে বিরাজমান থাকিয়া তাহার নিকট তাহার স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল, এই ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিতেছেন। কিন্তু রাজ্যসুখে মত্ত দেহাভিমানী জীবাত্মা তাঁহার এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছে না। এইজন্য বামন সেই দেহাভিমানী জীবাত্মাকে স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা মায়ার কার্য্যেই ঘুরাইতেছেন। কিন্তু জীবকে জীবিত রাখিবার জন্য প্রতিদিন জীবাত্মাকে আপনার সহিত মিলিত করিয়া সুষুপ্তির আনন্দ দিতেছেন। কিন্তু যদি কোন ভাগ্যে কোন জীবাত্মা বামনকে বলে, "আমার স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল আমি আপনাকে সমর্পণ করিলাম", তখন বামন আর তাহাকে মায়ার কার্য্যে বদ্ধ রাখেন না, এবং তাহার ত্রিপাদ ভূমি অধিকার করিয়া লয়েন। বামনরূপী কৃষ্ণ জীবাত্মার ত্রিপাদভূমি অধিকার করিলেই জীবাত্মা ত্রিগুণাতীত এবং মায়াতীত হয়, এবং তাহার দেহাভিমান বিদূরিত হয়। ত্রিপাদ ভূমি অধিকার করিয়া লইয়া কৃষ্ণ তাহার মস্তকে চতুর্থ পদ অর্পণ করেন। বিশ্বাতীত, মায়াতীত, তুরীয় কৃষ্ণ স্বয়ংই চতুর্থ পদ। মস্তকে চতুর্থ-পদ-দানের অর্থ, জীবাত্মা মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধদেশে সহস্রারে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার সহিত মিলনের পরমানন্দ সম্ভোগ করে। কৃষ্ণ সমাধির অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীর সহস্রারে জীবাত্মার সহিত মিলিত হয়েন, আবার, যেমন বলিরাজার পাতালপ্রাসাদের দ্বারে, তদ্রূপ জীবাত্মার হৃদয়প্রাসাদের দ্বারে বামনরূপে দ্বারী হইয়া থাকেন, যাহাতে মায়া সেই প্রাসাদ পুনরাধিকার করিয়া জীবাত্মাকে পুনরায় বিশ্বমায়ার অন্তর্গত করিতে না পারে। ইহাই সমাধির অবস্থা। কৃষ্ণকে ত্রিপাদ ভূমি অর্পণ করিয়া তাঁহার ভজনা না করিলে মানব মায়ামুক্তই হইতে পারে না, সমাধিতে তাঁহার সহিত মিলনলাভ ত দূরের কথা। কৃষ্ণ বলিয়াছেন :

দেবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ৭।১৪

—"আমার সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ঐশী মায়া দুরতিক্রমণীয়া। অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে যাহারা আমার শরণ লইয়া আমার ভজনা করে, তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করে।" সুতরাং, কৃষ্ণের ভজনা না করিলে মানব মায়ামুক্ত হইতে পারে না এবং সমাধি লাভ করিতে পারে না; মায়ামুক্ত হইয়া সমাধি লাভ করিতে না পারিলে পুনর্জন্ম অনিবার্য্য। অতএব, মুক্তিলাভের জন্য কৃষ্ণের ভজনার প্রয়োজন। এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে ঃ—শ্রুতি বলেন ঃ

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ডক ২।২।৮

—"অবরের অর্থাৎ ত্রিগুণময়ত্বহেতু নিকৃষ্ট বিশ্বের, পর অর্থাৎ অতীত যিনি, সেই মায়াতীত পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে দ্রষ্টার অন্তরের বাসনাসংস্কারের বন্ধন বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সকল কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" সুষুপ্তিতে জীবাত্মা পরমেশ্বরকে দর্শন করে, সুতরাং, শ্রুতিবাক্য অনুসারে তাহার বাসনাসংস্কার এবং সকল কর্ম্ম বিনষ্ট হওয়া উচিত। ইহাই মুক্তাবস্থা। তবে সুষুপ্তিলাভের ফলে জীবাত্মার মুক্তি হইবে না কেন? উত্তর ঃ ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতেছে, ইহা না জানিয়াই সৃষ্টিলীলার ব্যবস্থা অনুসারে জীবাত্মা সুষুপ্তিতে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়, এবং কৃষ্ণের দর্শনলাভও তাহার হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন যে সুষুপ্তিকালে জীবাত্মার সমগ্র চেতনা তাহারই মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বলিয়া তখন সে দেহের বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানে না। ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতেছে জানিয়া যদি জীবাত্মা তাঁহার সহিত মিলিত হইত এবং যদি তাহার ঈশ্বরের দর্শনলাভ হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তিভঙ্গের পর সেই মিলনের জ্ঞান এবং দর্শনলাভের স্মৃতি জীবাত্মার থাকিত, কিন্তু জীবাত্মার এইরূপ জ্ঞান বা স্মৃতি থাকে না। সুতরাং সুষুপ্তিতে জীবাত্মা জ্ঞাতসারে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হয় না এবং তাঁহার দর্শনও পায় না। সুষুপ্তিভঙ্গের পর "আমি ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম", এই জ্ঞান যদি জীবাত্মার থাকিত, তবে সকল মনুষ্যেরই এই জ্ঞান থাকিত; কিন্তু মনুষ্যের এই জ্ঞান নাই। যাঁহারা শ্রুতিতে বিবৃত এই তত্ত্ব অধ্যয়ন বা শ্রবণের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এই তত্ত্ব জানেন। না জানিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইলেও

জীবাত্মা তাঁহার আনন্দ প্রাপ্ত হয়, কারণ বস্তুগুণ জানা বা না-জানার অপেক্ষা রাখে না। অগ্নিতে জানিয়া বা না জানিয়া হস্তার্পণ করিলেও হস্ত দগ্ধ হইবে। তদ্রূপ, না জানিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেও আনন্দলাভ হইবে। সুষুপ্তিভঙ্গের পর সকলেই শরীরের ও মনের প্রফুল্লতা বোধ করে, এবং ইহা যে পরমানন্দপ্রাপ্তির ফলে হইয়াছে, এই বোধ মাত্র থাকে। এইজন্য সকল প্রাণী সুষুপ্তিকে আনন্দময় বস্তু বলিয়া মনে করে এবং সুষুপ্তি পাইতে চাহে। অধ্যাত্মযোগসাধনার ফলে কৃষ্ণের দর্শন পাইলে তবে "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" হয়, নতুবা নহে। এখন দেখা গেল যে, "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত সুষুপ্তিতত্ত্বের কোন বিরোধ নাই। মহাপ্রলয়ে সকল জীবগণ সহ বিশ্ব ঈশ্বরে বিলীন হয় এবং তাঁহার সহিত একীভূত অবস্থায় থাকে; প্রলয়ান্তে সর্গারম্ভে আবার প্রলয়ের পূর্ব্বের বিশ্ববাসী সমস্ত জীবগণের পুনরাবর্ত্তন হয়। কৃষ্ণের সহিত একীভূত হইয়াও তাহারা মুক্তিলাভ করে না, কারণ বাসনা-সংস্কারসহ তাহাদের প্রলয় হইয়াছিল, সর্গারম্ভে সেই বাসনাসংস্কারবশেই তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। সুষুপ্তিকেও জীবগণের দেহবৃত্তির দৈনন্দিন প্রলয় বলা যাইতে পারে। বাসনাসংস্কার থাকা সত্ত্বেও তাহাদের সুষুপ্তিতে ঈশ্বরের সহিত মিলনলাভ হয়, সুষুপ্তিভঙ্গের পর সেই বাসনসংস্কারবশেই তাহাদের দেহ-বৃত্তিতে এবং সংসারে পুনরাবৃত্তি হয়। প্রলয়ের পর সর্গারম্ভেও যেমন জীব-গণের জ্ঞান বা স্মৃতি থাকে না যে তাহারা কৃষ্ণের সহিত একীভূত থাকিবার পর সংসারে পুনরাগমন করিয়াছে, তেমনই সুষুপ্তিভঙ্গের পরেও জীবগণের জ্ঞান বা স্মৃতি থাকে না যে তাহারা কৃষ্ণের সহিত মিলিত অবস্থায় ছিল। সুষুপ্তি এবং সমাধির মধ্যে প্রভেদ কি, এবং সুষুপ্তি কেন মুক্তির কারণ নহে, তাহা বিবৃত হইল।

৯।৬।৩ ধর্ম্ম এক এবং অদ্বিতীয়

কৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। পরমেশ্বর কৃষ্ণই ধর্ম্ম। সুতরাং, ধর্ম্মও এক এবং অদ্বিতীয়। পরমেশ্বর কৃষ্ণ সকল দেশের সকল জাতির সকল মানবের এক এবং অদ্বিতীয় ধর্ম্ম। শুধু আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী-গণেরই নহে, সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সকল অধিবাসীরই এক এবং অদ্বিতীয় ধর্ম্ম পরমেশ্বর কৃষ্ণ। জগতে হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতি নামের

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নাই। এক এবং অদ্বিতীয় ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানবগণ বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে। এই সকল সাধনপ্রণালীকেও ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা হয় বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতি নামের উদ্ভব হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে পরমেশ্বরের ভজনাকারী মানবগণ এক ও অদ্বিতীয় কৃষ্ণকে নানাবিধ নামে ও রূপে ভজনা করে। বিভিন্ন প্রণালীতে এবং বিভিন্ন নামে ও রূপে সকলেই এক এবং অদ্বিতীয় ধর্ম্মকে লাভ করিবার চেষ্টা করে।

৯।৬।৪ ধর্ম্মস্থাপনের অর্থ

ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে কৃষ্ণ ধর্ম্ম স্থাপন করিতে অবতীর্ণ হয়েন। মানব যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান হয় এবং সেই অজ্ঞানতাবশতঃ ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন হয়, অথবা কেবল কামনামূলক যাগযজ্ঞপূজাদি করে, অথবা স্বকল্পিত ধর্ম্মের সাধনা করে, তখন তাহাকে ধর্ম্মের গ্লানি বলা হয়। ধর্ম্মের গ্লানি হইলে মানব ধর্ম্মলাভের প্রতিকূল কর্ম্ম করে; ইহাই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান। এইরূপ হইলে কৃষ্ণ ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য অবতীর্ণ হয়েন। জীবগণকে তাঁহার স্বীয় তত্ত্ব, তাহাদের স্বরূপতত্ত্ব, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধতত্ত্ব, যে সনাতন সাধনপন্থার দ্বারা জীবগণের মুক্তি, প্রেমবিকাশ এবং তাঁহাকে নিত্যপ্রাপ্তি হয় সেই সাধনপন্থা, প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া, বহু জীবকে তাঁহাকে প্রাপ্ত করাইয়া, তিনি ধর্ম্মস্থাপন করেন। তিনি এই সকল তত্ত্ব মানবকে শিক্ষা না দিলে মানব তাহা জানিতে পারে না। তিনি আপনি মানবকে আপনাকে প্রাপ্ত না করাইলে মানব তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। মানব যাহাতে অনন্তকালের জন্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, এইজন্য তিনি স্বয়ং তাহার নিকট আগমন করেন। তিনি মায়াময় জগতে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া মানব মায়াকে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাকে নিত্যলীলায় প্রাপ্ত হইতে পারে।

৯।৬।৫ অবতারগণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান

কেহ কেহ ঈশ্বরের অবতারত্বে সংশয় করেন। তাঁহারা বলেন, অনন্ত এবং জন্মরহিত ঈশ্বর কিরূপে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি জন্তুর রূপে, এবং মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন? এইরূপ সংশয় করিবার কোন কারণ

নাই। যোগেশ্বর কৃষ্ণের যোগৈশ্বর্য্য অনন্ত এবং অচিন্ত্যনীয়। যোগমায়ার সহায়ে তিনি যে কোন পরিমাণের যে কোন মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। ঈশ্বর লীলার নিমিত্ত স্বীয় অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দকে ঘনীভূত করিয়া যেমন মানবপরিমাণ মূর্ত্তি হইয়াছেন, তেমনই, অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তিনি লীলার প্রয়োজনানুরূপ যে কোন মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে পারেন এবং করেন। কৃষ্ণ বলিয়াছেন :

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতা ৪।৬

—"আমি জন্মমৃত্যুহীন এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইলেও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আত্মমায়ার দ্বারা অবতীর্ণ হই।" কৃষ্ণের পরাপ্রকৃতি হ্লাদিনী তাঁহার স্বীয় প্রকৃতি। তিনি পরাপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অর্থাৎ আনন্দলীলাময় ভগবান রূপে, অবতীর্ণ হয়েন। তিনি আত্মমায়ার দ্বারা, অর্থাৎ যোগমায়ার দ্বারা, আপনাকে প্রকাশ করেন। অবতারের দেহও প্রাকৃত দেহ নহে। অবতারগণও সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। তাঁহাদের সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ মানবের জড়চক্ষুর গোচর হইতে পারে না। কৃষ্ণ মানবকে ধর্ম্ম এবং আদর্শমানবের আচরণ শিক্ষা দিতে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি যদি আপনাকে লোকচক্ষুর গোচর না করেন, তাহা হইলে তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার কোন সার্থকতাই থাকে না। কৃষ্ণ মানবকে কৃপা করিবার জন্য অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া কৃপা করিয়াই স্বেচ্ছায় স্বীয় সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহকে মায়িক প্রাকৃত শরীরের ন্যায় মানবচক্ষুর গোচর করেন এবং মায়িকদেহবিশিষ্ট নরের ন্যায় আচরণ করেন। তিনি মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি যে দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন, সেই দেহবিশিষ্ট প্রণীর মতই আচরণ করেন, কারণ, তত্তৎ দেহের অনুরূপ আচরণ না করিলে অস্বাভিক আচরণ হয়। কেহ কেহ আপত্তি করেন, যে ঈশ্বরের শক্তি সূর্য্যের আলোক এবং উত্তাপ, সেই ঈশ্বর মর্ত্তে অবতীর্ণ হইলে মর্ত্তলোক পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত। এরূপ আপত্তি অসার। ঈশ্বরের বিগ্রহে অনন্ত শক্তি আছে, কিন্তু তিনি শক্তির ব্যবহার না করিলে তাঁহার শক্তি কার্য্যকারী হয় না। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ ঈশ্বরের শক্তির কার্য্যাবস্থা। ঈশ্বরের অনন্তশক্তিযুক্ত বিগ্রহ কার্য্যাবস্থা নহে। তিনি তাঁহার যে শক্তিকে যখন কার্য্যে নিয়োজিত করেন তখন সেই শক্তির ক্রিয়া হয়, নতুবা তাঁহার শক্তি-

তাঁহার বিগ্রহের মধ্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। সুতরাং, ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেই তাঁহার শক্তি কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় না এবং জগৎ দগ্ধ হয় না। অবতারের আত্মপ্রকাশ লৌকিক জন্ম নহে, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ হইতে যেমন জীব-দেহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ নহে; তিনি উক্তরূপ সংসর্গ ব্যতীত আবির্ভূত হয়েন। অবতারগণের জন্মের ইতিহাস পাঠ করিলেই এই তত্ত্বের সত্যতা জানা যাইবে। অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে কর্ম্ম করেন তাহাও লৌকিক কর্ম্ম নহে; অর্থাৎ, মানব জন্মলাভ করিয়া স্বীয় প্রারব্ধাদির বশে কর্ম্ম করে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রারব্ধ বা কর্ম্মফলভোগ নাই; তিনি স্বেচ্ছায়, মানবকে কৃপা করিয়া, মানবের কল্যাণের জন্য কর্ম্ম করেন।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ গীতা ৪।৯

কৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমার জন্ম এবং কর্ম্ম অলৌকিক, অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে, ইহা যিনি যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগের পর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না।" গীতার পূর্ব্বোদ্ধৃত ৪।৬ শ্লোকে আমরা পাইয়াছি যে কৃষ্ণ যোগমায়ার দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেন; ৪।৯ শ্লোকে আমরা পাইলাম যে তাঁহার জন্ম দিব্য, অর্থাৎ তাঁহার জন্ম মানবের জন্মের ন্যায় মায়িক জন্ম নহে, তাঁহার জন্ম যোগমায়ার দ্বারা আত্মপ্রকাশ। জগতে নরলীলা, অর্থাৎ নরবৎ আচরণের দ্বারা লীলা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া ঈশ্বর যদি ঈশ্বরের মতই আচরণ করেন, তাহা হইলে নরলীলার সার্থকতা থাকে না। এইজন্য, অবতীর্ণ হইয়া তিনি নরবৎ আচরণ করেন, আদর্শ মানবের ন্যায় আচরণ করিবার জন্য স্বীয় মহিমাকে যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। তাঁহার অঙ্গজ্যোতিও তাঁহার মহিমা; অবতারকালে কৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গজ্যোতিকেও যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এইজন্য, মর্ত্তে অবতারকালে তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ গীতা ৭।২৫

—"অবতীর্ণ হইয়া আমি স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা আপনাকে সম্যকরূপে আবৃত রাখি, এইজন্য আমার ঐশী স্বরূপ সকলের নিকট প্রকাশিত হয় না এবং মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে জন্মহীন, নিত্যসত্য, অনন্ত এবং অক্ষর ঈশ্বর

বলিয়া জানিতে পারে না।" মূঢ় ব্যক্তিগণ এইরূপে যোগমায়াসমাবৃত অবতারকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে না পারিয়া মানুষ বলিয়া মনে করে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা ৯।১১

—"জগতে অবতীর্ণ আমি সর্ব্বভূতের মহেশ্বর, পরম ভাব, এবং পরাতত্ত্ব, ইহা না জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার মানুষী তনুতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।" কৃষ্ণ তাঁহার অবতারদেহকে মানুষী বলিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার অবতারদেহ মানবদেহের মত মায়িক দেহ নহে, তাঁহার অবতারদেহ মানবের মায়িক দেহের ন্যায় মানবেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত এবং মানবের মায়িক দেহের ন্যায় আচরণযুক্ত দেহ। অবতার আপনাকে যোগমায়াসমাবৃত রাখিলেও অবতীর্ণ হইয়া ঈশ্বরকে দুষ্টনিধন, সাধুগণের রক্ষা এবং ধর্ম্মস্থাপন করিবার জন্য ঐশী শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়। অবতারদেহ যোগমায়াসমাবৃত হওয়ায় মূঢ় ব্যক্তিগণ অবতারকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে না, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবতারের আকৃতির এবং প্রকৃতির বৈশিষ্ট এবং অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া অবতারকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন। উক্তরূপ লক্ষণসমূহের দ্বারা অবতার নির্ণয় করিবার উপদেশ শাস্ত্র দিয়াছেন।

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্ব্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥ ভাগবত ১০।১০।৩৪

—"শরীরীগণের মধ্যে, অর্থাৎ মায়িকদেহবিশিষ্ট জীবগণের মধ্যে, অবতীর্ণ অশরীরীর, অর্থাৎ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ঈশ্বরের, অবতারকে, শরীরীগণের পক্ষে অসম্ভব এমন অতুলনীয় এবং অপরিমেয় শক্তির কার্য্যাবলীর দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।" এই সকল লক্ষণের দ্বারা মহাত্মাগণ অবতারকে চিনিতে পারেন।"

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ গীতা ৯।১৩

—"হে পার্থ, আমি অবতীর্ণ হইয়া যোগমায়াসমাবৃত থাকিলেও দৈবীপ্রকৃতিবিশিষ্ট মহাত্মাগণ আমাকে সর্ব্বভূতের অব্যয় কারণ জানিয়া অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন।" মহাত্মাগণ যাঁহাকে অবতার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন,

তাঁহার অবতারত্বে সংশয় করিলে মানব ইহলোকে বা পরলোকে সুখী হইতে পারে না।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ গীতা ৪।৪১

—"অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়চিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহ-লোকে বা পরলোকে কোথাও সুখ নাই।" আমরা পাইলাম যে অবতারগণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান। ভাগবতও পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০।১০।৩৪ শ্লোকে ঘোষণা করিয়াছেন যে অবতার অশরীরী, অর্থাৎ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; গুণাবতারগণের মধ্যে সকলেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ নহেন, এবং আবেশ অবতারগণও সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ নহেন। পুরুষাবতারগণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ অবতার নহেন; তাঁহারা কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ।

৯।৬।৬ বেদান্তে অবতারতত্ত্ব

ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে আলোচনায় কেনোপনিষদ হইতে আমরা পাইয়াছি যে ব্রহ্ম দেবতাগণের নিকট যক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মহামায়া হিমালয় দুহিতা উমা রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। বেদান্ত কেবল এই দুই অবতারের বিবরণই দেন নাই, ঈশ্বর অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী হইলেও বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েন, এই তত্ত্বও বেদান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥ শ্বেত ২।১৬

—"যে পরমেশ্বর সর্ব্বদিক ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে আদ্যাবতার মহাবিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন। তিনিই সর্ব্বজীবের অভ্যন্তরে পরমাত্মা এবং জীবাত্মারূপে অবস্থান করেন।" ছান্দোগ্য শ্রুতি হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩।১৭।৬ সূত্রে আমরা পাইয়াছি যে পরমেশ্বর কৃষ্ণ দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন। সুতরাং, অবতারত্ব বেদান্তে নিরূপিত হইয়াছে।

৯।৬।৭ অবতারগণের প্রকারভেদ

(১) স্বয়ংরূপ অবতার। যখন স্বয়ং কৃষ্ণ স্বীয় রূপে, নামে, পরিপূর্ণ শক্তি

এবং গুণসহ জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার সেই অবতারকে স্বয়ংরূপ অবতার বলা হয়। কৃষ্ণ এবং তাঁহর স্বয়ংরূপ অবতার এক এবং অভিন্ন। স্বয়ংরূপ অবতার কৃষ্ণের অংশ নহেন, স্বয়ং কৃষ্ণ। (২) পুরুষাবতারগণ—ইঁহারা কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ। (৩) লীলাবতারগণ—ইঁহারা কৃষ্ণের অংশ। (৪) গুণাবতারগণ—ইঁহারা কৃষ্ণের অংশ। (৫) মন্বন্তরাবতারগণ—ইঁহারা কৃষ্ণের অংশ। (৬) যুগাবতারগণ—সকল যুগাবতারগণ কৃষ্ণের অংশ নহেন। যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ। (৭) আবেশাবতারগণ—ইঁহারা কৃষ্ণের অংশ। যে আবেশাবতারে কৃষ্ণের পূর্ণাবেশ, তিনি অংশ নহেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বয়ংরূপ অবতার

৯।৭।১ স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইবার কারণ : ব্রজলীলায় পরমধর্ম্মস্থাপন

পরমানন্দস্বরূপ কৃষ্ণকে নিত্যলীলায় প্রাপ্তি পরমধর্ম্মলাভ। প্রাকৃত বিশ্ব রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। জীবগণ পরমধর্ম্ম লাভ করিলে রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তার সাধিত হয়। তাঁহার নিত্যলীলা কেমন, এবং কি উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্বয়ং কৃষ্ণ গোলোকের নিত্যলীলার পরিকর সহ অবতীর্ণ হইয়া জীবকে তাহা না জানাইলে জীব তাহা জানিতে এবং প্রাপ্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইবার সময়ে স্বীয় সন্ধিনীশক্তিকে মর্ত্তে বৃন্দাবনধামরূপে প্রকাশিত করেন। বৃন্দাবনধাম মর্ত্তে প্রকটিত গোলোক। বৃন্দাবনধামও অপ্রাকৃত ধাম। কৃষ্ণের অবতারকালে যেমন তাঁহার অপ্রাকৃত বিগ্রহ তাঁহারই কৃপায় জীবগণের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাঁহারই কৃপায় বৃন্দাবনধামও তদ্রূপ হয়। স্বয়ংরূপ অবতারকালে কৃষ্ণ বৃন্দাবনধামে গোলোকের নিত্যলীলার পরিকরগণকেও অবতীর্ণ করাইয়া থাকেন। কৃষ্ণের সখাগণ, রাধা এবং তাঁহার সখীগণও বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়েন। ইঁহাদের সহিত কৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলা করেন। এইরূপে মর্ত্তের জীবগণ গোলোকের লীলা কিরূপ তাহা জানিতে পারে, নতুবা গোলোকের লীলা চিরকাল গোলোকে গোপনেই থাকিত। কিন্তু বৃন্দাবন লীলা গোলোকলীলার ন্যায় কেবলই পারস্পরিক সম্ভোগের লীলা

নহে। গোলোকে গোলোকের লীলা প্রাপ্ত হইবার উপায় কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় না ; মর্ত্তের বৃন্দাবনলীলায় সেই উপায় জীবগণকে শিক্ষা দিতে হয়। এইজন্য, যে অধ্যাত্মযোগসাধনার অনুষ্ঠান করিলে গোলোকের নিত্যলীলায় কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় রাধা এবং তাঁহার কায়ব্যূহ-সখীগণ ব্রজলীলায় সেই সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া তাহা মানবকে শিক্ষা দিয়াছেন। রাধা এবং তাঁহার গোলোকের সখীগণ কৃষ্ণের নিত্যকান্তা ; তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তিও নিত্য ; কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাদের অধ্যাত্মযোগসাধনার কোনই প্রয়োজন নাই। তথাপি, মানবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা এমনভাবে ব্রজলীলা করিয়াছেন, যেন তাঁহারা অধ্যাত্মযোগসাধনা করিয়া কৃষ্ণের সহিত রাসলীলা প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বয়ং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শিক্ষা না দিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা দেওয়া যায় না ; এইজন্য রাধা এবং তাঁহার গোলোকের সখীগণ স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া যোগসাধনা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা আচরিত এবং প্রচারিত সাধনার অনুষ্ঠান করিলে মানব গোলোকের নিত্যলীলায় কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ তাঁহাদের দ্বারা যোগসাধনার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। কৃষ্ণ লীলাপরিকরসহ স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ না হইয়া তাঁহার বৈকুণ্ঠস্থ কোন ভগবৎস্বরূপকে অবতীর্ণ করাইলে তাঁহার এই যুগ্ম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। এই যুগ্ম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ অবতার করেন। ব্রজলীলার জন্য কৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলাপরিকর গোলোকধামসহ অবতীর্ণ হইলেও গোলোক এবং তথায় কৃষ্ণ এবং তাঁহার নিত্যপরিকরগণ নিত্য বিরাজমান থাকেন এবং তাঁহাদের গোলোকলীলাও নিত্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, কারণ অনন্ত হইতে অনন্ত বিয়োগ করিলেও অনন্ত অবশিষ্ট থাকে।

৯।৭।২ স্বয়ংরূপ অবতারে কৃষ্ণের ও বাসুদেবের একত্ব

স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণ একই বিগ্রহে গোলোকবিহারী কৃষ্ণ এবং বৈকুণ্ঠাধিপতি বাসুদেব। স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণের ব্রজলীলা গোলোকবিহারী কৃষ্ণের লীলা এবং ব্রজের বাহিরের লীলা বাসুদেবলীলা। তাঁহার ব্রজলীলা মাধুর্য্যময়, ব্রজের বাহিরের বাসুদেবলীলা ঐশ্বর্য্যময়। কৃষ্ণই বাসুদেব ; এইজন্য, স্বয়ংরূপ অবতারে কৃষ্ণ যখন বাসুদেবলীলা করেন, তখন বৈকুণ্ঠাধিপতি বাসুদেব বৈকুণ্ঠেই থাকেন। কৃষ্ণ প্রথমে ব্রজলীলা করিয়াছেন। ব্রজলীলায় তিনি যে

পরমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, মানব যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি বাসুদেবলীলায় অসুরনিধন, ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন, গীতার প্রচার প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা ব্রজলীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

৯।৭।৩ জন্মলীলার যুগ্ম প্রকাশ—মথুরায় এবং গোকুলে

অসুরগণের অত্যাচারে নিপীড়িতা ধরিত্রীদেবী ব্রহ্মার নিকট স্বীয় দুঃখের বিবরণ জানাইলে ব্রহ্মা দেবগণ সহ কৃষ্ণের স্তুতি করিয়া ধরার দুঃখমোচনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা সমাধিতে কৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করিলেন যে তিনি যদুবংশে বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং তাঁহার আদি-ব্যূহের সঙ্কর্ষণও অবতীর্ণ হইবেন। দেবগণ আশ্বস্ত হইয়া স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। যদুবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন; যদুবংশ ভারতের বিখ্যাত রাজবংশ ছিল। যদুবংশীয় বসুদেব যথাকালে দেবকীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর দেবকীর ভ্রাতা কংস স্বয়ং সারথি হইয়া বসুদেব এবং দেবকীকে যখন রথারোহণে বসুদেবের গৃহে লইয়া যাইতেছিল, তখন সে আকাশবাণী শুনিল যে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র তাহাকে বধ করিবেন। অতঃপর কংস বসুদেব এবং দেবকীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল এবং দেবকীর গর্ভে সন্তান জন্মিবামাত্র কংস তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। বসুদেব তাঁহার অন্যা পত্নী রোহিণীকে ব্রজে নন্দমহারাজের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্কর্ষণ তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন। দেবকীর অষ্টম সন্তান রূপে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ ভগবতী যোগমায়াকে ব্রজধামে নন্দ এবং যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূতা হইবার আদেশ দিয়া বসুদেবের অন্তরে আবিষ্ট হইলেন। তখন বসুদেবের মূর্ত্তি জ্যোতির্মণ্ডিত হইল। বসুদেব স্বীয় অন্তর হইতে কৃষ্ণকে দেবকীর অন্তরে সমাহিত করিলেন। অতঃপর দেবকীর মূর্ত্তি অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। যদিও তিনি প্রাকৃত পন্থায় গর্ভধারণ করিলেন না, তথাপি কৃষ্ণের মায়ায় তাঁহার বাহ্যিক গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। এই সময়ে একদিন ব্রহ্মাদি দেবগণ কারাগারে আসিয়া দেবকীতে আবিষ্ট কৃষ্ণের স্তব করিলেন। যথাকালে শুভ মুহূর্ত্তে দেবকী হইতে কৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন। তৎকালে কৃষ্ণের মায়ায় দেবকীর গর্ভলক্ষণ তিরোহিত হইল। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী,

শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, কৌস্তুভশোভিত, শ্যামকলেবর চতুর্ভুজ শিশু রূপে কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। ইহা কৃষ্ণের বাসুদেবমূর্ত্তির শিশুপরিমাণ রূপ। অসুর-নিধন, সাধুগণের রক্ষা, এবং ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন ক্ষত্রিয়রূপে করিবেন বলিয়া, এবং বসুদেব এবং দেবকীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত দাস্যভাব বলিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে চতুর্ভুজ বাসুদেব রূপে কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব এবং দেবকী তাঁহাকে শুদ্ধ বাৎসল্যভাবে অঙ্কে ধারণ করিতে পারিলেন না; তাঁহারা নতমস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে স্তুতি করিলেন। তাঁহাদের স্তবে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত দাস্যভাব প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর কৃষ্ণ দ্বিভুজ শিশুমূর্ত্তি হইলেন। কৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীর নিকট বাসুদেব রূপে প্রকাশিত হইলেন, কিন্তু ব্রজলীলা করিবার জন্য তাঁহার ব্রজে যশোদানন্দনরূপে আবির্ভূত হইবারও প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, মথুরায় কংসের কারাগৃহে আবির্ভূত হইবার পরেই তাঁহার জন্মলীলাকে মথুরা হইতে গোকুলে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। তিনি বসুদেবকে বলিলেন, "যদি কংস হইতে আপনার ভয় হয়, তবে অবিলম্বে আমায় গোকুলে রাখিয়া যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূতা আমার যোগমায়াকে এখানে আনয়ন করুন।" বস্তুতঃ কৃষ্ণের কংসভয় থাকিতে পারে না; গোকুলেও জন্মলীলা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বসুদেবের মনে কংসভীতির উদ্রেক করিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় কংসের কারারক্ষীগণ নিদ্রিত হইল এবং রুদ্ধ কারাদ্বার উন্মুক্ত হইল। মথুরার কারাগৃহে কৃষ্ণ রাত্রিকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সেই রাত্রেই বসুদেব নিরাপদে কৃষ্ণকে গোকুলে লইয়া গেলেন। বসুদেব পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যশোদার কন্যারূপে যোগমায়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মায়ায় তাঁহার আবির্ভাবকালে নন্দগৃহের সকলে এবং যশোদাও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন। সেইজন্য নন্দগৃহের কেহই জানিতেন না যে যশোদার সন্তান জন্মিয়াছে। যশোদা এইমাত্র বুঝিয়াছিলেন যে একটী সন্তান তাঁহার ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু সেই সন্তান পুত্র বা কন্যা, তাহা কিছুই জানিতেন না। যোগমায়া আবির্ভূতা হইলে পর যশোদারও বাহ্য গর্ভলক্ষণ তিরোহিত হইয়াছিল। বসুদেব শিশু কৃষ্ণকে লইয়া নন্দগৃহে গমন করিলেন এবং কৃষ্ণকে নিদ্রাভিভূতা যশোদার পার্শ্বে শয়ান করিয়া তাঁহার কন্যাকে লইয়া আসিলেন। নন্দ, যশোদা বা গোকুলের কেহই এই শিশুবিনিময়ের ব্যাপার জানিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে

নিদ্রাভঙ্গের পর যশোদা দেখিলেন যে তাঁহার পার্শ্বে নবজাত পুত্র শয়ান রহিয়াছে। নন্দ, যশোদা, এবং ব্রজবাসী সকলেই জানিলেন যে সেই পুত্র যশোদার গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। এদিকে প্রাতঃকালে বসুদেব কংসকে সেই কন্যা দিয়া বলিলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভে ঐ কন্যাই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে কৃষ্ণ কৌশলে মথুরায় এবং ব্রজে তাঁহার একই জন্মলীলার যুগ্ম প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণের জন্মগ্রহণ মানবশিশুর জন্মগ্রহণের ন্যায় নহে; তিনি মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হয়েন নাই; বসুদেব এবং দেবকীর নিকট শিশুরূপে আত্মপ্রকাশই তাঁহার বসুদেবনন্দন এবং দেবকীনন্দন রূপে জন্মগ্রহণ। তদ্রূপ, তিনি যশোদারও গর্ভ হইতে প্রসূত হয়েন নাই; যশোদার নিকট শিশুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াই তিনি নন্দনন্দন এবং যশোদানন্দন হইলেন। দেবকীর নিকট চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তিনি জানাইলেন যে অসুর-নিধন, সাধুরক্ষা, এবং ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের জন্য তিনি দেবকীনন্দন রূপে বৈকুণ্ঠাধিপতি বাসুদেব, এবং যশোদার নিকট দ্বিভুজ শিশুমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জানাইলেন যে ব্রজলীলার নিমিত্ত তিনি যশোদানন্দনরূপে গোলোকবিহারী কৃষ্ণ। এইরূপে, একই জন্মলীলার যুগ্ম প্রকাশের দ্বারা কৃষ্ণ দেবকীনন্দন, যশোদানন্দন, বসুদেবনন্দন, এবং নন্দনন্দন হইলেন। কৃষ্ণকে যশোদানন্দন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যুক্তিহীন দ্বিকৃষ্ণবাদ সৃষ্টি করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

৯।৭।৪ লীলাময় ত্রিবিধ বয়োধর্ম্মের অনুরূপ বিগ্রহ : কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর

চিরকিশোর কৃষ্ণের নিত্যলীলা ত্রিবিধ বয়োধর্ম্মের অনুরূপ। এই ত্রিবিধ বয়োধর্ম্মের নাম কৌমার, পৌগণ্ড, এবং কৈশোর। প্রধানতঃ বাৎসল্যভাবের লীলার দ্বারা বাৎসল্যরসের আদানপ্রদানের জন্য কৃষ্ণ যোগমায়া অবলম্বনে স্বীয় চিরকিশোর বিগ্রহকে কৌমার বিগ্রহ করেন। যোগমায়া অবলম্বনেই তিনি পৌগণ্ডবিগ্রহও হয়েন। পৌগণ্ড এবং কৈশোর বিগ্রহে পঞ্চবিধ ভাবের লীলাই হয়। কেবল লীলার প্রয়োজনে লীলাকালে তিনি কৌমারবিগ্রহ এবং পৌগণ্ডবিগ্রহ হয়েন। তাঁহার নিত্যস্থিতি কৈশোরবিগ্রহে। ব্রজে আবির্ভাবকাল হইতে পঞ্চবর্ষাবধি তাঁহার কৌমার, ষষ্ঠবর্ষ হইতে দশম বর্ষাবধি

তাঁহার পৌগণ্ড, এবং একাদশ বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষাবধি তাঁহার কৈশোর লীলা। পঞ্চদশ বর্ষাবধি কৈশোর। কৃষ্ণের সমগ্র কৈশোর ব্রজে অতিবাহিত হয় নাই।

৯।৭।৫ সকল বিগ্রহেই কৃষ্ণ অনন্ত ও অখণ্ড সচ্চিদানন্দ

লীলার নিমিত্ত কৃষ্ণ কৌমার এবং পৌগণ্ড বিগ্রহ ধারণ করিলেও তাঁহার তত্তৎ দেহও অনন্ত এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। কৌমার এবং পৌগণ্ড দেহে তিনি ব্রজে যে লীলা করিয়াছেন তাহা ভাগবতে পাঠ করিলেই ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি আবির্ভাবের পরেই বসুদেব এবং দেবকীর প্রতি যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে। স্বীয় মুখাভ্যন্তরে যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, পূতনাবধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ প্রভৃতি কৌমার লীলাতেও তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কৌমার লীলাতে এবং পৌগণ্ড লীলাতে তাঁহার অনন্ত মাধুর্য্যেরও প্রকাশ দেখা যায়। ব্রজে কৃষ্ণের যে মধুরতম রাসলীলা, তাহা ব্রজের পৌগণ্ড-লীলার অন্তর্গত। এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে কৃষ্ণের কৌমার দেহ এবং পৌগণ্ড দেহও অনন্ত এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

৯।৭।৬ প্রকট ব্রজলীলার সংক্ষিপ্ত সূচী

কৃষ্ণ আবির্ভাবকাল হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত, ব্রজে অবস্থান করিয়া দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই, অর্থাৎ কৈশোরের প্রায় মধ্যভাগে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং, ব্রজে কৃষ্ণ কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর, এই ত্রিবিধ লীলাই করিয়াছেন। ভাগবতে তাঁহার ব্রজধামের এই ত্রিবিধ লীলা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটী বয়সানুক্রমিক সূচী ভাগবতের স্কন্ধের এবং অধ্যায়ের সংখ্যা উল্লেখপূর্ব্বক দেওয়া হইতেছে। কৌমার লীলা, জন্ম হইতে পঞ্চম বর্ষাবধি :— কংসের কারাগারে দেবকীনন্দনরূপে চতুর্ভুজ শিশুদেহে আবির্ভূত হইবার পরেই কৃষ্ণ দ্বিভুজ শিশুদেহ ধারণ করিলেন এবং বসুদেব তাঁহাকে গোকুলে নন্দালয়ে যশোদার সূতিকাগৃহে স্থাপন করিয়া তাঁহার নবজাত কন্যাকে লইয়া আসিলেন। কংস সেই কন্যাকে বধ করিতে উদ্যত হইতে কন্যারূপিণী যোগমায়ার অন্তর্ধান। কংসের মন্ত্রণা। এই সকল ঘটনা ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩য় এবং ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ১০।৫ (=ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৫ম

অধ্যায়)—নন্দালয়ে কৃষ্ণের জন্মমহোৎসব। নন্দের মথুরাগমন এবং বসুদেবের সহিত মিলন। ১০।৬—কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূতনাবধ। তখন কৃষ্ণের বয়স ৩ মাস। ১০।৭—৩ মাস বয়সেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শকটভঞ্জন বা শকটাসুরবধ। ১ বৎসর বয়সে তাঁহার দ্বারা তৃণাবর্ত্ত নামক অসুরবধ। ১০।৮—গর্গমুণির নন্দালয়ে আগমন এবং নন্দের নিকট কৃষ্ণের ও বলরামের নাম প্রকাশ। কৃষ্ণ-বলরামের বিবিধ বাল্যলীলা। কৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ এবং যশোদাকে স্বীয় মুখাভ্যন্তরে বিশ্বরূপ প্রদর্শন। ইহা কৃষ্ণের ২য় বর্ষের লীলা। ১০।৯—১০—যশোদা কর্ত্তৃক কৃষ্ণকে বন্ধন এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যমলার্জ্জুনভঞ্জন। কৃষ্ণের ৩য় বর্ষে এই লীলা। ১০।১১—কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ফলবিক্রয়িণীকে ধান্যদান এবং সেই ধান্যের রত্নে পরিণতি। সখাগণের সহিত ক্রীড়া। গোকুল হইতে কৃষ্ণ বলরাম সহ নন্দ, যশোদা এবং সকল গোপ ও গোপীগণের বৃন্দাবনে বাস করিতে আগমন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বৎস-চারণ আরম্ভ এবং বৎস-চারণকালে তাঁহার দ্বারা বৎসাসুর এবং বকাসুর বধ। কৃষ্ণের চতুর্থ বর্ষে এই লীলা। ১০।১২—সখাগণের সহিত বৎস-চারণ কালে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অঘাসুর বধ। ইহা কৃষ্ণের ৫ম বর্ষের লীলা। ব্রহ্মমোহন লীলা হইবার পর, এক বৎসর পরে, ব্রজবাসীগণ অঘাসুরবধের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ১০।১৩—১৪—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বৎসগণ এবং বৎসপালকগণ হরণ; এক বৎসর পরে ব্রহ্মার পুনরাগমন এবং পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণলীলা দর্শন। ব্রহ্মার মোহ এবং কৃষ্ণের প্রতি স্তব। কৃষ্ণের ৫ম বর্ষে এই লীলা। পৌগণ্ডলীলা, ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম বর্ষাবধি ঃ—১০।১৫—৬ষ্ঠ বর্ষে কৃষ্ণ বৎস-চারণ ত্যাগ করিয়া সখাগণের সহিত গো-চারণ আরম্ভ করিলেন এবং কৃষ্ণের ৬ষ্ঠ বর্ষেই বলরাম কর্ত্তৃক ধেনুকাসুরবধ।১০।১৬—৬ষ্ঠ বর্ষেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালিয়দমন, নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের প্রতি স্তব। ১০।১৭—কালিয় নাগের যমুনাহ্রদে প্রবেশের কারণ। ১০।১৮—কৃষ্ণের ৭ম বর্ষে বলরাম এবং সখাগণের সহিত গো-চারণকালে নানাবিধ ক্রীড়া। একদিন "বাহক ও বহনীয়" ক্রীড়ার সময় বলরাম কর্ত্তৃক প্রলম্বাসুরবধ। ১০।১৯—৭ম বর্ষেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দাবাগ্নিপান। ১০।২০—বৃন্দাবনে বর্ষা এবং শরৎ ঋতুর বর্ণনা। ১০।২১—কৃষ্ণের ৮ম বর্ষে আশ্বিনে তাঁহার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপীগণের পরস্পরের সহিত পূর্ব্বরাগপ্রকাশক আলাপন। ১০।২২—কৃষ্ণের ৮ম বর্ষে হেমন্ত ঋতুতে গোপীগণের কাত্যায়ণীপূজা, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের বস্ত্রহরণ এবং তাঁহাদের সহিত রাসলীলা করিবার অঙ্গীকার।

১০।২৩—কৃষ্ণের অষ্টম বর্ষের গ্রীষ্মকালে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণের কৃষ্ণদর্শন। ১।২৪-২৫—কৃষ্ণের ৮ম বর্ষে কার্ত্তিক মাসে তাঁহার দ্বারা ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ এবং গোবর্দ্ধন-ধারণ। ১০।২৬—কৃষ্ণের ৮ম বর্ষেই ব্রজবাসী গোপগণ কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নন্দকে কৃষ্ণের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে নন্দ তাঁহাদিগকে নামপ্রকাশকালে গর্গ মুণির উক্তি জ্ঞাত করিলেন। ১০।২৭—গোলোক হইতে গোমাতা সুরভি এবং স্বর্গ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ব্রজে আসিয়া কৃষ্ণকে ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিয়া গোবিন্দ নামে অভিহিত করিলেন। কৃষ্ণের ৮ম বর্ষে শুক্লা কর্ত্তিকী একাদশীতে এই অভিষেক। ১০।২৮—৮ম বর্ষের শুক্লা কার্ত্তিকী দ্বাদশীতে কৃষ্ণ বরুণালয় হইতে নন্দকে মোচন করিয়া আনিলেন। নন্দাদি গোপগণের প্রার্থনায় কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন। ১০।২৯—৩৩—এই পাঁচটী রাস-পঞ্চাধ্যায়। ইহাতে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা আছে। কৃষ্ণ ৮ম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৯ম বর্ষে প্রবেশ করিয়া ৯ম বর্ষের শরৎকালে রাসলীলা করিয়াছিলেন। ১০।৩৪—৯ম বর্ষের শিবরাত্রিতে কৃষ্ণ সুদর্শন নামক বিদ্যাধরকে মোচন করেন এবং দোলপূর্ণিমায় শঙ্খচূড়কে বধ করেন। ১০।৩৫—দিবাভাগে গোচারণের জন্য কৃষ্ণ বনে গমন করিলে তাঁহার অদর্শনে বিরহিণী গোপীগণের পরস্পরের সহিত উত্তরাগপ্রকাশক আলাপন। ব্রজের কৈশোরলীলা, ১১শ হইতে ১২শ বর্ষাবধি :—১০।৩৬—কৃষ্ণ একাদশ বর্ষের চৈত্রপূর্ণিমায় অরিষ্টনামক বৃষভাকার অসুরকে বধ করেন। ইহার পরেই দেবর্ষি নারদ কংসকে জানাইলেন যে কৃষ্ণ এবং বলরাম বসুদেবের পুত্র। ইহা শুনিয়া কংস কৃষ্ণ-বলরামকে বধ করিবার জন্য কেশী নামক দৈত্যকে ব্রজে পাঠাইল এবং তাহার দ্বারা নিহত না হইলে তাঁহাদিগকে মথুরায় আনিয়া বধ করিবার জন্য অক্রূরকে রথারোহণে ব্রজে যাইবার আদেশ দিল। ১০।৩৭—কৃষ্ণ ১২শ বর্ষের গৌণ ফাল্গুন দ্বাদশীর প্রাতঃকালে কেশী দৈত্যকে বধ করিলে পর নারদ তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে স্তুতি করিয়া বলিলেন যে সেই দিনেই অক্রূর তাঁহাকে এবং বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য আসিবে, পরদিবসেই তিনিও বলরাম মথুরায় যাইবেন, এবং তৎপরদিবসেই তিনি কংসকে বধ করিবেন। কৃষ্ণের কতকগুলি ভাবীলীলার উল্লেখ করিয়া নারদ প্রস্থান করিলেন। ব্যোমাসুরবধের বিবরণটী কেশীবধের বর্ণনার পরে প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু ব্যোমা-সুরবধ কেশীবধের পূর্ব্বেই হইয়াছিল, কারণ রাসলীলার সময়ে গোপীগণ ব্যোমা-

সুরবধের উল্লেখ করিয়াছেন। ১০।৩৮—কেশীবধের দিন সন্ধ্যায় অক্রূরের ব্রজে নন্দালয়ে আগমন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে, ইহার পরদিন প্রাতঃকালে অক্রূরের সহিত কৃষ্ণ-বলরামের মথুরাগমন বিবৃত হইয়াছে। ইহাই কৃষ্ণের প্রকট ব্রজ-লীলা। মথুরাগমনের পর বৃন্দাবনে তিনি প্রকটভাবে বিদ্যমান না থাকিলেও অপ্রকটভাবে নিত্য বিদ্যমান রহিলেন।

৯।৭।৭ ব্রজলীলায় লোকশিক্ষা এবং পারস্পরিক সম্ভোগ

ব্রজে কৃষ্ণ সখ্য, বাৎসল্য, এবং মধুর এই ত্রিবিধ ভাবের লীলা করিয়াছেন। ব্রজে বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনগণের সহিত কৃষ্ণ বাৎসল্য ভাবের লীলা করিয়াছেন; বাৎসল্যভাবে পারস্পরিক সেবা-আরাধনার দ্বারা বাৎসল্যরসের পারস্পরিক আদানপ্রদান ব্রজের বাৎসল্য ভাবের লীলা। ব্রজে সমবয়স্ক সখাগণের সহিত কৃষ্ণ সখ্যভাবের লীলা করিয়াছেন; সখ্যভাবে পারস্পরিক সেবা-আরাধনার দ্বারা সখ্যরসের পারস্পরিক আদানপ্রদান ব্রজের সখ্যভাবের লীলা। ব্রজে রাধা এবং গোপীগণের সহিত কৃষ্ণ মধুরভাবের লীলা করিয়াছেন; মধুরভাবে পারস্পরিক সেবা-আরাধনার দ্বারা মধুর রসের পারস্পরিক আদানপ্রদান ব্রজের মধুরভাবের লীলা। ব্রজলীলা কেবলই পারস্পরিক সম্ভোগের লীলা নহে। কেবল পারস্পরিক সম্ভোগই যদি ব্রজলীলার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণের এবং তাঁহার লীলাপরিকরের অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ গোলোক তাঁহাদের পারস্পরিক সম্ভোগের ধাম। ব্রজলীলায় রাধা এবং গোপীগণ কৃষ্ণের নিত্যলীলাপ্রাপ্তির উপায় যে সাধন প্রণালী, তাহাও মর্ত্ত্য জীবের মত স্বয়ং আচরণ করিয়া মানবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ব্রজলীলাকে উভয় দিক দিয়াই বুঝিতে হইবে, নতুবা উহা যথার্থভাবে বুঝা যাইবে না। এইজন্য, রাধা এবং গোপীগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধনপ্রণালীটী কিরূপ, তদ্দ্বারা কিরূপে মানবদেহে অবস্থিত জীবাত্মার চিৎ মায়ামুক্ত হয় এবং আনন্দাংশের প্রেমের বিকাশ হয়, এবং তখন মানবাত্মা কিরূপে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া মিলনানন্দ সম্ভোগ করে, এই সমস্ত বিষয় এবং রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার পারস্পরিক সম্ভোগ কিরূপ তাহাও ব্রজলীলার আলোচনার মধ্যে আমরা উল্লেখ করিয়া যাইব।

৯।৭।৮ গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত জ্ঞানযোগ : অবতীর্ণা নিত্যসিদ্ধা গোপী এবং সাধিকা গোপী

রাধা এবং তাঁহার গোলোকের সখীগণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম নিত্য বিকশিত; তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা। ব্রজে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহারা ব্রজবাসী সমবয়স্কা গোপকুমারীগণকে সখীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা রাধা এবং তাঁহার গোলোকের সখীগণকে নিত্যসিদ্ধা গোপী, এবং তাঁহাদের ব্রজবাসিনী সখীগণকে সাধিকা গোপী বলিয়া উল্লেখ করিব। ইঁহারা অবতীর্ণা নহেন এবং নিত্যসিদ্ধা নহেন। রাধা এবং তাঁহার গোলোকের সখীগণ এই ব্রজসখীগণের সহিত যে অধ্যাত্মযোগসাধনা করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, এবং ভক্তিযোগের সমাহার; সমগ্র-ভাবে ইহাকে ভক্তিযোগ বলা যাইতে পারে, কারণ তাঁহাদের জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগও ভক্তিমূলক। কৃষ্ণ পরমেশ্বর; তিনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এবং ভগবান; জীবাত্মা তাঁহার অংশ, কৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার অংশী-অংশ, উপাস্য-উপাসক, এবং প্রাপ্তব্য-প্রাপক সম্বন্ধ; কৃষ্ণকে নিত্যলীলায় প্রাপ্ত হওয়াই জীবাত্মার পরম প্রাপ্তি এবং পরাধর্ম্মলাভ, ইহাই মূল জ্ঞান। এই মূল জ্ঞানে সংশয়হীন স্থিতিই মূল জ্ঞানযোগ। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের এই মূল জ্ঞানযোগের প্রয়োজন না থাকিলেও, পরমধর্ম্মলাভের জন্য উক্ত জ্ঞানযোগের আবশ্যকতা মানবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারাও সাধিকা গোপীগণের সহিত একযোগে অনেক উক্তির দ্বারা ঘোষণা করিয়াছেন যে সকল গোপীগণ উক্ত জ্ঞানযোগে স্থিত আছেন। ভাগবতে রাসলীলা-বর্ণনার মধ্যে গোপীগণের উক্তি হইতে তাঁহাদের এই জ্ঞানযোগে স্থিতি নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়। ভাগবতের ১০।২৯।৩২, ১০।২৯।৩৩, ১০।৩০।২৮, ১০।৩১।৪ প্রভৃতি শ্লোকগুলি ইহার প্রমাণ। কেহ কেহ বলেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিতেন না। এই মত যে অসার এবং অসত্য, তাহা গোপীগণের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। গোপীগণ যে তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানলাভের শ্রদ্ধাযুক্ত চেষ্টার আরম্ভে জ্ঞানযোগের সাধনার আরম্ভ হয় এবং এই জ্ঞানযোগের সাধনার আরম্ভই কৃষ্ণভজনার আরম্ভ। এইজন্য এই জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগের এবং ভক্তিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সমন্বিত। গোপীগণ তাঁহাদের জ্ঞানযোগের পরিচয় দিয়া ইহা মানবকে শিক্ষা দিয়াছেন;

৯।৭।৯ ইহাই গীতায় ও বেদান্তে উপদিষ্ট জ্ঞানযোগ

গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত যে মূল জ্ঞানযোগের বিষয় আমরা বলিলাম, তাহাই গীতায় উপদিষ্ট মূল জ্ঞানযোগ। গীতায় জ্ঞানযোগের আবশ্যকতা ঘোষিত হইয়াছে।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানাশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি
নায়ং লোকহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ গীতা ৪।৪১

কিরূপে জ্ঞানলাভ করিতে হয় তাহাও গীতা বলিয়াছেন।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ গীতা ৪।৩৫

—"তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। তাঁহারা তোমায় তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিবেন।" জ্ঞানযোগে স্থিত ব্যক্তির দ্বারাই কৃষ্ণভজনা হয়, তাহাও গীতার ঘোষণা।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। গীতা। ৭।১৯

—"বহু জ্ঞানহীন জন্মের পর জ্ঞানবান হইলে মানব আমার ভজনা করে।" যে সংশয়হীন জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিলে মানব জ্ঞানযোগে আরূঢ় হয়, কৃষ্ণ গীতায় বিশদভাবে সেই জ্ঞানও বিবৃত করিয়াছেন। গীতায় উপদিষ্ট কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে মূল কথা এই :—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি", "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে", "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ", "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ", "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥" জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতা যে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন তাহার মূল কথা এই যে, জীবদেহ অপরা প্রকৃতি, জীবাত্মা পরাপ্রকৃতি এবং কৃষ্ণের অংশ, দেহ নশ্বর কিন্তু জীবাত্মা অবিনাশী, "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ", "মন্মনা ভব……মামেবৈষ্যসি।" ইহারই মধ্যে অংশী-অংশ, উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধতত্ত্বও উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা দেখিলাম যে, গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত জ্ঞানযোগ এবং গীতায় উপদিষ্ট জ্ঞানযোগ একই বস্তু। পরমধর্ম্মলাভের সাধনা শিক্ষা দিবার জন্য ব্রজলীলায় গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত মূল জ্ঞানযোগই পরে ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ গীতায় উপদেশ করিয়াছেন। গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত এবং গীতায় উপদিষ্ট জ্ঞানযোগই

বেদান্তে উপবিষ্ট জ্ঞানযোগ। "পরম" তত্ত্বের ব্যাখ্যায় আমরা পাইয়াছি যে কৃষ্ণই বেদান্তে নিরূপিত পরব্রহ্ম এবং পরাতত্ত্ব। বেদান্ত ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে জীব পরমেশ্বরের অংশ এবং জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে অংশ-অংশী, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, এবং উপাসক-উপাস্য সম্বন্ধ। এই তত্ত্বজ্ঞানে সংশয়হীন স্থিতিই জ্ঞানযোগ এবং ইহা আবশ্যক, তাহাও বেদান্তের উপদেশ।

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ……
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং……
বিমুক্তোহমৃতো ভবতি। মুণ্ডক ৩।২।৯

—"যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি শোক অতিক্রম করেন, পাপ অতিক্রম করেন, মুক্তিলাভ করেন, তাঁহার আর জন্মমৃত্যু হয় না।"

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। শ্বেত ১।১১

—"পরমেশ্বরকে জানিলে সমস্ত বন্ধন বিনষ্ট হয়, ত্রিতাপ দূরীভূত হয়, এবং জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ হয়।" ভাগবতের ১০।২৯।৩৩ শ্লোকে গোপীগণ নিত্যপ্রিয় কৃষ্ণের উপাসনা সম্বন্ধে যে জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিয়াছেন, বেদান্তও সেই শিক্ষাই দিয়াছেন।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। বৃহদারণ্যক ১।৪।৮

—"একমাত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরকে প্রিয়স্বরূপে উপাসনা করিবে।" কৃষ্ণ বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেই বেদ প্রকাশ করিয়া যে সনাতন সাধনপন্থায় পরমধর্ম্ম-লাভ হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বেদান্তে নিগূঢ়ভাবে উপদিষ্ট সেই সাধন-প্রণালীর অনুষ্ঠান ব্রজলীলায় গোপীগণ শিক্ষা দিয়াছেন এবং পরে তাহা কৃষ্ণের দ্বারা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

৯।৭।১০ গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত কর্ম্মযোগ

কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই, তথাপি তিনি জীবের কল্যাণের জন্য নিয়ত অতন্দ্রিতভাবে কর্ম্ম করেন। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণেরও কোন কর্ম্ম নাই, তথাপি ব্রজে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহারাও মানবের শিক্ষার জন্য কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহারা গার্হস্থ্য জীবনের সকল কর্ম্মই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মফলে আসক্তি ছিল না। তাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কৃষ্ণের প্রীতির জন্য কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতেন।

এবং সকল কর্ম্মফল কৃষ্ণকে সমর্পন করিতেন। তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠান উক্তরূপ ছিল বলিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে তাঁহারা কৃষ্ণের "অশুল্কদাসিকাঃ" (ভাগবত ১০।৩১।২)—বিনা বেতনের দাসী। সকল কর্ম্ম উক্তরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সকল কর্ম্মই কৃষ্ণের ভজনায় পরিণত হয়। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ম্মযোগ। গোপীগণ উক্তরূপ কর্ম্মযোগের সাধনা করিয়া মানবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে কেবল জ্ঞানযোগ অথবা কেবল ভক্তিযোগের দ্বারা কৃষ্ণকে লাভ করা যায় না, উক্তরূপ কর্ম্মযোগের সাধনাও আবশ্যক। জ্ঞানযোগে আরূঢ় না হইয়া মানব এইরূপ কর্ম্মযোগের সাধনা করিতে পারে না; বস্তুতঃ উক্তরূপ জ্ঞানযোগের ভিত্তিতেই এইরূপ কর্ম্মযোগ অধিষ্ঠিত।

৯।৭।১১ ইহাই গীতায় এবং বেদান্তে উপদিষ্ট কর্ম্মযোগ

গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত কর্ম্মযোগই গীতায় উপদিষ্ট কর্ম্মযোগ। কৃষ্ণ গীতায় কর্ম্মত্যাগের নিন্দা করিয়া নিয়ত কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে,

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। গীতা। ১৮।৪৫

—"মানবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া সম্যকপ্রকারে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।" কিরূপভাবে কর্ম্মনুষ্ঠান করিলে মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহাও কৃষ্ণ গীতায় উপদেশ করিয়াছেন।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। গীতা ২।৪৭

—"তোমার কেবলমাত্র কর্ম্মেই অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মফলে তোমার কোন অধিকার নাই।" সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে, সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে—কোনরূপ ফলকামনা না করিয়া, কৃষ্ণের প্রীতির জন্য মানবগণকে নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, এবং সকল কর্ম্মফল তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্‌ ॥ গীতা ৯।২৭

—"হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম-যজ্ঞাদি কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর তৎসমুদয় আমাকে সমর্পণ করিবে।" গীতায় উপদিষ্ট কর্ম্মযোগের ইহাই মুল কথা। গীতার এই কর্ম্মযোগের সাধনাই মানবকে গোপীগণের ন্যায় কৃষ্ণের অশুল্কদাসিকা করিতে

পারে। এইরূপ কর্ম্মযোগীর প্রত্যেকটী কর্ম্মই কৃষ্ণের অর্চ্চনা এবং সিদ্ধিলাভের সহায়ক।

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। গীতা ১৮।৩৫

—"মানব নিজ কর্ম্মের দ্বারা পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।" গীতার ঘোষণা এই যে,এইরূপ কর্ম্মযোগীই যথার্থ সন্ন্যাসী এবং তাঁহার সকল কর্ম্মবন্ধন অচিরে বিনষ্ট হয়। ভক্তি ব্যতীত এইরূপ কর্ম্মযোগের সাধনা হইতে পারে না; এইজন্য কর্ম্মযোগের সহিত ভক্তিযোগও অনুষ্ঠেয়। আমরা দেখিলাম, গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত কর্ম্মযোগই গীতায় উপদিষ্ট কর্ম্মযোগ। গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত কর্ম্মযোগ কৃষ্ণ পরে ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে গীতায় উপদেশ করিয়াছেন। ইহাই বেদান্তে উপদিষ্ট কর্ম্মযোগ। বেদান্তের ঘোষণা অনুসারেও, পরমেশ্বরকে লাভ করিতে হইলে বিষয়াসক্তিমূলক সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া, ফলকামনাহীন হইয়া এবং সকল কর্ম্মফল পরমেশ্বরকে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে।

তৎকর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্। শ্বেত ৬।৩

—"ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারই উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিয়া মানব কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগ লাভ করিতে পারে।"

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোহন্যঃ॥ শ্বেত ৬।৪

—"যিনি নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, এবং তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছেন, এইরূপ ভাবযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহার সকল কর্ম্মবন্ধন বিনষ্ট হয় এবং কর্ম্মক্ষয়ে তিনি আত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ করিয়া মায়াময় সংসারের অতীত হয়েন।" আমরা দেখিলাম যে, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে কৃষ্ণ বেদান্তে যে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রজলীলায় গোপীগণের দ্বারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত সেই কর্ম্মযোগেরই অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন এবং গীতায় সেই কর্ম্মযোগই উপদেশ করিয়াছেন।

৯।৭।১২ গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত ভক্তিযোগ

ভজনার ভাবই ভক্তি। স্বর্গাদি লাভের, জাগতিক ঐশ্বর্য্য সম্পদ যশ মান প্রভৃতি লাভের, যোগৈশ্বর্য্য লাভের, অথবা মোক্ষ লাভের কামনায় কৃষ্ণের

কিম্বা দেবদেবীর ভজনা করিবার যে ভাব, তাহা অশুদ্ধা ভক্তি। উক্তরূপ কোনপ্রকার কামনা না করিয়া, কেবলমাত্র কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কৃষ্ণকে ভজনা করিবার যে ভাব, তাহা শুদ্ধা ভক্তি। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ সাধিকা গোপীগণের সহিত স্বয়ং আচরণ করিয়া যে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শুদ্ধাভক্তির যোগ। কৃষ্ণকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঐকান্তিক নিষ্ঠার এবং আগ্রহের সহিত তাঁহাকে প্রণাম, এবং তাঁহার নাম, গুণ, লীলা কীর্ত্তন স্মরণ মনন জপ এবং ধ্যান, প্রধানতঃ ইহাই ভক্তিযোগের সাধনা। গোপীগণ এই প্রকারের ভক্তিযোগের সাধনা করিয়া ইহা মানকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারা অনুক্ষণ, এমন কি গৃহকর্ম্ম করিতে করিতেও কীর্ত্তন স্মরণ এবং মনন করিতেন। তাঁহারা কৃষ্ণের এবং তাঁহার লীলার ধ্যানও করিতেন। তাঁহারাই কৃষ্ণকে বলিয়াছেন, "বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্" (ভাগবত ১০।৩১।১০)—"তোমার লীলাবিহারের ধ্যান মঙ্গলজনক।" গোপীগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণের গুণ এবং লীলা বিষয়ে আলাপনও করিতেন এবং একত্রে কীর্ত্তনও করিতেন। এই ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগের সহিত অন্বিত। গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত যোগসাধনা জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগের সমন্বিত সাধনা এবং সমগ্রভাবে ইহাকে ভক্তিযোগ বলা যায়।

৯।৭।১৩ ইহাই গীতায় এবং বেদান্তে উপদিষ্ট ভক্তিযোগ

গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত ভক্তিযোগই গীতায় উপদিষ্ট ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের সাধনা সম্বন্ধে কৃষ্ণ গীতায় যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা এই :—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ গীতা। ৯।২৪

—"মহাত্মাগণ ঐকান্তিক যত্ন এবং দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সর্ব্বদা আমার নাম গুণ লীলা কীর্ত্তন করিয়া এবং আমায় প্রণাম করিয়া ভক্তির দ্বারা আমার সহিত নিত্যযুক্ত থাকিয়া আমার উপাসনা করেন। ভক্তিযোগের সাধনা ব্যতীত মানব কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে এবং তাঁহার নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে পারে না, কৃষ্ণ গীতায় তাহাও ঘোষণা করিয়াছেন।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ গীতা ১১।৫৪

—"হে পরন্তপ অর্জ্জুন, অনন্যভক্তির দ্বারাই আমাকে এইরূপে তত্ত্বতঃ জানিতে, প্রত্যক্ষ করিতে, এবং আমাতে অর্থাৎ আমার নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে পারা যায়।" ইহাই গীতায় উপদিষ্ট ভক্তিযোগসাধনার মূল কথা। গীতার ১২শ অধ্যায়ের ১৩-১৯ সংখ্যক সাতটী শ্লোকে কৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় ভক্তের যে বর্ণনা দিয়াছেন, গীতায় উপদিষ্ট জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ এবং ভক্তিযোগের সমন্বিত সাধনার দ্বারা তাঁহার তদ্রূপ প্রিয়ভক্ত হওয়া যাইতে পারে, নতুবা নহে। গীতায় কৃষ্ণ এই ত্রিবিধ যোগের সমন্বিত সাধনারই উপদেশ দিয়াছেন। আমরা পাইলাম যে, গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত ভক্তিযোগই গীতায় উপদিষ্ট ভক্তিযোগ এবং গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত ত্রিবিধ যোগের সমন্বিত সাধনাই গীতার উপদেশ। ইহাই বেদান্তে উপদিষ্ট ভক্তিযোগ। "ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।" ঈশ ১৮।—"হে ঈশ্বর, আপনার প্রতি আমরা বহু স্তুতি এবং প্রণাম করিতেছি।" "উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ।" মুণ্ডক ৩।২।১।—"যে ধীর ব্যক্তিগণ নিষ্কামভাবে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন।" "তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত।" তৈত্তিরীয় ৩।১০।৪।—"তিনি ব্রহ্ম, ইহা জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি যোগসাধনার উপদেশের উপক্রমে বলিয়াছেন: "যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ।" শ্বেত ২।৫।—"আমরা স্তুতি এবং প্রণতির দ্বারা সনাতন ব্রহ্মের সহিত যোগলাভের সাধনায় ব্রতী হইতেছি।" যোগসাধনায় উপদেশের উপসংহারেও এই শ্রুতি বলিয়াছেন:

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ শ্বেত ২।১৭

—"যে পরমেশ্বর অগ্নিতে, জলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে, সমগ্র ভুবনেই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করি।" বেদান্ত এই উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন। নামকীর্ত্তন, শ্রবণ, মনন, এবং ধ্যান, ভক্তিযোগের এই সাধনাগুলিও বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। "তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্।" কেন ৪।৬।—"পরব্রহ্ম কীর্ত্তনীয় নাম, অর্থাৎ পরব্রহ্মের নাম অবশ্যই কীর্ত্তনীয়, এবং নামকীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য।"

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা। কঠ ১।২।১৩

—"পরমেশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাহা সম্যক্‌প্রকারে গ্রহণ করিয়া মানব দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া অতি সূক্ষ্ম এবং দুরধিগম্য ধর্ম্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া মানব পরমানন্দ লাভ করে।" "মনসাভিক্লৃপ্তঃ।" কঠ ২।৩।৯। শ্বেত ৪।১৭—"মননের ফলে পরমেশ্বর অভিব্যক্ত হয়েন।" "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্।" শ্বেত ১।৩।—"যোগীগণ ধ্যানযোগে পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন।" "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" বৃহদারণ্যক ১।৪।৮।—"সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বরকে প্রিয়স্বরূপে উপাসনা করিবে।" আমরা দেখিলাম যে, পরমেশ্বরকে নিত্যপ্রিয় স্বরূপ জানিয়া তাঁহার কীর্ত্তন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান ভক্তিযোগের সাধনারূপে বেদান্ত কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে কৃষ্ণ বেদান্তে যে ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রজলীলায় রাধা এবং গোপীগণের দ্বারা তিনি সেই ভক্তিযোগেরই অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন এবং গীতায় সেই ভক্তিযোগই উপদেশ করিয়াছেন।

৯।৭।১৪ জীবাত্মার চিতের সাধনায় আনন্দের প্রেমবিকাশ

রাধা এবং তাঁহার গোলোকের সখীগণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; তাঁহাদের দেহদেহীভেদ নাই। কিন্তু মানবদেহ ত্রিগুণময়। মানবদেহে অবস্থিত জীবাত্মার চিদংশ মায়ার অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে দেহাভিমানী হয়। যতদিন চিৎ দেহাভিমানী থাকে ততদিন আনন্দাংশের প্রেমের বিকাশ হয় না। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগের সাধনা করে, জীবাত্মার চিৎ। বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়গণ চিতের চেতনা এবং জ্ঞানশক্তিতেই কার্য্য করে। চিৎ যোগসাধনাপরায়ণ হইলে বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়গণ চিতের সাধনার ফলে তাহার অনুগামী হইয়া তাহার সাধনার সহায়ক হয়। ইহার পরে জীবাত্মার চিতের দেহাভিমান দূর হয় এবং আনন্দের প্রেম বিকশিত হয়। চিৎ যেন ভগীরথ, এবং আনন্দ যেন গঙ্গা। চিৎ-ভগীরথ আনন্দ-গঙ্গাকে কৃষ্ণের আনন্দসিন্ধুতে মিলাইবার জন্য সাধনা করে। কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তনরূপ শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে চিৎ-ভগীরথ অগ্রে অগ্রে চলে এবং আনন্দ-গঙ্গা তাহার পশ্চাতে চলিতে থাকে। কিন্তু তখনও তমঃ রজঃ এবং সত্ত্ব গুণ আনন্দগঙ্গাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহে। তমোগুণরূপী রুদ্র মোহরূপ জটাজালে আনন্দগঙ্গাকে আবদ্ধ করে। চিৎ-ভগীরথ সাধনার দ্বারা তমঃ-রুদ্রকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার

মোহজটা হইতে আনন্দগঙ্গাকে নির্গত করে। আবার গতিপথে রজঃ-ঐরাবত আসিয়া আনন্দগঙ্গাকে সংসারে বদ্ধ রাখিতে চাহে, কিন্তু আনন্দগঙ্গার কৃষ্ণাভিমুখী ব্যাকুল গতির প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করে এবং আনন্দগঙ্গা চিৎ-ভগীরথের পশ্চাতে চলিতে থাকে। ইহার পর আসে সত্ত্বগুণরূপী জহ্নুমুণির বাধা। জ্ঞানচর্চ্চায় এবং বেদবিধির অনুষ্ঠানে রত সত্ত্ব-জহ্নু আনন্দগঙ্গাকে বেদবিধির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে। চিৎ-ভগীরথ সাধনার দ্বারা সত্ত্ব-জহ্নুকে অতিক্রম করিয়া আনন্দ-গঙ্গাকে সেই বাধা হইতে মুক্ত করে। ইহার পর আনন্দ-গঙ্গা অবাধ মুক্ত গতিতে চিৎ-ভগীরথের পশ্চাতে চলিয়া কৃষ্ণানন্দসিন্ধুতে গিয়া মিলিত হয়। তখন চিৎ-ভগীরথের সাধনার শেষ হয়; তখন সে নিজেও সেই কৃষ্ণানন্দসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া সেই আনন্দকেই জানিতে থাকে।

৯।৭।১৫ পূর্ব্বরাগ ও তন্ময়তা

এখানে রাগ শব্দের অর্থ প্রেম। পূর্ব্বোক্ত সাধনার ফলে প্রেম বিকশিত হইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণের প্রতি যে প্রগাঢ় প্রীতি, কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা, এবং তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল বিরহ উৎপন্ন হয়, তাহা রাগের প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলা হয়। পূর্ব্বরাগের উদয় হইবার পরে সাধক কৃষ্ণের নাম গুণ লীলা স্মরণ মনন কীর্ত্তন জপ এবং ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম নিত্য-বিকশিত, সুতরাং, তাঁহাদের সাধনার ফলে পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এরূপ বলা যায় না। কিন্তু সাধিকা গোপীগণের সহিত তাঁহারাও পূর্ব্বরাগের অবস্থা এবং তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ তন্ময়তা প্রকাশ এবং সম্ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিত্য বিকশিত প্রেমের স্বভাববশতঃ কৃষ্ণে তাঁহাদের তন্ময়তাও নিত্য-সিদ্ধ; এইজন্য, তাঁহারা সাধনার দ্বারা তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা প্রদর্শিত সাধনার প্রণালী অনুসারে ভজনাকারিণী সাধিকা গোপীগণের পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল এবং তাঁহারা তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন। গোপীগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রণালী অনুসারে সাধনা করিলে সকল নর-নারীই পূর্ব্বরাগ এবং তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে ৪৩।৪৪ শ্লোকদ্বয়ে আমরা গোপীগণের

পূর্ব্বরাগের সর্ব্বপ্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হই। কুঞ্চিতকুন্তলশোভিত মস্তকে শিখি-পুচ্ছের মুকুট ধারণ করিয়া, বক্ষে বন্যকুসুমের মাল্য পরিধান করিয়া, বেণু বাদন করিতে করিতে মনোহর নয়নভঙ্গি এবং মধুর হাস্যসহকারে, তাঁহার যশোগানে রত সখাগণের সহিত কৃষ্ণ যখন অপরাহ্নে গোষ্ঠ হইতে গোধন লইয়া ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, গোপীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য লোলুপ নেত্রে পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া তাঁহার লীলা গান করিতেন। তাঁহারা সলজ্জ হাস্যের এবং বিনয়ের সহিত কৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া দিবসের অদর্শনজাত বিরহ ব্যথা দূর করিতেন। ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ২১শ অধ্যায়ে কৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করিয়া গোপীগণ কৃষ্ণের বিষয়ে যে আলাপন করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বরাগপ্রকাশক। ভাগবতের এই পূর্ব্বরাগবর্ণনা ধর্ম্মজগতে এবং কাব্যজগতেও অপূর্ব্ব বস্তু, এবং ইহাই বৈষ্ণব কবিগণকে পূর্ব্বরাগবর্ণনার মূল উপাদান যোগাইয়া আসিতেছে। এই অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে ঃ

এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ॥ ভাগবত ১০।২১।২০

—"গোপীগণ বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণের লীলা পরস্পরকে বর্ণণা করিয়া শুনাইবার সময়ে তন্ময় হইতেন।" জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগের সাধক পূর্ব্বরাগ এবং তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, গীতায়ও তাহা উক্ত হইয়াছে।

মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা ১০।৯—১০

—"মচ্চিত্ত এবং মদ্গতপ্রাণ ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া এবং সর্ব্বদা আমার নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করিয়া তৃপ্তি এবং আনন্দ লাভ করেন। সেই সকল সততযুক্ত এবং প্রীতির সহিত ভজনাকারী ব্যক্তিগণকে সেই বুদ্ধিযোগ দান করি যদ্দ্বারা তাঁহারা আমায় প্রাপ্ত হয়েন।" গীতার যৌগিক ভাষায় ইহাই ভাগবতের পূর্ব্বরাগ এবং তন্ময়তা। বুদ্ধি যখন প্রীতির সহিত যোগসাধনা-পরায়ণ জীবাত্মার সাধনার সহযোগী হইয়া বিষয়চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ঐকান্তিক ধ্যানে মগ্ন হয়, তখন বুদ্ধির তদ্রূপ স্থিতিই বুদ্ধিযোগ। এইরূপ বুদ্ধিযোগই তন্ময়তা। সবিকল্প সমাধি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এবং যাঁহারা

নির্ব্বিকল্প সমাধিকে এবং মোক্ষকে সাধনার ফলে পরম প্রাপ্তি মনে করেন, তাঁহারাও, এই তন্ময়তার অবস্থাকে সবিকল্প সমাধি বা ভাবসমাধি নামে অভিহিত করেন; কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। তন্ময়তা সমাধি নহে।

৯।৭।১৬ মায়াতীত হইবার জন্য মায়াশক্তির অর্চ্চনা

নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের মহামায়ার অর্চ্চনার কোন প্রয়োজন ছিল না; মানবশিক্ষার জন্য তাঁহারা সাধিকাগোপীগণের সহিত ইহা করিয়াছিলেন। গোপীগণের পূর্ব্বরাগ এবং তন্ময়তার পরিচয় দিয়া ভাগবত তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কাত্যায়ণীব্রতের বিবরণ দিয়াছেন। এই কাত্যায়ণীব্রত মহামায়ার অর্চ্চনা। মহামায়া কৃষ্ণের মায়াশক্তির মূর্ত্ত রূপ। সুতরাং, মহামায়ার অর্চ্চনা কৃষ্ণের মায়াশক্তিরই অর্চ্চনা। জীবাত্মা মায়াশক্তির প্রভাবেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া দেহাভিমানী হয়; মায়াশক্তির প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া মায়াতীত হইলে কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া জীবাত্মা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে তাহার কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ হয়। পূর্ব্বরাগ এবং তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেও জীবাত্মা মায়াতীত এবং মুক্ত হয় না এবং তাহা না হওয়ায় তাহার প্রেমবিকাশও হয় না। এই অবস্থায় সাধককে মায়াতীত হইবার জন্য বিশেষভাবে কৃষ্ণের শরণ লইতে হয়। মায়াশক্তি কৃষ্ণের; কৃষ্ণই মায়াশক্তির অধীশ্বর। তিনি ভিন্ন মানবকে কেহই তাঁহার মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে পারেন না। কৃষ্ণ বলিয়াছেন:

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা ৭।১৪

—"আমার ত্রিগুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়া। যাহারা আমার শরণ লয়, তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ, আমি তাহাদিগকে মায়ামুক্ত করি।" শ্রুতিও বলিয়াছেন:

তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তি॥ শ্বেত ১।১০

—"পরমেশ্বরের ধ্যান, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য যোগসাধনা, এবং তাঁহার তত্ত্ববোধের ফলে সংসারে বন্ধনকারী মায়া হইতে মুক্তিলাভ হয়।" যোগসাধনার ক্ষেত্রে, কৃষ্ণেরই বিধান অনুসারে, মায়ামুক্ত হইবার জন্য তাঁহার মায়াশক্তির মূর্ত্ত রূপ মহামায়ার শরণ লইয়া অর্চ্চনা করিলে কৃষ্ণেরই শরণ লওয়া এবং অর্চ্চনা করা হয়, কারণ কৃষ্ণ এবং তাঁহার শক্তি অভিন্ন। ঐশ্বর্য্য সম্পদ যশ মান

প্রভৃতি কোন বিষয় কামনায় মহামায়ার অর্চ্চনা করিলে তদ্দারা মুক্তিলাভ হয় না। কেবলমাত্র মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির দৃঢ় সঙ্কল্প এবং প্রার্থনা লইয়া কৃষ্ণের মায়াশক্তির অর্চ্চনা করিলে তিনি মায়ামুক্ত করেন। মুক্তি, প্রেমের বিকাশ, এবং নিত্যলীলায় কৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে মানবকে মায়াতীত হইবার জন্য মহামায়ার অর্চ্চনা করিতেই হইবে, ইহা মানবকে শিক্ষা দিবার জন্য নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ভাগবতে কেবল রাধা এবং গোপীগণের দ্বারা মহামায়ার অর্চ্চনাই উল্লিখিত হয় নাই, ১০ম স্কন্ধের ৩৪শ অধ্যায়ে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে ব্রজবাসী সকল গোপগোপীগণ ব্রজের অন্তর্গত অম্বিকাবনে অম্বিকার অর্থাৎ মহামায়ার, অর্চ্চনা করিতেন। মুক্তিলাভের এবং প্রেমবিকাশের সাধনায় গোপীগণের ন্যায় মহামায়ার অর্চ্চনা অলঙ্ঘ্য নিয়ম; ইহা না করিলে মানবের সদ্‌গুরু লাভ হয় না, প্রেমের বিকাশ হয় না, এবং নিত্যলীলায় কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে এই অর্চ্চনা সমাপন করিয়া আসেন বলিয়া বর্ত্তমান জন্মে তাঁহারা আর ইহা না করিয়াও সদ্‌গুরুলাভ এবং মুক্তিলাভ করিয়া কৃষ্ণকে প্রপ্ত হয়েন, কিন্তু ইহা না করিয়া কেহই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

৯।৭।১৭ গোপীগণের কাত্যায়ণীব্রত

রাধা এবং গোপীগণ মহামায়ার যে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাহাকে তাঁহাদের কাত্যায়ণীব্রত বলা হয়। মহামায়ারই অন্য নাম কাত্যায়ণী। গোপীগণ সমগ্র কার্ত্তিক মাস হবিষ্য ভোজন করিতেন এবং প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া একত্র মিলিত হইয়া কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে যমুনাতীরে গিয়া মহামায়ার বালুকাময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহারা দেবীর নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেন:

কাত্যায়ণি! মহামায়ে! মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥ ভাগবত ১০।২২।৪

—"হে দেবি কাত্যায়ণি! মহামায়ে! মহাযোগিণি! অধীশ্বরি! আমি তোমায় প্রণাম করি। তুমি নন্দগোপসুত কৃষ্ণকে আমার পতি করিয়া দাও। ব্রজের কুমারীগণ এই মন্ত্র জপ করিয়া মহামায়ার পূজা করিয়াছিলেন।"

৯।৭।১৮ কৃষ্ণ ও গোপীর পতিপত্নীত্ব পরমভাব ঃ জীবাত্মাও পরাপ্রকৃতি

গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়ণীব্রত করিয়াছিলেন, উপপতিরূপে পাইবার জন্য নহে। পতিরূপে পাইবারও অর্থ এরূপ নহে যে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বেদবিধি অনুসারে বিবাহ করিয়া বেদবিহিত গার্হস্থ্য জীবন যাপন করুন। নর-নারীগণ বেদবিধি অনুসারে বিবাহ করিলে তাহাদের মধ্যে পতিপত্নী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং বেদবিধি লঙ্ঘন করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে উপপতি-উপপত্নী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বেদবিহিত পতিপত্নী সম্বন্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ উপপতি-উপপত্নী সম্বন্ধ, দুই-ই অধিভূত ক্ষরভাবের ভূমির লিঙ্গ-ভেদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দৈহিক সম্বন্ধ ; দৈহিক সম্বন্ধ মাত্রেই প্রাকৃত বস্তু এবং ইহার আদি ও অন্ত আছে। এই সম্বন্ধের আরম্ভ হয় বিবাহে এবং অবসান হয় মৃত্যুতে ; ইদানীং পতিপত্নী-সম্বন্ধ আইন আদালতেও বিচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ৬।৩।১ অনুচ্ছেদে কৃষ্ণের এবং রাধার পতিপত্নীত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা পাইয়াছি যে সেই পতি-পত্নীত্ব নিত্য ; ইহার আদি নাই এবং অন্তও নাই ; কারণ ইহা কৃষ্ণের সহিত তাঁহারই পরাপ্রকৃতির সম্বন্ধ এবং কৃষ্ণ ও তাঁহার পরাপ্রকৃতি দুই-ই নিত্য এবং আদ্যন্তহীন। রাধাকৃষ্ণের এই যে নিত্য এবং আদ্যন্তহীন পতিপত্নাত্ব, ইহাই গোপীগণ মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের আপনাদের জন্য এই প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তাঁহারাও সাধিকা গোপীগণের সহিত একত্রে এই প্রার্থনা করিয়াছেন, সাধিকা গোপী-গণকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার জন্য যে কৃষ্ণের সহিত জীব-মাত্রেরই এইরূপ নিত্য এবং আদ্যন্তহীন পতিপত্নী-সম্বন্ধ, এবং নর-নারী সকলেরই সেই সম্বন্ধটী জ্ঞাত হইয়া তাহা সম্ভোগ করিবার জন্য সাধনা করা কর্ত্তব্য। নর এবং নারী সকলেরই দেহ অপরা প্রকৃতি এবং জীবাত্মা পরাপ্রকৃতি ; এই তত্ত্ব কৃষ্ণ গীতায় ঘোষণা করিয়াছেন।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ গীতা ৭।৪—৫

এই শ্লোকদ্বয়ে নিহিত অর্থ ঃ—"ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ ব্যোম মন বুদ্ধি

অহঙ্কার, এই আট প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন রূপে কৃষ্ণের অপরা প্রকৃতি বিভক্ত। গন্ধ রস রূপ স্পর্শ এবং শব্দ, এই পঞ্চ তন্মাত্রা উক্ত পঞ্চ স্থূল ভূতের অব্যবহিত কারণ, এবং অহঙ্কার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অব্যবহিত কারণ। এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের অব্যবহিত কারণ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব জীবমাত্রেরই দেহের উপাদান। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা প্রকৃতি; ইহা হইতে উদ্ভূত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বও অপরা প্রকৃতি। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমবায়ে গঠিত সকল জীবদেহই অপরাপ্রকৃতি। সকল দেহের জন্মমৃত্যু আছে, স্থতরাং আদি ও অন্ত আছে। আদ্যন্তবিশিষ্ট দেহের সম্বন্ধও আদ্যন্তবিশিষ্ট; এইজন্য দৈহিক পতিপত্নী সম্বন্ধও আদ্যন্তবিশিষ্ট। কৃষ্ণের চিদানন্দ পরাপ্রকৃতি এবং পরমভাব। জীবমাত্রেরই দেহে অবস্থিত জীবাত্মা কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ; এইজন্য জীবাত্মামাত্রেই পরাপ্রকৃতি এবং পরমভাব। অপরাপ্রকৃতি-দেহ এবং পরাপ্রকৃতি-জীবাত্মা, এই দুইয়ের সমবায় জীব। স্থতরাং নরই হউক অথবা নারীই হউক, মানবমাত্রেই কৃষ্ণের প্রকৃতি। অপরাপ্রকৃতি-দেহ জড় এবং অচেতন বস্তু; ইহার মধ্যে পরাপ্রকৃতি-জীবাত্মা থাকে বলিয়া ইহা সচেতন এবং সপ্রাণ হয়, নতুবা দেহ বাঁচিয়া থাকে না এবং জগৎও রক্ষা পায় না। এইজন্য কৃষ্ণ বলিলেন যে তাঁহার পরাপ্রকৃতি-চিদানন্দ জীবভূত হইয়া অর্থাৎ জীবাত্মারূপে সকল জীবদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগতকে রক্ষা করিতেছে।" আমরা পাইলাম যে, নর এবং নারী সকলেরই জীবাত্মা কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ, পরাপ্রকৃতি, এবং পরমভাব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অপরাপ্রকৃতি-জীবাত্মায় হ্লাদিনী এবং প্রেম আছে। ইহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জীবাত্মার স্ত্রীপুরুষাদি লিঙ্গভেদ নাই; না থাকিবার কারণ, জীবাত্মা পরাপ্রকৃতি এবং পরমভাব। এইজন্য, কৃষ্ণের সহিত রাধার যে পতি-পত্নী সম্বন্ধ জীবাত্মারও সেই পতিপত্নী-সম্বন্ধ; অর্থাৎ নরই হউক অথবা নারীই হউক, সকলেরই জীবাত্মার কৃষ্ণের সহিত উক্তরূপ পতিপত্নী-সম্বন্ধ। জীবাত্মা জন্মমৃত্যুহীন, অর্থাৎ আদ্যন্তহীন; এইজন্য, কৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার উক্তরূপ পতিপত্নী-সম্বন্ধও আদ্যন্তহীন, স্থতরাং, নিত্য। যতদিন জীবাত্মার প্রেমের বিকাশ না হয়, ততদিন সে এই সম্বন্ধটীর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং সম্ভোগ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু তাহার এই সম্বন্ধ থাকেই। প্রেমের বিকাশ হইলে জীবাত্মা এই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং সম্ভোগ প্রাপ্ত হয়; একবার ইহা প্রাপ্ত

হইলে আর কখনও ইহা হারাইতে হয় না, কারণ যে জীবাত্মার প্রেমের বিকাশ হইয়াছে কৃষ্ণ তাহাকে নিত্যলীলার পরিকররূপে গ্রহণ করেন। গোপীগণ কাত্যায়নীব্রত, এবং মহামায়ার নিকট কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার প্রার্থনা করিয়া কৃষ্ণের সহিত নর-নারীগণের উক্তরূপ সম্বন্ধের তত্ত্বও শিক্ষা দিয়াছেন এবং প্রেমবিকাশ ও এই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং সম্ভোগ প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহাদের দ্বারা প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে সাধনা করিতেও শিক্ষা দিয়াছেন। গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত এই যে নিগূঢ়তম এবং নিবিড়তম সম্বন্ধের তত্ত্বটী শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা কেবল গীতার পূর্ব্বোদ্ধৃত ৭।৫ শ্লোকেই ঘোষিত হয় নাই, বেদান্তেও এই সম্বন্ধ নিরূপিত এবং ঘোষিত হইয়াছে। আমরা সুষুপ্তিতে কৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার মিলনলাভের বিষয়ে আলোচনায় বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৩।২১ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি যে সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত স্ত্রীপুরুষের আলিঙ্গনের ন্যায় মিলন এবং আনন্দ লাভ করে। এতদ্দারা বেদান্ত কেবল সুষুপ্তি-তত্ত্বই ব্যক্ত করেন নাই, ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, জীবাত্মা কৃষ্ণের পরা-প্রকৃতি এবং কৃষ্ণের সহিত তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকারের নিত্য এবং আদ্যন্তহীন পতিপত্নী সম্বন্ধ, এবং ইহার সম্ভোগেই পরম আনন্দ। এইজন্য উক্ত শ্রুতি ১।৪।৮ সূত্রে কৃষ্ণকে প্রিয়স্বরূপে, অর্থাৎ প্রিয়তম নিত্যপতিরূপে উপাসনা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এবং গর্গসংহিতায় বিবৃত, ব্রজধামে সঙ্গোপনে ব্রহ্মার দ্বারা নির্ব্বাহিত, কৃষ্ণের সহিত রাধার বিবাহ লোকাতীত লীলার লোকাতীত বিবাহ, লৌকিক লীলার লৌকিক বিবাহ নহে। ইহা যদি লৌকিক বিবাহ হইত, তাহা হইলে রাধার পিতামাতা অভিমন্যু গোপের (ওর্ফে আয়ান ঘোষের) সহিত পুনরায় রাধার লৌকিক বিবাহ দিতেন না।

৯।৭।১৯ বস্ত্রহরণলীলা

বস্ত্রহরণলীলা কৃষ্ণের এবং নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের আনন্দলীলা, সাধিকা গোপীগণের কৃষ্ণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, এবং কৃষ্ণকে নিত্যলীলায় পাইতে ইচ্ছুক সকল নরনারীকে উক্তরূপ আত্মসমর্পণের শিক্ষা। এই লীলার পরিচয় হইতে ইহা পরিস্ফুট হইবে। সমগ্র কার্ত্তিক মাস গোপীগণ কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রত-উদ্যাপনের দিবসের প্রাতঃকালে তীরে বস্ত্র রাখিয়া স্নান করিতে

যমুনায় নামিলেন। তাঁহারা যখন নগ্নদেহে যমুনায় স্নান করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণ কয়েকজন সমবয়স্ক সখার সহিত আসিয়া অলক্ষিতে বস্ত্রগুলি হরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং সখাগণের সহিত হাস্য করিতে করিতে গোপীগণকে তাঁহার নিকটে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ করিতে বলিলেন। কৃষ্ণ এবং নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ পরমভাব; পরমভাবে লিঙ্গভেদজ্ঞান নাই। ক্ষরভাবের ভূমির লিঙ্গভেদজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে লজ্জা, তাহা প্রাকৃত লজ্জা। প্রাকৃতস্ত্রীসুলভ লজ্জা লিঙ্গভেদজ্ঞানের ফল; নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে কৃষ্ণের নিকট প্রাকৃতস্ত্রীসুলভ লজ্জা ছিল না; তাঁহারা যে প্রাকৃতস্ত্রীসুলভ লজ্জা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লৌকিক লীলায় লৌকিক আচরণ। কিন্তু সাধিকা-গোপীগণের মধ্যে তখনও এইরূপ লজ্জা ছিল। জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া গোপীগণ কৃষ্ণকে বলিলেন:

শ্যামসুন্দর! তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ! নো চেদ্‌রাজ্ঞে ব্রুবামহে॥ ভাগবত ১০।২২।১৫

—"হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী; তুমি আমাদিগকে যাহা করিতে বলিবে আমরা তাহাই করিব। আমাদের বস্ত্র দাও, নতুবা আমরা রাজাকে বলিয়া দিব।" কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা যদি আমার দাসী এবং আমার আদেশ পালন করিবে, তবে আমার নিকটে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।" কৃষ্ণ পুনরায় উক্ত আদেশ করিলে গোপীগণ নগ্নদেহেই জল হইতে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু করপল্লবদ্বয় দ্বারা গুহ্যাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন "তোমরা ব্রতাচরণকালে নগ্নদেহে স্নান করিয়া দেবহেলন করিয়াছ। অপরাধস্খালনের জন্য তোমাদের যুক্তকরপল্লবদ্বয় মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া এবং নতমুখ হইয়া প্রণাম করিয়া তোমাদের বস্ত্র গ্রহণ কর।" তাঁহার আদেশ অনুসারে গোপীগণ যুক্তকর মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া অশেষকর্ম্মা পরমপুরুষ কৃষ্ণকেই প্রণাম করিলেন। সাধিকা গোপীগণের কৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা হইল। কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহারা বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণের নিকট হইতে চলিয়া যাইলেন না, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার জন্য সেইখানেই দণ্ডায়মানা রহিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন:

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিত সোহসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ভাগবত ১০।২২।২৫

—"হে সাধ্বীগণ, তোমরা আমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমার আরাধনা করিতে চাও, তোমাদের এই সঙ্কল্প আমি জানি। আমি তোমাদের এই সঙ্কল্প অনুমোদন করিলাম; ইহা সত্য হইবার যোগ্য।" এই উক্তির দ্বারা কৃষ্ণ সাধিকা গোপীগণকে নিত্যলীলায় গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। এই উক্তি করিয়াই কৃষ্ণ বলিলেন ঃ

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে ॥ ভাগবত ১০।২২।২৬

—"যাহাদের বুদ্ধি আমাতে আবেশিত হইয়াছে, আমার প্রতি তাহাদের যে কাম, তাহা প্রাকৃত কাম নহে, কারণ ধান্যকে ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে যেমন তাহার মধ্য হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয় না, তদ্রূপ আমাতে আবেশিত বুদ্ধি হইতে প্রাকৃত কাম উদ্গত হয় না।" এতদ্বারা কৃষ্ণ জানাইলেন যে তাঁহার সহিত পতিপত্নী সম্বন্ধ এবং নিত্যলীলা পরমভাব, তাহাতে লিঙ্গভেদজ্ঞান এবং প্রাকৃত কাম নাই, তাঁহার প্রতি যে কাম তাহা অপ্রাকৃত কাম, অর্থাৎ প্রেম, এবং প্রেমও পরমভাব। এই উক্তির দ্বারা কৃষ্ণ জগৎবাসী সকলকেই জানাইলেন যে, তিনি গোপীগণের সহিত যে মধুরভাবের লীলা করিবার অঙ্গীকার পরবর্ত্তী শ্লোকেই করিতেছেন, যে লীলা ভাগবতে রাসলীলা নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাকৃত কাম নাই এবং তাহা প্রাকৃত কামক্রীড়া নহে। অতঃপর কৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥ ভাগবত ১০।২২।২৭

—"হে অবলাগণ, হে সতীগণ, তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাত্যায়ণীব্রত করিয়াছ, তোমাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ তোমারা নিত্যলীলায় আমায় পতিরূপে পাইয়াছ। আগামী রাত্রিসকল তোমরা আমার সহিত রমণ করিবে, অর্থাৎ, আমার সহিত মধুরভাবের লীলার দ্বারা মধুর রস সম্ভোগ করিবে।" কৃষ্ণ তাঁহার এই অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন। মানব যখন মায়ামুক্ত হইবার জন্য কৃষ্ণের মায়াশক্তির অর্চ্চনা করে, কৃষ্ণ তাহারও বস্ত্র হরণ করেন। জাতি কুল মান ঐশ্বর্য্যসম্পদ পদমর্য্যাদা ভোগসুখ প্রভৃতির দ্বারা দেহাভিমানী মানব আপনাকে আবৃত রাখিয়াছে। এই সমূহের মধ্যে কোন একটীকে হারাইয়া মানব লোকচক্ষুতে ক্ষুদ্র হইতে লজ্জা বোধ করে। যে মানব কৃষ্ণকেই চাহে,

কৃষ্ণ তাহার এই দেহাভিমানরূপ বস্ত্র হরণ করিয়া তাহাকে তাহার পরাপ্রকৃতি এবং পরমভাব স্বরূপে অবস্থিত করেন। তখন সেই স্বরূপে স্থিত মানবাত্মা গোপীগণের ন্যায় ক্ষোভহীন অবস্থায় বলিতে পারে, "শ্যামসুন্দর! তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্"; কৃষ্ণ তখন তাহাকে দর্শন দিয়া মুক্তিদান করেন। বস্ত্রহরণ লীলা হইতে রাসলীলার সূত্রপাত, এইজন্য প্রথমে এই লীলাটীর মর্ম্ম বুঝিলে রাসলীলা বুঝা যায়।

৯।৭।২০ লৌকিক দৃষ্টিতেও বস্ত্রহরণলীলা দোষহীন

বস্ত্রহরণলীলার গূঢ়তত্ত্বটী না বুঝিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে ইহা দোষাবহ। কিন্তু ইহার মর্ম্মটী বুঝিলে ঐরূপ মত প্রকাশের কারণ থাকে না। লৌকিক দৃষ্টিতেও ইহা দোষাবহ নহে। এই লীলার সময় কৃষ্ণ সপ্তম বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টম বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সখাগণ এবং গোপীগণ তাঁহার প্রায় সমবয়স্ক এবং সমবয়স্কা। এইরূপ সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের মনে কুভাবের উদয় হয় না। আজিও ভারতের বহু গ্রামাঞ্চলে এইরূপ বয়সের বালকবালিকাগণ নগ্নদেহে একত্র খেলা করিয়া বেড়ায়; ইহা তাহাদের অভিভাবকগণ এবং প্রতিবেশীগণ দোষাবহ বলিয়া মনে করে না।

৯।৭।২১ মুক্তি ও পঞ্চমপুরুষার্থ

মানব গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ এবং ভক্তিযোগের সাধনা করিয়া তাঁহাদের ন্যায় কৃষ্ণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে কৃষ্ণ মানবকে দর্শন দান করেন। এই দর্শনদান কেবল মুক্তিদানের নিমিত্ত। ইহাই যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত ব্রহ্মদর্শন। এই দর্শনলাভের ফলে মানব মুক্ত অবস্থা লাভ করে; এই অবস্থাই মুক্তি, মোক্ষ, বা নির্ব্বাণ। সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন যে অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলেই মানব মুক্তি লাভ করে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডক ২।২।৮

মোক্ষলাভই যাঁহাদের লক্ষ্য এবং যাঁহারা কৃষ্ণকে কেবল মুক্তিদাতারূপেই ভজনা করেন, সেই সকল যোগী এই মুক্তির অবস্থাতেই থাকিয়া যান; তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারেন না, কারণ মুক্তিদাতা মুক্তি দিয়াছেন এবং

তাঁহাদের লক্ষ্যলাভ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ যোগীগণ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন এবং মৃত্যুর পরে সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাঁহাদের দেহ স্বীয় কারণে বিলীন হইয়া যায়, তাঁহাদের জীবাত্মা কৃষ্ণের চিদানন্দে বিলীন হইয়া যায়, তাঁহাদের আর কোন সত্ত্বাই থাকে না। এইরূপ কেবল মোক্ষকামী যোগীগণ কৃষ্ণকে নিত্যলীলায় প্রাপ্ত হয়েন না; এইজন্য তাঁহারা পরিণয়, অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত মিলনসম্ভোগ, লাভ করিতে পারেন না। ব্রজলীলায় কৃষ্ণ এবং গোপীগণ যে পরমধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা কেবল মোক্ষলাভের ধর্ম্ম নহে, তাহা পরিণয়লাভের ধর্ম্ম। প্রেমের বিকাশ না হইলে পরিণয়লাভ হয় না। প্রেম, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের অতীত; এইজন্য প্রেম পঞ্চমপুরুষার্থ নামে অভিহিত হয়। ব্রজলীলায় পঞ্চমপুরুষার্থের পরমধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে। পঞ্চমপুরুষার্থ লাভ না হইলে জীবাত্মা পরিণয় প্রাপ্ত হয় না। পরিণয়লাভ যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা মায়াতীত ও মুক্ত অবস্থা পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; তাঁহারা মুক্তাবস্থা পাইয়া পরিণয়ের জন্য ব্যাকুলভাবে সাধনা করিতে থাকেন। এইরূপ সাধনার ফলে প্রেমের বিকাশ হয়। মোক্ষলাভ প্রেমবিকাশের সাধনার প্রাথমিক সিদ্ধি এবং সোপান। গোপীগণ যেমন কৃষ্ণের নিকট হইতে বস্ত্র ফিরিয়া পাইবার পরেও চলিয়া যান নাই, তাঁহার নিকট রাসলীলার অঙ্গীকার না পাওয়া পর্য্যন্ত দণ্ডায়মানা রহিলেন, সাধক যদি মুক্তিলাভের পরেও পরিণয়লাভের জন্য ব্যাকুল হয়, কৃষ্ণ তাঁহাকেও পরিণয় অঙ্গীকার করেন।

৯।৭।২২ মুক্তির পর প্রেমের বিকাশ: প্রেম নিত্যসিদ্ধ

পঞ্চমপুরুষার্থ যাঁহাদের লক্ষ্য, মুক্তাবস্থালাভের পর তাঁহাদের জীবাত্মার আনন্দাংশের প্রেম বিকশিত হয়। প্রেম সাধনার দ্বারা লভ্য নহে; জীবাত্মার আনন্দাংশে প্রেম আছেই; চিৎ মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে প্রেমের বিকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়াছেন:

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ চৈঃ। চঃ। মধ্য ২২ শ পঃ

—"কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ, কারণ ইহা জীবাত্মার আনন্দাংশে বিদ্যমান আছেই; ইহা সাধ্য নহে, অর্থাৎ সাধনার দ্বারা ইহা লভ্য নহে। শ্রবণাদির, অর্থাৎ

জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ এবং ভক্তিযোগ সাধনার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ হয়।" সাধনার ফলে কৃষ্ণকৃপা এবং কৃষ্ণের দর্শন লাভ হয়, তখন মানব মুক্ত এবং শুদ্ধ হয়, এবং তাহার কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ হয়, ইহাই মহাপ্রভুর দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

কৃষ্ণকৃপা হইতে হয় স্বভাব উদয়। চৈঃ। চঃ। মধ্য ২৪শ পঃ

জীবাত্মার আনন্দাংশের প্রেমই জীবাত্মার স্বভাব ; কৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার দর্শন এবং মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রেমের বিকাশ হয় ; ইহাই মহাপ্রভুর এই উক্তিরও অর্থ। ভজনার ভাব ভক্তি ; এই ভক্তি থাকিলে অধ্যাত্মযোগ-সাধনা হইতে পারে ; এইজন্য অধ্যাত্মযোগসাধনাকে অভিধেয় ভক্তি বলা হয়। এই ভক্তি প্রেম নহে। এই ভক্তির ফলে কৃষ্ণকৃপা, কৃষ্ণদর্শন, এবং মুক্তি লাভ হয় এবং প্রেমের বিকাশ হয়। এইজন্য বলা হয় যে, ভক্তির দ্বারা ভগবান লভ্য। কিন্তু ভক্তি, পরাভক্তি, এবং প্রেমভক্তি এই শব্দত্রয়ও প্রেম অর্থে ব্যবহৃত হয়। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তি শব্দটীকে প্রেম অর্থে ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন, "সন্তানের মুখ না দেখিলে যেমন অপত্যস্নেহ জন্মে না, সেইরূপ ভক্তবৎসল সেই পরমেশ্বরকে না পাইলে—তাঁহার প্রসন্ন মুখ না দেখিলে ভক্তিলাভ হইতে পারে না।" গীতাও এই তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ গীতা ১৮।৫৪

—"মুক্ত আত্মা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় ; এইরূপ অবস্থায় সেই আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে, শোকহীন, কামনাহীন, এবং সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হয়। সেই আত্মা আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করে, অর্থাৎ তাহার প্রেমের বিকাশ হয়।" ছান্দোগ্য শ্রুতি ৮।৩।৪ সূত্রে "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" বাক্যদ্বারা ঘোষণা করিয়াছেন যে মুক্ত জীবাত্মা স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ তাহার দেহাভিমানী অবস্থায় যে স্বরূপ আচ্ছাদিত থাকে, মুক্তাবস্থায় তাহারই প্রকাশ হয়, নূতন স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না। উদ্ধৃত ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্য "স্বেন" শব্দ ব্যবহার করিয়া যে এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মসূত্রে নিরূপিত হইয়াছে।

সংপদ্যাবির্ভাবঃ, স্বেনশব্দাৎ। ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১

—"জীবাত্মা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে প্রকাশ পায়, বেদান্ত "স্বেন" শব্দের দ্বারা ইহা নিরূপণ করিয়াছেন।" জীবাত্মার স্বরূপেই প্রেম আছে ;

এইজন্য, পঞ্চমপুরুষার্থ লক্ষ্য হইলে, জীবাত্মা যখন মুক্তাবস্থায় স্বরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহার প্রেমও প্রকাশ পায়। "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা" শ্লোকে (ভা ১১।২।৩৮) ভাগবতও এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন।

নাম্না হি লভ্যতে ভক্তির্ভক্ত্যা প্রেম হি লভ্যতে। বৃহন্নারদীয় পুরাণ

—"ভগবানের নামসাধনার দ্বারা ভক্তি লাভ হয়, এবং ভক্তির অর্থাৎ ভক্তিযোগের সাধনার ফলে প্রেম লাভ হয়।" এই শাস্ত্রবাক্য হইতেও পাওয়া যাইতেছে যে, ভক্তি এবং প্রেম একই বস্তু নহে, ভক্তির ফলে প্রেম লাভ হয়। নিত্যসিদ্ধ প্রেমের বিকাশই প্রেমলাভ। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের প্রেমের নিত্য বিকাশ, কিন্তু সাধিকা গোপীগণের মুক্তাবস্থায় প্রেমবিকাশ হইয়াছিল; এই অবস্থা লাভ করিলে নরনারীগণেরও প্রেমবিকাশ হয়। মুক্তাবস্থালাভে দৈহিক আমিত্ব (কাঁচা আমি) অন্তর্হিত হয়; প্রেমবিকাশে আত্মিক আমিত্ব (পাকা আমি) প্রকাশিত হয়। ইহার পরে জীবাত্মা কৃষ্ণকে নিত্যলীলায় প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার উপাসনা করে। ইহাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঘোষণা করিয়াছেন।

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥ চৈঃ চঃ। মধ্য ২৪ শ পঃ

এই উক্তির মর্ম্ম এই যে, ভক্তিযোগের সাধনার ফলে কৃষ্ণদর্শনলাভে মুক্তি হয় এবং মুক্তিলাভের পরে প্রেমবিকাশ হইলে কৃষ্ণকে নিত্যলীলায় প্রাপ্তি এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ আরাধনা হয়।

৯।৭।২৩ প্রেমের সহিত ভাবের বিকাশ : ব্রজের পঞ্চমপুরুষার্থ

যখন প্রেমের বিকাশ হয়, তখন প্রেমের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, অথবা মধুর ভাবেরও বিকাশ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মার চিৎ সাধনা করে। সাধকাবস্থায় যাহার চিৎ ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধ-প্রকাশক "তত্ত্বমসি" বাক্যের অভেদসম্বন্ধটীতে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণের সহিত স্বীয় অভেদ ভাবনা করে, তাহার প্রেম শান্তভাব লইয়া বিকশিত হয়; যাহার চিৎ কৃষ্ণের প্রভুত্বে আকৃষ্ট হইয়া "কৃষ্ণ নিত্যপ্রভু" জ্ঞানে দৃঢ় হইয়া কৃষ্ণকে প্রভু ভাবনা করে, তাহার প্রেম দাস্যভাব লইয়া বিকশিত হয়; যাহার চিৎ কৃষ্ণের সখ্যে আকৃষ্ট হইয়া "কৃষ্ণ নিত্যসখা" জ্ঞানে দৃঢ় হইয়া কৃষ্ণকে সখা ভাবনা করে, তাহার প্রেম সখ্যভাব লইয়া বিকশিত হয়; যাহার চিৎ কৃষ্ণের শিশুভাবে

আকৃষ্ট হইয়া "কৃষ্ণ নিত্যপাল্য" জ্ঞানে দৃঢ় হইয়া কৃষ্ণকে সন্তান ভাবনা করে, তাহার প্রেম বাৎসল্যভাব লইয়া বিকশিত হয়; যাহার চিৎ কৃষ্ণের পরম-পুরুষত্বে এবং পরমপতিত্বে আকৃষ্ট হইয়া "কৃষ্ণ নিত্যপতি" জ্ঞানে দৃঢ় হইয়া কৃষ্ণকে কান্ত ভাবনা করে, তাহার প্রেম মধুরভাবের সহিত বিকশিত হয়। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের নিত্য মধুর ভাব। সাধিকা গোপীগণ "কৃষ্ণ নিত্যপতি" জ্ঞানে তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের প্রেম মধুরভাবের সহিত বিকশিত হইয়াছিল। নরনারীগণের জীবাত্মার চিতে কৃষ্ণের সহিত যেরূপ সম্বন্ধজ্ঞান দৃঢ় হয়, সেইরূপ ভাব লইয়া তাহাদের প্রেমের বিকাশ হয়। শান্তভাবের উপাসক দাস্য সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুরভাবের ভজনায় আকৃষ্ট হইয়া উক্ত সম্বন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটীর অনুযায়ী কৃষ্ণের ভাবনা করিলে তাঁহার তদনুরূপ দাস্য সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুর ভাবের বিকাশ হইতে পারে। দাস্যভাবের উপাসকের ঐরূপে সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুর ভাবের বিকাশ হয়। সখ্যভাবের উপাসকেরও ঐরূপে বাৎসল্য অথবা মধুর ভাবের বিকাশ হইতে পারে। বাৎসল্যভাবের উপাসকেরও ঐরূপে মধুরভাবের বিকাশ হইতে পারে। মধুর ভাবে সর্ব্ব ভাবের সমাহার আছে। প্রেমের বিকাশই পঞ্চমপুরুষার্থলাভ। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুর, এই পঞ্চভাবের মধ্যে যে কোন ভাব লইয়া প্রেমের বিকাশ হইলেই পঞ্চমপুরুষার্থ লাভ হয়। কিন্তু শান্তভাব অপেক্ষা দাস্যভাব শ্রেষ্ঠ, দাস্য অপেক্ষা সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ, মধুর শ্রেষ্ঠতম ভাব। ব্রজলীলায় যে পরমধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, তাহা দাস্য সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুর ভাবের সহিত কৃষ্ণের আরাধনা; এইজন্য সখ্য দাস্য বাৎসল্য এবং মধুর ভাবের প্রেম ব্রজের পঞ্চমপুরুষার্থ।

৯।৭।২৪ শান্তভাবের উপাসনা ধ্যানমূলক : তত্ত্বমসি

ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা নিরূপিত সম্বন্ধ জ্ঞাত হইলে শান্ত ভাবের অভেদজ্ঞান বুঝা যাইবে। প্রকরণ এবং অভিপ্রায় অনুসারে এই শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৮ম হইতে ১৬শ খণ্ডে উদ্দালক আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে পরব্রহ্মতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন যে পরব্রহ্ম মূল কারণ এবং তিনি আপনাকেই জীব ও জগৎ রূপে পরিণত করিয়াছেন। তৎপরে

তিনি জীবদেহের সহিত জীবাত্মার ভিন্নতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি দেহের অবস্থা, দেহের সুষুপ্তাবস্থায় জীবাত্মা পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ ভোগ করে, সুষুপ্তিভঙ্গে জীবাত্মা পুনরায় দেহাভিমান প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা তিনি পরব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার ভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন যে, জীবদেহ নশ্বর কিন্তু জীবাত্মা অবিনাশী, জীবদেহ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, পরব্রহ্মই পরমাত্মা, তিনিই জীবদেহে জীবাত্মারূপে অবস্থিত, এবং জীবাত্মা পরব্রহ্মের অংশ। ইহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা পরব্রহ্মের অংশ বলিয়া জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম। স্বর্ণের একটী কণিকাও স্বরূপতঃ স্বর্ণ, এবং সেই স্বর্ণ-কণিকা বলিতে পারে, "আমি স্বর্ণ"; কিন্তু স্বর্ণ-কণিকা সমগ্র স্বর্ণ নহে। যেহেতু জীবাত্মাই জীবের যথার্থ স্বরূপ এবং সেই জীবাত্মা পরব্রহ্মের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন, সেইহেতু জীবাত্মাও বলিতে পারে, "আমি পরব্রহ্ম," কিন্তু পরব্রহ্মের অংশ জীবাত্মা সমগ্র পরব্রহ্ম নহে। পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার এই ভিন্নতা এবং স্বরূপগত অভিন্নতা বুঝাইতে আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন, "তত্ত্বমসি", অর্থাৎ, "তিনি তুমি হইতেছ।" এই শ্রুতিবাক্যে "তৎ" অনুবাদ এবং "ত্বমসি" বিধেয়। "তৎ" পরব্রহ্মের বাচক, "ত্বম্" জীবাত্মার বাচক, এবং "অসি" পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের বাচক। "তৎ" সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন, তাঁহার তত্ত্ব পূর্ব্বেই বিবৃত এবং জ্ঞাত হইয়াছে, এইজন্য তৎ অনুবাদ। সেই তৎ আপনাকে ত্বম্-রূপে বিস্তার করিয়া ত্বম্-এর সহিত যে সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছেন, তাহা তৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বলিয়া "ত্বমসি" বিধেয়। দুইটী স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত স্বতন্ত্র বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ থাকিতে পারে; জীবাত্মা স্বয়ং পূর্ণ পরব্রহ্ম হইলে জীবাত্মা এবং পরব্রহ্মের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। তৎ-এর সহিত ত্বম্-এর ভেদ ও আছে বলিয়া বেদান্ত তৎ-কে জানিবার এবং প্রিয়স্বরূপে উপাসনা করিবার জন্য ত্বম্-কে উপদেশ দিয়াছেন; "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" —(তৈত্তিরীয় ৩।১)—"তৎ-কে বিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা কর"; "তদেতৎ প্রেয়ঃ। ......আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" (বৃহদারণ্যক ১।৪।৮)—"এই তৎ সকলের প্রিয়তম; তাঁহাকে প্রিয়স্বরূপে উপাসনা কর।" পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া শ্রুতি "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার কেবলই অভেদত্ব নির্ণয় করেন নাই, ভেদাভেদ-

সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি এবং অন্যান্য শ্রুতিও পরব্রহ্ম এবং জীবাত্মার মধ্যে অংশী-অংশ, ধ্যেয়-ধ্যাতা, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, প্রাপ্তব্য-প্রাপক, উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন এবং এইরূপ সম্বন্ধনির্ণয়ের দ্বারা ভেদাভেদ-সম্বন্ধই নির্ণীত হইয়াছে। "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা যদি কেবলই অভেদত্ব নিণাত হইত, তাহা হইলে শ্রুতি কর্তৃক দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ তত্ত্ব নিরূপিত হইত, কিন্তু শ্রুতি তাহা করিতে পারেন না এবং করেনও নাই। সাধকাবস্থায় জ্ঞানযোগের সাধনাকালে কৃষ্ণের সহিত স্বরূপতঃ অভেদজ্ঞানে আকৃষ্ট জীবাত্মার চিতে এই জ্ঞান স্থিতিলাভ করিলে সেই সাধকের প্রেম শান্তভাবের সহিত বিকশিত হয়। শান্তভাবের যোগার এইরূপ অভিন্নতাজ্ঞান মায়াবাদের অভিন্নতাজ্ঞান নহে। মায়াবাদীর অভেদবাদ বা অদ্বৈতবাদ অনুসারে "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ," অর্থাৎ জীবাত্মা নামক স্বতন্ত্র বস্তুর সত্ত্বাই নাই, এক এবং অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম সকল জীবদেহে এক ও অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্মরূপেই বিদ্যমান আছেন, এবং সকল জীবই অনন্ত অখণ্ড পূর্ণ পরব্রহ্ম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই মত ভ্রান্ত। শান্তভাবের যোগী আপনাকে পরব্রহ্মের অংশ, এবং পরব্রহ্ম তাঁহার উপাস্য, জ্ঞেয় এবং প্রাপ্তব্য বলিয়া জানেন, কিন্তু পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্ত্বার যে স্বরূপগত অভিন্নতা আছে, শান্তভাবের যোগী কৃষ্ণের সহিত সেই স্বরূপগত অভিন্নতার জ্ঞানে দৃঢ় হইয়া কৃষ্ণের সহিত আপনাকে অভেদ ভাবনা করেন, কিন্তু "আমিই অনন্ত পরব্রহ্ম", "আমিই কৃষ্ণ" এরূপ ভাবেন না। ইহাই শান্তভাবের যোগীর অভিন্নতাজ্ঞান এবং অভেদ-ভাবনা। কৃষ্ণের অক্ষর পরব্রহ্মত্বের জ্ঞান এইরূপ অভেদজ্ঞানের মূল, কারণ কৃষ্ণ অনন্ত অক্ষর অচিন্ত্য পরব্রহ্ম বলিয়াই তিনি আপনাকে জীব ও জগৎরূপে বিস্তার করিয়াছেন। এইজন্য, শান্তভাবের যোগী কৃষ্ণের অনন্ত অক্ষর অচিন্ত্য পরব্রহ্ম স্বরূপতার ধ্যান করেন। শান্তভাবের যোগীর উপাসনা ধ্যানমূলক, সেবামূলক নহে। এইরূপ উপাসনাও কৃষ্ণেরই উপাসনা।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ গীতা ১২।৩-৪

—"সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন এবং সর্ব্বভূতের হিতকারী যে সকল যোগী ইন্দ্রিয়-

সংযমপূর্ব্বক অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বব্যাপী অচিন্ত্য অচল ধ্রুব কূটস্থ অর্থাৎ সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান অবিনাশী অক্ষরের উপাসনা করে তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।" এতদ্দ্বারা ঘোষিত হইল যে, শান্তভাবের যোগীর অক্ষর-উপাসনা কৃষ্ণেরই উপাসনা এবং এইরূপ উপাসনার ফলে তিনি কৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হয়েন। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" (গীতা ৮।৩)—অক্ষর পরব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্ম অক্ষর। আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে কৃষ্ণই পর-ব্রহ্ম; সুতরাং কৃষ্ণই অক্ষর। গীতার ৮ম অধ্যায়ে শান্তভাবের যোগীর অক্ষরোপাসনাকেই অক্ষরব্রহ্মযোগ বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে ওঙ্কারযুক্ত কৃষ্ণনামের ধ্যানই এই অক্ষরব্রহ্মযোগসাধনা (গীতা ৮।১৩)। ইহা হইতেও প্রাপ্ত হওয়া গেল যে শান্তভাবের যোগীর অক্ষরোপাসনা কৃষ্ণেরই উপাসনা। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫-৮ শ্লোকচতুষ্টয়ে কৃষ্ণ ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, এইরূপ অক্ষরব্রহ্মযোগ অপেক্ষা তাঁহাতে মন-বুদ্ধি আবিষ্ট করিয়া তাঁহার আরাধনা আরও উত্তম। এই ঘোষণার মর্ম্ম এই যে, শান্ত-ভাবের অক্ষরোপাসনা অপেক্ষা দাস্য সখ্য বাসৎল্য অথবা মধুরভাবে তাঁহার সেবামূলক আরাধনা আরও উত্তম। শান্ত ভাবের যোগী সবিকল্প সমাধি লাভ করেন। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভক্তিযোগের সাধনা ব্যতীত কেবল জ্ঞানযোগের সাধনায়, অথবা "আমি অনন্ত অখণ্ড পূর্ণ পরব্রহ্ম" ভাবনায় শান্ত-ভাবও বিকশিত হয় না।

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো! ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

ভাগবত ১০।১৪।৪

—ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, পরম মঙ্গলের নির্ঝরিণীস্বরূপ ভক্তি ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ করে, শস্যহীন তুষে পার দেওয়া যেমন পণ্ডশ্রম, তাহাদের সেই ক্লেশস্বীকারও তদ্রূপ পণ্ডশ্রম।" যাহারা কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ না জানিয়া অথবা না মানিয়া আপনা-দিগকে কৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন অথবা সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে করে, তাহারাও কৃষ্ণকে এবং প্রেমবিকাশ লাভ করা দূরের কথা, মোক্ষলাভও করিতে পারে না।

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্ব্বহির্মৃগ্য অহোহজ্ঞজনতাজ্ঞতা॥ ভাঃ ১০।১৪।২৭

—ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "তুমিই পরব্রহ্ম এবং সকল জীবাত্মাই তোমার অংশ। যাহারা আপনাদিগকে তোমা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে করে এবং যাহারা আপনাদিগকেই পরব্রহ্ম মনে করিয়া শ্রুতিসিদ্ধান্তের বহির্ভূত উপায়ে তোমাকে অন্বেষণ করে, অহো ! সেই অজ্ঞ ব্যক্তিগণের কি গভীর অজ্ঞানতা !" স্বয়ংরূপ অবতারে ব্রজলীলায় শান্তভাবের লীলা নাই। শান্তভাবের যোগীগণ দেহত্যাগের পর যে নিত্যলীলা প্রাপ্ত হয়েন তাহা বৈকুণ্ঠের নিত্যলীলা; তাঁহারা পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠে নিত্যস্থিতি লাভ করেন।

৯।৭।২৫ ভাব এবং ভাবাতীত ভাব

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর, এই পঞ্চবিধ ভাবই ভাবাতীত ভাব। জীবাত্মার প্রেম যে কোন ভাবের সহিত বিকশিত হইলেই জীবাত্মা সবিকল্প স্থিতি লাভ করে। ভাবাতীত ভাব, নির্ব্বিকল্প স্থিতি, এবং সবিকল্প স্থিতি না বুঝিলে প্রেমের আরাধনা কিরূপে হয় তাহা বুঝা যাইবে না। এইজন্য এই তত্ত্বগুলি এখানে বিবৃত হইতেছে। মানবদেহ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়। গীতায় এই তিনটী গুণকে ভাব বলা হইয়াছে।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসশ্চা যে। গীতা ৭।১২

এই ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত মানবদেহও একটী ভাব। ভৌতিক দেহের মৃত্যু হয়, এইজন্য গীতা বলিয়াছেন যে, দেহমাত্রই ক্ষর ভাব।

অভিভূতং ক্ষরো ভাবঃ। গীতা ৮।৪

বুদ্ধি দেহের প্রধান অংশ ; বুদ্ধিও ত্রিগুণময় ; সুতরাং বুদ্ধিও ক্ষর ভাব। বুদ্ধির যে অহঙ্কার, আর্থাৎ আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ভাব, ইহাই দৈহিক আমিত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ এই দৈহিক আমিত্বকে "কাঁচা আমি" বলিয়াছেন। এই যে কাঁচা আমি বা দৈহিক আমিত্ব, ইহাও ত্রিগুণময়, ইহাও দৈহিক ভাব, ইহাও ক্ষর ভাব। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণও একটী ভাব। তাঁহার ভাব নিত্য। এই নিত্য ভাবটী ক্ষরের অর্থাৎ ক্ষরভাবের অতীত, ইহাই ভাবাতীত ভাব এবং পরমভাব। কৃষ্ণ বলিয়াছেন :

পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥
পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ৮।২০-২২

—"ভূতবর্গের অতীত আর একটী পরম ভাব আছে। ভূতবর্গের মূল জড় উপাদান যে প্রকৃতি, তাহাও অব্যক্ত অর্থাৎ মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গের অতীত এবং ইহাদের দ্বারা অগ্রহণীয়। পরম ভাব অব্যক্ত প্রকৃতিরও অতীত, স্থতরাং তাহা মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গের এবং তাহার দৈহিক আমিত্বেরও অতীত বস্তু। সেই পরম ভাব সনাতন বস্তু অর্থাৎ নিত্যবস্তু; সমুদয় ভূতের বিনাশেও তাহার বিনাশ হয় না। এই যে ক্ষর ভাবের অতীত অবিনাশী পরম ভাব, বেদ-বেদান্ত ইহাকেই পরমা গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এই ভাব-টীকে পাইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই পরম ভাব আমারই স্বরূপ। যে পরম পুরুষকে অনন্যা ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়, যাঁহাতে সর্ব্বভূত আশ্রিত এবং যিনি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, সেই পরম পুরুষই পরম ভাব। আমিই সেই পরমপুরুষ এবং পরমভাব।" ইহা হইতে আমরা পাইলাম যে, সচ্চিদানন্দ পরম ভাব; পরম ভাব চিদ্বস্তু; ইহা অব্যক্ত, অর্থাৎ দৈহিক ভাবের অতীত। সচ্চিদানন্দ দৈহিক ভাবের অতীত বলিয়া সচ্চিদানন্দ ভাবাতীত ভাব। এই যে অব্যক্ত ভাব, ভাবাতীত ভাব, বা পরমভাব সচ্চিদানন্দ, কৃষ্ণ এই সচ্চিদা-নন্দের বিগ্রহ। এইজন্য কৃষ্ণ ভাবাতীত ভাব বা পরম ভাব। আমরা যে তত্ত্ব পাইলাম তাহা সংক্ষেপে এইরূপে বলা যায়, "মানবদেহ ভাব; সচ্চিদা-নন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ ভাবাতীত ভাব এবং ভাবাতীত ভাবই পরম ভাব।" মানবদেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মা কৃষ্ণের চিৎ এবং আনন্দের অংশ। চিৎ এবং আনন্দ ভাবাতীত ভাব; এইজন্য জীবাত্মাও ভাবাতীত ভাব। জীবাত্মার অহম্ আত্মিক অহম্; ইহা চিদ্বস্তু; ইহাও ভাবাতীত ভাব। শ্রীরাম-কৃষ্ণ এই আত্মিক অহম্-কে "পাকা আমি" বলিয়াছেন। প্রেম এই আত্মিক অহম্-এর স্বভাব; এইজন্য প্রেমও ভাবাতীত ভাব। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের আনন্দাংশে যে প্রেম আছে তাহাও ভাবাতীত ভাব। ভাব ভাবাতীত ভাবকে পাইতে, প্রত্যক্ষ করিতে, এবং ভাবাতীত ভাবের মধ্যে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। ভাবাতীত ভাব ভাবাতীত ভাবকে প্রত্যক্ষ করিতে, প্রাপ্ত হইতে, এবং ভাবাতীত ভাবের মধ্যে স্থিতিলাভ করিতে পারে। ভাবাতীত

ভাবের মধ্যে ভাবাতীত ভাবের স্থিতি দুই প্রকারের, নির্ব্বিকল্প স্থিতি এবং সবিকল্প স্থিতি। দেহে অবস্থানকালে জীবাত্মার নির্ব্বিকল্প স্থিতি নির্ব্বিকল্প সমাধি এবং সবিকল্প স্থিতি সবিকল্প সমাধি।

৯।৭।২৬ নির্ব্বিকল্প সমাধি এবং সবিকল্প সমাধি : অভেদভাব বা অদ্বৈতভাব

বিকল্পের অর্থ, দ্বিত্ব = ভেদ = স্বতন্ত্র সত্ত্বা। নির্ব্বিকল্পের অর্থ, দ্বিত্বহীন = ভেদহীন = স্বতন্ত্রসত্ত্বাহীন। সবিকল্পের অর্থ, দ্বিত্বের সহিত = ভেদের সহিত = স্বতন্ত্র সত্ত্বার সহিত। কৃষ্ণের সহিত বিলীনতাপ্রাপ্তির মিলনে জীবাত্মার স্বীয় স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না, এইজন্য তাহার অংশী-অংশ, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, উপাস্য-উপাসক প্রভৃতি ভেদও থাকে না, এবং তাহার আত্মিক অহম্-এরও স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না। এইরূপ বিলীনতাপ্রাপ্তির একীভূত মিলনে জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না; ইহাই নির্ব্বিকল্প স্থিতি। জীবাত্মার দেহে অবস্থানকালে এইরূপ নির্ব্বিকল্প স্থিতিই নির্ব্বিকল্প সমাধি। ইহাতে অংশী এবং জ্ঞেয় কৃষ্ণ হইতে অংশ এবং জ্ঞাতা জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্ত্বা না থাকায় ইহাতে বিজ্ঞান লাভও হয় না এবং আনন্দসম্ভোগও হয় না। কৃষ্ণের সহিত যে মিলনে জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে সেই মিলনে তাহার অংশী-জ্ঞেয়-উপাস্য কৃষ্ণ হইতে অংশ-জ্ঞাতা-উপাসকরূপে ভেদও থাকে এবং তাহার আত্মিক অহম্-এরও স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে। এইরূপ মিলনে জীবাত্মার বিকল্প থাকে বলিয়া এইরূপ মিলনে স্থিতি সবিকল্প স্থিতি। জীবাত্মার দেহে অবস্থানকালে সবিকল্প স্থিতি সবিকল্প সমাধি। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না বলিয়া জীবাত্মা কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষরূপে জানিতে এবং তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষরূপে আনন্দের আদানপ্রদানের দ্বারা আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে না। সবিকল্প সমাধিতে জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকায় জীবাত্মা কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষরূপে জানিতে, বিজ্ঞান লাভ করিতে, এবং তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষরূপে আনন্দের আদানপ্রদানের দ্বারা আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে। অধ্যাত্মযোগসাধনার ফলে জীবাত্মা দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়ামুক্ত হইবার পরে ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে আরূঢ় হয়; আরূঢ় হইয়া প্রথমেই নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হয়। কেবল মোক্ষকামী সাধক নির্ব্বিকল্প স্থিতিতেই থাকিয়া যান; পঞ্চমপুরুষার্থ তাঁহার লক্ষ্য না হওয়ায় তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন না। কেবল মোক্ষকামনায় সাধনা করিয়া মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পর বহু মুক্ত যোগী

পঞ্চমপুরুষার্থলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া সাধনা করেন এবং প্রাপ্ত হয়েন। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর ভাবের যোগীর আত্মিক অহম্ স্ব স্ব ভাবে প্রত্যক্ষরূপে কৃষ্ণের সহিত আনন্দের আদান প্রদানের জন্য ব্যাকুলতায় নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সবিকল্প সমাধি লাভ করেন, এবং এই অবস্থায় কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষরূপে জানিতে, বিজ্ঞান লাভ করিতে, এবং তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষরূপে আনন্দের আদানপ্রদানের দ্বারা আনন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন। ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে ভাবের ভূমির ভেদজ্ঞান না থাকায়, ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে আরূঢ় হইলেই সকল জীবাত্মাই অভেদভাব বা অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হয়। এই অভেদভাব মায়াবাদীর অভেদবাদ নহে; ইহা কৃষ্ণের সহিত স্বীয় স্বরূপগত অভিন্নতা হইতে প্রসূত তাঁহার সহিত স্বরূপগত অভেদের ভাব। এইজন্য, কেবল শান্তভাবের যোগীরই অভেদভাব হয় তাহা নহে, দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবের যোগীগণেরও হয়। কিন্তু শান্তভাবের যোগী কেবল অভেদভাবটীকেই সম্ভোগ করিতে চাহেন; দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবের যোগীগণ অভেদভাবটীকেই সম্ভোগ করিতে চাহেন না, তাঁহারা ভিন্ন সত্ত্বায় থাকিয়া প্রত্যক্ষভাবে সেবা-আরাধনার দ্বারা কৃষ্ণের সহিত আনন্দের আদান-প্রদান চাহেন। বিয়োগদশায় অভেদভাবের অধিকতর স্ফুরণ হয়, যেমন রাস-লীলার সময় কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীগণের হইয়াছিল। মায়াবাদীর অভেদবাদ একটী মতবাদ মাত্র, একটী চিন্তার ধারা মাত্র, কিন্তু ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে আরূঢ় প্রেমিক যোগীর অভেদ ভাব একটী সাধনালব্ধ অবস্থা; ভাবের এবং ভেদের ভূমিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে এই অভেদভাব কি বস্তু তাহা বুঝা যায় না। প্রেমিক যোগীর আত্মিক অহম্ এইরূপ অভেদভাবে থাকিয়াই সবিকল্প স্থিতিতে থাকেন এবং সবিকল্প সমাধিতে কৃষ্ণের সহিত আনন্দের আদানপ্রদান করেন। সবিকল্প সমাধিলাভই যোগসাধনার পরমপ্রাপ্তি এবং পরম সিদ্ধি। রামপ্রসাদের উপমা অনুসারে, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জীবাত্মা চিনি হইয়া যায় বলিয়া চিনির মধুরতা আস্বাদন করিতে পারে না; তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "চিনি হওয়া ভাল নয় মা, চিনি খেতে ভালবাসি।" বেদান্ত সবিকল্প সমাধি লাভকেই যোগসাধনার পরমপ্রাপ্তি এবং পরম সিদ্ধি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বেদান্ত পরমেশ্বরকে প্রিয়স্বরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন (আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত-বৃহ। ১।৪।৮), এবং এইরূপ

উপাসনা করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিবার উপদেশও দিয়াছেন (তেদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—মুণ্ডক ২।২।৭); আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—তৈত্তিরীয় ২।৯) জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্ত্বা না থাকিলে আনন্দভুক্ হইতে পারে না; সুতরাং, বেদান্ত অনুসারে সবিকল্প সমাধি যোগসাধনার ফলে পরম প্রাপ্তি এবং পরম সিদ্ধি। নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থার যোগীর জীবাত্মা দেহত্যাগের পরে নিত্য নির্ব্বিকল্প স্থিতি লাভ করে, অর্থাৎ তাহার সত্ত্বা কৃষ্ণে চিরবিলীন হইয়া যায় এবং সেইজন্য সে গোলোকে অথবা বৈকুণ্ঠে গিয়া এবং থাকিয়া কৃষ্ণের সহিত আনন্দের আদানপ্রদানের দ্বারা আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু বেদান্ত বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা দেহত্যাগের পরে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করে, (ব্রহ্মলোকে মহীয়তে—কঠ ১।২।১৭ এবং ১।৩।১৬ "তোষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ"—প্রশ্ন ১।১৬।

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥ মুণ্ডক ৩।২।৬

—"সন্ন্যাসযোগসাধনার (অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগসাধনার) ফলে যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া সুনিশ্চিত বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা (অর্থাৎ তাঁহাদের জীবাত্মা) পরম মুক্তি লাভ করিয়া দেহত্যাগের পর অনন্তকাল ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া পরামৃত (অর্থাৎ পরমানন্দ) প্রাপ্ত হয়েন।" ব্রহ্মসূত্রও বলিয়াছেন যে, পরমাগতিপ্রাপ্ত জীবাত্মার দেহত্যাগের পরেও স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে এবং সেই স্বতন্ত্র সত্ত্বায় নিত্যধামে অনন্ত আনন্দ সম্ভোগ করে।

(১) বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ। ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৮
(২) ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ। ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২১

—"(১) মুক্ত জীবাত্মার বিকারবিহীন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন রূপ থাকে, ইহা বেদান্তে ঘোষিত হইয়াছে। (২) দেহ ত্যাগের পর মুক্ত জীবাত্মা অর্থাৎ পরমগতিপ্রাপ্ত জীবাত্মা আনন্দসম্ভোগব্যাপারে পরমেশ্বরের সমানত্ব লাভ করে, অর্থাৎ পরমগতিপ্রাপ্ত জীবাত্মা নিত্যধামে স্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দঘন সত্ত্বায় কৃষ্ণের সহিত আনন্দের আদানপ্রদানের দ্বারা কৃষ্ণের সমান আনন্দ সম্ভোগ করে।" এইরূপে, সবিকল্প সমাধির অবস্থার যোগীর জীবাত্মা দেহত্যাগের পরে নিত্য সবিকল্প

স্থিতি লাভ করে। বেদান্ত এবং ব্রহ্মসূত্র অনুসারে মুক্ত আত্মার ইহাই পরম গতি এবং পরম প্রাপ্তি, এবং দেহত্যাগের পরে মুক্ত আত্মা দেবযান পথে গমন করিয়া নিত্যধামে এই শাশ্বত সবিকল্প স্থিতি প্রাপ্ত হয়। আমরা পাইলাম যে, বেদান্তের এবং ব্রহ্মসূত্রের ঘোষণা অনুসারে দেহে অবস্থানকালে সবিকল্প সমাধিলাভ জীবাত্মার পরম সিদ্ধি এবং দেহত্যাগের পর নিত্য সবিকল্প স্থিতি লাভ, অর্থাৎ নিত্যধামে স্বতন্ত্র সত্তায় থাকিয়া কৃষ্ণের সহিত আনন্দের আদান-প্রদানের দ্বারা অনন্ত আনন্দ সম্ভোগ জীবাত্মার পরম গতি। গীতা-ভাগবতাদি সকল শাস্ত্রই এই তত্ত্বই ঘোষণা করিয়াছেন। শান্তভাবের যোগীর জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত স্বীয় স্বরূপগত অভেদজ্ঞানে ধ্যানমূলক উপাসনার দ্বারাও সবিকল্প সমাধিই লাভ করেন, কারণ, শান্তভাবও প্রেমের ভাব এবং প্রেম বিকাশ হইলেই আত্মিক অহম্ স্বতন্ত্র সত্তায় থাকিয়া কৃষ্ণের সহিত আনন্দের আদানপ্রদান করিতে চাহে। এইজন্য, উক্তরূপ অভেদজ্ঞানে অক্ষরোপাসনা করিলেও প্রেমের স্বভাব শান্তভাবের যোগীকেও সবিকল্প সমাধিতেই রক্ষা করে। তিনি দেহাবস্থানকালে যে সবিকল্প সমাধি লাভ করেন, তাহা সুষুপ্তিকালের মিলনের ন্যায়। সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা অন্তরাকাশে বামনরূপী কৃষ্ণের সহিত মিলন লাভ করে, কিন্তু শান্তভাবের যোগী সবিকল্প সমাধিতে সহস্রারে পরব্রহ্মরূপী কৃষ্ণের সহিত মিলন লাভ করে। সুষুপ্তির এবং সমাধির প্রভেদ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। প্রেমবিকাশের পরেও অভেদভাবের প্রাধান্যহেতু, শান্তভাবের যোগী সুষুপ্তিকালের মিলনের ন্যায়, সবিকল্প সমাধিতে কৃষ্ণের সহিত মিলন লাভ করিয়াও মিলনকালে স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তার উপলব্ধি করিতে পারেন না, কিন্তু সুষুপ্তিকালের মিলনের ন্যায় আনন্দ সম্ভোগ করেন। ইহাই শান্তভাবের যোগীর সবিকল্প সমাধি। দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর ভাবের যোগীগণ যে সমাধি লাভ করেন তাহা সবিকল্প সমাধি; তাহা সুষুপ্তির মিলনের ন্যায় নহে; তাহাতে তাঁহাদের স্বতন্ত্র সত্ত্বার বোধ থাকে, সমাধিতে কৃষ্ণের সহিত লীলা করেন, এবং লীলার পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। শান্তভাবের যোগী নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং ধ্যানাবস্থায় চিতের দ্বারা তত্ত্ববিজ্ঞানও লাভ করেন।

৯।৭।২৭ দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর ভাবের উপাসনা সেবামূলক ঃ মধুর ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

শান্তভাবের অভেদভাব, সাম্য এবং নিষ্ঠা দাস্যভাবে আছে, অধিকন্তু ইহাতে দাস্যের সেবা আছে। শান্তভাবের উক্ত বৈশিষ্টসহ দাস্যভাবের সেবা সখ্যভাবে আছে, অধিকন্তু ইহাতে সখ্য আছে। শান্তভাবের উক্ত বৈশিষ্ট, দাস্যের সেবা, এবং সখ্যভাবের সখ্য বাৎসল্যভাবে আছে, অধিকন্তু ইহাতে বাসৎল্য আছে। শান্তভাবের উক্ত বৈশিষ্ট, দাস্যভাবের সেবা, সখ্যভাবের সখ্য, এবং বাৎসল্যভাবের বাৎসল্য মধুরভাবে আছে, অধিকন্তু ইহাতে দাম্পত্য আছে। মধুরভাবে অন্য চারিভাবের সমাহার হইয়াছে বলিয়া মধুরভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মধুরভাবের এই দাম্পত্য, অর্থাৎ পতিপত্নীত্ব, কি বস্তু তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর, এই চারি ভাবের উপাসকগণের আত্মিক অহম্ কৃষ্ণে বিলীনতা চাহে না, কৃষ্ণের সহিত অভেদভাব লইয়া স্ব স্ব পৃথক সত্ত্বায় অবস্থান করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিয়া কৃষ্ণকে আনন্দ দান করিতে চাহে এবং তাহাই করে। এই চারিভাবের উপাসক শান্তভাবের উপাসকের ন্যায় বিজ্ঞানও লাভ করে, অধিকন্তু গোলোকের নিত্যলীলাও সম্ভোগ করে। এইজন্য, এই চারিভাবের উপাসনা সেবামূলক। দাস্যভাবের উপাসক কৃষ্ণকে প্রভুজ্ঞানে সেবা করিয়া দাস্যরস দান করে এবং কৃষ্ণের নিকট হইতে দাস্যরস প্রাপ্ত হয়। সখ্যভাবের উপাসক কৃষ্ণকে সখাজ্ঞানে সেবা করিয়া সখ্যরস দান করে এবং কৃষ্ণের নিকট হইতে সখ্যরস প্রাপ্ত হয়। বাৎসল্যভাবের উপাসক কৃষ্ণকে পাল্যজ্ঞানে সেবা করিয়া বাৎসল্যরস দান করে এবং কৃষ্ণের নিকট হইতে বাৎসল্যরস প্রাপ্ত হয়। মধুরভাবের উপাসক কৃষ্ণকে পতিজ্ঞানে উপাসনা এবং সেবা করিয়া মধুর রস দান করে এবং কৃষ্ণের নিকট হইতে মধুর রস প্রাপ্ত হয়। মধুর রসকে আদ্যরস, সুরত, এবং শৃঙ্গার রসও বলা হয়। কৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে মধুর রস সম্ভোগ করিবার জন্য স্বীয় আনন্দাত্মাকে রাধারূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে আদ্যরস বলা হয়; প্রাকৃত নর-নারীগণ প্রাকৃত সুরতক্রীড়ার সময় পরস্পর হইতে মধুর রস প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে সুরতও বলা হয়; প্রাকৃত কামক্রীড়াকে শৃঙ্গার বলা হয়; শৃঙ্গারকালে নর-নারী পরস্পর হইতে মধুর রস প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে শৃঙ্গার রসও বলা হয়। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের আনন্দাংশে অনন্ত সুরত অর্থাৎ মধুর রস আছে, তিনিই সমগ্র সুরতের

অধীশ্বর, এবং অন্য যাহা কিছুতে সুরত আছে তাহা কৃষ্ণের অনন্ত সুরতের অংশ বলিয়া ভাগবতে কৃষ্ণকে "সুরতনাথ" বলা হইয়াছে (ভা ১০।৩১।২)। কেবল যে নারীজাতিই মধুরভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিতে পারে তাহা নহে ; নর-জাতিও পারে। জীবাত্মার লিঙ্গভেদ নাই, কারণ জীবাত্মা পরমভাব ; জীবাত্মার আনন্দাংশে প্রেম এবং প্রেমে মধুরভাবও আছে, এইজন্য নরনারী সকলেই কৃষ্ণকে পতিরূপে ভজনা করিতে পারে। পরমভাবের পতিপত্নীত্বও পরমভাব, তাহাতে লিঙ্গভেদজ্ঞান নাই ; নিত্যলীলায় মধুরভাবের সেবা প্রাকৃতদেহের দ্বারা সেবা নহে, এবং অপর তিনটী ভাবের সেবাও প্রাকৃত দেহের দ্বারা সেবা নহে, স্ব স্ব ভাবরসময় অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘনদেহের দ্বারা সেবা ; এইজন্য নর-নারী সকলেই কৃষ্ণকে পতি এবং আপনাদিগকে তাঁহার পরাপ্রকৃতি জ্ঞানে মধুরভাবে কৃষ্ণের সেবা করিতে পারে। নিত্যলীলায় দাস্যভাবের সেবা অপ্রাকৃত দাস্যভাবরসময় সচ্চিদানন্দঘন দেহে, সখ্যভাবের সেবা অপ্রাকৃত সখ্য-ভাবরসময় সচ্চিদানন্দঘন দেহে, বাৎসল্যভাবের সেবা অপ্রাকৃত বাৎসল্যভাবরসময় সচ্চিদানন্দঘন দেহে, এবং মধুরভাবের সেবা অপ্রাকৃত মধুরভাবরসময় সচ্চিদা-নন্দঘন দেহে হইয়া থাকে। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের দ্বারা প্রদর্শিত আধ্যাত্ম-যোগসাধনার অনুষ্ঠান করিয়া নরনারীগণের দাস্য সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুর ভাবের প্রেম বিকশিত হইলে তাঁহারা গোলোকের নিত্যলীলায় কৃষ্ণের কিরূপে সেবা করিয়া তাঁহার সহিত আনন্দের পারস্পরিক আদানপ্রদান করেন, কৃষ্ণ ব্রজলীলায় স্বীয় নিত্যলীলার পরিকরগণের সহিত পারস্পরিক সম্ভোগের লীলা করিয়া তাহা নরনারীগণকে জ্ঞাত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা কৃষ্ণের সেই ব্রজলীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

৯।৭।২৮ ব্রজে দাস্যভাবের লীলা

কৃষ্ণ ব্রজে স্বীয় নিত্যলীলার পরিকরগণের সহিত যে পারস্পরিক সম্ভোগের লীলা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অন্দরলীলা। এই লীলায় সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান এবং সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তাভাব নাই ; এই লীলায় কৃষ্ণ সর্ব্বরস আনন্দস্বরূপ। তাঁহার নিত্যলীলার পরিকরগণও তাঁহাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান এবং সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভাবিয়া তাঁহার সহিত এই লীলা করেন নাই ; তাঁহারা স্ব স্ব ভাবানু-সারে কৃষ্ণকে প্রভু সখা সন্তান বা পতি জানিয়া তাঁহার সহিত লীলা করিয়াছেন।

এইজন্য তাঁহাদের দাস্য শুদ্ধ দাস্য, তাঁহাদের বাৎসল্য শুদ্ধ বাৎসল্য, তাঁহাদের সখ্য শুদ্ধ সখ্য, তাঁহাদের দাম্পত্য শুদ্ধ দাম্পত্য। সর্ব্বরস আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণও, যাঁহাদের যে ভাব, তাঁহাদের নিকট সেই ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাদের সহিত এই লীলা করিয়াছেন। দাস্যভাবের উপাসনা ব্রজের বাহিরে সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু তথায় প্রায়ই দাস্যভাবের উপাসকগণ কৃষ্ণকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান এবং সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভু জ্ঞানে কৃষ্ণের উপাসনা করেন। এইরূপ জ্ঞানে কৃষ্ণের উপাসনায় কৃষ্ণের বাসুদেবস্বরূপেরই উপাসনা হয়। এইরূপ দাস্যভাবের উপাসকগণ অন্দরের নিত্যলীলা প্রাপ্ত হয়েন না, দেহত্যাগের পরে বৈকুণ্ঠের নিত্যলীলা প্রাপ্ত হয়েন। ব্রজের শুদ্ধ দাস্য ভাবের সেবা অন্তঃপুরের সেবা। ভাগবতে বর্ণিত ব্রজলীলায় কেবল দাস্যভাবের লীলা দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রজে কৃষ্ণের মাতা, পিতা, সখাগণ, গোপীগণ, এবং বাৎসল্যভাবযুক্ত বয়োজ্যেষ্ঠগণ তাঁহার সর্ব্ববিধ সেবা করিয়াছেন। ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, ব্রজরাজ নন্দের নন্দনের সেবা করিবার জন্য দাসদাসী অবশ্যই ছিল। মানবের প্রতি মানবের দাস্যভাব আংশিক এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত দাস্যরসও আংশিক। দৈহিক স্বার্থের দ্বন্দ্ববশতঃ এইরূপ প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধের অবসান ঘটিতে পারে; মৃত্যুতে ইহার অবসান নিশ্চিত; সুতরাং ইহা অনিত্য। কৃষ্ণের প্রতি মানবের দাস্যভাবের বিকাশ হইলে তাহা এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত দাস্যরস আংশিকতা এবং অনিত্যতাকে অতিক্রম করিয়া পূর্ণতা এবং নিত্যতা প্রাপ্ত হয়। মানবের দাস্যাকাঙ্ক্ষার ইহাই পরম সার্থকতা।

৯।৭।২৯ ব্রজে সখ্যভাবের লীলা

কৃষ্ণের সর্ব্বরস আনন্দে যে সখ্যরস আছে, তাঁহার সেই সখ্যরসের দিৎসা এবং লিপ্সা আছে। স্বয়ং সখা হইয়া সখাগণের সহিত লীলা না করিলে এই দিৎসা এবং লিপ্সা সার্থক হইতে পারে না। সখ্য হয় সমানে সমানে। সখাগণ পরস্পরকে সমান ভাবিয়া, পরস্পরকে প্রীতি করিয়া, পরস্পরের সেবা করিয়া, এবং পরস্পরের সহিত হাস্য ক্রীড়া কৌতুক করিয়া পরস্পরকে আনন্দ দান করিয়া আনন্দ লাভ করেন। ব্রজে সখ্যভাবের লীলায় কৃষ্ণ সখাগণের সহিত স্বীয় সমানত্ব স্বীকার করিয়া লীলা করিয়াছেন। সখাগণকে আনন্দ দিবার জন্য তিনি তাঁহাদের সহিত ক্রীড়ায় পরজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে

স্কন্ধে বহন করিয়াছেন। ব্রজে মধুরভাবের লীলায় প্রত্যেক গোপীকে আনন্দ দিবার জন্য কৃষ্ণ যেমন বহুমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, ব্রজে সখ্যভাবের পুলিনভোজন লীলায়ও তিনি তদ্রূপ প্রত্যেক সখাকে আনন্দ দিবার জন্য, তাঁহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলী আকারে উপবিষ্ট এবং তাঁহাতে নিবদ্ধদৃষ্টি সখাগণের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট থাকিয়া প্রত্যেকের দিকে এককালে দৃষ্টিপাত করিয়া এককালেই প্রত্যেকের সহিত হাস্যালাপ করিয়াছিলেন। ব্রজের শুদ্ধ সখ্যভাবের লীলার দ্বারা কৃষ্ণ এবং তাঁহার সখাগণ পরস্পরকে নিত্য সখ্যরস সম্ভোগ করাইয়াছেন। মানবের প্রতি মানবের সখ্যভাব আংশিক এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত সখ্য-রসও আংশিক। দৈহিক স্বার্থের দ্বন্দ্ববশতঃ এইরূপ সখ্যের অবসান ঘটিতে পারে; মৃত্যুতে ইহার অবসান নিশ্চিত; সুতরাং ইহা অনিত্য। কৃষ্ণের প্রতি মানবের সখ্যভাবের বিকাশ হইলে তাহা এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত সখ্যরস আংশিকতা এবং অনিত্যতাকে অতিক্রম করিয়া পূর্ণতা এবং নিত্যতা প্রাপ্ত হয়। মানবের সখ্যাকাঙ্ক্ষার ইহাই পরম সার্থকতা।

৯।৭।৩০ ব্রজে বাৎসল্যভাবের লীলা

কৃষ্ণের সর্ব্বরস আনন্দে যে বাৎসল্যরস আছে, তাঁহার সেই বাৎসল্যরসের দিৎসা এবং লিপ্সা আছে। এই দিৎসা এবং লিপ্সা সার্থক করিবার জন্য বাৎ-সল্যভাবের লীলা করিবার জন্য কৃষ্ণ নন্দযশোদার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই লীলায় নন্দ এবং যশোদা বিশ্বের পিতা ও মাতা কৃষ্ণের পিতা ও মাতা, বিশ্বের পালক কৃষ্ণের পালক, বিশ্বের প্রণম্য কৃষ্ণের প্রণম্য, বিশ্বের শাসনকর্ত্তা কৃষ্ণের শাসনকর্ত্তা। নন্দ-যশোদা কৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞানে লালনপালন করিয়াছেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে তিরস্কার, প্রহার এবং বন্ধনও করিয়াছেন। এই সমস্তই তাঁহাদের বাৎসল্যভাবের সেবা, এইজন্য কৃষ্ণ তাঁহাদের তিরস্কার, প্রহার এবং বন্ধনেও আনন্দ লাভ করেন। তাঁহাদের দ্বারা শাসিত তিরস্কৃত প্রহৃত এবং বদ্ধ হইবার জন্য কৃষ্ণ চাপল্য এবং উৎপাত করেন। তাঁহাদের আদেশে তাঁহাদের গো-চারণাদি কার্য্য করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদের বিবিধপ্রকারের সেবা করিয়াছেন। এইরূপ শুদ্ধ বাৎসল্যভাবের লীলার দ্বারা নন্দ-যশোদা এবং কৃষ্ণ পরস্পরকে নিত্য বাৎসল্যরস সম্ভোগ করাইয়াছেন। কৃষ্ণের পরমেশ্বরত্বের জ্ঞান থাকিলে শুদ্ধ বাৎসল্যভাবের লীলা হয় না বলিয়া যখনই নন্দ এবং যশোদার এইরূপ

জ্ঞানের উদয় হইয়াছে কৃষ্ণ তখনই স্বীয় যোগমায়াপ্রভাবে তাঁহাদিগকে সেই জ্ঞান বিস্মৃত করাইয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের শুদ্ধ বাৎসল্যভাব রক্ষা করিয়াছেন। মানব এবং তাহার সন্তানের মধ্যে যে পারস্পরিক বাৎসল্যভাব তাহা আংশিক এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত বাৎসল্যরসও আংশিক। পৌগণ্ড বয়সের সন্তানের যে সুকুমার অঙ্গশোভা এবং অঙ্গভঙ্গি পিতামাতার মনোহরণ করে, সন্তানের বয়োবৃদ্ধি হইলে পর পিতামাতা সন্তানের মধ্যে আর সে বস্তু প্রাপ্ত হয়েন না; তখন দৈহিক স্বার্থের দ্বন্দ্ববশতঃ বাৎসল্যের অবসান ঘটিতে পারে; মৃত্যুতে ইহার অবসান নিশ্চিত। সুতরাং ইহা অনিত্য। কৃষ্ণের প্রতি মানবের বাৎসল্যভাবের বিকাশ হইলে তাহা এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত বাৎসল্যরস আংশিকতা এবং অনিত্যতাকে অতিক্রম করিয়া পূর্ণতা এবং নিত্যতা প্রাপ্ত হয়, এবং বাৎসল্যভাবের নিত্যলীলায় কৃষ্ণকে সন্তানরূপে নিত্যপ্রাপ্তিহেতু শিশুসন্তানের পরম মনোহর এবং পরমসুন্দর অঙ্গশোভা এবং অঙ্গভঙ্গিরও নিত্যপ্রাপ্তি হয়। মানবের বাৎসল্যাকাঙ্ক্ষার ইহাই পরম সার্থকতা।

৯।৭।৩১ বস্ত্রহরণলীলার এবং রাসলীলার মধ্যবর্ত্তী বৎসর

কৃষ্ণ আট বৎসর বয়সে হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে বস্ত্রহরণ লীলা করিয়াছিলেন এবং নয় বৎসর বয়সে শরৎকালে রাসলীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। মধ্যে এক বৎসর গত হইয়াছে। বস্ত্রহরণলীলার সময় ব্রজগোপীগণ কুমারী ছিলেন, ইহা ভাগবতে উক্ত হইয়াছে।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানা কাত্যায়ণ্যর্চ্চনব্রতম্ ॥ ভাগবত ১০।২২।১

—"হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া কাত্যায়ণীব্রত আচরণ করিয়াছিলেন।" এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের অভিভাবকগণ বেদবিধিমতে তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। রাধা এবং তাঁহার গোলোকের সখীগণ মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়া নারীবৎ আচরণ না করিলে মর্ত্ত্যলীলার সার্থকতা থাকে না। এইজন্য, লৌকিক ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব অভিভাবকগণের আদেশমত বিবাহ করিয়াছিলেন। রাসলীলায় যাইবার সময় গোপীগণের কেহ কেহ পতির শুশ্রূষা করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেককে পতিগণ যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ভাগবতের এই বিবরণ হইতে

কুমারীগণের বিবাহ হইয়াছিল তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। তৎকালে ভারতের বহু স্থানে নবম বর্ষ বয়সের মধ্যে কুমারীদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এইজন্য গোপীগণ নবম বর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের অভিভাবকগণ তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। গোপীগণের এই লৌকিক বিবাহ হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহারা কৃষ্ণের যেরূপ পতিত্ব পাইবার জন্য কাত্যায়ণীব্রত করিয়াছিলেন এবং তৎকালে কৃষ্ণ যে পতিত্বের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই পতিত্ব বেদবিধি অনুসারে বিবাহের দ্বারা স্থাপিত লৌকিক পতিত্ব নহে, তাহা কৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরাপ্রকৃতির বেদবিধির অতীত অলৌকিক নিত্যসিদ্ধ পতিত্ব। কৃষ্ণ ইহা জানিতেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বেদবিধি অনুসারে লৌকিক বিবাহ করেন নাই, এবং গোপীগণও ইহা জানিতেন বলিয়া তাঁহারা অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে আপত্তি করেন নাই। এইরূপ লৌকিক বিবাহ করিয়াও গোপীগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণের নাম গুণ লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন এবং স্মরণ করিতেন, কৃষ্ণধ্যানে তন্ময় হইতেন, এবং কবে কৃষ্ণ স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহাদের সহিত মধুর ভাবের লীলা করিবেন তাহার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকিতেন। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণও সাধিকা গোপীগণের সহিত উক্তরূপ প্রতীক্ষাযুক্ত সাধনা করিয়া মানবকে উহা শিক্ষা দিয়াছেন। নরনারীর পরস্পরের প্রতি মধুরভাব এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত মধুর রস আংশিক; কৈশোরের অথবা যৌবনের দেহের স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যও বয়োবৃদ্ধির সহিত থাকে না; দৈহিক স্বার্থের দ্বন্দ্ববশতঃ ইহার অবসান হইতে পারে; মৃত্যুতে ইহার অবসান নিশ্চিত। সুতরাং, নরনারীর পরস্পরের প্রতি মধুরভাব আংশিক এবং অনিত্য। কৃষ্ণের প্রতি নরের বা নারীর মধুরভাবের বিকাশ হইলে তাহা, এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত মধুর রস আংশিকতা এবং অনিত্যতাকে অতিক্রম করিয়া পূর্ণতা এবং নিত্যতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা নিত্যলীলায় কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়া সেই নিত্য কিশোর পরম-সুন্দরের সৌন্দর্য্যও অনন্তকাল সম্ভোগ করে। নরনারীর মধুর রসের আকাঙ্ক্ষার ইহাই পরম সার্থকতা। ইহাও নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ জগতের সকল নরনারীকে শিক্ষা দিয়াছেন।

৯।৭।৩২ রাসলীলার আরম্ভ : মধুরভাবের লীলা

গোপীগণের এক বৎসর প্রতীক্ষায় অতিবাহিত হইল। বস্ত্রহরণলীলার

পর বৎসরে শরৎকালের শুক্লপক্ষীয় রাত্রিতে কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত মধুরভাবের লীলা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ব্রজের মধুরভাবের লীলা সাধারণভাবে রাসলীলা নামে অভিহিত হয়। ভাগবত নিম্নলিখিত শ্লোকটীর দ্বারা রাসলীলার বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন।

ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ভাগবত ১০।২৯।১

—"প্রস্ফুটিতা মল্লিকা পুষ্পের দ্বারা আমোদিত সেই সকল শারদীয়া রজনী দর্শন করিয়া যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবানও রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন।" এইটীকে রাসলীলাতত্ত্বের সূত্রশ্লোক বলা যাইতে পারে। প্রথমেই ভগবান শব্দ ব্যবহার করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, যিনি রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন, সেই কৃষ্ণ মনুষ্য নহেন, তিনি ভগবান ; ভগবান সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ; সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ দেহদেহীবিভেদহীন অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু এবং তাহাতে প্রাকৃত কাম নাই ; সুতরাং, তাঁহার রমণ প্রাকৃত কামক্রীড়া নহে। "ভগবানও"—এই "ও" শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, কেবল কৃষ্ণই রাধা এবং গোপীগণের সহিত রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন তাহা নহে, রাধা এবং গোপীগণও তাঁহার সহিত রমণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। "ও" শব্দের দ্বারা এই তত্ত্বও ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, যদিও কৃষ্ণ ভগবান এবং ষড়ৈশ্বর্য্যের ঈশ্বর, সমগ্র বিশ্বে তাঁহার অপ্রাপ্ত অথবা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি তাঁহার অহম্-এর অর্থাৎ তাঁহার আনন্দের স্বভাববশতঃ তিনি লীলা করেন। "সেই সকল রাত্রি" বলিয়া ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, বস্ত্রহরণলীলার সময় যে সকল রাত্রিতে কৃষ্ণ রমণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সমাগতা শারদীয়া রাত্রিগুলি সেই সকল রাত্রি। "চক্রে" ক্রিয়াটীতে আত্মনেপদ ব্যবহার করা হইয়াছে। কর্ত্তা নিজ প্রয়োজনে কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলে আত্মনেপদ ব্যবহৃত হয়। আত্মনেপদ ব্যবহারের দ্বারা এই তত্ত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজ প্রয়োজনে গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বস্ত্রহরণলীলার সময় কৃষ্ণ রাসলীলা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ; তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন তাঁহার নিজপ্রয়োজন। ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনও ছিল। কৃষ্ণ স্বীয় আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য যুগলমূর্ত্তি হইয়া লীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্বীয় হ্লাদিনীর স্বভাববশতঃ আনন্দ সম্ভোগ করা তাঁহার

ইচ্ছা, কিন্তু সেই হ্লাদিনীর স্বভাববশতঃই আনন্দদিৎসার সার্থকতা ব্যতীত আনন্দলিপ্সার সার্থকতা হয় না। রাধাকে এবং গোপীগণকে আপনার আনন্দাংশের অনন্ত মধুর রস দান করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিয়া তিনি আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদের সহিত রমণ করার অর্থ, তাঁহাদিগকে মধুর রস দান করা। সুতরাং তাঁহাদের সহিত রমণ করা তাঁহার নিজ প্রয়োজন। এই শ্লোকে ভাগবত জানাইলেন যে, এই যুগ্ম প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত কৃষ্ণ রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। "যোগমায়া" শব্দটীর অর্থ, কৃষ্ণের অঘটনঘটন-পটিয়সী চিচ্ছক্তি। কৃষ্ণ যোগমায়া অবলম্বনে রাসলীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার চিচ্ছক্তির যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা রাসলীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাসলীলার মধ্যে তাঁহার যৌগিক ক্রিয়া কি, তাহা দৃষ্ট হইবে। রাসলীলা আরম্ভ করিবার জন্য কৃষ্ণ চারুনয়না গোপীগণের মনোহরণকারী মধুর গান করিলেন—"জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্"—ভা ১০।২৯।৩। যমুনাতীরবর্ত্তী বনে কৃষ্ণ গান করিলেন; গোপীগণ তাঁহার নিকট হইতে অনেক দূরে ব্রজের পল্লীতে স্ব স্ব গৃহে কর্ম্মনিরতা ছিলেন। কৃষ্ণের যোগমায়া তাঁহার সঙ্গীতময় আহ্বান গোপীগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করিয়া দিল। সেই আহ্বান "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" "গতিবিদ্" কৃষ্ণ তাঁহার গানের এইরূপ মর্ম্মস্থলে গতি জানেন, কিন্তু তাঁহার "উদ্গীতমোহিতা"—উচ্চ গীতে মোহিতা গোপীগণ জানিতেন না, কৃষ্ণ কোথায় কোন্ বনে থাকিয়া গান গাহিয়াছেন। গোপীগণ গৃহকর্ম্ম অসমাপ্ত অবস্থায় ত্যাগ করিয়া আকুল প্রাণে উন্মত্তাবৎ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গমনোদ্যতা হইলেন। তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধুগণ যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু কোন বাধাই তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। নিত্য-সিদ্ধা গোপীগণ পরস্পর কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইয়াই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যাইতে লাগিলেন (আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ); অর্থাৎ প্রত্যেকে একাকিনী যাইতেছিলেন। কৃষ্ণের যোগমায়া প্রেমোন্মত্তা গোপীগণের কৃষ্ণাভিমুখী গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের সকাশে উপস্থিত করিলেন। রাসলীলার সময় কৃষ্ণের বয়স নবম বর্ষ চলিতেছে; গোপীগণ তাঁহার প্রায় সমবয়স্কা। লৌকিক দৃষ্টিতে রাসলীলা যাহাতে দোষাবহ না হয়, তজ্জন্য লৌকিক পৌগণ্ড বয়সে কৃষ্ণ রাস-লীলা করিতেছেন; কিন্তু রাসলীলা অপ্রাকৃত এবং অলৌকিক, এবং তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালেই রাসলীলা করিবেন। রাসলীলায় কৃষ্ণকে এবং গোপী-

গণকে পরিপূর্ণ মধুর রস সম্ভোগ করিতে হইবে ; এইজন্য পরিপূর্ণ কিশোর বিগ্রহ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা রাসলীলা করিবেন। যোগমায়াপ্রভাবে পৌগণ্ড-বিগ্রহ কৃষ্ণ এবং গোপীগণ সকলেই পরিপূর্ণ কিশোর বিগ্রহ হইলেন এবং সকলের বিগ্রহ যোগমায়ার দ্বারাই লীলার উপযোগী বেশভূষা-প্রসাধন-অলঙ্কার-পুষ্পমাল্য প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত হইল।

৯।৭।৩৩ সাধনসিদ্ধা গোপীগণের প্রাকৃত দেহ ত্যাগ করিয়া রাসলীলায় প্রবেশ

বস্ত্রহরণলীলার সময় কৃষ্ণ সাধনসিদ্ধা গোপীগণের সহিতও রাসলীলা করিবার অঙ্গীকার করিযাছিলেন। সাধনে সিদ্ধিলাভের পরেও ত্রিগুণের সমবায়ে গঠিত দেহটী সত্ত্বগুণপ্রধান হয় বটে, কিন্তু রজস্তমোগুণদ্বয়ও অপ্রধানভাবে থাকে বলিয়া দেহটী ত্রিগুণময়ই থাকে। প্রেমবিকাশের পর সত্ত্বগুণপ্রধান দেহের সকল বৃত্তিই প্রেমের অনুগামী হয় ; দৈহিক কাম প্রেমের মধুরভাবের অনুগামী হইয়া কৃষ্ণসেবা করে, রিপুর কার্য্য করে না, কিন্তু তাহা হইলেও দেহটী ত্রিগুণময়ই থাকে। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের সহিত কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের রাসলীলা হইতে পারে, পরমভাবের সহিত পরমভাবেরই মিলন হইতে পারে। অধিভূত ক্ষরভাব ত্রিগুণময় দেহ কৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিতে পারে না। রাধার এবং অবতীর্ণা গোপীগণের দেহ ত্রিগুণময় নহে ; তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। এইজন্য তাঁহারা স্ব স্ব বিগ্রহেই রাসলীলার জন্য কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিলেন। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ গুণময় দেহে রাসলীলা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না, অথচ তাঁহাদের সহিতও কৃষ্ণকে ব্রজে রাসলীলা করিতে হইবে, কারণ কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ আছেন। তাঁহাদিগকে ব্রজের রাসলীলা প্রাপ্ত করাইবার জন্য কৃষ্ণ যোগমায়াপ্রভাবে তাঁহাদের পতিগণকর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করাইলেন। দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহের তীব্র তাপে অলব্ধবিনির্গমা গোপীগণের অশুভ অর্থাৎ ত্রিগুণময় দেহের বন্ধন বিনষ্ট হইল এবং সবিকল্প সমাধিতে তাঁহারা কৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের পুণ্যের সংস্কারও দূরীভূত হইল। তদবস্থায় তাঁহাদের জীবাত্মা গুণময় দেহ ত্যাগ করিল, অর্থাৎ তাঁহাদের দেহের মৃত্যু হইল, এবং তাঁহাদের জীবাত্মা মধুরভাবরসময় সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া যোগমায়া সহায়ে কৃষ্ণ সকাশে উপস্থিত নিত্যসিদ্ধা গোপীমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। নরনারীগণ গোপীগণের

প্রদর্শিত প্রণালীতে সাধনা করিয়া যখন সাধনসিদ্ধ হয়, তখন সত্ত্বগুণ প্রবল এবং প্রধান হইলেও তাহার দেহ ত্রিগুণময়ই থাকে এবং সেই দেহে সে নিত্যরাসলীলায় প্রবেশ করিতে পারে না। যতদিন তাহার জীবাত্মা দেহে থাকে, ততদিন সে সবিকল্প সমাধিতে কৃষ্ণের সহিত মিলন প্রাপ্ত হয়। সবিকল্প সমাধিতে রাসলীলাদর্শন, এমন কি রাসলীলায় যোগদানও করিতে পারে, কিন্তু তাহা স্বল্প কালের জন্য; এইরূপ সাধনসিদ্ধ নর বা নারী দেহের মৃত্যুর পর সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহে কৃষ্ণের নিত্য লীলামণ্ডলে প্রবেশ করেন। যাঁহাদের শুদ্ধ সখ্য, দাস্য অথবা বাৎসল্য ভাবের প্রেম বিকশিত হয়, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা; কিন্তু দেহত্যাগের পর তাঁহারা মধুরভাবের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হয়েন না, নিজ নিজ ভাবানুযায়ী নিত্যলীলা প্রাপ্ত হয়েন।

৯।৭।৩৪ কৃষ্ণের বাক্‌চাতুরী

গোলোকের নিত্যলীলায় লোকশিক্ষার প্রয়াস নাই; তাহা কেবলই পারস্পরিক সম্ভোগ; কিন্তু মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজলীলার দ্বারা পরমধর্ম্ম স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রজের রাসলীলার মধ্যেও লোকশিক্ষার প্রয়াস আছে। রাসলীলাকালে কৃষ্ণের এবং গোপীগণের উক্তিসমূহের মধ্যে লোকশিক্ষার প্রয়াস সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। উক্তিসমূহের মর্ম্ম হইতেই এইরূপ প্রয়াস বুঝা যাইবে; আমরাও ইহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যাইব। গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "অয়ি মহাভাগ্যবতীগণ! আপনারা স্বাগত। আমি আপনাদের কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব? ব্রজের কুশল ত? আপনাদের আগমনের কারণ কি? রজনী ঘোররূপা এবং বন শ্বাপদসঙ্কুল। স্ত্রীলোকের এখানে থাকা উচিত নহে। আপনারা ব্রজে ফিরিয়া যান। আপনাদের আত্মীয়গণ আপনাদিগকে খুঁজিতেছেন; তাঁহাদের উদ্বেগ সৃষ্টি করিবেন না। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনের শোভা দেখা হইল, এখন ঘরে ফিরিয়া গিয়া পতির সেবা করুন। শিশুগণ এবং গো-বৎসগণ রোদন করিতেছে। ঘরে গিয়া তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করান। আপনারা আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা ঠিকই হইয়াছে, কারণ সকল জন্তুই আমাকে প্রীতি করে। কিন্তু অকপটভাবে পতির এবং তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণের সেবা এবং শিশুপালন

নারীর পরম ধর্ম্ম। পতি দুঃশীল নির্ধন বৃদ্ধ অথবা জড় হইলেও কল্যাণকামী নারী তাহাকে ত্যাগ করিবে না। কুলস্ত্রীর পক্ষে ঔপপত্য ভয়াবহ, তুচ্ছ, এবং দুঃখময়; ইহাতে স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় এবং অপযশ প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা সর্ব্বত্রই নিন্দনীয়। আমার নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন, আমাকে দর্শন, এবং আমার ধ্যান করিলে আমার প্রতি যেরূপ ভক্তিভাব হয়, আমার নিকট থাকিলে তদ্রূপ হয় না; অতএব আপনারা ঘরে ফিরিয়া যান, ঘরে গিয়া আমার নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন শ্রবণ এবং স্মরণ করুন এবং আমায় ধ্যান করুন।” কৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধা অবতীর্ণা গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি করিয়াছেন, সাধনসিদ্ধা গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া নহে; কারণ, সাধনসিদ্ধা গোপীগণ দেহ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে নিত্যলীলায় নিত্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পুনরায় গৃহে ফিরিয়া পতিসেবাদির কর্ম্ম করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। নিত্য-সিদ্ধা গোপীগণ ব্রজে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তাঁহাদের অবতারকাল এখনও শেষ হয় নাই, এবং তাঁহাদিগকে এখনও ব্রজে থাকিয়া পরমধর্ম্মলাভের সাধনা শিক্ষা দিতে হইবে। এইজন্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এই উক্তির দ্বারা জানাইলেন যে, তাঁহাদের এখন মর্ত্ত্য লীলা সংবরণ করিয়া নিত্যলীলায় থাকিবার সময় হয় নাই; তাঁহাদিগকে পুনরায় ব্রজে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং মর্ত্ত্য নারীর ন্যায় পতিসেবাদি লৌকিক আচরণও করিতে হইবে, নতুবা মর্ত্তলীলার সার্থকতা থাকিবে না। কিন্তু কৃষ্ণ যে শিশু পালন করিতে বলিয়াছেন, সেই সকল শিশু এই গোপীগণের গর্ভজাত শিশু নহে, তাঁহাদের পরিবারস্থ জ্যেষ্ঠ-ব্যক্তিগণের শিশু। রাসলীলার সময় গোপীগণের বয়স নয় বৎসর, কাহারও ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন, কাহারও কিঞ্চিদধিক। বলাই বাহুল্য, এইরূপ অল্প বয়সে তাঁহাদের গর্ভে সন্তানের জন্ম হইতে পারে না। তখন, এবং এখনও, নবাগতা বালিকা বধূগণ পরিবারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ পরিজনগণের শিশুগণকে দুগ্ধপান করায় এবং লালনপালনের বিবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে; ইহাতে তাহাদের গৃহকর্ম্ম করাও হয় এবং শিশুপালনের কার্য্য শিক্ষা করাও হয়। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ বিবাহিত পতিগণের সহিত কখনও কামক্রীড়া, অর্থাৎ সঙ্গম, করেন নাই এবং কখনও গর্ভধারণও করেন নাই। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ রাসলীলা পাইবার জন্য নব বৎসর বয়সেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কখনই পতিসহবাস হয় নাই। রাধার এবং অবতীর্ণা গোপীগণের

সহিত তাঁহাদের স্বামীগণ সহবাস করেন নাই, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। রাধার লৌকিক পতি আয়ান ঘোষ মহামায়ার উপাসক ছিলেন। তিনি রাধাকে মহামায়ারূপে দেখিয়া তাঁহাকে ইষ্টদেবীরূপে পূজা করিতেন। রাসলীলার সময় কৃষ্ণের বয়স নয় বৎসর। ব্রজের সন্তানবতী গোপীগণের নয় বৎসর বয়স্ক বালক কৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব থাকিতে পারে না এবং ছিলও না; কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের বাৎসল্যভাব ছিল। রাসলীলা মধুরভাবের লীলা; বাৎসল্যভাবের গোপীগণের ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। এইজন্য, রাসলীলায় ব্রজের কোন সন্তানবতী গোপীর অবস্থান অসম্ভব। এই উক্তির মধ্যে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে ঔপপত্য দোষাবহ, কিন্ত এরূপ বলেন নাই যে তাঁহার সহিত রাসলীলায় গোপীগণের ঔপপত্যদোষ হইবে। তিনি এরূপ বলিতেও পারেন না, কারণ এই উক্তির মধ্যে তিনি জানাইয়াছেন যে তিনিই বেদান্তের "তদেতৎ প্রেয়ঃ" বলিয়া জীবাত্মার আনন্দাংশের স্বভাববশতঃ সকল জন্তুই তাঁহাকে প্রীতি করে এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়; তিনি তাঁহার সহিত গোপীগণের নিত্য পতি-পত্নীত্বের সম্বন্ধ জানেন; এবং, বস্ত্রহরণকালে তিনি তাঁহাদের পতি হইবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, উপপতি হইবার অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি জানেন, তিনি তাঁহাদের উপপতি নহেন, এবং তাঁহারা তাঁহাকে উপপতি ভাবিয়া তাঁহার নিকট আসেন নাই, নিত্যপতি ভাবিয়াই আসিয়াছেন। যদি তিনি সত্যই জানিতেন যে তাঁহারা তাঁহাকে উপপতি মনে করেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া তাঁহারই নামগুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ ও ধ্যান করিতে বলিতেন না, কারণ ইহা তাঁহার অবিদিত নহে যে কেবল উপ-পতির সঙ্গ করিলেই ঔপপত্য দোষ হয় তাহা নহে, উপপতির শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ ধ্যানও ঔপপত্যদোষ। ঔপপত্য দোষাবহ এবং পতি দুঃশীল রুগ্ন বা নির্ধন হইলেও পতিসেবা নারীর ধর্ম্ম, গোপীগণকে নারীর এই পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ দিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, যতদিন তাঁহারা ব্রজে অবতীর্ণা থাকিবেন, ততদিন মানবসমাজের লৌকিক লীলায় তাঁহাদিগকেও এই পাতি-ব্রত্যধর্ম্মের আচরণ করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণের নামগুণাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-ধ্যানাদি করিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় যে ভক্তিযোগ, তাহা সকলকে শিক্ষা দিতে হইবে। কৃষ্ণ তাঁহার এই সকল গূঢ় অভিপ্রায় গূঢ়ভাবে এই উক্তির মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন, এইজন্য ইহা তাঁহার বাকৃচাতুরী, অর্থাৎ বাক্যবিন্যাসের

কৌশল। এই উক্তিটী পরীক্ষিতকে বলিবার পূর্ব্বেই শুকদেবও ইহাকে কৃষ্ণের বাকৃচাতুরীই বলিয়াছেন।

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্॥ ভাগবত ১০।২৯।১৭

শুকদেব বলিলেন, "ব্রজগোপীগণকে নিকটে আগতা দেখিয়া বাগ্মীশ্রেষ্ঠ ভগবান তাঁহাদিগকে বচনচাতুর্য্যে বিমোহিতা করিবার জন্য বলিলেন।" ইহা বলিয়া শুকদেব কৃষ্ণের উক্তিটী বলিয়াছেন। কৃষ্ণ গোপীগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই বাকৃচাতুরী করেন নাই, কারণ অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ গোপীগণের বিশুদ্ধ প্রেম অবগত ছিলেন; ইহা জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণ জানিতেন যে, গোপীগণ সহসা এই উক্তির মর্ম্ম না বুঝিয়া, এই উক্তির দ্বারা তিনি তাঁহাদিগকে ঔপপত্যের আছিলায় প্রত্যাখ্যান করিতেছেন ভাবিয়া হতাশ হইবেন এবং তাঁহাদের প্রেমের ক্রোধ মান দৈন্য প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা উৎপন্ন হইবে। এই অবস্থাসমূহ প্রেমের ভাবের ভাব। বাকৃচাতুরীর দ্বারা গোপীগণের মধ্যে উক্তরূপ ভাবসমূহ উৎপন্ন করিয়া তাহা সম্ভোগ করিবার জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টোক্তি না করিয়া উক্তরূপ বাকৃচাতুরী করিয়াছেন। বাকৃচাতুরীর অন্য কারণ এই যে, সুচিরবাঞ্ছিত প্রিয়তম বস্তু লাভ করিবার আশা পূর্ণ হইলে অতিশয় আনন্দ হয় তাহা সত্য; কিন্তু সেই আশা হতাশায় পরিণত হইবার পর যদি সহসা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তবে আরও বহুগুণ অধিক আনন্দ লাভ হয়। কৃষ্ণ গোপীগণকে হতাশ করিয়া তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে অত্যধিক আনন্দ দিয়া নিজেও অত্যধিক আনন্দ লাভ করিবার জন্য উক্তরূপ বাকৃচাতুরী করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের এই উক্তি এবং গোপীগণ ইহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে, তাঁহারা ইহাও শিক্ষা দিয়াছেন যে গোপীগণ কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিতেন এবং কৃষ্ণ বিবাহিতা নারীগণের সহিত মধুরভাবের লীলা করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার পরদারত্ব এবং বিবাহিতা নারীগণের ঔপপত্য হয় না।

৯।৭।৩৫ গোপীগণের উত্তর

কৃষ্ণের উক্তি শ্রবণ করিয়া গোপীগণ ভাবিলেন যে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইজন্য তাঁহার এই উক্তি তাঁহাদের নিকট অপ্রিয়

বোধ হইল ; তাঁহারা হতাশ এবং ভগ্নসংকল্প হইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণা হইলেন। তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে তাঁহাদের বিম্বাধর শুষ্ক হইল ; অজস্র অশ্রুধারায় তাঁহাদের নয়নের অঞ্জন এবং বক্ষের কুঙ্কুমরাগ ধৌত হইল ; নতমুখী হইয়া চরণাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা মৃত্তিকালিখন করিতে করিতে অসহনীয় দুঃখভরে তাঁহারা কিছুক্ষণ মৌনী হইয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। তৎপরে অঞ্চলের দ্বারা অশ্রুমোচন করিয়া কিঞ্চিৎ ক্রোধাবেশে তাঁহারা কৃষ্ণের উক্তির উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে যে উত্তর দিলেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম এবং অভিপ্রায় প্রদত্ত হইতেছে। গোপীগণ প্রথমেই ঔপপত্যের আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। "হে বিভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার যোগ্য নহে, কারণ তুমি পরম কৃপালু ; আদি-পুরুষ পরমেশ্বর তুমি সংসারত্যাগী মুমুক্ষু যোগীগণকে কৃপা করিয়া মুক্তি দান করিয়া থাক। আমরা মোক্ষকামী নহি ; আমরা তোমার উপাসনা করিতে চাই ; এইজন্য আমরাও যোগীগণের ন্যায় সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে কৃপা করিয়া গ্রহণ কর। হে প্রিয়তম! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ; পতিপুত্রাদির সেবা নারীর ধর্ম্ম, এই উপদেশ তুমি আমাদিগকে দিয়াছ। কিন্তু, তুমিই পরমেশ্বর এবং আত্মা ; তুমিই সকল জীবদেহে অধিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ জীবাত্মা এবং শুভপ্রেরণাদাতা বন্ধু পরমাত্মা। পরম-পতি তুমিই পতিপুত্রাদিরূপে বিদ্যমান ; তোমার সেবা করিলে সকলেরই সেবা করা হয়। অতএব, তোমারই উপদেশ অনুসারে তুমিই আমাদের উপাস্য এবং তোমার সেবাই আমাদের ধর্ম্ম।" এতদ্দ্বারা গোপীগণ জানাইলেন যে, লৌকিক লীলায় তাঁহাদের বিবাহিত পতি থাকিলেও তাঁহারা কৃষ্ণকে পরমপতি পরমেশ্বর, এবং স্বয়ং ভগবান জানিয়াই তাঁহার ভজনা করেন, এবং সকল নরনারীরই তাহাই করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা তাঁহারা ইহাও জানাইলেন যে, তাঁহারা কৃষ্ণকে ভজনা করেন, লৌকিক পতিরূপেও নহে এবং লৌকিক উপ-পতিরূপেও নহে, এবং তাঁহারা প্রাকৃত কামক্রীড়ার জন্য কৃষ্ণের নিকট আসেন নাই। তাঁহাদের এই উক্তি প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় করিবার জন্য গোপীগণ বলিতেছেন, "আমরা জানি যে তুমি প্রাকৃত জীব নহ, তুমি আত্মা ; তোমার মধ্যে প্রাকৃত কাম নাই। এই তত্ত্ব জানিয়া আমরা যে তোমায় উপপতি ভাবিয়া কামক্রীড়ার জন্য তোমার নিকট আসিতে পারি না এবং আসিও নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা ইহাও জানি যে তুমি অস্তি-ভাতি-প্রিয়-সচ্চিদানন্দ,

সুতরাং পরমানন্দস্বরূপ এবং প্রেমময়, এবং এইজন্যই তুমি নিজেই বলিয়াছ যে তুমি সকল জীবের নিত্যপ্রিয় এবং সকল জন্তু তোমায় প্রীতি করে এবং তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইজন্যই, তুমি কেবল আমাদেরই নিত্যপ্রিয় নহ, তোমার তত্ত্বজ্ঞ সকল নরনারীরই তুমি নিত্যপ্রিয়। পতিপুত্রাদির সহিত যে লৌকিক সম্বন্ধ তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখদায়ক; তাহারা নিত্যপ্রিয় হইতে পারে না। একমাত্র তুমিই নিত্যপ্রিয়, এইজন্য তত্ত্বজ্ঞ সকল নরনারীই প্রেমের সহিত তোমার ভজনা করেন। পরমপুরুষ পরমাত্মা এবং পরমপতি ভগবানের ভজনা করিলে যদি আমাদের ঔপপত্য হয়, তবে বিবাহিতা নারীমাত্রেই ভগবানের ভজনা করিলে তাহাদেরও ঔপপত্য হয়। কিন্তু জগতের বহু বিবাহিতা নারী তোমার ভজনা করিতেছে; তাহাদের আত্মীয়বন্ধুগণ অথবা জগতবাসী কেহই এরূপ নির্ব্বোধ আপত্তি করে না যে বিবাহিতা নারী ভগবানের ভজনা করিলে তাহার ঔপপত্য হয়। হে বরদেশ্বর, হে কমললোচন, ঔপপত্যের এইরূপ অসার আপত্তি করিয়া তোমাকে সেবা করিবার আমাদের দীর্ঘকালের আশা ছিন্ন করিয়ো না।" তাঁহার নিকট না থাকিয়া ঘরে গিয়া তাঁহার নামগুণাদির শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিবার যে উপদেশ কৃষ্ণ দিয়াছেন, এখন গোপীগণ তাহার উত্তর দিতেছেন। "তুমি আনন্দস্বরূপ। তুমি কৃপা করিয়া যাহাকে আপনার করিয়া লও এবং আপন সকাশে আকর্ষণ কর, সে সর্ব্বদা তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার উপাসনা করিতে চাহে। তুমি যেরূপ উপদেশ দিয়াছ, সেইরূপেই আমরা আমাদের চিত্তকে গৃহধর্ম্মে এবং হস্তদ্বয়কে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলাম; কিন্তু আজ সঙ্গীতের দ্বারা আমাদিগকে আহ্বান করিয়া তোমার নিকট আনিয়াছ। এখন আমাদের আর গৃহে ফিরিয়া যাইবার সাধ্য নাই। আমাদের চরণদ্বয় তোমার চরণতল হইতে একপদও চলিতে পারিতেছে না। তুমিই বল, আমরা এই অবস্থায় কিরূপে ব্রজে ফিরিয়া যাইব এবং তুমি আমাদিগকে গ্রহণ না করিলে আমরা কি করিব।" কৃষ্ণের নিকট হইতে এই প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া গোপীগণ নিজেদের দৃঢ় সংকল্প তাঁহাকে জানাইতেছেন। "হে প্রিয়তম, তোমার মধুর হাস্য, মধুর দর্শন, এবং মধুর সঙ্গীত তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাদের অন্তরে যে প্রবল কামনাবহ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছে, তোমার অধরামৃত সিঞ্চন করিয়া সেই বহ্নি নির্ব্বাপিত কর। যদি তাহা না করিয়া তুমি আমাদিগকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে হে সখে, কামনাগ্নি

এবং বিরহাগ্নি, এই দ্বিবিধ অগ্নির দ্বারা দগ্ধদেহ আমরা যোগীগণের ন্যায় ধ্যানের দ্বারা তোমার চরণসান্নিধ্য প্রাপ্ত হইব।" অতঃপর তাঁহারা উক্তরূপ সঙ্কল্পগ্রহণের কারণ বিবৃত করিতেছেন। "হে অম্বুজাক্ষ, বৃন্দাবনবাসী আমাদের অতি প্রিয় তুমি। তোমার চরণযুগল স্পর্শ করিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদেবীও পরমানন্দ লাভ করেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা একদিন তোমার ঐ লক্ষ্মীসেবিত চরণ স্পর্শ করিয়াছিলাম। সেই স্পর্শের দ্বারা আমরা যে পরমানন্দ পাইয়াছিলাম তাহা অসীম এবং অতুলনীয়। সেই দিন হইতে আমরা পতি পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি লৌকিক সম্বন্ধবিশিষ্ট কাহারও নিকটে থাকিতে পারিতেছি না। আজ তাহাদের সকলকেই ত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি, তোমার নিকট হইতে আর গৃহে ফিরিব না।" কৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়াই মধুরভাবময়ী গোপীগণ ইতিপূর্ব্বে যে অসীম মধুর রস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লৌকিক পতির নিকট তাহার সহস্রাংশও প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এই কারণে গোপীগণ তদবধি গৃহে পরিজনগণের সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, কৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আজ সেই সঙ্গলাভ করিয়া আর তাহা তাঁহারা কোন ক্রমেই ত্যাগ করিবেন না, ইহাই তাঁহাদের সঙ্কল্প। সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ ইহা জানিয়াই পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন যে লৌকিক লীলায় পতি প্রভৃতিকে ত্যাগ করা চলিবে না, তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে। কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তিই যে পরম সৌভাগ্য, এক্ষণে গোপীগণ তাহাই বলিতেছেন। "বৈকুণ্ঠের অসীম এবং অতুল সম্পদপ্রাপ্তি অপেক্ষাও তোমার চরণপ্রাপ্তি পরম সৌভাগ্য। বৈকুণ্ঠে নারায়ণরূপে অবস্থিত তোমার বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের অসীম সম্পদের অধিকারিণী হইয়াও, তোমার দাসদাসীগণ কর্তৃক তুলসীর দ্বারা পূজিত তোমার চরণযুগল প্রাপ্ত হইবার জন্য কামনা করেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য যাঁহাকে ভজনা করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও যখন তোমার চরণ-লাভের জন্য ব্যাকুলা, তখন ইহা বলাই বাহুল্য যে তোমার চরণের তুলনায় বৈকুণ্ঠও অতি তুচ্ছ। আজ আমরাও লক্ষ্মীদেবীর মত তোমার পাদপ্রাপ্তির কামনায় তোমার পাদরজের শরণ লইলাম।" পরবর্ত্তী উক্তিতে গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের, তথা জীবমাত্রেরই, নিত্য সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে তাঁহার দাসীরূপে তাঁহার উপাসনা করা তাঁহাদের এবং সকল জীবের পরম ধর্ম্ম, এবং সেই দাস্যই তাঁহারা প্রার্থনা করিতেছেন। "তুমি

পরমানন্দস্বরূপ, পরম সুন্দর, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ; এইজন্য তুমি পুরুষভূষণ, পরম-পুরুষ, পুরুষোত্তম, এবং এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ। আমরা, এবং জীবমাত্রেই, তোমার পরাপ্রকৃতি। তোমার প্রকৃতি তোমার নিত্যদাসী। প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষের উপাসনা—নিয়ত পুরুষের নিকট থাকিয়া তাঁহার আনন্দদায়ক সেবাকার্য্য-সম্পাদন। ইহারই জন্য আমরা জগতের সকল কাম্যবস্তু, এমন কি গৃহ এবং আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছি ; তোমার ঐ সুন্দর হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া তোমার চরণসেবা করিবার তীব্র কামনা আমাদের অন্তরকে দগ্ধ করিতেছে। অতএব হে দুঃখহন্তা পুরুষোত্তম, আমাদিগকে তোমার দাস্য প্রদান কর।” এতক্ষণ গোপীগণ তাঁহাদের নিত্য-দাসীত্বের এবং কৃষ্ণের পুরুষোত্তমত্বের তত্ত্ববিচারের দ্বারা ঔপপত্যদোষের আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা কৃষ্ণগুণের প্রভাববিচারের দ্বারা ঔপপত্যদোষের আপত্তি খণ্ডন করিয়া তাঁহাদের নিত্য কৃষ্ণদাসীত্ব সমর্থন করিতেছেন। “তোমার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যগুণের এমনই প্রভাব যে তাহা মহাজ্ঞানী আত্মারাম যোগীগণকেও আকর্ষণ করিয়া দাসীরূপে তোমার চরণসেবা করিবার জন্য তোমার চরণতলে টানিয়া আনে। আমরা অবলা নারী, আমাদিগকে যে দাসীরূপে টানিয়া আনিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তোমার ঐ অলকাবৃত আনন, কুণ্ডলশোভিত গণ্ডস্থল, অমৃতময় অধর, সহাস্য অবলোকন, ত্রিলোককে অভয়দানকারী ভুজদণ্ডযুগল, এবং লক্ষ্মীর একমাত্র আনন্দস্থল তোমার ঐ বক্ষ দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি। হে প্রিয়তম, ত্রিলোকে এমন কে নারী আছে এবং এমন কে পুরুষও আছে, যে তোমার মুরলীর মধুর মূর্চ্ছনা শ্রবণ করিয়া এবং ত্রিলোকের সকল সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের সার তোমার রূপ দর্শন করিয়া বেদবিহিত বিধিনিষেধের শাশ্বত আর্য্যপথ ত্যাগ না করে। বেদবিধির প্রভাব ত্রিলোকবাসীর উপর ততক্ষণই প্রবল থাকে, যতক্ষণ তোমার গুণের প্রভাব তাহাদের উপর পতিত না হয়। তোমার গুণের প্রভাব যাহার উপর পতিত হয়, তাহাকেই বেদবিধি ত্যাগ করাইয়া বেদাতীত তোমার চরণতলে দাসী করিয়া টানিয়া আনে। তাহারা তোমার চরণতলে আসিয়া তোমার সেবার দ্বারা তোমার নিকট হইতে যে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, বেদ সেই আনন্দকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় নাই। তাই শ্রুতিগণও আজ সেই পরমানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য গোপীরূপে এখানে আসিয়াছেন, তোমার মধুরভাবের

লীলা পাইবার নিমিত্ত। দেবতামনুষ্যাদির কথা কি বলিব, গো-মহিষ-মৃগ-পক্ষী প্রভৃতি জন্তুগণও, এমন কি বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণও, তোমার রূপ দর্শন করিয়া এবং তোমার মুরলীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ অঙ্গে পুলকচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। অতএব হে প্রিয়তম, তোমার ত্রিলোকবিজয়ী গুণের প্রভাবাকর্ষিতা আমাদিগকে তোমার দাসীরূপে অঙ্গীকার কর।" অবশেষে গোপীগণ কৃষ্ণকে তাঁহার স্বয়ংরূপ-অবতারত্ব স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় তুমিই ছিলে, এইজন্য তুমি আদিপুরুষ। আবার তুমিই স্বয়ং-ভগবান, তুমিই লীলার জন্য সুরলোক নরলোক প্রভৃতি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি যেমন সুরলোকের রক্ষক, তদ্রূপ এই নরলোকেরও রক্ষক। তুমি বিশেষতঃ ব্রজের ভয়হারী এবং দুঃখহারী, কারণ ব্রজলীলাই তোমার স্বয়ংরূপ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা সুনিশ্চিত। তুমি পূর্ব্বে পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতিকে বধ করিয়া, কালিয়দমন করিয়া, দাবাগ্নি পান করিয়া, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া এবং আরও বহুবিধ কার্য্য করিয়া ব্রজের আর্ত্তি দূর করিয়াছ। আমরা তোমার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া একান্ত আর্ত্ত হইয়াছি। অতএব হে আর্ত্তবন্ধো, তোমার এই দাসীগণের তপ্ত স্তনে এবং মস্তকে তোমার করকমলের মধুর স্পর্শ দান করিয়া আমাদের বিরহজ্বালা এবং আর্ত্তি দূর কর।" ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, গোপীগণের এই উক্তির দ্বারা কৃষ্ণের গোপী-প্রেম-সম্ভোগ হইয়াছে এবং ব্রজলীলার উদ্দেশ্য অনুযায়ী লোকশিক্ষার কার্য্যও সাধিত হইয়াছে।

৯।৭।৩৬ রাসলীলার প্রথম পর্য্যায় ; সংযোগলীলা—অঙ্গের দ্বারা সেবা

কৃষ্ণ যে উদ্দেশ্যে বাক্‌চাতুরী করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল। এখন তিনি সহাস্যে গোপীগণের সহিত মধুরভাবের লীলা আরম্ভ করিলেন। পাছে কেহ ভাবে যে রাসলীলা প্রাকৃত কামক্রীড়া, সেইজন্য শুকদেব এখানেও বলিয়াছেন, "যোগেশ্বরেশ্বরঃ আত্মারামঃ অপি গোপীঃ অরীরমৎ"—"কৃষ্ণ যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর এবং আত্মারাম ; তথাপি তিনি গোপীগণকে আপনার সহিত রমণ করাইলেন।" কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর, ইহা বলিয়া শুকদেব জানাইলেন যে রাস-লীলায় কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের সংযোগ পরমভাবের সহিত পরমভাবের সংযোগ, এবং কৃষ্ণ আত্মারাম, ইহা বলিয়া জানাইলেন যে গোপীগণের সহিত

তাঁহার রমণ তাঁহারই আনন্দাত্মায় তাঁহার রমণ। কৃষ্ণ গোপীগণকে আপনার সহিত রমণ করাইলেন, ইহার অর্থ এই যে, গোপীগণকে স্বীয় মধুর রস সম্ভোগ করাইলেন, কারণ, তাহা না করিলে তিনিও উহা সম্ভোগ করিতে পারেন না। অতঃপর কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত যে রাসলীলা আরম্ভ করিলেন, তাহা সংযোগ-লীলা। যমুনাপুলিনে তাঁহাদের সহিত গান গাহিতে গাহিতে তিনি যে সংযোগ-লীলা করিলেন, তাহা এইরূপ :

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালোকোরু—নীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীনা—মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়ঞ্চকার ॥

ভা ১০।২৯।৪৬

—"বাহুপ্রসারের দ্বারা আলিঙ্গন, নখাগ্রদ্বারা হস্ত-কেশ-জঙ্ঘা-কটিবন্ধ-স্তন-স্পর্শন, হাস্যপরিহাস, ক্রীড়াকৌতুক, এবং অবলোকনের দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের কাম সমধিক উদ্দীপিত করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে রমণ করাইলেন।" তাঁহাদের কাম যে অপ্রাকৃত কাম, অর্থাৎ প্রেম, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রেম সমধিক উদ্দীপিত হইলে সমধিক আনন্দলাভ হয়; এইজন্য সংযোগলীলায় প্রেম সমধিক উদ্দীপিত হয়। সংযোগলীলার পারস্পরিক সেবা এবং আরাধনা অঙ্গের দ্বারা হইয়া থাকে, কারণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণের এবং গোপীগণের প্রেমরসময় অঙ্গের পারস্পরিক দর্শন এবং স্পর্শনের দ্বারা তাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। রাসলীলার প্রথম পর্য্যায়ে কৃষ্ণ এবং গোপীগণ উক্তরূপে স্ব স্ব অঙ্গের দ্বারা পারস্পরিক সেবা করিয়া সংযোগলীলা করিলেন। উক্ত শ্লোকে জঙ্ঘা ও স্তনস্পর্শের উল্লেখের দ্বারা কামক্রীড়া সূচিত হয় নাই। পৌগণ্ড বর্ষীয় বালক মাতৃক্রোড়ে বসিয়া মাতার জঙ্ঘা ও স্তন স্পর্শ করে, কিন্তু তাহাতে মাতা বা সন্তানের কামগন্ধও নাই, পরন্তু উভয়েই বাৎসল্যরস সম্ভোগ করে। এখানেও কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীগণের জঙ্ঘা ও স্তন স্পর্শে কামগন্ধও নাই, কেবল মধুর-রসের সম্ভোগের জন্য উক্তরূপে স্পর্শের প্রয়োজন ছিল।

৯।৭।৩৭ বিয়োগ—অঙ্গের দ্বারা সেবার অপ্রাপ্তি : সংযোগ ও বিয়োগ নিত্যলীলার যুগলরূপ

কৃষ্ণের সহিত যাঁহারা পরিণয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কখনই পরিণয়ের

অপ্রাপ্তি হয় না। পরিণয়লীলা নিত্যলীলা। কৃষ্ণ এবং তাঁহার নিত্যলীলার পরিকর যখন প্রত্যক্ষভাবে মিলিত হইয়া স্ব স্ব অঙ্গের দ্বারা পারস্পরিক সেবা ও আরাধনা করেন, তখন তাঁহাদের সংযোগলীলা। যখন কৃষ্ণ পরোক্ষে থাকায় উক্তরূপে অঙ্গের দ্বারা সেবা হয় না, তখন তাঁহাদের বিয়োগলীলা। কৃষ্ণ যুগল-মূর্ত্তি; কৃষ্ণের নিত্যলীলাও যুগলমূর্ত্তি; সংযোগ এবং বিয়োগ নিত্যলীলার যুগলরূপ। দিবস ও রাত্রি যেমন এক অখণ্ড কালেরই দুইটী রূপ, তদ্রূপ সংযোগ ও বিয়োগ এক অখণ্ড নিত্যলীলার দুইটী রূপ। যেমন দিবসের পর রাত্রি আসে, তদ্রূপ পর্য্যায়ক্রমে সংযোগের পর বিয়োগ আসে। যেমন সূর্য্যের অস্ত-গমনের নিমিত্ত রাত্রি হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত বিয়োগ হয়। যেমন রাত্রিতে সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়েন না কিন্তু পরোক্ষে থাকেন, তদ্রূপ বিয়োগে কৃষ্ণ দৃষ্টিগোচর হয়েন না কিন্তু পরোক্ষে থাকেন। নিত্যলীলায় রাধাভাবকে সংযোগে এবং বিয়োগে সম্ভোগ করিবার জন্য কৃষ্ণ রাধাকে এমন বিগ্রহ দিয়াছেন যে রাধাভাবেই বিয়োগেরও কারণ নিহিত আছে। কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহে সৎ চিৎ এবং আনন্দ অনন্ত এবং পূর্ণ; সংযোগলীলায় রাধাকে প্রাপ্তিতে তাঁহার পূর্ণ চিতে সৌভাগ্যবোধের উদয় হয় না। কিন্তু রাধার বিগ্রহে সৎ এবং চিৎ অপূর্ণ; সংযোগলীলায় কৃষ্ণকে প্রাপ্তিতে রাধার অপূর্ণ চিতে সৌভাগ্য-বোধের উদয় হয়। চিতে সৌভাগ্যবোধের উদয় হইলে প্রেমভাবে গর্ব্ব নামক অবস্থা উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণের পূর্ণ চিতে সৌভাগ্যবোধ না হওয়ায় তাঁহার প্রেম-ভাবে গর্ব্বের উদয় হয় না, কিন্তু রাধার অপূর্ণ চিতে সৌভাগ্যবোধ হওয়ায় তাঁহার প্রেমভাবে গর্ব্বের উদয় হয়। রাধার অংশ এবং কায়ব্যূহ গোপীগণেও এইরূপ হয়। গর্ব্ব সেবা এবং আরাধনার বিঘ্ন। গোপীগণের গর্ব্ব হইলেই তাহা প্রশমিত করিবার জন্য কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া পরোক্ষে থাকেন, এবং গর্ব্ব প্রশমিত হইলে আবার তিনি সংযোগলীলা করেন। গর্ব্ব সকল বিয়োগেরই কারণ নহে; বিয়োগের অন্যান্য কারণও আছে। ভাগবতে রাসলীলার মধ্যে যে কারণে বিয়োগ হইয়াছিল তাহা গর্ব্ব। শুকদেব গর্ব্বপ্রশমনহেতু কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান এবং প্রশমনান্তে পুনঃ প্রসাদের তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ভাগবত ১০।২৯।৪৮

গোপীগণের সেই সৌভাগ্যগর্ব্ব এবং তজ্জাত মান লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ

তাঁহাদের গর্ব্ব প্রশমিত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ অর্থাৎ সংযোগ দিবার জন্য সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।" রাধার গর্ব্বোদয়ের পূর্ব্বেই গোপীগণের গর্ব্বোদয় হইয়াছিল; এইজন্য কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া গোপীগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সংযোগলীলায় কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গের দ্বারা সেবা ও আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকে আনন্দদান প্রেমের স্বভাব। বিয়োগে এই স্বভাবের সার্থকতা না হওয়ায় ইহার সার্থকতার জন্য গোপীগণ কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ-ভাবে লাভ করিবার নিমিত্ত বিয়োগদশায় অতীব ব্যাকুল হয়েন এবং লাভ করিতে না পারায় অতিশয় ক্লেশ অনুভব করেন। রাধার এবং গোপীগণের সর্ব্বপ্রকারের ভাব ও ভাবালঙ্কার সংযোগলীলায় প্রকাশিত হয় না; কতক-গুলি সংযোগে এবং কতকগুলি বিয়োগে প্রকাশিত হয়। তাঁহাদের প্রেমের সর্ব্ববিধ ভাব এবং ভাবালঙ্কার কৃষ্ণ সম্ভোগ করিতে চাহেন, কিন্তু কেবল সংযোগ-লীলায় তাহা সম্ভোগ করা যায় না; তৎসমুদয় সম্ভোগ করিবার জন্য সংযোগ এবং বিয়োগ, উভয়েরই প্রয়োজন। এইজন্য কৃষ্ণ নিত্যলীলায় সংযোগলীলা এবং বিয়োগলীলা, উভয়বিধ লীলার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৯।৭।৩৮ রাসলীলার দ্বিতীয় পর্য্যায়—বিয়োগলীলা

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনা।
অতপ্যং স্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্॥ ভাগবত ১০।৩০।১

—"ভগবান সহসা অন্তর্হিত হইলে ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় অনুতপ্তা হইলেন, যেমন যূথপতি করী অদৃশ্য হইলে করিণীগণ হইয়া থাকে।" কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইবামাত্র গোপীগণের গর্ব্ব এবং মান অন্তর্হিত হইল, এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার সহিত সংযোগের জন্য ব্যাকুল হইলেন। ইহার পর গোপীগণের ব্যাকুল কৃষ্ণান্বেষণ, তৎকালে তাঁহাদের প্রেমভাবের বিবিধ এবং বিচিত্র অবস্থাসমূহের প্রকাশ, এবং পরোক্ষে বিদ্যমান কৃষ্ণের সেই গোপীপ্রেমসম্ভোগ, এই সমস্তই বিয়োগলীলা। গোপীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে কৃষ্ণের গুণ এবং লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে কৃষ্ণকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহারা চলিতে চলিতে আকাশকে, বৃক্ষগণকে, এবং লতাগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহারা কৃষ্ণকে তাহাদের নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়াছে কিনা। গোপীগণ এইরূপে উন্মত্তাবৎ কৃষ্ণান্বেষণ করিয়াও

কৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া অতিশয় কাতর হইলেন। এই সময়ে কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের অভেদভাবের পূর্ণ বিকাশ হইল। তাঁহারা আপনাদিগকে কৃষ্ণবোধ করিয়া কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পূতনাবধ, বকাসুরবধ, গো-চারণ, বংশীবাদন, কালিয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি কৃষ্ণ-লীলার অনুকরণ করিলেন। পুনরায় তাঁহারা বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি লক্ষণের দ্বারা তাঁহারা নিশ্চয় জানিলেন যে উহা কৃষ্ণেরই চরণচিহ্ন। তাঁহারা সেই চরণচিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে যাইতে যাইতে তাঁহারা কৃষ্ণের চরণচিহ্নের সহিত রাধারও চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন ঃ

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ যামনয়দ্রহঃ॥ ভাগবত ১০।৩০।২৮

—"ভগবান হরি ঈশ্বর গোবিন্দ ঐ গোপীটীর দ্বারাই নিশ্চয়ই সর্ব্বোত্তমরূপে আরাধিত হয়েন, কারণ গোবিন্দ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লইয়া নির্জ্জনে আসিয়াছেন।" রাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্নের বৈশিষ্ট দেখিয়া গোপীগণ তাঁহাদের বিবিধ প্রকারের লীলার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এতক্ষণ রাধাকৃষ্ণের সংযোগলীলা চলিতেছিল। এখন রাধারও গর্ব্বের উদয় হইল।

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্। ভাগবত ১০।৩০।৩৭

—"রাধাও আপনাকে সকল গোপীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা মনে করিলেন।"

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥ ভাগবত ১০।৩০।৩৮

—"বনের একস্থানে উপস্থিত হইয়া রাধা গর্ব্বভরে কৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি চলিতে পারিতেছি না। যথায় তোমার ইচ্ছা আমায় তথায়ই তুমি বহন করিয়া লইয়া চল।" কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।"

ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত। ভাগবত ১০।৩০।৩৯

—"রাধা কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন তখন কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। তখন তাঁহার সেই বধূর গর্ব্ব প্রশমিত হইল এবং তিনি অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন।"

হা নাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ! ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ!
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ভাগবত ১০।৩০।৪০

—"হা নাথ! হা বল্লভ! হা প্রিয়তম! হা মহাভুজ! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? হে সখে! তোমার এই দীনদশাপন্না দাসীকে তোমার সান্নিধ্য প্রদান কর।" রাধা যখন একাকিনী উক্তরূপে বিলাপ করিতেছিলেন, তখন অন্বেষণপরায়ণা গোপীগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার নিকটে আসিয়া সকল বিবরণ তাঁহার নিকট শুনিলেন। তখন কৃষ্ণোন্মাদিনী রাধা এবং গোপীগণ বনে বনে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বনমধ্যে যতদূর জ্যোৎস্নায় আলোকিত হইতেছিল ততদূর পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর অরণ্য দেখিয়া তাঁহারা তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় যমুনাপুলিনে ফিরিয়া আসিয়া একত্রে কৃষ্ণের গুণ এবং লীলা গান করিতে করিতে তাঁহাদিগকে দর্শন দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই গোপীগীতের মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। "হে দয়িত। হে সুরতনাথ! আমারা তোমার অশুল্কদাসিকা; তোমার নিকট তোমার চরণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু আমরা চাহি না। তুমি বরদ; তবে কেন আমাদিগকে দর্শন না দিয়া বধ করিতেছ? তুমি পূর্ব্বে আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ; আজ তোমার বিয়োগে আমাদের প্রাণ যায়! এ ঘোর বিপদে তুমি দর্শন দিয়া আমাদিগকে প্রাণদান কর। তুমি বিশ্বরক্ষা করিতে অবতীর্ণ হইয়া তোমার অশুল্কদাসীকাগণকে রক্ষা করিবে না? তোমার নিকট আমাদের এই চারিটী প্রার্থনা: (১) সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তিগণের দ্বারা পূজিতচরণ তুমি, তোমার যে করকমল দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর হস্তধারণ কর, সেই করকমল আমাদের মস্তকে ন্যস্ত কর। (২) ব্রজবাসীগণের দুঃখনিবারণকারী এবং আপনজনগণের গর্ব্বধ্বংসকারী তুমি, তোমার এই দাসীগণকে তোমার কমলানন দর্শন করাও। (৩) গোষ্ঠে চরণশীল পশুগণের অনুগমনকারী, কালিয়নাগের ফণায় অর্পিত, প্রণতজনের পাপকর্ষণকারী, এবং লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্থল তোমার চরণকমল আমাদের স্তনের উপর স্থাপন করিয়া, তোমাকে পাইবার তীব্র কামনাজাত সন্তাপ দূর কর। (৪) হে কমললোচন, তোমার এই দাসীগণকে তোমার মধুর বাক্য শুনাইয়া এবং অধরামৃত দান করিয়া কৃতার্থ কর। আমাদের এই চারিটী প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমাকে না

পাইলে কেবল তোমার কথামৃত শ্রবণ করিলেই আমাদের সন্তাপ দূর হইবে না, কারণ তোমার হাস্য, প্রেমাবলোকন, ধ্যানমঙ্গল লীলাসমূহ, এবং নির্জ্জন আলাপ স্মরণ করিলেই তোমাকে পাইবার জন্য আমাদের অন্তর অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠে। সুতরাং, তুমি দেখা দিয়া তোমার প্রণতজনের কামনা-পূর্ণকারী, ব্রহ্মার দ্বারা অর্চ্চিত, ধরণীর শোভা, আপৎকালে ধ্যেয়, সর্ব্বসুখময় চরণকমল আমাদের স্তনের উপর অর্পণ কর। মধুরনাদী বেণুর দ্বারা চুম্বিত তোমার অধরের যে অমৃত মধুর রস বর্দ্ধিত করে, সকল দুঃখশোক বিনাশ করে, এবং নরনারী সকলকেই অন্য সকল বস্তুতেই আসক্তিহীন করিয়া কেবল তোমাতেই আকৃষ্ট করে, তোমার সেই অধরামৃত আমাদিগকে দান কর। হে প্রিয়তম, দিবসে তুমি যখন গো-চারণ করিতে গোষ্ঠে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনের এক-একটী নিমেষ আমাদের নিকট এক-একটী যুগ বলিয়া মনে হয়; আবার অপরাহ্নে গোধন লইয়া তোমার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তোমার দর্শন-লালসায় পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মানা আমরা তোমার কুঞ্চিত কেশদামশোভিত শ্রীমুখ যখন দর্শন করি, তৎকালে আমাদের চক্ষুর নিমেষপাত তোমাকে দর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে বলিয়া আমরা চক্ষুর নিমেষসৃষ্টিকারী বিধাতাকে নিন্দা করি। এখন এই দীর্ঘ সময় তোমার অদর্শন যে কত বেদনাদায়ক, তাহা তোমায় কেমন করিয়া বলিব! তোমার উচ্চ গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা সকল আত্মীয়বান্ধবকে ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। হে শঠ! রাত্রিকালে কোন্ পুরুষ স্ত্রীলোককে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া যায়? তথাপি তুমিই আমাদের একমাত্র প্রিয়তম; তোমাকে প্রাপ্ত হইবার তীব্রস্পৃহাযুক্ত আমাদের মন তোমার দর্শনা-ভাবে মুহুর্ম্মুহুঃ মুহ্যমান হইতেছে। হে প্রিয়তম, আমরা তোমার স্বজন; তোমার অদর্শনজাত আমাদের হৃদ্‌রোগের ঔষধ কি তাহা তুমি জান। সেই ঔষধ আমা-দিগকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা কর। হে প্রিয়তম, কেবল যে তোমার অদর্শনের জন্যই আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি তাহা নহে। তোমার সুকোমল চরণের তুলনায় আমাদের স্তন কঠিন; পাছে তোমার চরণকমলে ব্যথা লাগে, তজ্জন্য ভয়ে ভয়ে অতি ধীরে ধীরে তোমার চরণযুগল আমাদের স্তনের উপর স্থাপন করি; আর এখন তুমি রাত্রিকালে নগ্নপদে বনভূমিতে বিচরণ করিতেছ, এই ভাবিয়া ত্বদ্‌গতপ্রাণা আমরা অতিশয় মুহ্যমানা হইতেছি।" ইহা বলিতে বলিতে রাধা এবং গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

৯।৭।৩৯ রাসলীলার তৃতীয় পর্য্যায়—সংযোগলীলা

কৃষ্ণদর্শনলালসায় গোপীগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন তখন কৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ভাগবত ১০।৩২।২

—"গোপীমণ্ডলে কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মুখকমলে মৃদুমধুর হাস্য। তিনি পীত বসন এবং পীত উত্তরীয় পরিহিত। তাঁহার বক্ষে পুষ্পমাল্য। তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য সাক্ষাৎ কামদেবেরও মনকে মথিত করে।" গোলোকের নিত্যলীলার পরিপূর্ণ কিশোরমূর্ত্তিতে কৃষ্ণ রাসলীলা করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র গোপীগণ প্রীত্যুৎফুল্লনয়নে উত্থিত হইয়া কেহ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া, কেহ তাঁহার হস্ত স্বীয় স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া কেহ বা তাঁহার চরণকমল স্তনের উপর ধারণ করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা এবং পূজা করিলেন। তাঁহারা এমন নিমেষহীন নয়নে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহারা নেত্ররন্ধ্র দিয়া কৃষ্ণকে হৃদয়ের মধ্যে লইয়া যাইতে চাহেন। কৃষ্ণ-দর্শনে পরমানন্দপ্রাপ্তা গোপীগণের বিরহতাপ দূর হইল। গোপীগণ আপনাদের উত্তরীয় বিস্তীর্ণ করিয়া কৃষ্ণের জন্য আসন রচনা করিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে উপবিষ্ট হইলে গোপীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসীনা হইলেন। শান্তভাবের যোগীগণ সমাধিতে অন্তরে যাঁহার সহিত সংযোগ লাভ করেন, গোপীগণ তাঁহাকে উক্তরূপে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। তিনি গোপীগণের প্রশ্নের উত্তরে অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে বলিলেন ঃ

এবং মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েহবলাঃ!
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥
ভা ১০।৩২।২১

—"হে অবলাগণ, আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তোমরা লৌকিক নিন্দাভয়, বৈদিক ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার, এবং আত্মীয়বন্ধুগণকে ত্যাগ করিয়াছ। তোমাদের আমাকে প্রাপ্তি নিত্য নিরবচ্ছিন্ন। আমার প্রতি তোমাদের প্রেমপ্রবাহ নির-বচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য আমি তোমাদের দ্বারা অদৃষ্ট ছিলাম, কিন্তু তোমাদের নিকটেই পরোক্ষে অবস্থান করিয়া তোমাদের প্রেমামৃত সম্ভোগ করিতেছিলাম। অতএব হে প্রিয়াগণ, তোমাদিগকে দর্শনদান করি নাই বলিয়া তোমাদের প্রিয়

১৬

আমার প্রতি তোমরা ক্রুদ্ধ হইয়ো না।" তাঁহার অন্তর্দ্ধান যে কেবল "প্রশমায় প্রসাদায়", এই উক্তির দ্বারা কৃষ্ণ তাহা জানাইলেন। বিয়োগকালেও কৃষ্ণের অপ্রাপ্তি হয় না এবং কৃষ্ণ প্রেমিকের নিকট পরোক্ষে থাকিয়া প্রেমের পূজা গ্রহণ করেন, তাহা কৃষ্ণের উক্তি হইতে প্রমাণিত হইল। অতঃপর কৃষ্ণ বলিলেন :

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

ভা ১০।৩২।২২

—"তোমরা আমার ভজনা করিয়া দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া আমার সহিত এই যে সংযোগ লাভ করিয়াছ, ইহা নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ। আমি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তোমাদের উপাসনা করিলেও তোমাদের এই প্রেমোপাসনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রেমোপাসনার দ্বারাই আমার এই প্রেম-ঋণ পরিশোধিত হউক।" তাঁহার সহিত গোপীগণের সংযোগ নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ, ইহা বলিয়া কৃষ্ণ জানাইলেন যে : "গোপীগণের আগমনের পরেই তিনি ঔপপত্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাক্‌চাতুরী মাত্র; বস্তুতঃ, তাঁহার সহিত গোপীগণের সংযোগে তাঁহারও পরদারত্ব হয় না এবং গোপীগণেরও ঔপপত্য হয় না।" গোপীগণের প্রেমোপাসনার দ্বারাই তাঁহাদের নিকট তাঁহার প্রেম-ঋণ পরিশোধিত হইবে, ইহা বলিয়া কৃষ্ণ জানাইলেন যে : "গোপীগণের প্রেমোপাসনার ঋণ প্রতিমুহূর্ত্তে বাড়িয়াই চলিয়াছে। গোপীগণ তাঁহার নিকট কোন ঐশ্বর্য্যসম্পদই চাহেন না; কোটী বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যসম্পদও তাঁহারা চাহেন না; তাঁহারা কেবল চাহেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে নিকটে পাইয়া তাঁহার প্রিয় সেবার দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিতে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের সেই উপাসনা গ্রহণ করিলেই তাঁহারা আনন্দ লাভ করিবেন, এবং তাঁহারা এইরূপে যতই অধিক আনন্দ লাভ করিবেন, তাঁহার ততই অধিক ঋণমুক্তি হইতে থাকিবে। তাঁহাকে প্রেমোপাসনার দ্বারা তাঁহাদের আনন্দদিৎসার সর্থকতা হইলেই তাঁহাদের আনন্দলিপ্সা সার্থক হইবে, নতুবা নহে। সুতরাং গোপীগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে প্রেমোপাসনাই তাঁহাদের ঋণ হইতে তাঁহার কতকাংশে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দাস্য সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুর, যে কোন ভাবে কৃষ্ণের দর্শন এবং স্পর্শ পাইলেই কৃষ্ণের সর্ব্বরস আনন্দ হইতে

প্রেমিক নিজ ভাবানুরূপ অপরিসীম আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। গোপীগণ "কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ" (ভা ১০।৩২।৯)—কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াই পরমানন্দে পরিপ্লুতা হইলেন, ইহা বলিয়া শুকদেব জানাইয়াছেন যে, কৃষ্ণকে দর্শন করিলেই পরমানন্দ পাওয়া যায়। গোপীর আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইল, কৃষ্ণের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া। তাঁহারা "তদঙ্গোপচিতাশিষঃ" (১০।৩৩।১)—কৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আনন্দসমৃদ্ধা হইলেন, ইহা বলিয়া শুকদেব জানাইলেন যে, কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণ এবং অঙ্গস্পর্শ করিয়া মধুর ভাবের উপাসিকা গোপীগণ কৃষ্ণের সর্ব্বরস আনন্দ হইতে অপরিসীম মধুর রস প্রাপ্ত হইলেন। গোপীগণকে তাঁহার অনন্ত মধুর রস অশেষবিশেষ প্রকারে সম্ভোগ করাইবার জন্য এক্ষণে কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রাসনৃত্য আরম্ভ করিতেছেন।

৯।৭।৪০ রাসনৃত্যে কৃষ্ণের বহু মূর্ত্তি

রাসলীলার জন্য বহু গোপী আসিয়াছেন। কৃষ্ণ নিজাঙ্গ দ্বারা তাঁহাদিগকে মধুর রস দান করিবেন। একই মূর্ত্তিতে প্রত্যেক গোপীর সহিত আলিঙ্গিত হওয়া সম্ভব নহে, অথচ প্রত্যেক গোপীকেই তাঁহাকে আলিঙ্গনদান করিতে হইবে, নতুবা প্রত্যেক গোপী তাঁহার অনন্ত মধুর রস সম্ভোগ করিতে পারিবেন না। গোপীগণকে সেবা ও আরাধনা করিবার জন্য কৃষ্ণ যোগমায়া অবলম্বনে বহু হইলেন। যত সংখ্যক গোপী ছিলেন, কৃষ্ণ আপনাকে ততসংখ্যক করিলেন। সকল মূর্ত্তিই অনন্ত অখন্ড সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ এবং অনন্ত মধুর-রসময় কৃষ্ণমূর্ত্তি।

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্।······ভাগবত ১০।৩৩।৩-৪

—"যোগেশ্বর কৃষ্ণ প্রতি দুইজন গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রত্যেক গোপী বাহুর দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিলেন। প্রত্যেক গোপী মনে করিলেন, কৃষ্ণ তাঁহারই নিকট আছেন। এইরূপে, গোপীমণ্ডলশোভিত রাসোৎসব কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আরব্ধ হইল।" স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা কৃষ্ণ বহুমূর্ত্তি হইলেন, এবং তাঁহার যোগমায়ার প্রভাবেই প্রত্যেক গোপীর বোধ হইল যে

কৃষ্ণ কেবল তাঁহার নিকটেই তাঁহার কণ্ঠধারণ করিয়া আছেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, যদিও কৃষ্ণ বহুমূর্ত্তি হইয়া প্রত্যেক গোপীর দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার যোগমায়াপ্রভাবে কোন গোপীই আপনার দ্বারা আলিঙ্গিত কৃষ্ণকে ব্যতীত অন্য কোন কৃষ্ণ-মূর্ত্তিকেই দেখিতে পাইতেছেন না। "যোগেশ্বরেণ" শব্দটীর দ্বারা শুকদেব জানাইয়াছেন যে, অচিন্ত্য যোগমায়ার অধীশ্বর কৃষ্ণের পক্ষে এইরূপ অলৌকিক কার্য্য মোটেই অসম্ভব নহে। এইরূপে, প্রত্যেক গোপী কৃষ্ণ কর্তৃক এবং কৃষ্ণ প্রত্যেক গোপী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন। পরেও উক্ত হইয়াছে যে, যত সংখ্যক গোপী ছিলেন, কৃষ্ণ আপনাকে ততসংখ্যক করিয়াছিলেন।

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ ভাগবত ১০।৩৩।২০

৯।৭।৪১ রাসলীলা

রাসলীলায় ত্রিবিধ ক্রীড়া আছে, স্থলক্রীড়া, জলক্রীড়া, এবং বনক্রীড়া। প্রথমে স্থলক্রীড়া সম্পাদিত হইয়াছিল। স্থলক্রীড়ায় রাসনৃত্যই প্রধান ক্রীড়া। রাসনৃত্যের সাধারণ লক্ষণ এইরূপ ঃ

নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্।
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥

—"নটগণের দ্বারা গৃহীতকণ্ঠী নর্ত্তকীগণ পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকিয়া যে নৃত্য করেন তাহার নাম রাসনৃত্য।" মানবীয় রাসনৃত্যের নটগণ ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ। রাসলীলার রাসনৃত্যের নটগণ বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশমান এক ও অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম নটবর কৃষ্ণ। ভাগবতে বর্ণিত ব্রজের মধুরভাবের লীলায় রাসনৃত্যটী প্রধান ক্রীড়া বলিয়া এই লীলাকে রাসলীলা নামে অভিহিত করা হয়। এক-এক কৃষ্ণের বামে এক-এক গোপী পরস্পরের দ্বারা আলিঙ্গিত অবস্থায় মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া রাসনৃত্য আরম্ভ হইল। তখন রাসলীলা দর্শন করিবার নিমিত্ত সস্ত্রীক দেবতাগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ উপস্থিত হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের বহু বিমান অন্তরীক্ষকে পূর্ণ করিয়াছিল। তাঁহারা আকাশ হইতে কৃষ্ণ এবং গোপীগণের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ কৃষ্ণের যশোগান করিলেন। রাসমণ্ডল হইতে

গোপীগণের বলয় নূপুর এবং কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। স্বর্ণবর্ণের মণিগণের মধ্যে মধ্যে নীলবর্ণের মরকতমণিসমূহের দ্বারা গ্রথিত একটী হার যেমন শোভাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, প্রতি দুইজন স্বর্ণকান্তি গোপীর মধ্যে নীলকান্তি কৃষ্ণের অবস্থানের ফলে রাসমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভাপ্রাপ্ত হইল। এমনও মনে হইল, যেন নীলবর্ণের কৃষ্ণরূপ মেঘচক্রে বিদ্যুৎবরণী গোপীরূপ তড়িৎ শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণবধূগণ বিবিধপ্রকারের চরণবিন্যাস, ভুজসঞ্চালন, এবং হাস্যময় ভ্রূবিলাসসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখনও ঐক্যতানে, কখনও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবিধ রাগরাগিণীর অবতারণা করিয়া মধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বহু প্রশংসা করিলেন। এইরূপে নৃত্যগীত করিতে করিতে গোপীগণ পরিশ্রান্তা হইয়া কেহ স্বপার্শ্বস্থিত কৃষ্ণের বাহু আপন স্কন্ধে লইলেন, কেহ তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহু আঘ্রাণ করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিতা হইলেন, কেহ কৃষ্ণের গণ্ডে আপন গণ্ড মিলিত করিয়া তাঁহার অধর হইতে চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন, কেহ তাঁহার করকমল স্বীয় স্তনের উপর স্থাপন করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শের ফলে গোপীগণের আনন্দাতিশয্যের বিষয়ে শুকদেব বলিতেছেন ঃ

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টীকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ভা ১০।৩৩।১৮

—"কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে গোপীগণ এমনই আনন্দাভিভূতা হইলেন যে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইল ; নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদের কেশপাশ, বস্ত্র, কুচপট্টীকা, মাল্য, এবং অলঙ্কার বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের সেই আনন্দাভিভূত অবস্থায় তাঁহারা তৎসমুদয় পুনর্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই।" রাসলীলার নিমিত্ত কৃষ্ণ যে "ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুঃ" ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই নটবর বপু প্রধানতঃ শৃঙ্গার-রসের, অর্থাৎ মধুর রসের মূর্ত্তি ; মধুর রস সকল রসের রাজা অর্থাৎ অন্য সকল রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; এইজন্য, তাঁহার এই প্রধানতঃ মধুর-রসময় নটবর বপু রসরাজ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির স্পর্শলাভমাত্রেই গোপীগণ আনন্দাতিশয্যে অভিভূতা হইয়াছিলেন ; আবার, এই মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিয়া অন্তরীক্ষচারী দেবদেবীগণের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। নৃত্যশ্রমে গোপীগণ পরিশ্রান্তা হইলেন।

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।

প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ ! পাণিনা। ভাগবত ১০।৩২।২১

—"প্রেমবিহারের ফলে শ্রান্তা গোপীগণের বদন কৃষ্ণ স্বীয় পরমসুখপ্রদ হস্তের দ্বারা মার্জ্জন করিলেন।" গোপীগণ তখন "তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ"—কৃষ্ণের নখস্পর্শের দ্বারা প্রকৃষ্ট আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রসরাজ কৃষ্ণের নখও রসময়, এইজন্য নখস্পর্শেও পরমানন্দ লাভ হয়। এইরূপে আনন্দিতা গোপীগণ কৃষ্ণের গুণ এবং লীলা গান করিতে করিতে তাঁহার পূজা করিলেন। অতঃপর জলক্রীড়া। নৃত্যগীতের শ্রমদূরীকরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত যমুনার জলে নামিলেন। হাস্যপরায়ণা গোপীগণ কৃষ্ণের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার অঙ্গে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এইরূপ জলক্রীড়ার সময়েও আকাশে স্থিত বিমান হইতে দেব-দেবীগণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জলক্রীড়ার পরে বনক্রীড়া করিবার জন্য তাঁহারা যমুনাতটবর্ত্তী বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিবিধ বনকুসুমের এবং যমুনার জলজাত কুমুদকহ্লার প্রভৃতির সৌরভে পূর্ণ বনে কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥ ভা ১০।৩৩।২৬

—"এইরূপে সত্যসঙ্কল্প কৃষ্ণ অনুরক্তা গোপীগণের সহিত শরৎকালীন কাব্যরসের আশ্রয়স্বরূপ চন্দ্রালোকিত রাত্রিসকল আনন্দময় লীলা করিয়াছিলেন। এই লীলাবিহারে তাঁহার সৌরত (চরম ধাতু) স্খলিত হয় নাই।" রাসলীলা-বর্ণনার উপসংহারকালেও, "কৃষ্ণের সৌরত স্খলিত হয় নাই", ইহা বলিয়া শুকদেব পুনশ্চ ঘোষণা করিলেন যে রাসলীলা প্রাকৃতকামক্রীড়া নহে। রাসনৃত্যকালে কৃষ্ণদর্শনে অন্তরীক্ষচারী দেব-দেবীগণের অবস্থার বর্ণনা দিয়া ভাগবত, রসরাজ কৃষ্ণের দর্শনেও দর্শনকারীর মধ্যে কি পরিমাণ আনন্দ সঞ্চারিত হয়, তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।

কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ॥ ভা ১০।৩৩।১৯

—"খেচরগণ (=অন্তরীক্ষচারী দেবগণ) এবং তাঁহাদের স্ত্রীগণ কৃষ্ণকে

এবং তাঁহার লীলা দেখিয়া মধুর-রসের দ্বারা অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞানহীন হইলেন। স্বীয় গ্রহগণের সহিত চন্দ্রও আনন্দবিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।” শৃঙ্গার-রসময় রসরাজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দেবগণ এবং দেবীগণ সকলেই মধুর রসে অভিভূত হইলেন। এখানে ভাগবত এই তত্ত্বও প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত পৃথিবী, চন্দ্র, এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ আনন্দাভিভূত হইয়া রহিলেন এবং তজ্জন্য এই সৌরমণ্ডলের সকল গ্রহগণ এবং উপগ্রহসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে স্ব স্ব স্থানে গতিহীন অবস্থায় রহিল, ইহার ফলে রাসলীলার রাত্রি অতি দীর্ঘ হইল। রাসলীলার দ্বারা কৃষ্ণের এবং গোপীগণের অনন্ত মধুর রস সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা পার্থিব চারিপ্রহরস্থায়ী ক্ষুদ্র রজনীতে সার্থকতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই রাসলীলার রাত্রি কৃষ্ণের যোগমায়াপ্রভাবে সুদীর্ঘস্থায়ী হইল; কতকাল স্থায়ী হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। আবার গ্রহ-উপগ্রহের দেবতাগণ সচেতন হইলে, গ্রহ-উপগ্রহ সমূহ স্ব স্ব গতিপথে চলিতে আরম্ভ করিলে রজনী গত হইতে লাগিল। কৃষ্ণের যোগমায়াপ্রভাবেই এই সৌরমণ্ডল-নিবাসী সকলেই সেই সুদীর্ঘ রজনী সুষুপ্তিতে বাহ্যচেতনাহীন থাকিয়া প্রাতঃ-কালে জাগ্রত হইয়া জানিতে পারিল না, কতকাল তাহারা সুষুপ্তাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছে। কৃষ্ণের মায়াশক্তির প্রবাহই কাল। এই রাসলীলার সময় কৃষ্ণ এই সৌরমণ্ডলে মায়াশক্তির গতি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যোগমায়ার অধীশ্বর কৃষ্ণের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। কালই জন্মমৃত্যু, ক্ষয়বৃদ্ধি, জরা-রোগ প্রভৃতি পরিবর্ত্তন এবং বিকার উৎপন্ন করে। কালের গতি না থাকিলে কোন বস্তুরই উক্তরূপ কোন পরিবর্ত্তন বা বিকার হইতে পারে না। রিপ্ ভ্যান্ উইংকিল্ (Rip Van Winkle) ২০ বৎসর ব্যাপী নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া দেখিয়াছিল যে, সে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং জগতের সকল বস্তুরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কারণ, তাহার নিদ্রাকালে কালের গতি বন্ধ ছিল না। রাসলীলার সময় মায়াশক্তির প্রবাহ বন্ধ থাকায় এই সৌরমণ্ডলের কোন বস্তুর কোন পরিবর্ত্তন এবং বিকার হয় নাই। রাসলীলায় কৃষ্ণ এই সকল যোগমায়ার কার্য্য করিবেন, শুকদেব প্রথমেই তাহা বলিয়া রাখিয়াছেন। উষাসমাগমে কৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধা অবতীর্ণা গোপীগণকে এবং রাধাকে ব্রজে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন; রাসলীলা আরম্ভের পূর্ব্বেই কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যা-

গমন করিবার কথা বলিয়াই রাখিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের ব্রজলীলা সংবরণ করিবার সময় তখন হয় নাই। কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে তাঁহারা অনিচ্ছা-স্বত্বেও স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কৃষ্ণের যোগমায়াপ্রভাবেই গোপীগণের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের কার্য্যটী তাঁহাদের পতিগণের এবং অন্য সকল পরিজনের অজ্ঞাতসারেই হইয়াছিল, কারণ নিদ্রা হইতে উত্থিত পতিগণ দেখিলেন যে তাঁহাদের পার্শ্বেই তাঁহাদের পত্নীগণ শয়ান রহিয়াছেন। এইজন্য গোপগণ কৃষ্ণের অথবা তাঁহাদের পত্নীগণের উপর বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হইলেন না। রাধা এবং অবতীর্ণা গোপীগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সাধনসিদ্ধা গোপীগণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই; তাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন বলিয়া কোন ঘটনার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ তিনি রাসলীলাকালেও গৃহে মাতাপিতার নিকটেও ছিলেন; তাহা না হইলে নন্দ-যশোদা আকুল হইয়া বেড়াইতেন। যিনি রাসলীলার জন্য বহুমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, সেই যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ মাতাপিতার সুখের নিমিত্ত ও যে তাঁহাদের নিকট আরও এক মূর্ত্তিতে ছিলেন, ইহা আদৌ বিস্ময়জনক নহে।

৯।৭।৪২ পরদারত্বখণ্ডন : পরকীয়া ভাব : স্বকীয়া ভাব

শুকদেবের নিকট রাসলীলা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ বলিলেন, "পরমেশ্বর কৃষ্ণ অধর্ম্ম নাশ করিয়া ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ধর্ম্মরক্ষক। তিনি কেন পরস্ত্রীসংসর্গ করিয়া অধর্ম্ম আচরণ করিলেন? আপ্তকাম হইয়াও তিনি কি অভিপ্রায়ে নিন্দনীয় কর্ম্ম করিলেন, তাহা বুঝাইয়া দিয়া আপনি আমাদের সংশয় খণ্ডন করুন।" যদি ইহা পরীক্ষিতের নিজস্ব সংশয় হইত, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তিনি রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব এবং লীলাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রখরবুদ্ধি পরীক্ষিৎ সমস্ত তত্ত্বই বুঝিয়াছিলেন; তথাপি সংশয়াত্মা সাধারণ মানবের সংশয় শুকদেবের দ্বারা খণ্ডন করাইবার জন্য উক্তরূপ প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলেন নাই, "আমার সংশয় খণ্ডন করুন;" তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের সংশয় খণ্ডন করুন।" পরীক্ষিতের সভায় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। মেধাবী পরীক্ষিৎ বুঝিয়াছিলেন যে সভাস্থ কাহারও কাহারও মনে উক্তরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও অনেকের মনে ঐরূপ সংশয় হইতে পারে। তাঁহার নিজের সংশয় ছিল না,

তথাপি তাঁহাদের এবং সকল যুগের সকল মানবের সংশয়খণ্ডনের জন্য "আমাদের সংশয় খণ্ডন করুন" বলিয়া প্রার্থনা জানাইলেন। এই প্রশ্নের শুকদেব যে উত্তর দিলেন, তাহাতে প্রথমে তিনি প্রশ্নকর্ত্তার পরদারত্ব-আপত্তিকে তর্কের খ্যাতিরে মানিয়া লইয়া দেখাইলেন যে, রাসলীলায় কৃষ্ণের পরদারত্ব হইলেও পরমেশ্বরের পক্ষে তাহা দূষণীয় হইতে পারে না, তৎপরে তিনি দেখাইলেন যে, কৃষ্ণের এবং গোপীগণের মধ্যে পরদারত্ব এবং ঔপপত্য নাই এবং থাকিতে পারে না। তাঁহার উত্তরের মর্ম্ম এই : "যদি তর্কের খ্যাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে রাসলীলায় পরদারত্ব আছে, তথাপি ঈশ্বরের তাহাতে দোষ হয় না; যেমন অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইলেও চিরনির্দ্দোষ এবং চিরপবিত্র, তদ্রূপ, ঈশ্বর পরস্ত্রীসংসর্গ করিলেও তাঁহাকে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যদি বল, ঈশ্বরের দোষ না হইলেও লোকে তাঁহার আচরণের অনুকরণ করিতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, দেহপরতন্ত্র ক্ষুদ্র জীব ঈশ্বরের ন্যায় আচরণ করিতে পারে না; সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত হলাহল মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবই পরিপাক করিতে পারেন, কোন জীব পারে না। যদি বল, ঈশ্বর মানবকে পরস্ত্রীসংসর্গ করিতে নিষেধ করিয়া স্বয়ং তাহা করিলে তাঁহার বাক্যের সহিত আচরণের সামঞ্জস্য থাকে না এবং সদাচারের প্রমাণ প্রদর্শিত হয় না, তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বর মানবকে যে উপদেশ দান করেন, তাহা মানবের জন্যই, নিজের জন্য নহে; মানবের সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারাই মানব ঈশ্বরবিহিত সদাচার পালন করিতে পারিবে; সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কার্য্য বেদাতীত এবং অলৌকিক; তিনি মানবের সদাচার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই সকল কর্ম্ম করেন না; এইজন্য, ঈশ্বরের সকল কার্য্যের অনুকরণ করা মানবের কর্ত্তব্য নহে; যে মৃত্যুঞ্জয় নহে সে যদি হলাহল পান করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত; তদ্রূপ, মানব মূঢ়তাবশতঃ ঈশ্বরের সকল কার্য্যের অনুকরণ করিলে তাহার ধ্বংস সুনিশ্চিত; ঈশ্বর মানবকে যে উপদেশ দান করেন, মানবের তদনুসারে কার্য্য করা উচিত; ঈশ্বরের কার্য্যসমূহের মধ্যে যে সকল কার্য্য তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের অনুরূপ, সেই সকল কার্য্যেরই অনুকরণ মানব করিতে পারে। যদি বল, পরস্ত্রীসংসর্গ করিলে ঈশ্বরের কর্ম্মবন্ধন হইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বর দেবতামনুষ্যাদি সকলের কর্ম্মফলবিধাতা, কিন্তু স্বয়ং কর্ম্মফল এবং কর্ম্মবন্ধনের অতীত; তাঁহার পাপপুণ্য কুশল-অকুশল

কিছুই নাই ; সুতরাং, তিনি পরস্ত্রীসংসর্গ করিলেও তাঁহার কর্ম্মবন্ধন এবং কর্ম্মফলভোগ হইতে পারে না। ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত মহাপুরুষগণও বিধিনিষেধের বন্ধন অতিক্রম করিয়া জগতে বিচরণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন হয় না, তখন স্বয়ং ঈশ্বরের কর্ম্মবন্ধন হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। তোমায় দেখাইলাম যে, গোপীগণের সহিত রাসলীলায় কৃষ্ণের পরস্ত্রীসংসর্গ হইয়াছে ইহা তর্কের খ্যাতিরে ধরিয়া লইলেও তাহাতে কৃষ্ণের কোন দোষ হয় নাই। কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণ গোপীগণের উপপতি নহেন এবং আপনাকে গোপীগণের উপপতি মনেও করেন না, এবং গোপীগণও কৃষ্ণের উপপত্নী নহেন এবং আপনাদিগকে কৃষ্ণের উপপত্নী বলিয়া মনেও করেন না : রাসলীলার দ্বারা কৃষ্ণের পরদারত্ব এবং গোপীগণের ঔপপত্য হয় নাই। কৃষ্ণ গোপীগণের, তাঁহাদের পতিগণের, এবং দেবতামনুষ্যাদি সকল দেহীগণের মধ্যে পতিরূপে অবস্থিত থাকিয়া সকলকে পরিচালিত করিতেছেন। কৃষ্ণ অখিলের পতি এবং পরমপতি ; সকলেই তাঁহার প্রকৃতি। গোপীগণ কৃষ্ণের পরাপ্রকৃতি, তাঁহার নিত্যবধূ ; কৃষ্ণ তাঁহাদের নিত্যপতি। স্বীয় পরাপ্রকৃতির সহিত মধুরভাবের লীলাই কৃষ্ণের রাসলীলা। সুতরাং, রাসলীলার দ্বারা কৃষ্ণের পরদারত্ব এবং গোপীগণের ঔপপত্য হইতে পারে না। সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ কৃষ্ণে প্রাকৃত কাম নাই ; সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ রাধা এবং গোপীগণেও প্রাকৃত কাম নাই, এই কারণেও পরদারত্ব এবং ঔপপত্য হয় নাই।” রাসলীলার মধ্যেও কৃষ্ণ এবং গোপীগণ পরদারত্ব এবং ঔপপত্য অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। এখানে শুকদেবও পরদারত্ব এবং ঔপপত্য খণ্ডন করিলেন। শুকদেব কেবল যে আপত্তি খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণের এবং গোপীগণের দ্বারা প্রাকৃত কামক্রীড়া হয় নাই বলিলেন তাহাই নহে। তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাসলীলা শ্রবণ করিয়া নরনারীগণও কামজয়ী হইয়া পরাভক্তি লাভ করে।

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ভাগবত ১০।৩৩।৩

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃনুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেন ধীরঃ ॥
ভা ১০।৩৩।৪০

এই দুইটী শ্লোকের মর্ম্মার্থ: "কৃষ্ণ রাধা এবং গোপীগণ গোলোকধামে মধুরভাবের নিত্যলীলা করেন। জগতের নরনারীগণ ব্রজলীলার বিবরণ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণপরায়ণ হইবে, তাহাদের প্রেমবিকাশ হইবে, এবং জগতে পরমধর্ম্ম স্থাপিত হইবে বলিয়া কৃষ্ণ গোলোক হইতে স্বগণ সহিত অবতীর্ণ হইয়া ব্রজের লীলা করিয়াছেন। ব্রজবধূগণের সহিত কৃষ্ণের এই মধুরভাবের লীলা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবে অথবা কীর্ত্তন করিবে, সে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিবে এবং হৃদ্রোগ কাম ত্যাগ করিয়া ধীর হইবে।" এতদ্দ্বারা ঘোষিত হইল যে, কৃষ্ণের এবং গোপীগণের রাসলীলা উপপত্নীগণের সহিত উপপতির কামক্রীড়া ত নহেই, পরন্তু ইহার শ্রবণের ফলে নরনারীগণও কামহীন হইয়া প্রেম লাভ করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণের সহিত রাধার এবং গোপীগণের পতিপত্নীত্ব বেদাতীত পরমভাব এবং তাঁহাদের এই নিত্যসম্বন্ধ লৌকিক পতিপত্নীত্ব নহে এবং লৌকিক উপপতি-উপপত্নীত্বও নহে। তথাপি কেহ কেহ রাধার এবং গোপীগণের ভাবকে পরাকীয়া ভাব বলেন। এইরূপ বলিবার দুইটী কারণ আছে: (১) কোন বিবাহিতা নারী যদি জারের প্রতি আসক্ত হয়, তবে সে পতিগৃহে থাকিয়া সকল সময়েই জারের চিন্তা করে, জারের সহিত পূর্ব্বমিলনের স্মৃতিতে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, এবং আবার কখন জারের সহিত মিলনলাভের সুযোগ পাইবে, সেই চিন্তায় ব্যাকুল থাকে। যখন এইরূপ সুযোগ ঘটে, তখন জারের সহিত গোপন মিলনে সেই নারী অত্যধিক আনন্দ প্রাপ্ত হয়। রাধা এবং গোপীগণ স্ব স্ব পতিগৃহে থাকিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করিতেন, তাঁহার সহিত পূর্ব্বমিলনের স্মৃতিতে আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন, এবং আবার কখন তাঁহার সহিত মিলনলাভ হইবে, এই চিন্তায় ব্যাকুল থাকিতেন। যখন আবার তাঁহারা সংযোগ লাভ করিতেন তখন তাঁহারা অসীম আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। উপপত্নীর, অর্থাৎ পরকীয়া নারীর উক্ত ভাবের সহিত রাধার এবং গোপীগণের উক্ত ভাবের সাদৃশ্য থাকায় তাঁহাদের ভাবকে পরকীয়াভাব, অর্থাৎ পরকীয়া নারীর ভাবের ন্যায় ভাব বলা হয়। রাধার এবং গোপীগণের ভাবকে পরকীয়া ভাব বলার এরূপ অর্থ নহে যে, কৃষ্ণের সহিত রাধার এবং গোপীগণের সম্বন্ধ পরকীয়াসম্বন্ধ, অর্থাৎ উপপতি-উপপত্নী সম্বন্ধ। রাধার এবং গোপীগণের ভাবকে পরকীয়া ভাব বলার অর্থ এই যে, লৌকিক এবং প্রাকৃত পরকীয়া ভাবের সহিত তাঁহাদের ভাবের কতকগুলি বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে মাত্র।

(২) কৃষ্ণ পরে অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্বারকায় অবস্থিতা তাঁহার সেই সকল বেদবিধি অনুসারে বিবাহিতা পত্নীগণের ভাবকে স্বকীয়াভাব বলা হয়। তাঁহাদের ভাবের সহিত কৃষ্ণের নিত্যলীলার নিত্যবধূ রাধার এবং গোপীগণের ভাবের পার্থক্য বুঝাইবার জন্যও ইঁহাদের ভাবকে পরকীয়াভাব বলা হয়। রাধা এবং কায়ব্যূহ গোপীগণ কৃষ্ণের আনন্দাত্মারই মূর্ত্তি এবং কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণের পর হইতে পারেন না এবং তাঁহাদের ভাব লৌকিক পরকীয়া ভাব হইতে পারে না। লৌকিক পরকীয়া ভাবের কারণ কাম; ইহার সহিত বাহ্যিক সদৃশ্যযুক্ত যে রাধার এবং গোপীগণের ভাবকে পরাকীয়া ভাব বলা হয় তাহার কারণ অপ্রাকৃত প্রেম; সুতরাং, রাধার এবং গোপীগণের তথাকথিত পরকীয়া ভাবও অপ্রাকৃত এবং অলৌকিক। লৌকিক প্রাকৃত পরকীয়া ভাব এবং অলৌকিক অপ্রাকৃত তথাকথিত পরকীয়া ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। লৌকিক উপপত্নীর পরকীয়া-ভাবের কারণ কাম বলিয়া তাহার উপপতিচিন্তা উপপতির ত্রিগুণময় জড় দেহের চিন্তা, তাহার পূর্ব্বমিলনের স্মৃতি পূর্ব্বে সম্পাদিত প্রাকৃত কামক্রীড়ার স্মৃতি, এবং তাহার পুনর্ম্মিলনের উৎকণ্ঠা কেবল নিজ সুখের জন্য উপপতির প্রাকৃত দেহের সহিত প্রাকৃত কামক্রীড়ার জন্য উৎকণ্ঠা। রাধা এবং তাঁহার কায়ব্যূহ গোপীগণের তথাকথিত পরকীয়াভাবের কারণ প্রেম বলিয়া তাঁহাদের চিন্তা উপপতির চিন্তা নহে, পরমানন্দস্বরূপ পরমভাব সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ অপ্রাকৃত নিত্য পরমপতির চিন্তা, তাঁহাদের পূর্ব্বমিলনের স্মৃতি সেই পরমপতিকে আনন্দ দান করিয়া আনন্দলাভের স্মৃতি, এবং তাঁহাদের পুনর্ম্মিলনের উৎকণ্ঠা সেই পরমপতি কৃষ্ণকে আনন্দ দান করিবার উৎকণ্ঠা। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতেই বুঝা যাইবে যে লৌকিক পরকীয়া ভাব এবং রাধা ও গোপীগণের তথাকথিত পরকীয়া ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত তথাকথিত পরকীয়া ভাবের কারণ প্রেম বলিয়া, ব্রজের প্রেমলীলায় প্রেমের কেবল মধুর-ভাবেই যে এইরূপ পরকীয়া ভাব আছে তাহা নহে, দাস্য, সখ্য, এবং বাৎসল্য ভাবেও এইরূপ ভাব আছে। ব্রজের দাসগণ, সখাগণ, এবং পিতা-মাতা-গুরুজনগণও স্ব স্ব গৃহে থাকিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা করিতেন, কৃষ্ণের সহিত পূর্ব্ব-মিলনের স্মৃতিতে আনন্দ পাইতেন, এবং কৃষ্ণের সহিত পুনর্ম্মিলনলাভের জন্য উৎকণ্ঠায় থাকিতেন। সুতরাং লৌকিক পরকীয়াভাবের লক্ষণগুলি কেবল

মধুরভাবের উপাসিকাগণেরই ছিল তাহা নহে, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ভাবত্রয়ের উপাসকগণের এবং উপাসিকাগণেরও ছিল। ব্রজের প্রেমলীলার এইরূপ তথাকথিত পরকীয়াভাব ব্রজলীলার নিজস্ব ভাব, এইজন্য ইহা ব্রজলীলার স্বকীয়া ভাব। ব্রজলীলার এই অপ্রাকৃত স্বকীয়া ভাবকে প্রাকৃতমনোবুদ্ধিবিশিষ্ট নরনারীগণের বোধগম্য করিবার জন্য, লৌকিক প্রাকৃত পরকীয়াভাবের বাহ্য লক্ষণের দ্বারা উপলক্ষিত করিয়া ইহাকে পরকীয়া ভাব বলা হয়। রাধা এবং গোপীগণ যদি কৃষ্ণকে ভগবান না জানিয়া এবং তাঁহাকে মনুষ্য জানিয়া তাঁহার ভজনা করিতেন, তাহা হইলে সেই ভজনা জারের ভজনা হইত এবং তাঁহাদের ভাব লৌকিক পরকীয়া ভাব হইত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে, রাধা এবং গোপীগণ জানিতেন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং তাঁহারা তাঁহার পরাপ্রকৃতি এবং নিত্যবধূ। বিবাহিতা নারী এইরূপ জ্ঞানে কৃষ্ণের ভজনা করিলে জারের ভজনা হয় না এবং লৌকিক পরকীয়া ভাবও হয় না। নারদীয় ভক্তিসূত্রেও এই তত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে।

তত্রাপি ন মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ। নাঃ ভঃ সূঃ। ২২

তদ্বিহীনং জারানামিব। নাঃ ভঃ সূঃ। ২৩

—"কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের যে প্রেম, তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণের ভগবত্তার বিস্মৃতিদোষ নাই। এই বিস্মৃতিদোষ থাকিলে জারের ভজনা হয়।" বিবাহিতা নারী ভগবানের ভজনা করিলে যদি ঔপপত্য হয়, তাহা হইলে কোন বিবাহিতা নারীরই ভগবৎ-ভজনা করা চলে না। কিন্তু কোন মানবই মনে করে না যে তাহার পত্নী কৃষ্ণের ভজনা করিলে উপপতির ভজনা করা হইবে। ব্রজের গোপগণও এরূপ মনে করিতেন না যে তাঁহাদের পত্নীগণ এবং ভগিনীগণ কৃষ্ণের ভজনা করিয়া উপপতির ভজনা করিতেছেন। গোপীগণ রাসলীলায় যাইবার সময় গোপগণ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীগণ কৃষ্ণকে জার ভাবিয়া উপপত্নীরূপে তাঁহার নিকট যাইতেছিলেন, এরূপ মনে করিয়া তাঁহারা নিষেধ করেন নাই। ব্রজের সকল গোপগণও জানিতেন যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁহারাও স্ব স্ব ভাবানুযায়ী কৃষ্ণের ভজনা করিতেন, এবং তাঁহারা জানিতেন যে গোপীগণও কৃষ্ণকে ভগবান জানিয়া কৃষ্ণের ভজনা করেন। অষ্টম বা নবম বর্ষীয়া সুকুমারী বালিকাগণের রাত্রিকালে যমুনাতীরে গমন নিরাপদ নহে; এইরূপ ভাবিয়া গোপগণ রাসলীলাকালে যাইতে উদ্যতা গোপীগণকে নিষেধ

করিয়াছিলেন। গোপীগণ নিষেধ না মানিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া গোপগণ কৃষ্ণের উপর অথবা গোপীগণের উপর কোনরূপ বিরক্তি বা ক্রোধ করেন নাই, ইহা ভাগবতে উক্ত হইয়াছে (ভাগবত ১০।৩৩।৩৮)। আমরা পাইলাম যে, রাসলীলায় কৃষ্ণের পরদারত্ব হয় নাই, গোপীগণের ঔপপত্য হয় নাই, এবং গোপীগণের ভাব লৌকিক পরকীয়া ভাব নহে। কেহ কেহ বলেন যে, ভেদাভেদসম্বন্ধতত্ত্ব অনুসারে কৃষ্ণের সহিত রাধার এবং গোপী-গণের অভেদও ছিল এবং ভেদও ছিল; ভেদত্বই পরত্ব; সুতরাং রাধার এবং গোপীগণের মধ্যে লৌকিক পরকীয়া ভাব ছিল। এই মতটী সম্পূর্ণ অসার, কারণ:—কৃষ্ণের এবং জীবের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে; রাধা এবং গোপীগণ জীব নহেন; তাঁহারা সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ এবং কৃষ্ণের অভিন্নাংশ; কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ভেদাভেদসম্বন্ধ নহে, অভেদসম্বন্ধ; জীবাত্মাও যখন যোগসাধনার দ্বারা ভেদের ভূমি ক্ষরভাবকে অতিক্রম করিয়া অভেদের ভূমি পরমভাবে আরূঢ় হয়, তখন তাহার প্রেমবিকাশ হয় এবং সেও সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহে নিত্যলীলার পরিকর এবং কৃষ্ণের অভিন্নাংশ স্বরূপে নিত্য অভেদসম্বন্ধে স্থিত হয়। সুতরাং, ভেদাভেদ সম্বন্ধ ইঁহাদের প্রতি প্রযুজ্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, রাধা ও গোপীগণ কৃষ্ণের উপপত্নী ছিলেন না, ইহা সত্য; কিন্তু কৃষ্ণ যোগমায়ার দ্বারা তাঁহাদের অন্তরে তাঁহার প্রতি উপপতিভাব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইজন্য কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের ভাব পরকীয়া ভাব। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উক্তরূপ উপপতিভাব-সৃষ্টির ঘটনা ভাগবতে সমর্থিত হয় না, পরন্তু ভাগবত ইহার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। যদি সত্যই উক্তরূপ উপপতিভাব সৃষ্ট হইত, গোপীগণের বাক্যে এবং আচরণে উপপতিভাব প্রকাশ পাইত। কিন্তু ভাগবতে আমরা পাইয়াছি যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্যই কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন, উপপতিরূপে নহে; কৃষ্ণও তৎকালে পতিরূপে পাইবার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন; ভাগবতে রাসলীলার পূর্ব্বে কৃষ্ণ গোপীগণের নিকট ঔপপত্য সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার উত্তরে গোপীগণ অতি স্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়রূপে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা কৃষ্ণকে উপপতিরূপে ভজনা করেন না, নিত্যপ্রিয় পতিরূপে ভজনা করেন। সুতরাং, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীগণের অন্তরে তাঁহার প্রতি উপপতিভাব-সৃষ্টির কাহিনী এবং ইহার ফলে গোপীগণের পর-কীয়াভাবের উৎপত্তির মতবাদ ভাগবতসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এবং বাস্তববিরুদ্ধ। ইহাও

উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এবং গর্গসংহিতায় বিবাহও বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহের পর উপপতিভাব-সৃষ্টি বাস্তববিরুদ্ধ।

৯।৭।৪৩ রাসলীলার পরবর্ত্তী সংযোগলীলা ঃ উত্তর রাগ

পূর্ব্ববর্ণিত রাসলীলায় গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইবার পর হইতে, কৃষ্ণ যতদিন প্রকটভাবে বৃন্দাবনে ছিলেন ততদিন প্রতিরাত্রেই তাঁহার সহিত গোপীগণের সংযোগলীলা হইত, ইহা ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০।৩৩।২৬ শ্লোকেও তাহা সূচিত হইয়াছে।

গোপ্য কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ ভাগবত ১০।৩৫।১

—"প্রাতঃকালে সখাগণের সহিত কৃষ্ণ গো-চারণের নিমিত্ত বনে গমন করিলে কৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ তাঁহার লীলা গান করিয়া দুঃখের সহিত দিবাভাগগুলি অতিবাহিত করিতেন।" এতদ্দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, দিবাভাগে বিয়োগ এবং রাত্রিকালে সংযোগ হইত। কৃষ্ণ প্রথম সংযোগ লীলা যেমন রাসক্রীড়ার দ্বারা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সকল সংযোগলীলাই যে তদ্রূপ রাসক্রীড়ার দ্বারাই করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বৃন্দাবনের কুঞ্জে, কাননে, গিরিকন্দরে তিনি রাধা এবং গোপীগণের সহিত বিবিধপ্রকারের ক্রীড়াবিলাস করিতেন। রাধার প্রেমভাবের বিবিধ অবস্থা সম্ভোগ করিবার জন্য কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে রাধার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, প্রেমের আরাধনায় প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিতে পারে না, কিন্তু লীলাবৈচিত্রের জন্য কৃষ্ণ রাধার সহিত চন্দ্রাবলীর প্রতিদ্বন্দ্বীতাভাবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে রাধার সহিত কৃষ্ণের বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, মান, মানভঞ্জন, কলহান্তরিতা, মিলন, কুঞ্জবিহার প্রভৃতি বিবিধপ্রকারের লীলা সম্পাদন করা সম্ভব হইয়াছিল। রাধা কৃষ্ণের আগমনপ্রতীক্ষায় বাসকসজ্জা হইয়া আছেন, অর্থাৎ আপনাকে ও কেলি-কুঞ্জকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া আছেন। কিন্তু তিনি শুনিলেন যে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়াছেন; ইহাতে তিনি খণ্ডিতা অর্থাৎ কুপিতা এবং ঈর্ষান্বিতা হইলেন। ইহার পরে তিনি মান করিলেন। কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার মানভঞ্জন করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিলেন। রাধার প্রবল প্রেমের মানও প্রবল; কৃষ্ণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল; রাধা তাঁহাকে আপন কুঞ্জে থাকিতে দিলেন

না; কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। তাহার পরেই রাধা কলহান্তরিতা হইলেন। "হায়! আমি প্রিয়তমকে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া মনোকষ্ট দিয়া বিদায় করিলাম!" এই তীব্র অনুশোচনার সহিত তাঁহার ভয় হইল, "হায়! হায়! আমার এই অপরাধের ফলে প্রিয়তম যদি আমার নিকট আর না আসেন!" রাধার এইরূপ অনুতপ্ত এবং ভীত অবস্থার নাম কলহান্তরিতা অবস্থা। তখন ললিতা বিশাখা প্রভৃতি রাধার প্রিয়সখিগণ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকে রাধার কুঞ্জে আনিয়া মিলন করাইলেন। মিলনের পর কুঞ্জবিহার। এইরূপ এবং আরও কতপ্রকারের লীলার দ্বারা ব্রজের মধুরভাবের লীলা সম্পাদিত হইত। সময় এবং সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই দিবাভাগেও সংযোগলীলা হইত। ব্রজে কৃষ্ণ যেমন গোপের পুত্র বলিয়া গো-চারণ করিতেন, তদ্রূপ রাধা এবং তাঁহার সখিগণও গোপের কন্যা বলিয়া কখনও যমুনায় জল আনিতে, কখনও দধি দুগ্ধ মাখন বিক্রয়ার্থে বাহিরে যাইতেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত কখনও যমুনায় নৌকালীলা, কখনও বা দানঘাটী লীলা অর্থাৎ গোপীগণের নিকট হইতে দধিদুগ্ধাদির শুল্ক আদায়ের ছলে লীলা করিতেন। দিবাভাগের অধিকাংশ লীলাই স্ব স্ব পৌগণ্ড মূর্ত্তিতেই করিতেন। কিন্তু দিবসের সংযোগ-লীলা প্রাত্যহিক ব্যাপার ছিল না; এইজন্য ভাগবতে শুকদেব বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ গো-চারণের নিমিত্ত বনে গমন করিলে গোপীগণ তাঁহার লীলা গান করিয়া দিবাভাগ দুঃখের সহিত অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ লীলাকীর্ত্তন ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৫শ অধ্যায়ে দ্বাদশটী যুগলশ্লোকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা গোপীগণের উত্তর রাগ প্রকাশক। উত্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী। এই রাগ কৃষ্ণের সহিত সংযোগলীলার পরবর্ত্তী বলিয়া, গোপীগণের এই রাগকে অর্থাৎ প্রেমানুরাগকে উত্তর রাগ বলা হয়। উত্তর রাগে, দিবাভাগের বিয়োগব্যথার সহিত কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তনের আনন্দের, গত রজনীর সংযোগস্মৃতির আনন্দের, এবং আগামী রজনীতে পুনরায় সংযোগলীলার আশার আনন্দের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। এইজন্য, গোপীগণের উত্তর রাগ বর্ণনার উপক্রমে শুকদেব যদিও বলিয়াছেন যে, গোপীগণ "নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্", তিনি বর্ণনার উপসংহার করিয়াছেন এই বলিয়া:

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্! কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ॥ ভাগবত ১০।৩৫।২৬

—"হে রাজন্, কৃষ্ণচিত্তা এবং কৃষ্ণমনস্কা গোপীগণ এইরূপে কৃষ্ণলীলা গান করিয়া দিবাভাগেও মহোৎসবময়ী হইয়া আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন।" তচ্চিত্তা এবং তন্মনস্কা শব্দদুইটার অর্থ এই যে, গোপীগণ কৃষ্ণগতপ্রাণা ছিলেন এবং তাঁহাদের মন কৃষ্ণের চিন্তায়, কৃষ্ণের সহিত প্রাপ্ত সংযোগের স্মরণে, এবং তাঁহার সহিত সংযোগপ্রাপ্তির আশায় পূর্ণ থাকিত। এইরূপ অবস্থাকে শুকদেব মহোদয় অর্থাৎ মহোৎসব বলিয়াছেন, কারণ ইহাতে বিয়োগকালেও আনন্দ প্রাপ্ত হাওয়া যায়। এই স্মৃতি এবং তজ্জাত আনন্দ উত্তর রাগের বিশেষত্ব ; ইহা পূর্ব্বরাগে নাই। নরনারীগণের জীবাত্মার প্রেমবিকাশের পর কৃষ্ণের সহিত সংযোগপ্রাপ্তি হইলে তাঁহারাও উত্তর রাগের অবস্থা লাভ করেন।

৯।৭।৪৪ বেদান্তে ভাগবতধর্ম্ম

কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, কৃষ্ণ ব্রজলীলার দ্বারা যে পঞ্চমপুরুষার্থের পরমধর্ম্ম স্থাপনা করিয়াছেন তাহা ভাগবতের নিজস্ব ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্ম বেদান্তে উপদিষ্ট হয় নাই। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ভাগবত বেদান্তের ভাষ্য। বেদান্তে যদি এই পরমধর্ম্মের তত্ত্ব না থাকিত, তাহার ভাষ্য ভাগবতেও ইহা থাকিত না। বেদান্ত মূল শাস্ত্র ; ইহা তত্ত্ববীজ। ভাগবত সেই তত্ত্ববীজের পুষ্পপল্লবশোভিত ফলবান বৃক্ষ। ভাগবতের এই পরাধর্ম্ম বেদান্তে তত্ত্ববীজরূপে আছে। সৎ চিৎ আনন্দ সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা বেদান্তসূত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে বেদান্তমতে পরমেশ্বর সাকার, কিন্তু তাঁহার বিগ্রহ ত্রিগুণাতীত, জড়াতীত, অপ্রাকৃত, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, দেহদেহীবিভেদহীন আত্মা বলিয়া বেদান্ত পরমেশ্বরকে নিরাকার এবং সাকার বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৭।৬ সূত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ পরমেশ্বর এবং তিনি দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন এবং বৃন্দাবন তাঁহার এই লীলার ধাম ; গোপালতাপনী শ্রুতি হইতেও আমরা এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।৩ সূত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ আনন্দসম্ভোগের নিমিত্ত আপনাকে রাধাকৃষ্ণরূপে যুগলমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়া লীলা আরম্ভ করিলেন, এবং তৎপরে আপনিই পুরুষ ও প্রকৃতি হইয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এবং এই বিশ্ববাসী সকল জীবই কৃষ্ণের প্রকৃতি। কৃষ্ণই ধর্ম্ম, এই তত্ত্বের আলোচনাকালে

আমরা বেদান্ত হইতে সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে কৃষ্ণই আনন্দ এবং জীবপ্রকৃতি সেই আনন্দের দ্বারাই জীবন ধারণ করে। আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণের উপাসনাই জীবপ্রকৃতির ধর্ম্মসাধনা, ইহাও বেদান্তের উপদেশ, তাহাও ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ সূত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবপ্রকৃতি আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণের ভজনার দ্বারা তাঁহার সহিত যে সংযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ এবং সেই সংযোগফলে জীবপ্রকৃতি কৃষ্ণ হইতে আনন্দ লাভ করে, ইহাও বৃহদারণ্যক শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন। এই সূত্রটী সুষুপ্তিতত্ত্বের আলোচনাকালে পূর্ব্বেই আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। এই সূত্রটীর মর্ম্ম এরূপ নহে যে, কেবল সুষুপ্তিকালেই জীবপ্রকৃতি পরমপুরুষ কৃষ্ণের সহিত সংযোগ লাভ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করে। এই সূত্রের দ্বারা ইহাও নিরূপিত হইয়াছে যে, যোগসাধনার দ্বারা জীবপ্রকৃতি যখন পরমপুরুষ কৃষ্ণের সহিত সংযোগ লাভ করে, তখনও সে আনন্দ সম্ভোগ করে, এবং এইরূপ সংযোগলাভের দ্বারা আনন্দসম্ভোগই জীবপ্রকৃতির পরমধর্ম্মলাভ। এই পরাধর্ম্মলাভের জন্য পরমপুরুষ কৃষ্ণকে নিত্যপ্রিয় স্বরূপে উপাসনার উপদেশও বৃহদারণ্যক শ্রুতি দিয়াছেন, তাহাও আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। সুতরাং আমরা পাইলাম যে, ভাগবতের পরমধর্ম্ম বেদান্তে তত্ত্ববীজরূপে বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণ স্বয়ংই বেদ-বেদান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, "বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্"—গীতা ১৫।১৫। কৃষ্ণ পরমধর্ম্ম বেদান্তে তত্ত্ববীজরূপে প্রকাশ করিয়া ব্রজলীলার দ্বারা সেই পরমধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তের ভাষ্য ভাগবত ব্রজলীলার, এবং তদ্দ্বারা স্থাপিত পরমধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া বেদান্তের সেই তত্ত্ববীজের পরিণত রূপটী প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং, ভাগবতে বর্ণিত ব্রজলীলার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরমধর্ম্ম বেদান্তে উপদিষ্ট পরমধর্ম্ম। বেদান্তের পরমধর্ম্মকে লাভ করিতে হইলে ভাগবতধর্ম্মকে লাভ করিতে হইবে।

৯।৭।৪৫ প্রকট ব্রজলীলার উপসংহার

উক্তরূপে ব্রজলীলা করিতে করিতে কৃষ্ণ কৈশোর বয়স প্রাপ্ত হইলেন। একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স কৈশোর। কৈশোর প্রবেশ করিবার পরও কিঞ্চিদধিক এক বর্ষ কাল কৃষ্ণ বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া লীলা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সময়ের লীলা ব্রজের কৈশোর লীলা। ব্রজের দাস্য সখ্য

বাৎসল্য এবং মধুর, এই চতুর্ব্বিধ ভাবেরই উপাসক এবং উপাসিকাগণ ব্রজে কৃষ্ণের কৈশোরলীলাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন কৃষ্ণের দ্বাদশ বর্ষ বয়স চলিতেছিল, তখন কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত অক্রূরের সহিত কৃষ্ণ মথুরা গমন করিয়া প্রকট ব্রজলীলার উপসংহার করেন। মথুরাগমনের পর ব্রজে কৃষ্ণ প্রকটভাবে বিদ্যমান না থাকিলেও অপ্রকটভাবে ব্রজে তাঁহার নিত্যস্থিতি। অতঃপর ব্রজের দাসগণ, পিতা-মাতা-গুরুজনগণ, এবং রাধা ও গোপীগণ ধ্যানে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতেন। কৃষ্ণও পরোক্ষে থাকিয়া তাঁহাদের উপাসনা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যক্ষ লীলায় সংযোগ প্রাপ্ত হইতেন না বলিয়া বাহ্যদশায় তাঁহারা যে বিয়োগ ব্যথা পাইতেন তাহা বর্ণনার অতীত। মথুরায় গমন করিবার কিছুদিন পরে কৃষ্ণ তাঁহার ব্রজের লীলাপরিকরকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত স্বীয় সুহৃৎ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধবের ব্রজে আগমন ভাগবতের উদ্ধবসংবাদ নামে খ্যাত। উদ্ধব ছিলেন জ্ঞানী ব্যক্তি; তিনি প্রেমের মর্ম্ম জানিতেন না। ব্রজে আসিয়া তিনি ব্রজবাসীগণের, বিশেষতঃ রাধার প্রেম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। রাধা দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় কৃষ্ণকে ভ্রমরের সহিত তুলনা করিয়া উদ্ধবের নিকট যে উক্তি করিয়াছিলেন, ভাগবতে দশটী শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই দশটী শ্লোককে ভ্রমরগীতা বলা হয়। ভাগবতের ভাষ্যকারগণ স্বীকার করেন যে তাঁহারা ভ্রমরগীতার যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়াও ইহার ভাবটী পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। উদ্ধব এই প্রেম দেখিয়া স্বীয় জ্ঞানবত্তাকে ধিক্কার দিয়া ব্রজপ্রেমের কণিকা ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন ব্রজে তৃণগুল্মরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রজে অবস্থান করিতে পারেন। একবার প্রভাসতীর্থে সাক্ষাৎ মিলন ব্যতীত, লীলাসংবরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ বিয়োগব্যথার মধ্য দিয়াই ব্রজের লীলা পরিকর মর্ত্ত্য লীলার অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই বিয়োগ নিত্যলীলার বিয়োগ নহে, ইহা মর্ত্ত্য লীলার প্রয়োজনে হইয়াছিল। মর্ত্ত্য লীলার অবসানে এই বিয়োগেরও অবসান হইয়াছিল।

৯।৭।৪৬ ব্রজের বাহিরের লীলা : লীলাসংবরণের লীলা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণ একই বিগ্রহে গোলোক-বিহারী কৃষ্ণ এবং বৈকুণ্ঠপতি বাসুদেব, এবং ব্রজের বাহিরে তিনি যে লীলা

করিয়াছেন তাহা তাঁহার বাসুদেবলীলা। এই গ্রন্থে ব্রজের বাহিরে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়া কংস এবং তাহার অনুচরগণকে বধ করিয়া যদুবংশকে মথুরায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপরে আদর্শ গৃহীর আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি গুরুগৃহে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলেন। ইহার পর তিনি বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। মথুরায় অবস্থানের পর কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করেন এবং তথায় পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া মহিষীগণের সহিত লোকশিক্ষার নিমিত্ত আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন। কৃষ্ণের ষোল হাজার আট মহিষী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ছিলেন এবং অনেক স্বর্গের দেবীও ছিলেন। লক্ষ্মীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং অনেক দেবীও তদ্রূপ করিয়াছিলেন। অনেক মানবীও তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া দ্বারকালীলায় তাঁহাদিগকে মহিষী করিয়া তাঁহাদের তপস্যার সিদ্ধিদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানা ছিলেন বলিয়া বৃন্দাবনের লীলায় কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হয়েন নাই, দ্বারকায় পুরলীলায় তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ একই সময়ে সকল মহিষীর গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তিতে বিদ্যমান থাকিতেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে মনে করিতেন যে কৃষ্ণ তাঁহার গৃহেই অবস্থান করিতেছেন, যেমন রাসলীলাকালে কৃষ্ণ বহুমূর্ত্তি হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক গোপী মনে করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ তাঁহারই নিকট আছেন। দ্বারকায় অবস্থানকালের মধ্যে কৃষ্ণ বহু দৈত্য এবং অসুর বধ করিয়া এবং করাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের বাধাহীন সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার সখা অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধোদ্যত কুরুপাণ্ডববাহিনীদ্বয়ের মধ্যে অর্জ্জুনের রথে আরূঢ় থাকিয়া অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া মানবজাতিকে গীতা দান করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুষ্ট নিধন এবং ভূভারহরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সার্ব্বভৌম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন করতঃ তিনি আবার দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি কৌশলে যদুকুলকে ধ্বংস করিয়া স্বয়ং মর্ত্ত্য লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের জন্মলীলার ন্যায় তাঁহার মর্ত্ত্য লীলা সংবরণও একটী অলৌকিক লীলা। "যদুকুল ধ্বংসের পরে কৃষ্ণ একাকী বৃক্ষতলে বসিয়া-

ছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যাধের শরে তিনি চরণে বিদ্ধ হয়েন ; ইহার ফলে তিনি দেহত্যাগ করেন ; তাঁহার দেহত্যাগের পর দেহটী অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল।” লীলা সংবরণের এই বিবরণ হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণের বিগ্রহ মায়িক ত্রিগুণময় জড়দেহ ছিল। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কৃষ্ণের অবতীর্ণ হইবার কাল হইতে লীলাসংবরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সমগ্র লীলাকালের মধ্যে তাঁহার বিগ্রহের স্বরূপের এবং স্বরূপশক্তির যে সকল পরিচয় শাস্ত্র দিয়াছেন, তৎসমুদয়কে বাদ দিয়া, কেবলমাত্র তাঁহার লীলা সংবরণের বিবরণটীর বিচারের দ্বারা তাঁহার বিগ্রহের স্বরূপতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টার ফলে উক্তরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। ঐরূপ আংশিক বিচারের দ্বারা কৃষ্ণবিগ্রহের স্বরূপতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইতে পারে না ; তাঁহার সমগ্র লীলাকালের মধ্যে তাঁহার বিগ্রহের যে সকল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত তাঁহার লীলাসংবরণকালের ঘটনার সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য মতে তাঁহার বিগ্রহের স্বরূপতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যে কৃষ্ণবিগ্রহে অনন্ত শক্তি অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং অনন্ত মাধুর্য্যের বিদ্যমানতা শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, যে কৃষ্ণবিগ্রহ অবতারকালে চতুর্ভুজ শিশু, ক্ষণপরে দ্বিভুজ শিশু, এবং অবতীর্ণ হইয়াই শিশুমূর্ত্তিতে স্বীয় অনন্তত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যে কৃষ্ণবিগ্রহে যশোদা এবং অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণবিগ্রহ ব্রহ্মমোহন লীলায় অসংখ্য গাভী বৎস গোপালক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, যে কৃষ্ণবিগ্রহ স্বীয় ভারে কালিয়নাগের অযুত ফণা বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণবিগ্রহ বামহস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণবিগ্রহ রাসলীলাকালে অসংখ্য হইয়াছিলেন, যে কৃষ্ণবিগ্রহ দ্বারকায় ষোড়শ সহস্র মহিষীর গৃহে এককালে অবস্থান করিতেন, সেই কৃষ্ণবিগ্রহ ত্রিগুণময় মায়িক জড় দেহ নহে, তাহা অনন্ত চিচ্ছক্তিযুক্ত এবং অনন্ত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট অনন্ত সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ, এই তত্ত্ব স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরও সহজেই বোধগম্য হয়। এই কৃষ্ণবিগ্রহ শরবিদ্ধ হইতে পারেন না ; এই কৃষ্ণবিগ্রহের মৃত্যু নাই ; এই কৃষ্ণবিগ্রহকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, ইহাও সুসত্য তত্ত্ব। সুতরাং, যে দেহ শরবিদ্ধ, মৃত, এবং অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল, তাহা কৃষ্ণবিগ্রহ হইতে পারে না। ত্রিগুণময় মায়িক জড় দেহই শরবিদ্ধ, মৃত, এবং অগ্নিদগ্ধ হইতে পারে। সুতরাং, যে দেহ শরবিদ্ধ মৃত এবং অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল তাহা মায়িক জড় দেহ। আমরা পাইলাম, যে দেহ শরবিদ্ধ, মৃত, এবং অগ্নিদগ্ধ

হইয়াছিল তাহা মায়িক জড় দেহ এবং তাহা কৃষ্ণবিগ্রহ নহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই মায়িক জড় দেহটী কাহার দেহ, কোথা হইতে আসিল, এবং কেন আসিল ? উত্তর :—কৃষ্ণ মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়া নরসমাজে লৌকিক লীলায় নরবৎ লৌকিক আচরণ করিয়াছেন। তিনি যদি লৌকিক লীলার অবসান করিতে লৌকিক মৃত্যুলীলা না করিয়া, যেমন অলৌকিক রাসলীলার সময় গোপীগণের নিকট হইতে সহসা সশরীরে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন তদ্রূপ মর্ত্ত হইতে সহসা সশরীরে অন্তর্দ্ধান করিতেন, তাহা হইলে লোকচক্ষে তাঁহার মর্ত্ত্য লীলার লৌকিকত্ব রক্ষিত হইত না। লোকচক্ষে মর্ত্ত্য লীলার লৌকিকত্ব রক্ষা করিবার জন্য তিনি জন্মলীলা করিয়াছিলেন ; কাহারও পুত্র না হইয়া গোলোক হইতে মর্ত্তে সহসা সশরীরে আবির্ভূত হয়েন নাই। জন্মলীলার লৌকিকত্ব রক্ষা করিবার জন্য তিনি বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম অলৌকিক ; তিনি মানবশিশুর ন্যায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়েন নাই ; তিনি যোগমায়ার দ্বারা দেবকীর বাহ্যিক গর্ভ লক্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কারাগারে গোপনে বসুদেব-দেবকীর নিকট আবির্ভূত হইয়া তিনি যোগমায়ার দ্বারাই দেবকীর বাহ্যিক গর্ভলক্ষণ তিরোহিত করিয়াছিলেন, কারারক্ষীগণকে নিদ্রাভিভূত করিয়াছিলেন, অর্গলবদ্ধ কারাদ্বারকে আপনা-আপনিই উন্মুক্ত করাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য অলৌকিক কার্য্যও করাইয়াছিলেন। তাঁহার যোগমায়ার এই সকল অলৌকিক কার্য্য নরসমাজের অজ্ঞাত ছিল ; নরসমাজ জানিয়াছিল যে কৃষ্ণ দেবকীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে, যোগমায়ার দ্বারা কৃষ্ণ তাঁহার অলৌকিক আবির্ভাবকে নরসমাজে লৌকিক জন্ম বলিয়া ধারণা করাইয়া লোকচক্ষে জন্মলীলার লৌকিকত্ব রক্ষা করিয়া জন্মলীলা করিয়াছিলেন। নরসমাজকে তাঁহার অলৌকিক জন্মলীলার উক্তরূপ লৌকিকত্ব প্রদর্শনই তাঁহার জন্মলীলার লৌকিকত্ব। ইহা হইতে আমরা পাইলাম যে, তাঁহার অলৌকিক জন্মলীলার লৌকিকত্ব তাঁহার যোগমায়াসৃষ্ট বিভ্রম মাত্র। তদ্রূপ, কৃষ্ণ তাঁহার মর্ত্ত্য লীলা সংবরণের অলৌকিক লীলাকেও যোগমায়ার দ্বারা নরসমাজে লৌকিক মৃত্যু বলিয়া ধারণা করাইয়া, যোগমায়া সৃষ্ট সেই বিভ্রমের দ্বারা লোকচক্ষে তাঁহার অলৌকিক লীলাসংবরণলীলার লৌকিকত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার লীলাসংবরণলীলার লৌকিকত্ব রক্ষা করিতে কৃষ্ণ লীলাসংবরণ করিবার সময়ে যোগমায়ার দ্বারা তাঁহার বিগ্রহের

অনুরূপ একটী মায়িক জড় দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে অনন্ত যোগমায়ার অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বীয় অনন্ত মায়াশক্তির একাংশকে এই বিশাল স্থাবরজঙ্গমাত্মক জড় বিশ্বে পরিণত করিয়া প্রতি দেহে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তাঁহার পক্ষে তাঁহার সেই মায়াশক্তির একাংশকে ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার বিগ্রহের অনুরূপ একটী জড় দেহে পরিণত করা অতীব সহজসাধ্য। এইরূপে তাঁহার বিগ্রহের সদৃশ একটী মায়িক জড় দেহ সৃষ্টি করিয়াই কৃষ্ণ সশরীরে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার অলৌকিক লীলাসংবরণলীলা। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই মায়িক জড় দেহটী শরবিদ্ধ এবং মৃত হইয়াছিল ততক্ষণ তিনি সেই দেহটীতে তাঁহার আবেশ রাখিয়া সেই দেহের দ্বারা তাঁহার নিকটে আগত আত্মীয়বন্ধুগণের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সকল আত্মীয়বন্ধু তাঁহার যোগমায়া প্রভাবে বুঝিতে পারেন নাই যে, সেই দেহ কৃষ্ণবিগ্রহ নহে, তাহা মায়িক দেহ, এবং কৃষ্ণ সেই দেহ অবলম্বনে তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন। সেই মায়িক জড়দেহই শরবিদ্ধ হইয়াছিল ; তাহা হইতে কৃষ্ণ স্বীয় আবেশ অপসৃত করিবামাত্র তাহা মৃত হইয়াছিল এবং সেই দেহই অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল। যোগমায়াসৃষ্ট এই বিভ্রমই অলৌকিক লীলাসংবরণলীলার লৌকিকত্ব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অংশাবতারগণ

৯।৮।১ পুরুষাবতার

প্রাকৃত বিশ্বের সৃষ্টির নিমিত্ত কৃষ্ণ স্বীয় মায়াশক্তিকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে পরিণত করিয়া স্বয়ং পুরুষরূপে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করেন; তাঁহার এই পুরুষাবতারকে কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু বলা হয়। ইনি সৃষ্টির প্রয়োজনে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, এই দুই রূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। ইঁহাদিগকে কৃষ্ণের পুরুষাবতার বলা হয়। ইঁহারা কৃষ্ণের অংশ। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনাকালে ইঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

৯।৮।২ লীলাবতার

লীলাবতারগণ ধর্ম্মস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হয়েন না। কখনও তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মস্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন; কখনও স্থাপিত ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন : কখনও তাঁহারা স্বয়ং আদর্শ মানবজীবন যাপন করিয়া মানবকে তদ্রূপ মহৎ জীবন লাভ করিতে শিক্ষা দেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, অশ্ব, বরাহ, হংস, নৃসিংহ, বামন—ইঁহারা লীলাবতার এবং অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র লীলাবতার। তাঁহার লীলা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি রাবণ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণকে বধ করিয়া ধর্ম্ম-রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, পত্নীপ্রেম, আশ্রিত-রক্ষণ, সত্যরক্ষা, প্রজাপালন, প্রভৃতি অশেষবিধ মহৎগুণের পরমাদর্শ নিজ জীবনে আচরণ করিয়া মানবকে তৎসমুদয় শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্"—গীতা ১০।৩১—"শস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম।" কৃষ্ণের উক্তি অনুসারেই কৃষ্ণ এবং রাম অভিন্ন ; তাঁহাদের অভিন্নতা প্রমাণ করিতে অন্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না।

৯।৮।৩ গুণাবতার

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিবকে কৃষ্ণের গুণাবতার বলা হয়। ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্ট জীব ; তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু আছে ; পরমায়ুক্ষয়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিষ্ণু এবং শিব গুণাবতার হইলেও কৃষ্ণের স্বাংশ স্বরূপ এবং নিত্য।

৯।৮।৪ মন্বন্তরাবতার

মন্বন্তরাবতার বুঝিবার জন্য মন্বন্তর কি, অগ্রে তাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। দিবারাত্রির পরিমাণ আমাদের মানব জগতের যেরূপ, সর্ব্বত্রই তদ্রূপ নহে। আমাদের জগতে আমাদের ২৪ ঘণ্টায় এক মানবীয় দিবারাত্রি হয়, এবং এই পরিমাণের ৩৬৫ দিনে এক মানবীয় বৎসর হয়। কল্পারম্ভ হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত আমাদের জগতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এবং কলি নামক চারিটী যুগ বারে বারে পর পর আসিয়া থাকে। মানবীয় জগতের সত্যযুগের পরিমাণ মানবীয় ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২৯৬০০০ মানবীয় বৎসর, দ্বাপরযুগের পরিমাণ ৮৬৪০০০ মানবীয় বৎসর, এবং কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ মানবীয়

বৎসর। মানবীয় ১ বৎসরে স্বর্গে দেবতাগণের এক দিবারাত্রি হয় এবং দৈব ১২০০০ বৎসরে মানবীয় চতুর্যুগ হয়, অর্থাৎ মানবীয় সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি, এই চারিযুগের মোট পরিমাণ ৪৩২০০০০ বৎসর দৈব ১২০০০ বৎসরের সমান। ব্রহ্মার ১ দিবসের পরিমাণ মানবীয় সহস্র চতুর্যুগ, এবং রাত্রির পরিমাণও তাহাই। মানবীয় চতুর্যুগ বলিতে পর পর আগত সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই চারি যুগ বুঝায়। সহস্র চতুর্যুগ বলিতে পর পর সহস্রবার আগত চতুর্যুগ বুঝায়। স্থতরাং, সহস্র চতুর্যুগের পরিমাণ ৪৩২০০০০০০০ মানবীয় বৎসর। ইহাই ব্রহ্মার একটী দিবাভাগের পরিমাণ এবং ইহাই তাঁহার একটী রাত্রির পরিমাণ। আমরা পাইলাম যে ব্রহ্মার একটী অহোরাত্রের পরিমাণ ৮৬৪০০০০০০০ মানবীয় বৎসর। ব্রহ্মার একটী অহোরাত্রকে একটী কল্প বলা হয়। এইরূপ দিবারাত্রির গণনায় ৩০ দিনে ব্রহ্মার এক মাস এবং ৩৬৫ দিনে ব্রহ্মার এক বৎসর। এইরূপ ১০০ বৎসর ব্রাহ্মার আয়ুস্কাল। একটী কল্পান্তর্গত দিবাভাগের আরম্ভে ব্রহ্মাণ্ডসমূহের স্থষ্টি হয় এবং দিবস ব্যাপিয়া ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বিদ্যমান থাকে; দিবাভাগের অন্তে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হয় এবং রাত্রিভাগে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। রাত্রি গত হইলেই একটী কল্পের অবসান হইল; ইহাই কল্পক্ষয়। পুনরায় নূতন কল্পারম্ভে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় দিবসে স্থষ্টি ও স্থিতি এবং রাত্রে প্রলয় এবং স্থিতিহীনতা। ব্রহ্মার ১০০ বৎসর আয়ুস্কালের মধ্যে এইরূপ কত কল্প হয় তাহা গণনার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। এক একটী কল্পের মধ্যে যে প্রলয় হয়, সেই প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে, নূতন কল্পারম্ভে প্রকৃতি হইতে পুনরায় উদ্ভূত হয়। ব্রহ্মার ১০০ বৎসর আয়ুস্কাল পূর্ণ হইলে তাঁহার মৃত্যু হয়; তখন মহাপ্রলয় হয়। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিরও অস্তিত্ব থাকে না; তখন প্রকৃতি কৃষ্ণের মায়াশক্তিতে বিলীন হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ের পর পুনরায় সর্গারম্ভ, অর্থাৎ স্থষ্টির আরম্ভ হয়, আবার নূতন ব্রহ্মারও উৎপত্তি হয় এবং পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মার দিবাভাগে স্থষ্টি এবং রাত্রিকালে প্রলয় হইতে থাকে। এইরূপে কল্পের পর কল্পের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের সহিত ব্রহ্মাণ্ডগণেরও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে (Cycle of existence)। গীতার ৮।১৭-১৯ এবং ৯।৭ শ্লোকচতুষ্টয়ে এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও কল্পের এইরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মার একটি দিবসের মধ্যে পর পর চৌদ্দ জন মনু বিশ্ব শাসন করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের শাসনকালকে এক-

একটী মন্বন্তর বলা হয়। যে মন্বন্তরে যে মনু শাসন করেন, সেই মন্বন্তর সেই মনুর নামে অভিহিত হয়। চতুর্দ্দশ মনুর নাম ঃ— (১) স্বায়ম্ভুব (২) স্বারোচিষ (৩) উত্তম (৪) তামস (৫) রৈবত (৬) চাক্ষুষ (৭) বৈবস্বত (৮) সাবর্ণি (৯) দক্ষসাবর্ণি (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি (১২) রুদ্রসাবর্ণি (১৩) দেবসাবর্ণি (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি। প্রত্যেক মন্বন্তরে কৃষ্ণের এক-একটী মন্বন্তরাবতার হয়। মন্বন্তরাবতারের অধীনে এবং নির্দ্দেশমত প্রত্যেক মনু স্বীয় মন্বন্তরে শাসন করেন। এক্ষণে প্রত্যেক মন্বন্তরের পার্শ্বে সেই মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতারের নাম লিখিত হইতেছে। (১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতারের নাম যজ্ঞ। (২) স্বারোচিষের, বিভু। (৩) উত্তমের, সত্যসেন। (৪) তামসের, হরি। (৫) রৈবতের, বৈকুণ্ঠ। (৬) চাক্ষুষের, অজিত। (৭) বৈবস্বতের, বামন। (৮) সাবর্ণির, সার্ব্বভৌম। (৯) দক্ষসাবর্ণির, ঋষভ। (১০) ব্রহ্মসাবর্ণির, বিষ্বক্সেন। (১১) ধর্ম্মসাবর্ণির, ধর্ম্মসেতু। (১২) রুদ্রসাবর্ণির, সুধামা। (১৩) দেবসাবর্ণির, যোগেশ্বর। (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণির, বৃহদ্ভানু। এখন যে মন্বন্তর চলিতেছে ইহার নাম বৈবস্বত; বর্ত্তমান মন্বন্তরের নাম বৈবস্বত মন্বন্তর এবং ইহার মন্বন্তরাবতার বামন।

নবম পরিচ্ছেদ

যুগাবতার এবং আবেশাবতার

৯।৯।১ যুগাবতার ঃ যুগধর্ম্ম

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই চারিটী যুগ। কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে তিনি ধর্ম্মস্থাপন করিবার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণই ধর্ম্ম, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান ধর্ম্মজ্ঞান, তাঁহাকে লাভ করাই ধর্ম্মলাভ, এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সাধনাই ধর্ম্মসাধনা। প্রতি যুগে ধর্ম্মস্থাপনের জন্য তাঁহার যে অবতার, তাঁহাকে যুগাবতার বলা হয়। ধর্ম্মস্থাপন করিবার জন্য কৃষ্ণ প্রতি যুগে একবার করিয়াই যুগাবতার করেন। মন্বন্তরাবতার সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা পাইয়াছি যে, মানবীয় সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিবস হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিবসে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, তৎপরে আবার

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, এইরূপে চতুর্যুগের সহস্রবার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক বারের আবর্ত্তনে কৃষ্ণ একবার করিয়া যুগাবতার করেন। সুতরাং দেখা গেল যে কৃষ্ণের যুগাবতারের সংখ্যা অগণ্য। কৃষ্ণ যুগাবতার করিয়া ধর্ম্মসাধনার প্রণালীও শিক্ষা দেন। কৃষ্ণই ধর্ম্ম; সুতরাং সকল যুগেই ধর্ম্ম একই। কৃষ্ণকে নিত্যপ্রাপ্ত হইবার জন্য যে সনাতন সাধনপন্থা, তাহাও সকল যুগেই একই। কিন্তু সত্য ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে সেই সনাতন সাধনপন্থার সহিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ এবং তপস্যাদির অনুষ্ঠানও বিহিত হইয়াছে। কলিযুগের বৈশিষ্ট এই যে, কলিযুগের মানব অন্য কোনরূপ যজ্ঞ-তপস্যাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও কেবলমাত্র সনাতন সাধনপন্থা অনুসারে অধ্যাত্মযোগসাধনা করিলে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে পারে। কৃষ্ণের নামের বহিরঙ্গ সাধনা এবং অন্তরঙ্গ সাধনাই সেই সনাতন সাধনপন্থা। কলিযুগে মুক্তি লাভ করিবার এবং কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার একমাত্র উপায় কৃষ্ণের নামের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সাধনা, ইহাই শাস্ত্রের বিধান। প্রতি যুগে যেরূপ সাধনার দ্বারা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সেই যুগের যুগধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। কেবল নাম-সাধনাই কলিযুগের যুগধর্ম্ম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ বৃহন্নারদীয়বচনম্

—"কলিযুগে কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, কেবল হরিনামই একমাত্র গতি। এতদ্ব্যতীত কলিযুগে অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।"

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধ পরং ব্রজেৎ॥ ভাগবত ১২।৩।৪৩

—"হে রাজন্, কলিযুগ অশেষ দোষে দুষ্ট হইলেও তাহার একটী মহান্ গুণ আছে। তাহা এই যে, কলিযুগের মানব কোনরূপ ব্রত তপস্যা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণের কীর্ত্তনের, অর্থাৎ কৃষ্ণের নামের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ করে, এবং মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে পরমধর্ম্ম তাহাও প্রাপ্ত হয়।" এই যে পরমধর্ম্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে, ইহা প্রেমবিকাশের এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির ধর্ম্ম এবং ইহাই চতুর্ব্বর্গের অতীত পঞ্চমপুরুষার্থ।

৯।৯।২ কলিযুগের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের যুগাবতার। স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাভাব লইয়া কৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এইজন্য, তিনি অংশ-অবতার নাহেন, পূর্ণ অবতার। নবদ্বীপধামে ১৪০৭ শকাব্দে কৃষ্ণ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ১৪৫৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত প্রকট লীলা করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমে গৌরাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর তাঁহার নাম হইয়াছিল কৃষ্ণচৈতন্য। এইজন্য কৃষ্ণের এই যুগাবতারকে গৌরাঙ্গ অবতারও বলা হয় এবং কৃষ্ণচৈতন্য অবতারও বলা হয়। আত্মাবতার মহাবিষ্ণু এবং সঙ্কর্ষণ রাম অদ্বৈত আচার্য্যরূপে এবং নিত্যানন্দরূপে তৎকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর যুগাবতারত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ, তাঁহার তত্ত্ব এবং লীলা, সমস্তই শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বহু বিখ্যাত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই কারণে, এখানে, সেই সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগের যুগধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। রাধাভাবে ভাবিত স্বয়ং কৃষ্ণই মহাপ্রভু, সুতরাং প্রেমবিকাশ এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য যোগসাধনা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তথাপি, ব্রজলীলায় যেমন কৃষ্ণের প্রেরণায় রাধা এবং গোপীগণ ধর্ম্মলাভের সাধনা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া মানবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তদ্রূপ, মহাপ্রভুও স্বয়ং যোগসাধনা করিয়া মানবকে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মলাভের উপায় শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু আচরণের এবং উপদেশের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, কলিযুগের ধর্ম্মসাধনা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, সদাচার, এবং নামসাধনা। তিনি আচরণের ও উপদেশের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, মুক্তিলাভের পর প্রেমবিকাশ এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তিই মানবজীবনের লক্ষ্য, এবং কলিযুগে এই লক্ষ্যলাভের উপায় নামসাধনা। তিনি আচার ও প্রচারের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, নামসাধনা দ্বিবিধ, বহিরঙ্গ নামসাধনা এবং অন্তরঙ্গ নামসাধনা। উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের নাম গুন লীলা কীর্ত্তন বহিরঙ্গ নামসাধনা। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুদত্ত নামের স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যান অন্তরঙ্গ নামসাধনা। মহাপ্রভু স্বয়ং এবং তাঁহার সকল পার্ষদগণও সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুদত্ত নামের অন্তরঙ্গ সাধনা করিতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের নাম গুণ লীলা কীর্ত্তন করিয়া বহিরঙ্গ নামসাধনাও করিতেন। অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ, দ্বিবিধ নাম-

সাধনাই যে কলিযুগের নামসাধনা, তাহা কেবল মহাপ্রভু নহেন, তাঁহার পার্ষদ-গণও আচরণের এবং উপদেশের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু ইহাও শিক্ষা দিয়াছেন যে, মোক্ষলাভ নামসাধনার লক্ষ্য নহে, আনুষঙ্গিক ফল মাত্র; নাম-সাধনার ফল প্রেমবিকাশ এবং নিত্য কৃষ্ণপ্রাপ্তি। তিনি বলিয়াছেন যে জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের আরাধনাই তাহার কার্য্য, প্রেমবিকাশ এবং নিত্যলীলায় নিত্য কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাহার ধর্ম্মলাভ। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, ইহা সাধনার দ্বারা লভ্য নহে। নামসাধনার এবং কৃষ্ণের নাম গুণ লীলা কীর্ত্তন শ্রবণের ফলে মানব শুদ্ধচিত্ত হয়, তখন সে কৃষ্ণের দর্শন এবং মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থায় তাহার প্রেমের বিকাশ হয় এবং সে নিত্যলীলায় কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়; ইহাই পরমধর্ম্ম, ইহা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের অতীত বলিয়া ইহাই পঞ্চমপুরুষার্থ। ব্রজলীলার দ্বারা স্থাপিত পরমধর্ম্ম এবং মহাপ্রভুর দ্বারা স্থাপিত পরমধর্ম্ম একই; বস্তুতঃ, পরমধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না, ইহা সর্ব্বকালেই এক এবং অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই সনাতন সাধনপন্থা শিক্ষা দিয়া মানবকে কৃষ্ণ প্রাপ্ত করাইয়া ধর্ম্মস্থাপন করিয়া-ছিলেন। মহাপ্রভুর দ্বারা স্থাপিত যুগধর্ম্ম পরমধর্ম্ম। তিনি যুগধর্ম্ম স্থাপন করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।

৯।৯।৩ আবেশাবতার : সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

আবেশাবতার দুই প্রকার, শক্ত্যাবেশ অবতার এবং পূর্ণাবেশ অবতার। আমরা পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ প্রতি যুগে, ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য, একবার করিয়া যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েন; কিন্তু তিনি যে প্রতি যুগে মাত্র একবার করিয়াই অবতীর্ণ হয়েন তাহা নহে। যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে যুগধর্ম্ম স্থাপন করেন, জগতের মানবজাতিকে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার যোগ্যতা দান করিবার নিমিত্ত, যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে লীলাবতার এবং শক্ত্যাবেশ অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েন। আবার, যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে যুগধর্ম্ম স্থাপন করিয়া যান, সেই ধর্ম্ম কালক্রমে ম্লান হইলে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হইবার পরে পূর্ণাবেশ অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েন। বর্ত্তমান কলিযুগেও, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ ভারতে এবং ভারতের বাহিরের

অন্যান্য দেশেও সময়ে সময়ে লীলাবতার এবং শক্ত্যাবেশ অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া, নাস্তিক, জড়বাদী, ভূতপ্রেতের এবং কল্পিত দেবতার পূজাপরায়ণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কল্পিত মতাবলম্বী, পরস্পর বিদ্বেষী, এবং যুদ্ধবিগ্রহপরায়ণ নানাজাতীয় মানবগণকে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং মানবদেহে অবিনাশী জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী করিয়া, এবং অহিংসা মানবপ্রেম দয়া সত্যপালন প্রভৃতি উচ্চবৃত্তিসমূহের অনুশীলন শিক্ষা দিয়া, মানবজাতিকে যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কর্ত্তৃক স্থাপিত যুগধর্ম্ম গ্রহণ এবং সাধনা করিবার যোগ্যতালাভের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে যথাকালে কৃষ্ণ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে লীলাবতার এবং শক্ত্যাবেশ অবতারগণ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া ভারতের এবং ভারতের বাহিরের যে সকল দেশের অধিবাসীগণকে উক্তরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সকল দেশের অধিবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নামসাধনা নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছেন। তাহা না করিলে ধর্ম্মলাভের অন্য কোন পন্থা নাই। নামসাধনার দ্বারা মানবকে ধর্ম্মলাভ করিতে হইবে, ইহা ঈশ্বরের বিধান। ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করিয়া কোন মানব ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং, সকল দেশের এবং সকল জাতির মধ্যেই যাঁহারা ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রদর্শিত নামসাধনাকেই ঈশ্বরলাভের উপায় রূপে গ্রহণ করিতেছেন, ইহা বিস্ময়ের বস্তু নহে। জগতে যুগধর্ম্মস্থাপন ব্যতীত অন্য বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত সকল সময়েই কৃষ্ণ স্বয়ং অথবা তাঁহার স্বাংশ ভগবৎ-স্বরূপ অবতীর্ণ হয়েন না। সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, কৃষ্ণ কোন সুযোগ্য জীবের মধ্যে আপনার সেই শক্তির আবেশ করেন। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত কৃষ্ণশক্তির এইরূপ আবেশ কৃষ্ণেরই আবেশ কারণ কৃষ্ণ এবং তাঁহার শক্তি অভিন্ন। যে সকল সুযোগ্য জীবে কৃষ্ণের শক্তির উক্তরূপ আবেশ হয়, তাঁহারা কৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার। জগতের যে কল্যাণকর কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ যাঁহাতে শক্তির আবেশ করেন, সেই শক্ত্যাবেশ-অবতার সেই কার্য্য সম্পাদন করেন। সনক সনাতন সনন্দ সনৎকুমার কৃষ্ণের জ্ঞানশক্তির আবেশাবতার; তাঁহারা জগৎকে কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান

শিক্ষা দিয়াছেন। পরশুরাম কৃষ্ণের সংহারশক্তির আবেশাবতার; তিনি পৃথিবীকে ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক শক্ত্যাবেশ-অবতার জগতের কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, এখনও করেন। শক্ত্যাবেশ-অবতার পূর্ণাবেশ-অবতার নহেন। কৃষ্ণ যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম স্থাপন করেন; কালক্রমে তাহাতে গ্লানি প্রবেশ করে এবং তাহা দুর্ব্বল হইয়া যায়। সেই গ্লানি দূর করিয়া তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, কৃষ্ণ যে যুগাবতার রূপে যুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন, কোন সুযোগ্য মহাপুরুষের মধ্যে কৃষ্ণের সেই যুগাবতারের পূর্ণ আবেশ হয়। কৃষ্ণের যুগাবতার কর্ত্তৃক আবিষ্ট মহাপুরুষ কৃষ্ণের সদ্‌গুরু-অবতার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং কৃষ্ণই সদ্‌গুরু। উক্তরূপ পূর্ণাবেশ-অবতার সদ্‌গুরু রূপে কার্য্য করিয়া যুগ-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণের সদ্‌গুরু-অবতার। কৃষ্ণ এবং তাঁহার যুগাবতার অভিন্ন; এইজন্য, যুগাবতারের পূর্ণাবেশ কৃষ্ণেরই পূর্ণাবেশ। এই কারণে, কৃষ্ণ, যুগাবতার, এবং সদ্‌গুরু-অবতার অভিন্ন। অবতারত্বের প্রধান বৈশিষ্ট অনুসারে অবতারগণের প্রকারভেদ করা হয়। স্বয়ংরূপ অবতারে স্বয়ংরূপে ব্রজলীলাই প্রধান বৈশিষ্ট; এইজন্য, যদিও কৃষ্ণই সদ্‌গুরু, তাঁহার স্বয়ংরূপ অবতারকে সদ্‌গুরু-অবতার বলা হয় না। যুগাবতারে যুগধর্ম্মস্থাপনই প্রধান বৈশিষ্ট; এইজন্য, যদিও যুগাবতার সদ্‌গুরু, তাঁহাকে সদ্‌গুরু-অবতার বলা হয় না। যুগাবতার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত যুগধর্ম্ম ম্লান হইলে তাহাকে পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য সদ্‌গুরু-রূপে কার্য্যই পূর্ণাবেশ-অবতারের প্রধান বৈশিষ্ট; এইজন্য পূর্ণাবেশ-অবতার হইতেছেন সদ্‌গুরু-অবতার। পূর্ণাবেশ-অবতার শক্ত্যাবেশ-অবতার নহেন। সদ্‌গুরু-অবতার হইতেছেন পূর্ণাবেশ-অবতার, এইজন্য সদ্‌গুরু-অবতার শক্ত্যাবেশ-অবতার নহেন। কৃষ্ণ, যুগাবতার, অথবা সদ্‌গুরু-অবতার সদ্‌গুরুর কার্য্য করাইবার জন্য যে সুযোগ্য মহাপুরুষে গুরু-শক্তির আবেশ করেন, তিনি সদ্‌গুরু, কিন্তু সদ্‌গুরু-অবতার নহেন। এইরূপ গুরুশক্তির আবেশপ্রাপ্ত সদ্‌গুরুগণ শক্ত্যাবেশ-অবতার। স্বয়ংরূপ অবতারের, যুগাবতারের, এবং সদ্‌গুরু-অবতারের কার্য্য সমগ্র জগতের সমগ্র মানবজাতির জন্য; কিন্তু সদ্‌গুরুর কার্য্য কৃষ্ণের, যুগাবতারের, অথবা সদ্‌গুরু-অবতারের দ্বারা নির্দ্ধারিত বিশেষ স্থানের এবং ব্যক্তিগণের জন্য। শক্তি এবং শক্তিমান

অভিন্ন বলিয়া কৃষ্ণ এবং সদ্‌গুরু অভিন্ন। কৃষ্ণ এবং যুগাবতার অভিন্ন, এইজন্য যুগাবতার এবং সদ্‌গুরু অভিন্ন। কৃষ্ণ এবং সদ্‌গুরু-অবতার অভিন্ন, এইজন্য সদ্‌গুরু-অবতার এবং সদ্‌গুরু অভিন্ন। সদ্‌গুরু-অবতার জগতে এককালে মাত্র একজনই থাকেন, এবং যুগাবতার কর্ত্তৃক স্থাপিত যুগধর্ম্ম ম্লান হইলে সদ্‌গুরু-অবতার অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু সদ্‌গুরু জগতে এককালে একাধিক থাকিতে পারেন এবং যুগাবতার অথবা সদগুরু-অবতার অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেও থাকেন এবং পরেও থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে ধর্ম্মকে কলিযুগের যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দ্বারা নূতন সৃষ্ট ধর্ম্ম নহে; তাহা কলিযুগের যুগধর্ম্মরূপে শাস্ত্রেই বিহিত আছে। সেই ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য সদ্‌গুরু মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেও ভারতে ছিলেন, কিন্তু তখন সেই ধর্ম্ম যুগধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং স্বল্প লোকেই সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। ইহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কয়েকটী মাত্র উল্লিখিত হইতেছে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পঞ্চমপুরুষার্থের ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সদ্‌গুরু ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিদ্যমান ছিলেন এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণকে পঞ্চমপুরুষার্থের ধর্ম্মে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যও তাঁহারই দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীও সদ্‌গুরু ছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বর পুরীর দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক প্রেমরসময় কাব্য ও গীতি মহাপ্রভু সম্ভোগ করিতেন, সেই জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ পঞ্চমপুরুষার্থপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। আমরা পাইলাম যে, নামসাধনার দ্বারা পঞ্চমপুরুষার্থলাভের ধর্ম্ম, এবং সদ্‌গুরুগণ, মহাপ্রভুর পূর্ব্বেও ছিলেন। কিন্তু, মহাপ্রভু সেই ধর্ম্মকে কলিযুগের যুগধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরে কালক্রমে তাঁহার দ্বারা স্থাপিত যুগধর্ম্মে গ্লানি প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার অন্তর্দ্ধানের প্রায় ৪৫০ শত বৎসর পরে তিনি যে মহাপুরুষে পূর্ণরূপে আবিষ্ট হইয়া সেই ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। মহাপ্রভু স্বীয় অবতারকালের মধ্যেও সুযোগ্য মহাপুরুষে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা ধর্ম্মস্থাপনের কার্য্যে সহযোগিতা করাইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিবৃত

হইয়াছে যে নকুল ব্রহ্মচারীর মধ্যে মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল এবং এইরূপে আবিষ্ট হইয়া নকুল ব্রহ্মচারী মহাপ্রভুর ধর্ম্মস্থাপনের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোভাবের দীর্ঘকাল পরে ধর্ম্মগ্লানি হইলে তাঁহারই দ্বারা স্থাপিত ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি……তদাত্মানং সৃজাম্যহম্" এই অঙ্গীকার পালনার্থে তাঁহার পূর্ণাবেশ-অবতার সম্পূর্ণ আবশ্যক, সঙ্গত, সম্ভব, এবং স্বাভাবিক। শ্রীবিজয়কৃষ্ণের সদ্গুরু-অবতারকালে শ্রীসঙ্কর্ষণ রামেরও পূর্ণাবেশ-অবতার হইয়াছিল। আমরা পাইয়াছি যে, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য কৃষ্ণ যখন স্বয়ংরূপে অবতার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার আদিব্যূহের ক্রিয়াশক্তি-প্রধান স্বাংশ স্বরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ রাম শ্রীবলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখনও সঙ্কর্ষণ রাম নিত্যানন্দ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাও পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। কৃষ্ণাবতারে শ্রীবলরাম এবং কৃষ্ণচৈতন্যাবতারে শ্রীনিত্যানন্দ. ধর্ম্মস্থাপনের জন্য কৃষ্ণের ইচ্ছায় তত্তৎ-কালের প্রয়োজনানুরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন বর্ত্তমান যুগে পূর্ণাবেশ-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও শ্রীসঙ্কর্ষণ রাম পূর্ণাবেশ-অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস শ্রীসঙ্কর্ষণ রামের পূর্ণাবেশ-অবতার। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীবলরাম, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীনিত্যনন্দ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তদ্রূপ, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার মায়াশক্তিকে অর্চ্চনা করিতে হয়, ইহা ব্রজলীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীবিজয়কৃষ্ণের অবতারকালের পূর্ব্বে এবং অবতারকালের মধ্যেও মহামায়ার অর্চ্চনা অর্থ সম্পদ সম্মান প্রভৃতি বিষয়-কামনামূলক অর্চ্চনায় পরিণত হইয়াছিল; শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, "কামিনী-কাঞ্চন" প্রাপ্তির কামনায় মহামায়া অর্চ্চিত হইতেন। মহামায়ার অর্চ্চনায় এইরূপ গ্লানি প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ আচরণের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, কামিনী-কাঞ্চনের জন্য মহামায়ার অর্চ্চনা নহে, শুদ্ধাভক্তির প্রার্থনায় মহামায়ার অর্চ্চনা করিতে হইবে, শুদ্ধাভক্তি ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। শ্রীসঙ্কর্ষণের পূর্ণাবেশ-অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ নিজজীবনে যে সাধনা করিয়াছেন তাহা নিজ প্রয়োজনে নহে, তাহা লোকশিক্ষার নিমিত্ত। তাঁহার সাধনা তাঁহার লৌকিক আচরণ। শুদ্ধাভক্তির প্রার্থনায় মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া মুক্তাবস্থা

প্রাপ্ত হইলে প্রেমের বিকাশ এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা নিজ সাধনার দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। এই শিক্ষা দিবার জন্য তিনি প্রথমে মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া পরে মধুরভাবে কৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। সদ্‌গুরু-অবতার শ্রীবিজয়-কৃষ্ণ যখন কৃষ্ণকে প্রাপ্ত করাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কৃষ্ণের মায়াশক্তির অর্চ্চনার গ্লানি দূর করিয়া, কিরূপে মহামায়ার অর্চ্চনা করিলে মায়ামুক্ত হওয়া যায়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য। ইহাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য কার্য্য। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুগধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কার্য্যে ইহাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সহযোগিতার প্রধান কার্য্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরে প্রয়োজনানুরূপ আলোচনা করিতে হইবে। এক্ষণে আমরা সদ্‌গুরু-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

দশম পরিচ্ছেদ

সদ্‌গুরু-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ

৯।১০।১ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পূর্ণাবেশের সুযোগ্য পাত্র

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বংশধর। অদ্বৈত-প্রভুর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দশম পুরুষে বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা পূর্ণরূপে আবিষ্ট হইবার সুযোগ্য পাত্র ছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস বিবৃত করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। বিজয়কৃষ্ণ স্বীয় পূর্ব্বজন্মের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গ, ৩য় খণ্ড, হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে। "গয়াতে যখন আমি ছিলাম, একদিন বেড়াতে বেড়াতে ফল্গুর অপর পারে রামগয়ায় উপস্থিত হলাম। সেখানে একটী মন্দিরে নৃসিংহদেব দর্শন ক'রে তখনই আমার মনে পড়ল, যেন পূর্ব্বে কখনও আমি এই মূর্ত্তি দেখেছি। তার পরেই আমার ক্রমে ক্রমে সব কথাই স্মরণ হ'তে লাগল। ঐ স্থানে ফল্গুর পারে পুরাণ বাঁধান ঘাটের উপরে

একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, সেই গাছের পশ্চিম দিকের একটা ডালাতে ছুরি দিয়ে "ওঁ রাম" এই নামটী বড় ক'রে কেটে লিখে রেখেছিলাম। তাও আমার মনে হ'ল। অমনি আমি উঠে সেই গাছটীর কাছে উপস্থিত হ'লাম, দেখলাম সেই লেখা ডালাতে রয়েছে। তবে ডালার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলি অনেকটা তফাৎ তফাৎ হ'য়ে পড়েছে। তারপর রামগয়ার যে স্থানে থেকে সাধনভজন করেছিলাম এবং সে সময়ে আমার সঙ্গে যে দুটী পরমহংস ছিলেন, সে সমস্তই আমার মনে হ'ল। ক্রমে অনেক কথাই মনে পড়ল। আমি পাহাড়ের সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে, সেই সমস্ত স্থান ও চিহ্ন দেখে অবাক্ হ'লাম। পূর্ব্বজন্মের সমস্ত স্মৃতিই সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে জেগে উঠল।" বিজয়কৃষ্ণ সকল সময়েই স্বীয় তত্ত্ব এবং স্বমহিমা অতীব গোপনে রাখিয়াছিলেন ; তিনি পূর্ব্বজন্মে কিরূপ উচ্চাবস্থার মহাপুরুষ ছিলেন তাহা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস যতটুকু প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে সন্ন্যাসী ছিলেন, রামগয়ায় পাহাড়ে থাকিয়া সাধনভজন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকট দুইজন পরমহংস থাকিতেন। এই উক্তি হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, তিনি এমনই উচ্চাবস্থার সিদ্ধযোগী এবং মহাপুরুষ ছিলেন যে পরমহংসগণও তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন। বলাই বাহুল্য যে এইরূপ মহাপুরুষ জীবন্মুক্ত এবং তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় এবং আদেশে সদ্‌গুরু-অবতার রূপে কার্য্য করিবার জন্য তিনি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোস্বামীপ্রভুর পূর্ব্ব-জন্মের ইতিহাস হইতেই আমরা তাঁহার সুযোগ্যতার প্রমাণ পাইলাম। তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর রূপে। অদ্বৈত প্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার ছিলেন, তিনি মহাপ্রভুর মাননীয় পার্ষদ ছিলেন, এবং তাঁহার মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়হেতু তিনি ছিলেন জ্ঞান ও ভক্তির মূর্ত্তিস্বরূপ এবং জগদ্‌বরেণ্য আচার্য্য। এই অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে নবম পুরুষ ছিলেন, শ্রীআনন্দকিশোর গোস্বামী। ইনি পরম ভক্ত এবং প্রেমিক ছিলেন। দেবী স্বর্ণময়ী ছিলেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ, উদার, এবং মহানুভব মহিলা অতি দুর্ল্লভ। এই আনন্দকিশোর এবং স্বর্ণময়ীর পুত্র রূপে বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগয়ার জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ অদ্বৈতপ্রভুর দশম পুরুষে আনন্দকিশোর এবং স্বর্ণময়ীর পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া বিজয়কৃষ্ণ রূপে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিলাম যে, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মহাপ্রভুর পূর্ণাবেশের সুযোগ্য পাত্র, শ্রীঅদ্বৈতবংশ পূর্ণাবেশ অবতারের সুযোগ্য বংশ, এবং আনন্দকিশোর স্বর্ণময়ী পূর্ণাবেশ-অবতারের সুযোগ্য জনক জননী।

৯।১০।২ সদ্‌গুরু-অবতারের প্রয়োজন

গোস্বামীপ্রভুর আবির্ভাবের এবং আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ভারতের, তথা সমগ্র জগতের, ধর্ম্মের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, ধর্ম্মের সেই গ্লানি দূর করিয়া যুগধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার সাধ্য কোন মানবের ছিল না। তখনকার ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পর ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দুর উপর মুসলমানের অত্যাচার ইতিহাসে কুখ্যাত হইয়া আছে। ঔরঙ্গজেব মুসলমান ধর্ম্মকে রাজনীতির অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে ভারতবাসী হিন্দুগণ ভারতকে ভারতে আগত মুসলমানের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিল। হিন্দুগণকে মুসলমান করিলে তাহারা আর মুসলমানগণকে বিধর্ম্মী মনে করিয়া মুসলমানরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য যুদ্ধ করিবে না, ইহা ভাবিয়া ঔরঙ্গজেব ভারতের বিখ্যাত মন্দির এবং ভগবৎ-বিগ্রহ সমূহ ধ্বংস করাইয়াছিলেন, মন্দিরকে মস্‌জিদে পরিণত করাইয়াছিলেন, এবং হিন্দুগণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিধানে, ধর্ম্মদ্বেষী ঔরঙ্গজেব স্বীয় জীবনকালেই মুঘলসাম্রাজ্যের পতনারম্ভ দেখিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেই মুঘলসাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল। তাহার পর আসিল ইংরাজ জাতি। ইংরাজও খৃষ্টধর্ম্মকে রাজনীতির অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া অপরের দেশ অধিকার করিয়া শাসন করিবার উপায়রূপে ব্যবহার করিতেছিল। নানারূপ ছলে ও কৌশলে ইংরাজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল। অধিকৃত ভারতের অধিবাসীগণকে খৃষ্টান করিতে পারিলে তাহারা খৃষ্টান ইংরাজ-রাজের সহায় হইবে এবং তাহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে না বলিয়া ইংরাজ-রাজ ভারতবাসীগণকে খৃষ্টান করিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজ চতুর জাতি; সে মুসলমানের মত হিন্দুর মন্দির ধ্বংস এবং বলপ্রয়োগ করিয়া ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিতে আরম্ভ করিল না; ভারতীয়গণকে খৃষ্টান করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। বিদেশীয় ইংরাজের কুশাসনে এবং

অর্থশোষণে ভারতবাসীগণ অতিশয় দরিদ্র হইয়াছিল। ইংরাজ ভারতবাসীকে অর্থ, রাজপদ, এবং অন্য নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখাইয়া খৃষ্টান করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে ইংরাজ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার করিয়া এবং খৃষ্টান পাদ্রীগণের প্রচারকার্য্যের দ্বারা ভারতবাসীকে বুঝাইতে লাগিল যে ভারতীয় ধর্ম্ম কতকগুলি কুসংস্কারের সমষ্টিমাত্র। ইংরাজীশিক্ষিত ভারতীয় যুবকগণকে গির্জ্জায় আরাধনা দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছিল। তাহারা দেখিল, রবিবারের মনোলোভা বেশ এবং প্রসাধনে ভূষিত সাহেবগণ এবং মেমগণ বাহুবদ্ধ অবস্থায় গির্জ্জায় যাইতেছে; তাহারা শুনিল, অর্গেনবাদ্যের সহিত সাহেবগণের এবং মেমগণের প্রার্থনাকালীন ঐক্যতান সঙ্গীত; মুগ্ধ হইয়া তাহারা ভাবিল, খৃষ্টানধর্ম্মই মর্ত্তে আগত স্বর্গ এবং হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারমাত্র। রাজসরকার হইতে অর্থের, চাকুরীর, সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির লোভের সহিত মিলিত হইল পরীর প্রলোভন। "সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে, কে রাখে এ মৃগযূথে?" বহুকালের অত্যাচারে নিপীড়িত, দরিদ্র, রাজশক্তি-হীন হিন্দুকে রক্ষা করিবার জন্য কোন মানবীয় শক্তি ছিল না। যাঁহার "মেঘনাদবধ" কাব্য হইতে উক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রতিভাশালী মধুসূদন দত্তও ঐ প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া খৃষ্টান হইয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বহু হিন্দু উক্তরূপ অবস্থায় খৃষ্টান হইয়াছিল এবং তাঁহার আবির্ভাবকালেও হইতেছিল। তাহারা খৃষ্টান হইতেছিল, অর্থাৎ তাহারা ইংরাজের ন্যায় খৃষ্টান জাতি হইতেছিল, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল না। ভারতে ধর্ম্মের অভাব ছিল না, ভারতবাসীর অভাব ছিল রাজশক্তির, অন্নবস্ত্রের এবং আরাম-বিলাসের। রাজপদলাভের দ্বারা রাজশক্তির অভাব এবং অর্থ-লাভের দ্বারা অন্নবস্ত্রের এবং আরাম-বিলাসের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ভারত-বাসীগণ খৃষ্টান জাতি হইতেছিল। এইরূপ খৃষ্টানগণ যে বস্তুতঃ ধর্ম্মহীন, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার ভারতের হিন্দুও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিল। বিদেশীয় এবং বিধর্ম্মী রাজশাসনের এবং শিক্ষাবিস্তারের ফলে হিন্দুগণ শাস্ত্রে বিশ্বাস এবং সদাচার ত্যাগ করিয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ ধর্ম্মসাধনা ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে জীবন যাপন করিত, এবং অশিক্ষিত সমাজ চড়ক, গাজন, ভাসান, ঝাঁপান, বিষহরি বা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত এবং দেবীপূজার নামে ছাগবলি করিয়া ভাবিত, ইহাই ধর্ম্ম। অতি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি গোপনে যুগধর্ম্মের সাধনা

করিতেন, কারণ প্রকাশ্যে করিলে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মদ্বেষী দেশবাসীগণের বিদ্রূপ এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। ধর্ম্মের এই দুরবস্থার সময়ে যুগধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা যে অতীব প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। যুগধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা মানবশক্তির অতীত। এইজন্য সদ্‌গুরু-অবতারের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল।

৯।১০।৩ অবতারত্বের প্রমাণ

অবতারের তালিকা ক্রমশঃই স্ফীত হইতেছে দেখিয়া জনসাধারণ, বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত সমাজ, অবতারত্বের দাবী মানিয়া লইতে বড়ই অনিচ্ছুক। বস্তুতঃ, কাহাকেও অবতার বলিয়া ঘোষণা করা হইলেই তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিতও নহে। প্রথমেই জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে, যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ অবতার নহেন, তাঁহারাও মানব। দ্বিতীয়তঃ, যিনি সত্যই অবতার, তিনি কখনও সর্ব্বসাধারণের নিকট আপনাকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন না, বরং সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি স্বীয় অবতারত্ব গোপন করিবারই চেষ্টা করেন। সুতরাং, অবতারত্ব যদি শাস্ত্রপ্রমাণসম্মত, সুযুক্তিসিদ্ধ, এবং যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ ও বিশ্বাসী ভক্তগণ কর্ত্তৃক উপলব্ধীকৃত হয়, তবেই অবতারত্ব স্বীকৃত হইতে পারে। শাস্ত্র অবতারত্ব জ্ঞাত হইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন :

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্ব্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥ ভাগবত ১০।১০।৩৪

—"শরীরীগণের মধ্যে, অর্থাৎ প্রাকৃত জড় দেহবিশিষ্ট জীবগণের মধ্যে, অশরীরীর, অর্থাৎ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবানের, অবতারকে জ্ঞাত হওয়া যায়, শরীরীগণের পক্ষে অসম্ভব, অতুলনীয়, এবং অপরিমেয় শক্তির কার্য্যাবলীর দ্বারা।" শাস্ত্রের এই নির্দ্দেশ অনুসারে, কাহাকেও অবতার বলিয়া প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে, তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, আকৃতি, প্রকৃতি সমস্তই মানবাতীত। বিজয়কৃষ্ণের জন্ম, কর্ম্ম আকৃতি এবং প্রকৃতি মানবাতীত তাহা আমরা দেখাইতেছি। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ, বিশ্বাসী ভক্তগণ, এবং জনসাধারণের মধ্যেও অনেকে তাঁহার অবতারত্ব উপলব্ধি করিয়া যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাও আমরা বিবৃত করিতেছি।

৯।১০।৪ শ্রীবিজয়কৃষ্ণের অসাধারণ জন্ম

গোস্বামীপ্রভুর জন্মগ্রহণ অবতারের জন্মগ্রহণের ন্যায় অলৌকিক, তাহা তাঁহার জীবনী হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আনন্দকিশোর গোস্বামী এবং স্বর্ণময়ীদেবীর পুত্ররূপে গোস্বামীপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আনন্দকিশোর পরম প্রেমিক সাধক ছিলেন। কৃষ্ণের আরাধনাই তাঁহার কার্য্য ছিল। স্বর্ণময়ীও উদার এবং বিষয়াসক্তিহীনা ছিলেন। আনন্দকিশোর প্রৌঢ় বয়সে শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্য পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ধ্যাননিবিষ্ট মনে দেহের বোধ ছিল না। তিনি পুরীধামে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া যখন তাঁহাকে দর্শন করিতেছিলেন, তখন তিনি অনুভব করিলেন যে, শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহ হইতে একটী দিব্য তেজ নির্গত হইয়া তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়িলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষ্ণ, জগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একই তত্ত্ব এবং অভিন্ন। আনন্দকিশোর শান্তিপুরে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর আনন্দের সহিত স্বর্ণময়ীকে এই ঘটনা বলিলেন এবং অনুভব করিলেন, সেই দিব্য তেজ তাঁহার মধ্য হইতে স্বর্ণময়ীর অন্তরে সঞ্চারিত হইল। যুগাবতারের পূর্ণাবেশ হইবার যোগ্য দেহ উৎপন্ন করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথ তাঁহাদিগকে ঐরূপে দিব্যশক্তি দান করিয়াছিলেন। ইহার পরেই স্বর্ণময়ীর গর্ভ হইল। যতদিন তাঁহার গর্ভ ছিল, ততদিন তিনি অলৌকিক দর্শন এবং অনুভূতি লাভ করিতেন। কখনও তিনি সূর্য্যকিরণে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিতেন; কখনও গৃহে নূপুরবাদ্য শ্রবণ করিতেন, কখনও দিব্য গন্ধ পাইতেন, কখনও বা দিব্য জ্যোতি দর্শন করিতেন। প্রসবের পূর্ব্বে স্বর্ণময়ী শিকারপুর গ্রামে পিতা বেণীমাধব জোয়ার্দ্দারের গৃহে গমন করিয়াছিলেন। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, একদিন আদালতের পিয়াদাগণ আসিয়া বেণীমাধবের গৃহ অবরোধ করিল। তাঁহার এক বন্ধু ঋণগ্রস্থ হইয়াছিলেন। সেই বন্ধুকে কারাবাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার জামিন হইয়াছিলেন। সেই বন্ধুর ডিক্রিদার তাহার নিকট প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে না পারিয়া জামিন বেণীমাধবের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং নীলামের দ্বারা টাকা আদায় করিবার জন্য আদালত হইতে পিয়াদা আনিয়া তাঁহার গৃহ অবরোধ করাইয়াছিলেন। স্বর্ণময়ী ভীত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গৃহের

পশ্চাৎদিকের একটী কচুবনে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি একটী পিটুলীবৃক্ষের তলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন তিনি জ্ঞান লাভ করিলেন, তখন দেখিলেন যে, একটী সুন্দর শিশু তাঁহার গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছে, শিশুর নাড়ীচ্ছেদও হইয়াছে, এবং নিকটেই ফুল (=গর্ভপুষ্প= Placenta) পতিত রহিয়াছে। ইত্যবসরে বেণীমাধব ডিক্রীদারের প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দিলে পিয়াদাগণ চলিয়া গেল। তৎপরে তিনি এবং প্রতিবেশীগণ স্বর্ণময়ীর অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে তিনি কচুবনের মধ্যে পিটুলীবৃক্ষের তলে নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্টা রহিয়াছেন। তাঁহারাও দেখিলেন যে নিকটেই গর্ভপুষ্প পড়িয়া রহিয়াছে। কে শিশুর নাড়ীচ্ছেদ করিয়াছিল, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু শিশু নাড়ী (গর্ভপুষ্প) হইতে বিযুক্ত হইয়াই মাতৃক্রোড়ে ছিল। এই যে শিশুদেহ জাত হইল, এই দেহটী সাধারণ শিশুর দেহের মত নহে। অসাধারণ দেহ জন্ম দিতে পারিবেন বলিয়াই শ্রীজগন্নাথ মাতাপিতাকে দিব্যশক্তিতে শক্তিমান করিয়াছিলেন। এই শিশুদেহটী যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন তাহা সেই দিব্যশক্তির দ্বারাই রক্ষিত হইতেছিল; তখন উহার মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হয়েন নাই। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের আত্মা ঐশী কার্য্য সাধনের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহাকে গর্ভবাস করিতে হয় না। স্বর্ণময়ীর গর্ভ হইতে শিশুদেহ জাত হইবার পর, রামগয়ার জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের মুক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা পূর্ণরূপে আবিষ্ট হইয়া নবজাত শিশুদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাই বিজয়কৃষ্ণের অলৌকিক জন্ম।

৯।১০।৫ শ্রীবিজয়কৃষ্ণের আশৈশব প্রেমবিকাশ

বিজয়কৃষ্ণের জীবনে শৈশব হইতেই প্রেমবিকাশ, কৃষ্ণপ্রাপ্তি এবং কৃষ্ণের সহিত সংযোগলীলা দেখিতে পাওয়া যায়। অতি শৈশব হইতেই বিজয়কৃষ্ণ সন্ন্যাসজীবনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শিশু বিজয়কৃষ্ণ কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া সন্ন্যাসিমূর্ত্তিতে থাকিতে ভালবাসতেন। একদিন গৃহের পশ্চাদ্দিকে বিল্ববৃক্ষের তলে বালাযোগীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিশু বিজয়কৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। মাতা স্বর্ণময়ী অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে তথায় তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন। বহুক্ষণ পরে

তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন মাতা তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন।

আনন্দকিশোরের গৃহে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার নিত্য সেবাপূজা হইত। বিজয়কৃষ্ণ যখন চলিতে ফিরিতে এবং খেলা করিয়া বেড়াইতে পারিলেন, তখন হইতেই দেখা যাইত যে তিনি শ্যামসুন্দরের সহিত কথা কহিতেছেন। একদিন দেখা গেল, তিনি শ্যামসুন্দরের মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং বলিতেছেন, "তুমি খেলার নিয়ম জান না। খেল্‌তে খেল্‌তে কেন তুমি আমার ভাটা চুরি ক'রে পালিয়ে এলে? তুমি ভাটা চোর! তুমি যদি আমার ভাটা ফেরৎ না দাও, তবে কাল আবার যখন আমার সঙ্গে খেল্‌তে আস্‌বে, আমি এর প্রতিশোধ নেবো।" শিশু বিজয় সেদিন শ্যামসুন্দরের উপর রাগ করিয়া রাত্রে মাতার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুই না খাইয়া শুইয়া পড়িলেন। মাতা শয়নগৃহে বিজয়ের আহার্য্য রাখিয়া পার্শ্বে শয়ন করিলেন। গভীর রাত্রে মাতা স্বর্ণময়ী দেখিলেন, বিজয় শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "আজ আমার কাছে ঘাট মেনে তুমি পরাণে বাঁচ্‌লে, তা না হ'লে তোমায় মজা দেখাতাম।" তাহার পর বিজয় আবার বলিলেন, "আমি খাই নাই বলে তুমিও খাও নাই। তুমি খাও নাই কেন? এস, আমরা দুজনে একসঙ্গে খাই। তুমি মনে আর কোন দুঃখ রেখো না।" ভোজনান্তে বিজয় মুখ ধুইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন।

অন্য একদিন মাতা স্বর্ণময়ী দেখিলেন, বালক বিজয় মন্দিরের মধ্যে বসিয়া, শ্যামসুন্দরের বিগ্রহকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুকের দ্বারা তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইতেছেন। তখনও বালকের স্পষ্ট বাক্যোচ্চারণ হয় নাই। তিনি বলিতে-ছেন, "শ্যামসুন্, টু খাও, টু খাও", এবং ঝিনুকে করিয়া বিগ্রহের মুখে দুগ্ধ দিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিগ্রহ সেই দুগ্ধ পান করিতেছেন! বিস্মিতা জননী অন্যান্য ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া আনিয়া সেই দৃশ্য দেখাইলেন। বালক বিজয় তাঁহাদের উপস্থিতি বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া শ্যামসুন্দরকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের শৈশব এবং বাল্য জীবনে এইরূপ বহু ঘটনা আছে; কোন কোন মহাপুরুষের জীবনীতে দেখা যায় যে বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের সংসারে অনাসক্তি এবং ধর্ম্মলাভের পিপাসা আছে। কিন্তু শৈশব এবং বাল্য

হইতে প্রেমবিকাশ এবং কৃষ্ণের সহিত লীলাবিলাস মানবজীবনে হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানবাত্মায় নিত্যসিদ্ধ প্রেম আছে, কিন্তু সাধন-ভজনের দ্বারা মানব মায়ামুক্ত হইলে তাহার প্রেমের বিকাশ এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। আমরা দেখিতেছি যে, বিজয়কৃষ্ণের জীবনে বিনা সাধনভজনেই আশৈশব প্রেমের বিকাশ এবং নিত্য কৃষ্ণপ্রাপ্তি রহিয়াছে। ইহা মানবজীবনে সম্ভব নহে, অবতারের জীবনেই সম্ভব। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে বিজয়কৃষ্ণ পূর্ণা-বেশ-অবতার। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, রাধার এবং গোপীগণের প্রেম-বিকাশ এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি নিত্য, তথাপি ধর্ম্মস্থাপন করিতে লোকশিক্ষার জন্য তাঁহারা অধ্যাত্মযোগসাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও প্রেমবিকাশ এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি নিত্য; তিনিও ধর্ম্মস্থাপন করিতে লোকশিক্ষার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন। তদ্রূপ, বিজয়কৃষ্ণেরও প্রেমবিকাশ এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি নিত্য, তথাপি, যুগধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি অধ্যাত্মযোগসাধনা করিয়াছিলেন। রাধাভাবে ভাবিত কৃষ্ণচৈতন্য এবং বিজয়-কৃষ্ণ একই বস্তু, তাহা ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে। বিজয়কৃষ্ণের পরবর্ত্তী-জীবনের ঘটনাবলী হইতে এই তত্ত্ব আরও সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

৯।১০।৬ শ্রীবিজয়কৃষ্ণের পৌগণ্ড এবং কৈশোরের প্রেম

বিজয়কৃষ্ণের নিত্য প্রেমবিকাশ এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি দেখাইবার জন্য তাঁহার পৌগণ্ড এবং কৈশোর বয়সের দু'একটী ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইতেছে। শান্তিপুরের অপর দিকে গঙ্গাতীরে গুপ্তিপাড়া নামক গ্রামে একটী মন্দিরে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রনামে কৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিজয় মধ্যে মধ্যে সেই বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইতেন। কৃষ্ণবিগ্রহ দেখিতে দেখিতে তাঁহার সমগ্র শরীরে প্রবল কম্পন উপস্থিত হইত এবং তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূপতিত হইতেন। তাঁহার কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইবার পর তিনি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেন।

শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে লছমন দাস নামক একজন সাধু থাকিতেন। বালক বিজয় প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতেন এবং তাঁহার ভজনগান শুনিতে শুনিতে তিনি প্রেমাশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। কখনও কখনও বিজয়কৃষ্ণকে তদবস্থাতেই বহন করিয়া গৃহে আনিতে হইত।

শান্তিপুরের গঙ্গাতীরের অন্য স্থানে উড়িষ্যাবাসী অন্য একটী সাধু বাস করিতেন। বালক বিজয় তাঁহার নিকটও প্রায় যাইতেন। দোললীলার দিনে বিজয় তাঁহার আশ্রমে গমন করেন। তখন সাধু এই গানটী গাহিতেছিলেন:

"আজ হোলি খেল্‌বো শ্যাম তোমার সনে।
আজ একেলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে ॥......"

এই গান শুনিতে শুনিতে বালক বিজয়ের নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তিনি বাহ্যজ্ঞান-হীন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম শুনাইবার পর তাঁহার বাহ্যচেতনার উদয় হইল।

বিজয়কৃষ্ণের শৈশব বাল্য পৌগণ্ড এবং কৈশোর বয়সে তাঁহার প্রেমবিকাশের এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির পরিচয় আমরা পাইলাম। ইহা মানবাতীত অবস্থা এবং ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের পূর্ণাবেশ-অবতার।

৯।১০।৭ শ্রীবিজয়কৃষ্ণের দ্বারা ধর্ম্মযুদ্ধ এবং ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত : তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে গমনের প্রয়োজন : তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ

স্বীয় নিত্য বিকশিত প্রেমে এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে যদি বিজয়কৃষ্ণ আজীবন বিভোর হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা যুগধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইত না। ধর্ম্মস্থাপনের জন্য যেমন প্রথমেই ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়, ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনের জন্যও তদ্রূপ প্রথমেই ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। তৎপরে স্বয়ং সেই ধর্ম্মের আচরণ এবং প্রচার করিতে হয়। কৈশোর বয়স অতিক্রম করিয়া বিজয়কৃষ্ণ যুগধর্ম্ম পুনঃস্থাপনের জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্ম্মদ্বেষী অসুরগণের বধসাধন করিয়া ধর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কলিযুগের উপযোগী ধর্ম্মযুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় অসীম শক্তিতে কুতার্কিক কুধর্ম্মীগণের কুমত খণ্ডন করিয়া যুগধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও এইরূপেই ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যোচিত বিদ্যাধ্যয়নের কার্য্য সমাপন করিয়া বেদান্তপাঠ আরম্ভ করিলেন। বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য পাঠ করিয়া তিনি শুষ্কজ্ঞানের পন্থা অবলম্বন করিলেন। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম", এই মায়াবাদ

অবলম্বনে ধ্যানধারণা করিয়া তিনি দেখিলেন যে ইহাতে ধর্ম্মলাভ হওয়া ত দূরের কথা, ইহাতে চিত্তশুদ্ধিও হয় না এবং ইহা চিত্তকে শুষ্ক নীরস এবং স্বার্থপর করিয়া দেয়। এইরূপে বিজয়কৃষ্ণ মায়াবাদের অসারত্ব স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিলেন যে মায়াবাদ যুগধর্ম্ম নহে। পরে তিনি আউল বাউল অঘোরী কাপালিক কর্ত্তাভজা প্রভৃতি অন্য অনেক প্রণালীতেও সাধনা করিয়া তাহাদের অসারত্ব স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিলেন যে ইহাদের কোনটীই যুগধর্ম্ম নহে। এইরূপে বিজয়কৃষ্ণ যুগধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্র হইতে মায়াবাদকে এবং অন্য সকল উপধর্ম্মকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে একটী বিশেষ কার্য্য।

ইহার পর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার, এই দুইটী কার্য্য, ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিজয়কৃষ্ণের অন্যতম প্রধান কার্য্য এবং প্রধান ধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভগবান সকল অবতারেই ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কার্য্য করাইবার জন্য যোগ্য ব্যক্তিগণকে জন্মগ্রহণ করাইয়া থাকেন। কৃষ্ণাবতারে এবং চৈতন্যাবতারেও এইরূপ করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ-অবতারেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রলোভনমুগ্ধ এবং শাস্ত্রবিমুখ ভারতবাসীগনকে খৃষ্টানত্ব গ্রহণ করিতে দেখিয়া মহাত্মা রামমোহন রায় তাহার প্রতিরোধ করিতে বেদান্তপ্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ শক্তিশালী ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা খৃষ্টানদের অনুকরণে সাপ্তাহিক উপাসনার নিমিত্ত ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং পুরুষ ও নারী সকলেই ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়া সাপ্তাহিক উপাসনা করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ এখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনের রথে সারথি হইয়া অর্জ্জুনকে স্বীয় শক্তিতে শক্তিমান করিয়া অসুরকুলের ধ্বংসসাধন করতঃ ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম্মযুদ্ধে কেশবচন্দ্র সেনের রথের সারথি হইয়া তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া এবং জ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ও উপদেশের দ্বারা বহু ভারতবাসীকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের প্রচারের ফলেই বহু ভারতবাসী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। যে সকল শিক্ষিত ভারতবাসী খৃষ্টানত্ব গ্রহণ করিত, বিজয়কৃষ্ণ তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম

গ্রহণ করাইয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিলেন। সস্ত্রীক গীর্জ্জায় গিয়া রবিবাসরীয় প্রার্থনা করিবার সখ যাহাদের ছিল, সস্ত্রীক ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়া রবিবাসরীয় প্রার্থনা করিয়া তাহাদের সেই সখ মিটিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের চেষ্টাকে বিজয়কৃষ্ণ ব্যর্থ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকালে বিজয়কৃষ্ণ বেদবেদান্ত গীতা ভাগবত রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ মানবগণকে শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচারের ফলে ভারতবাসী জানিয়াছিল যে ধর্ম্মলাভের জন্য তাহার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা বলিয়াছি যে, কলিযুগের ধর্ম্মযুদ্ধ শস্ত্রযুদ্ধ নহে, শাস্ত্রযুদ্ধ। ভারত হইতে অবৈদিক বৌদ্ধধর্ম্মকে বিতারিত করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য শস্ত্রযুদ্ধ করেন নাই, শাস্ত্রযুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা মায়াবাদ সৃষ্টি এবং প্রচার বৌদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁহার শাস্ত্রযুদ্ধ। বৌদ্ধগণকে সহজে বেদকে গ্রহণ করাইয়া তাহদিগকে আবার বৈদিক হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইবার জন্য তিনি বেদান্তের স্বকল্পিত ব্যাখ্যার দ্বারা মায়াবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইলেও, তাঁহার দ্বারা মায়াবাদ সৃষ্টি এবং প্রচার বৌদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁহার শাস্ত্রযুদ্ধ। মহাদেবের অবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই শাস্ত্রযুদ্ধে জয়ী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন (১০।৪।১২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রযুদ্ধের দ্বারা সমস্ত কুমত খণ্ডন করিয়া যুগধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার তাঁহার শাস্ত্রযুদ্ধ। তিনি দৃঢ়ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র অভ্রান্ত, এবং শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্র পাঠ করিলে শাস্ত্রের অক্ষর-সমূহকে সজীব বলিয়া উপলব্ধি হয়। অতঃপর বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়াই "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥", শাস্ত্রবিহিত এই যুগধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মমন্দিরের মধ্যে এবং বাহিরে মৃদঙ্গবাদ্যসহ হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে কেবল ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই নহে, সকল দেশবাসীগণের মধ্যেই ভক্তিভাবের ধারা আসিল এবং সেই ভাবের আকর্ষণে বহু নরনারী ব্রাহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ গির্জ্জায় ভারতবাসীগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য উপাসনাকালে গির্জ্জায় মৃদঙ্গবাদ্যসহ নামকীর্ত্তন আরম্ভ

করিল। এইরূপে, বিজয়কৃষ্ণের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মমন্দিরে, গির্জ্জায় এবং অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত মৃদঙ্গবাদ্যসহ নামকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কার্য্যের দ্বারা বিজয়কৃষ্ণ দেশবাসীগণকে যুগধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিলেন। তাঁহার শাস্ত্র-যুদ্ধের এখানেই শেষ হয় নাই। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত অধ্যাত্ম-যোগসাধনা হয় না এবং ধর্ম্মলাভও হয় না, এই শাস্ত্রতত্ত্বের জ্ঞান দেশবাসী-গণ হারাইয়াছিলেন; ব্রাহ্মগণ গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ব্রাহ্মধর্ম্মে নিষিদ্ধ ছিল। ধর্ম্মলাভের জন্য শাস্ত্রবিধান অনুসারে সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন, এই তত্ত্ব সকলকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়াই সদ্‌গুরু শ্রীব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পরমহংসজী মানস সরোবরে থাকিতেন; তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ এবং সদ্‌গুরু। দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ অধ্যাত্ম-যোগসাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাও তাঁহার শাস্ত্রযুদ্ধ। প্রেমবিকাশ এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য যোগসাধনার প্রয়োজন। এই দুইটী বস্তু বিজয়কৃষ্ণের শৈশবকাল হইতেই আছে, তাহা আমরা পাইয়াছি। সুতরাং, ইহার জন্য তাঁহার যোগসাধনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু, ব্রজলীলায় নিত্যসিদ্ধা গোপী-গণের ন্যায় এবং যুগাবতারলীলায় মহাপ্রভুর ন্যায় বিজয়কৃষ্ণও লোকশিক্ষার জন্য যোগসাধনা করিয়াছিলেন। কিরূপে গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া যোগসাধনা করিতে হয়, তাহা নিজ আচরণের দ্বারা মানবকে শিক্ষা দিয়াছেন। যোগসাধনায় তাঁহার নিষ্ঠা এবং প্রচেষ্টা সাধকজীবনের আদর্শ। অতঃপর তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণ তাঁহার শাস্ত্রযুদ্ধের অন্য এক পর্য্যায়। ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মগণের সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। তিনি এই নাম ব্যবহার করিতেন না, গৃহস্থাশ্রমের বিজয়কৃষ্ণ নামই ব্যবহার করিতেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের নিজস্ব প্রয়োজন ছিল না, যুগধর্ম্মস্থাপনের জন্য তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজয়কৃষ্ণও যুগধর্ম্মের পুনঃস্থাপনের জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন,নিজ প্রয়োজনে নহে। তাঁহার সিদ্ধিলাভ লৌকিক লীলায় লোকচক্ষে লৌকিক আচরণ; সকল সিদ্ধিই তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান, তাঁহার

সিদ্ধিলাভ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না ; তথাপি তিনি এখন স্বীয় জীবনে সিদ্ধিলাভের অবস্থা প্রকাশ করিলেন। এখন তাঁহার অলৌকিক প্রেমবিকাশ এবং কৃষ্ণের সহিত লীলাবিলাসের পরিচয় পাইয়া বহু নার-নারী তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিতে লাগিল ; তিনি তাঁহাদিগকে যোগসাধনায় দীক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মমন্দিরের বেদীতে আচার্য্যরূপে যখন তিনি প্রেমবিগলিত অবস্থায় ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তখন মন্দিরে অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইত, নরনারীগণ ভাবাবেগে অশ্রুবর্ষণ করিত। কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহার উদ্দেশ্য এবং ভাব বুঝিতে পারিল না। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, এই আপত্তি তুলিয়া তাহারা তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। তিনি কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ-ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া লইল। তিনি ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজে কিছুদিন থাকিবার পর সেখানেরও কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়মের বিরুদ্ধ কার্য্যাবলীর প্রতিবাদ করিতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণ চিরকালের জন্য ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তাঁহার সেই কার্য্য সম্পন্ন হইলেই তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে বিজয়কৃষ্ণের কার্য্য, ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ, অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধ। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ ভারতবাসীর খৃষ্টানত্বগ্রহণে বাধা দিয়া, ভারতবাসীকে শাস্ত্র এবং সদাচারের প্রতি আকৃষ্ট এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া, কৃষ্ণের নাম সাধনাই সনাতন সাধনপন্থা, এবং সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সেই সনাতন সাধনপন্থায় সাধনা করিলে মুক্তি প্রেমবিকাশ এবং ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়, ইহা মানবকে শিক্ষা দিয়া এবং ইহাতে স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা মানবের বিশ্বাস জন্মাইয়া, এবং স্বীয় অলৌকিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা মানবকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া, যে কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্মযুদ্ধে বিজয়লাভ এবং যুগধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ধর্ম্মক্ষেত্রগঠন। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ না করিলে এই কার্য্য পৈত্রিকগৃহে বা তপোবনে থাকিয়া সম্পন্ন হইত না। কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পাণ্ডবপক্ষীয়গণের জন্য যুদ্ধ করেন নাই ; যদি তাহা করিতেন তবে যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয়গণের মৃত্যু হইত না ; তাঁহার প্রতি প্রীতি-পরায়ণ মাত্র কয়েকজন পাণ্ডব ব্যতীত সকল পাণ্ডবপক্ষীয়গণও যুদ্ধে নিহত হওয়ায়, যুদ্ধাবসানে কৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন, তখন কুরুক্ষেত্র মৃতের

স্থান ; কিন্তু ধর্ম্ম জয়ী হইল, ধর্ম্মক্ষেত্র গঠিত হইল, এবং গীতাবাণী জগতে প্রচারিত হইল। তদ্রূপ, বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের জন্য যুদ্ধ করেন নাই। যুদ্ধাবসানে তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজও ধর্ম্ম-প্রাণ-শূন্য মৃতের স্থান হইল ; ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাঁহারা বিজয়কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ ছিলেন, কেবল তাঁহারাই ধর্ম্মজীবনে জীবিত রহিলেন। ব্রাহ্মসমাজ মৃত হইল, কিন্তু ধর্ম্ম জয়ী হইল, ধর্ম্মক্ষেত্র গঠিত হইল, এবং বিজয়কৃষ্ণের বাণী জগতে প্রচারিত হইল। যেমন আজিও মৃত কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণের গীতাবাণী-প্রচারের এবং ধর্ম্মক্ষেত্র-গঠনের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র, তদ্রূপ আজিও মৃত ব্রাহ্মসমাজ বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মবাণীপ্রচারের এবং ধর্ম্মক্ষেত্রগঠনের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম, অর্থাৎ যে ব্রহ্মের উপাসনার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ ; এই সময়ে তাঁহার বক্তৃতা, উপদেশ এবং উক্তি সমূহ হইতে, তাঁহার ভক্তিযোগের উপাসনা হইতে, এবং ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিবার সময় তিনি সমাজের সভ্যগণকে যে পদত্যাগ পত্র দিয়াছিলেন এবং বন্ধুগণকে যে বিদায়পত্র লিখিয়াছিলেন সেই দুইটী পত্র হইতে নিঃসংশয়ভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মসমাজকে অবলম্বন করিয়া যে ব্রহ্মের উপাসনার ধর্ম্ম তিনি আচরণ এবং প্রচার করিয়াছিলেন, কৃষ্ণই সেই ব্রহ্ম। উক্ত দুইটী পত্রেই তিনি বলিয়াছেন যে রাধাকৃষ্ণভাব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং রাধাকৃষ্ণভাব ব্যতীত ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। আমরা পাইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণই ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণই ধর্ম্ম। যে বিজয়কৃষ্ণ অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর এবং আনন্দকিশোরের পুত্র, যে বিজয়কৃষ্ণের শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে, ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে, এবং ব্রাহ্মসমাজত্যাগের পরে কৃষ্ণপ্রেমের নিত্য বিকাশ এবং নিত্য কৃষ্ণপ্রাপ্তি, শাস্ত্র-সদাচার-ধর্ম্ম পুনস্থাপিত করিবার সংগ্রামের সারথি সেই বিজয়কৃষ্ণের ব্রহ্ম যে স্বয়ং কৃষ্ণ, তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনের ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত হয়। সুতরাং, ব্রাহ্মসমাজ অবলম্বন করিয়া বিজয়কৃষ্ণ যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা যুগধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন, কৃষ্ণই সেই ধর্ম্ম। বিজয়কৃষ্ণের এই ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ এবং ধর্ম্মক্ষেত্র গঠন লোকাতীত শক্তির কার্য্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ এবং ধর্ম্মক্ষেত্রগঠনও যেমন লোকাতীত শক্তির কার্য্য এবং কৃষ্ণ ভগবান বলিয়াই উক্ত লোকাতীত

কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন, বিজয়কৃষ্ণও ভগবান বলিয়াই উক্ত লোকাতীত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। প্রবল শক্তিশালী ইংরাজ-রাজের সাহায্যপুষ্ট খৃষ্টান প্রচারকগণের প্রভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তিগণের প্রভাব, উপধর্ম্মযাজীগণের প্রভাব, কুতার্কিকগণের প্রভাব, কলিযুগের প্রভাব—এতগুলি প্রবলশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ যুগধর্ম্ম পুনঃস্থাপনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্যই লোকাতীত শক্তির কার্য্য। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বিজয়কৃষ্ণ সদ্‌গুরু-অবতার।

৯।১০।৮ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুগধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বিজয়কৃষ্ণ এখন যুগধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কেবল তত্ত্বপ্রচারের দ্বারা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা হয় না, মানবকে ধর্ম্ম লাভ করাইয়া ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করা যায়। নরনারীগণকে যুগধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়া পরাধর্ম্ম লাভ করাইবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ এক্ষণে সদগুরুর কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি সদ্‌গুরু রূপে অধ্যাত্মযোগ সাধনায় দীক্ষাদানের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন প্রচারকার্য্যও করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার প্রচারকার্য্য শেষ হইয়াছিল, এখন তিনি সদ্‌গুরু রূপে দীক্ষাদানের কার্য্য করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে যে সকল নরনারীকে তিনি ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই এখন ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সমগ্র ভারতের নানাস্থানের বহু নর-নারী তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে অধ্যাত্মযোগসাধনায় দীক্ষা দিলেন, কৃষ্ণনামের সাধনাই তাহার মূল অঙ্গ। এই নামসাধনায় বহিরঙ্গ নামসাধনা এবং অন্তরঙ্গ নামসাধনা, দ্বিবিধ নাম সাধনাই আছে। নামসাধনা সনাতন সাধনপন্থা এবং নামসাধনাই কলিযুগের যুগধর্ম্ম, ইহা দৃঢ়ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নামব্রহ্মের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নাম-ব্রহ্মের পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" এই শ্লোকটী তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নামব্রহ্মের বিগ্রহ। মহাপ্রভু এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা এবং মৌখিক প্রচারের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন যে নামসাধনাই কলিযুগের যুগধর্ম্ম। বিজয়কৃষ্ণ এই শ্লোকের

কেবল মৌখিক প্রচার এবং ব্যাখ্যার দ্বারাই শিক্ষা দিলেন না ; তিনি উহাকেই নামব্রহ্ম রূপে স্থাপিত করিয়া এবং উহার পূজা প্রবর্ত্তন করিয়া অধিকতর দৃঢ়তার সহিত যুগধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। ইহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের বহু গৃহে নামব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত রহিয়াছে। বহিরঙ্গ নামসাধনা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি শিষ্য এবং ভক্তগণের সহিত একত্রে উচ্চ নামকীর্ত্তন করিতেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের ন্যায় বিজয়কৃষ্ণের কীর্ত্তনও অলৌকিক ব্যাপার। কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চারিত করিতেন যে সকলেই নামানন্দে বিভোর হইয়া পরমোৎসাহে কীর্ত্তনে যোগদান করিত এবং ইহার পর তাহারা নামকীর্ত্তনকে তাহাদের ধর্ম্মাচরণ-রূপে গ্রহণ করিত। কেবল বঙ্গদেশেই নহে, বঙ্গের বাহিরে ভারতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান স্থানে তিনি এইরূপ শক্তিসঞ্চারণকারী নামকীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর দ্বারা প্রবর্ত্তিত বহিরঙ্গ নামসাধনার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেবল বহিরঙ্গ নামসাধনার দ্বারাই ধর্ম্মলাভ করা যায় না ; অন্তরঙ্গ নামসাধনা নামসাধনার মুখ্য অঙ্গ। বিজয়কৃষ্ণ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে এই অন্তরঙ্গ নামসাধনায় দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। এই সাধনার সূক্ষ্ম তত্ত্ব যথাযথভাবে বুঝিতে হইলে অগ্রে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং মানবতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য, অন্তরঙ্গ নামসাধনার তত্ত্ব আমরা এখানে বিবৃত না করিয়া, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পরে বিবৃত করিব। এখানে কেবল ইহাই উল্লেখ করা হইতেছে যে, শ্বাস-প্রশ্বাসে সদ্‌গুরু-প্রদত্ত শক্তিশালী কৃষ্ণনামের অজপাসাধনাই অন্তরঙ্গ নামসাধনা। সদ্‌গুরু-প্রদত্ত কৃষ্ণনাম বলিতে কেবল "কৃষ্ণ", এই নামই বুঝায় না। কৃষ্ণ তাঁহার অনেক নাম প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল নামের মধ্যে যেটী যে মানবের প্রকৃতির উপযোগী, বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে সেই নামটী শক্তিসমন্বিত করিয়া প্রদান করিতেন। তাঁহার দীক্ষাদান একটী অলৌকিক ব্যাপার। তাঁহার নিকট হইতে নাম প্রাপ্ত হইবামাত্র দীক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ হইতেন, কেহ কেহ আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেন, কেহ কেহ উচ্চ হাস্য করিতেন, কেহ কেহ ভূমিতে লুটাইয়া গড়াগড়ি দিতেন। তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তির পর হইতেই দীক্ষিত ব্যক্তির জীবনের ধারা সুপরিবর্ত্তিত হইয়া জীবনটী একটানা ধর্ম্মস্রোতে পরিণত হইত। অনেকেরই অল্পকাল সাধনার পরেই মুক্তাবস্থালাভ, প্রেমবিকাশ, এবং

ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পরে এইরূপে নরনারী-গণকে ধর্ম্মলাভ করাইয়া বিজয়কৃষ্ণ যুগধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা লোকাতীত শক্তির কার্য্য। বিজয়কৃষ্ণের সমসাময়িক কোন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ অথবা অন্য কেহই যুগধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া, মানবকে যুগধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া, যুগধর্ম্মের সাধনা করাইয়া ধর্ম্মলাভ করাইয়া যুগধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, এবং করিতে পারিতেনও না ; কারণ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণও মানব, সদ্‌গুরু-অবতার নহেন। ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সদ্‌গুরু-অবতারের দ্বারাই হইতে পারে এবং হয়। বিজয়কৃষ্ণ যুগধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবেশাবতার এবং সদ্‌গুরু-অবতার।

৯।১০।৯ শ্রীবিজয়কৃষ্ণের রাধাভাব বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভাব

বিজয়কৃষ্ণের প্রেম, মধুর ভাব, মধুর ভাবের বিবিধ প্রকাশ, সুদ্দীপ্ত ভাব, এবং ভাবালঙ্কার কোন মানবে দৃষ্ট হয় না। ইহা তাঁহার রাধাভাব বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যভাব। তাঁহার জীবনীতে দেখা যায়, তিনি যে কেবল সমাধিতেই কৃষ্ণের নিত্যলীলা সম্ভোগ করিতেন, তাহা নহে। শয়নে, ভ্রমণে, আহারে, সকল সময়েই কৃষ্ণ তাঁহার সহিত লীলা করিতেন। তিনি কখনও প্রেমে বিহ্বল হইয়া বাহ্যজ্ঞানহীন হইতেন, কখনও হাস্য কখনও বা রোদন করিতেন। কখনও কখনও তাঁহার রোমকূপ হইতে রক্তোদ্গম হইত। মহাপ্রভুর অঙ্গে যেমন ভাবালঙ্কার দৃষ্ট হইত, বিজয়কৃষ্ণের অঙ্গেও তদ্রূপ দেখা যাইত। কখনও বিজয়কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ সিমূলবৃক্ষের ন্যায় কণ্টকিত হইত ; কখনও বা তিনি কম্পিত হইতে থাকিতেন ; কখনও তাঁহার অঙ্গ স্ফীত হইত কখনও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইত। কখনও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এককালে নৃত্য করিত, কখনও বা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নৃত্য করিত। কখনও কখনও প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় নৃত্যকালে তাঁহার দীর্ঘ, স্থূল, এবং গুরুভার জটাগুলি মস্তকের উপরে ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিত। যাহার কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ হইয়াছে, এমন মানবের দেহেও অশ্রু-কম্প-পুলক দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের অঙ্গে যেরূপ ভাবালঙ্কার হইত, তাহা কেবল রাধার এবং রাধাভাবে ভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গেই দৃষ্ট হইত। বিজয়কৃষ্ণের প্রেম এবং প্রেমানন্দসম্ভোগ রাধার এবং রাধাভাবে ভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেম এবং প্রেমানন্দসম্ভোগের সহিতই তুলনীয়।

রাধার প্রেমের এমনই মহাশক্তিশালী সংক্রমণশীলতা ছিল যে উদ্ধবের ন্যায় শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সংস্পর্শে আসিয়া পাষণ্ডগণও ভক্তিলাভ করিত। বিজয়কৃষ্ণের প্রেমের মহাশক্তিশালী সংক্রমণশীলতা কেবল রাধার এবং রাধাভাবে ভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমের সংক্রমণশীলতার সহিত তুলনীয় হইতে পারে। পাষণ্ডগণও বিজয়কৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তি লাভ করিয়াছে। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে বিজয়কৃষ্ণ রাধাভাবে ভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা পূর্ণরূপে আবিষ্ট সদ্‌গুরু-অবতার।

৯।১০।১০ শ্রীবিজয়কৃষ্ণের অনন্ত বিজ্ঞান

বিজয়কৃষ্ণ অনন্ত বিজ্ঞানেরও মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বিজ্ঞান দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ছিল না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, ত্রিকালের সকল ব্যাপারই তাঁহার বিজ্ঞাত ছিল। স্থানের ব্যবধানের দ্বারা তাঁহার জ্ঞান ব্যাহত হইত না। তিনি স্বীয় আসনে বসিয়াই জগতের সকল স্থানের সকল ব্যাপার জানিতে পারিতেন। কেবল যে এই জগতের সর্ব্বস্থানের ব্যাপারই তিনি জানিতে পারিতেন, তাহা নহে। পরব্যোমস্থিত বৈকুণ্ঠের এবং গোলোকের সংবাদও তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইত। শাস্ত্রোক্ত সকল তত্ত্বের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন এবং শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রসকল মূর্ত্ত হইয়া তাঁহাকে স্বরূপ দর্শন করাইতেন। যিনি স্বয়ং ভগবান এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্", এইরূপ অনন্ত বিজ্ঞান কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। বিজয়কৃষ্ণের এই অনন্ত বিজ্ঞানও তাঁহার সদ্‌গুরু-অবতারত্বের প্রমাণ।

৯।১০।১১ শ্রীবিজয়কৃষ্ণের ঐশী সাম্যভাব

বিজয়কৃষ্ণের সাম্যভাবও লোকাতীত। সর্ব্বজীবে তাঁহার সমভাব ছিল। তিনি তাঁহার পুত্রকন্যা-শিষ্যসেবকগণকে বলিতেন যে তাঁহার আশ্রমে তাঁহাদের কোন বিশেষ অধিকার নাই; ইহাতে সকলের সমান অধিকার আছে। তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার সেবার জন্য তাঁহাকে যে অর্থ প্রদান করিতেন তৎসম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, সেই অর্থ তাঁহার নহে; তাহাতে সর্ব্বজীবের সমান অধিকার

আছে। বস্তুতঃ, তিনি প্রার্থীগণকে অন্নবস্ত্রাদি দান করিয়া, এমন কি পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণকেও নিত্য আহার্য্য ও পানীয় দান করিয়া তাঁহার এই সাম্য-ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। অধিক কি, তাঁহার পুরীধামে অবস্থানকালে কয়েকজন প্রতিষ্ঠালিপ্সু ব্যক্তি ঈর্ষাবশতঃ তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য যখন তাঁহাকে বিষপ্রদান করিল, তিনি সকল তথ্য জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সেই বিষ ভোজন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে যাহা চাহিয়াছিল, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়াছিলেন। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিগণ তাঁহার দেহ চাহিল, তিনি তাহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের দত্ত বিষ ভোজন করিয়াছিলেন। এই উদার সাম্যভাব লোকাতীত। ইহাতে দেশগত, জাতিগত, অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের এবং সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। তিনি যে ধর্ম্মমত পোষণ এবং প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার অলৌকিক সাম্যভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; এইজন্য তাঁহার ধর্ম্মমতে লেশমাত্র সাম্প্রদায়িকতা নাই। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মমতকে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। সকল ধর্ম্মমতের নরনারীগণ তাঁহার নিকট ধর্ম্মসাধনায় দীক্ষালাভ করিয়াছে, এবং তিনি সকলকেই স্ব স্ব ধর্ম্মমতে থাকিয়া তাঁহার প্রদত্ত যোগসাধনা করিতে বলিতেন। যে সকল খৃষ্টান এবং মুসলমান তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি হিন্দু করেন নাই বা হিন্দু হইতে বলেন নাই; খৃষ্টান এবং মুসলমান থাকিয়াই যোগসাধনা করিতে বলিতেন। কি হিন্দু, কি অহিন্দু, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, সকলকেই তিনি সমচক্ষে দেখিয়া দুর্ল্লভ সাধন দান করিয়াছেন। সকল বিষয়েই তাঁহার এই অলৌকিক সাম্যভাব কেবল পরমেশ্বরের সাম্যভাবের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। গীতা ৯।২৯

—"আমি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, সুতরাং আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই।" বিজয়কৃষ্ণের সাম্যভাব ঠিক এইরূপ। তাঁহার এই ঐশী সাম্যভাবও তাঁহার সদ্গুরু-অবতারত্বের প্রমাণ।

৯।১০।১২ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভগবান

শাস্ত্র ঘোষণা করেন যে একমাত্র কৃষ্ণই মানবকে মুক্তিদান, এবং মানবাত্মার

প্রেমের বিকাশ করিতে পারেন এবং করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহা করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও তাহা করিয়াছেন। যে কার্য্য একমাত্র ভগবানের দ্বারা সাধিত হইতে পারে, বিজয়কৃষ্ণ তাহা করিয়াছেন। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে বিজয়কৃষ্ণ সদ্‌গুরু-অবতার এবং ভগবান।

বিজয়কৃষ্ণের প্রকৃতি এবং প্রকৃতিগত কার্য্যের পরিচয় হইতে আমরা পাইলাম যে তিনি সদ্‌গুরু-অবতার। এক্ষণে তাঁহার আকৃতির কয়েকটী অলৌকিক বৈশিষ্টের উল্লেখ করিয়া আমরা দেখাইতেছি যে তিনি সদ্‌গুরু-অবতার।

৯।১০।১৩ শ্রীবিজয়কৃষ্ণের লোকাতীত আকৃতি

শাস্ত্রে সদ্‌গুরু-অবতারের মূর্ত্তির এইরূপ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে ঃ

জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদর শরীরিণে।
কমণ্ডলু নিসঙ্গায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥ মহাভারত

বিজয়কৃষ্ণের মূর্ত্তি এই শাস্ত্রোক্ত সদ্‌গুরু-অবতার-মূর্ত্তি। বহু লোকে তাঁহার ফটোমূর্ত্তি দেখিয়া তাহা শিবমূর্ত্তির অঙ্কিত চিত্র বলিয়া মনে করিয়াছে এবং এখনও করে। তাঁহার শরীরের মধ্য হইতে বংশীধ্বনির ন্যায় একটী অতি মধুর ধ্বনি নির্গত হইত; ইহা অনেকেই শুনিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের উপর, পরিহিত বস্ত্রের উপর, এবং তিনি যে আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন তাহার উপরেও রাধাকৃষ্ণের এবং দেবদেবীগণের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিত, এবং মহাভারত পাঠকালে মহাভারতের যে ঘটনা পঠিত হইত তাহার চিত্রও ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার অঙ্গ হইতে মধুক্ষরণ হইত; এমন কি, গেণ্ডারিয়া আশ্রমে যে বৃক্ষতলে তিনি উপবিষ্ট থাকিতেন, সেই বৃক্ষ হইতেও মধুক্ষরণ হইত। বিজয়কৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গে বেদান্তের "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে" মন্ত্রের স্বরূপটী প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তিটীকে কেহ কেহ কৃষ্ণমূর্ত্তি রূপে, কেহ কেহ গৌরাঙ্গ রূপে, এবং কেহ কেহ শিবমূর্ত্তি রূপে দেখিয়াছিলেন। জীবনের শেষ একাদশ বর্ষকাল তিনি শয়ন এবং নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্নানাহারাদি প্রয়োজনের জন্য তিনি আসন হইতে উত্থিত হইতেন; এতদ্ব্যতীত সমস্ত দিবা-রজনী তিনি আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন; শাস্ত্রপাঠ, ধর্ম্মোপদেশদান, এবং নামকীর্ত্তন করিবার সময়ে ব্যতীত অন্য সকল সময়ে তিনি আসনে সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। এই সকল আকৃতিগত বৈশিষ্ট কোন মানবদেহে থাকিতে

পারে না এবং লক্ষিতও হয় না। এইগুলি লোকাতীত বৈশিষ্ট। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে বিজয়কৃষ্ণ সদ্‌গুরু-অবতার।

৯।১০।১৪ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং সমসাময়িক সিদ্ধযোগীগণের সাক্ষ্য

সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, এবং বিজয়কৃষ্ণের সমসাময়িক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ তাঁহার অবতারত্ব বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত শ্রীধর ঘোষ নামক একজন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিতে উৎসুক হইয়াছি। আপনি সদ্‌গুরু; সেইজন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আমায় দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যদি সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লইতে চাও, তবে বিজয়কৃষ্ণের নিকট যাও। বিজয়কৃষ্ণ এই যুগের সদ্‌গুরু-অবতার।" বারদীর সুপ্রসিদ্ধ লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণকে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা অচল দারুময় অথবা মৃন্ময় গৌরাঙ্গমূর্ত্তির পূজা কর। বিজয়কৃষ্ণ সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, সুমধুর হরিপ্রেমে সকলকে মাতাইয়া কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছে।" বিজয়কৃষ্ণ কুম্ভমেলায় গিয়াছিলেন। মেলায় লক্ষ লক্ষ সাধুর সমাগম হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। কতকগুলি সন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ কথা প্রচার করিতেছিল। এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য মেলায় অবস্থিত যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ সমবেত হইয়া বিজয়কৃষ্ণের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা বলিয়াছিলেন, "গোস্বামীপ্রভুর মত শক্তিমান সাধু সমগ্র মেলার মধ্যে দ্বিতীয় কেহ নাই। ইনি সকল বিধিনিষেধের পরপারে নিত্য অবস্থিত এবং অলৌকিক লীলা করিয়া পৃথিবীকে ধন্য করিতেছেন।" ইহা বলিয়া কাঠিয়াবাবা জানাইলেন যে, বিধিনিষেধের অতীত এবং অলৌকিক লীলার দ্বারা পৃথিবীকে ধন্যকারী বিজয়কৃষ্ণ সদ্‌গুরু-অবতার এবং ভগবান। এখানে আরও একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়কে দীক্ষাদান করিবার জন্য কাঠিয়াবাবা বিজয়কৃষ্ণের সহিত চৌধুরী-

মহাশয়ের গৃহে গমন করিয়াছিলেন। এই চৌধুরী মহাশয় পরে সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীসন্তদাস নামে বিখ্যাত এবং ব্রজবিদেহী মহান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীতে উক্ত ঘটনাটী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রজবিদেহী মহান্ত রূপে শ্রীসন্তদাসজী নামসাধনার ধর্ম্মে বহু নরনারীকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। উক্ত কুম্ভমেলাতেই মহাপুরুষ শ্রীভোলানন্দ গিরিমহারাজ বলিয়াছিলেন, "গোস্বামীপ্রভুকে আমি সাক্ষাৎ আশুতোষ রূপে দেখিয়া থাকি। ইঁহার সমতুল্য মহাত্মা আমি আর কোথাও দেখি নাই।" গিরিমহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে "মেরা আশুতোষ" বলিতেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে স্বীয় ইষ্টদেব আশুতোষকে দেখিতেন বলিয়াই ঐরূপ বলিতেন। মহাত্মা অর্জ্জুনদাস নামক একজন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কুম্ভমেলায় আসিয়াছিলেন। অনেক মহাপুরুষ স্বীয় মহিমা লোকসমাজে গোপন করিবার জন্য জড় বা উন্মত্তবৎ অবস্থান করেন। মহাত্মা অর্জ্জুনদাসও তদ্রূপ করিতেন। কিন্তু তথাপি লোক তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ, কখনও বা ক্ষ্যাপাবাবা বলিয়া ডাকিত। ইনি বলিয়াছিলেন "গোস্বামীপ্রভু মূর্ত্তিমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" তিনি কিরূপে ইহা জানিতে পারিলেন, তাঁহাকে এই প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ধ্যানযোগে জানিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইহার মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন।" অর্জ্জুনদাস বিজয়কৃষ্ণকে ভগবানের ন্যায় ভক্তি এবং পূজা করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ যখন পুরীধামে অবস্থান করিতেন, তথাকার বিখ্যাত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ স্বামী ভূতেশ্বরানন্দ তাঁহাকে অবতার বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে, দীক্ষা এবং সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে, বিজয়কৃষ্ণ নবদ্বীপে গিয়া সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তখন সেই বাবাজী মহাশয় দিব্যদৃষ্টির দ্বারা পরবর্ত্তীকালের বিজয়কৃষ্ণের সদ্‌গুরুমূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাকে আমি এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দেখিতেছি। আপনার শিরে দীর্ঘ জটা, ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা! আপনার একহস্তে দণ্ড, অন্য হস্তে কমণ্ডলু! আপনি "জয় শ্রীশচীনন্দন" বলিয়া এবং হরিধ্বনি করিয়া দুই বাহু তুলিয়া কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন! আপনি শীঘ্রই ঐরূপ মূর্ত্তিতে ঐরূপ কীর্ত্তন করিবেন।" যদিও তখন বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত জুতা, ধৌত বস্ত্র এবং উত্তরীয় পরিহিত ছিলেন, তথাপি বাবাজী মহাশয় দিব্যদৃষ্টিতে তাঁহার নিকট-ভবিষ্যতের সদ্‌গুরুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ যখন

কালনায় ভগবানদাস নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধুর নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনিও তাঁহার মধ্যে ভগবত্তার পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট জল প্রসাদ রূপে পান করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের সমসাময়িক বহু সাধুমহাত্মাগণ তাঁহার অবতারত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সকল যোগসিদ্ধ, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের সাক্ষ্য হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে বিজয়কৃষ্ণ সদ্গুরু-অবতার।

৯।১০।১৫ শ্রীবিজয়কৃষ্ণের ভক্ত শিষ্যগণের সাক্ষ্য

বিজয়কৃষ্ণের ভক্ত শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বিজয়কৃষ্ণ সদ্গুরু-অবতার। ভগবান ভক্তের নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন; এইজন্য ভক্তের সাক্ষ্যকে অবতারত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেই হয়। বাল্মিকী, তুলসীদাস প্রভৃতি রামভক্তগণের সাক্ষ্যের দ্বারা রামের অবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ব্যাস, শুকদেব প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তগণের সাক্ষ্যের দ্বারা কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সেণ্ট্ জন্, সেণ্ট্ পল্ প্রভৃতি খৃষ্টভক্তগণের সাক্ষ্যের দ্বারা খৃষ্টের অবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস, স্বরূপ দামোদর, সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি গৌরাঙ্গভক্তগণের সাক্ষ্যের দ্বারা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই ভক্তের সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, এবং দিতে পারেনও না। সুতরাং, বিজয়কৃষ্ণের ভক্ত শিষ্যগণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা তাঁহার যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও অগ্রাহ্য এবং অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পার্ষদগণের মধ্যে স্বরূপ দামোদরকে তাঁহার দ্বিতীয় কলেবর বলা হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া যে কড়চা লিখিয়াছেন, সেই কড়চার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশজী মহারাজ বিজয়কৃষ্ণের যোগসিদ্ধ শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম। দরবেশজী মহারাজ বিজয়কৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর। "শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত" গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি যে অষ্টবিংশ সূত্রশ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

ধর্ম্মস্য বিপ্লবমিহ প্রশমীক্ষ্য লোকে
সচ্ছাস্ত্র ধর্ম্ম পরিরক্ষণ হেতবেসৌ।
গৌরাঙ্গ এব স পুনঃ স্বয়মাবিরাসীৎ
স পার্ষদো বিজয়কৃষ্ণ ইতি প্রভুঃ সন্॥

সূত্রকর্ত্তা স্বয়ংই এই সূত্রশ্লোকের নিম্নলিখিত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন:

ধর্ম্মের বিপ্লব হেরি সংসার মাঝারে।
সত্য শাস্ত্র সদাচার রক্ষা করিবারে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গে লয়ে অন্তরঙ্গগণ।
শ্রীবিজয়কৃষ্ণরূপে পুন আগমন॥

উক্ত সূত্রকর্ত্তা অন্য একটী সূত্রের পদ্যানুবাদে বলিয়াছেন:

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দুহুঁ এক দুহুঁ এক নহে নহে ভিন্ন॥

শ্রীদরবেশজী মহারাজ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াই উক্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অন্য একটী সূত্রে তিনি বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ, কৃষ্ণচৈতন্য, এবং বিজয়কৃষ্ণ একই তত্ত্ব। সূত্রটীর তাঁহারই কৃত পদ্যানুবাদ:

পূরবে শ্রীকৃষ্ণ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
অন্তে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ তিন লীলা ধন্য॥

শ্রীদরবেশজী মহারাজ "অদ্বৈত অভিশাপ" নামক গ্রন্থে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও এই তত্ত্বেরই প্রমাণ। বিজয়কৃষ্ণের অন্যতম যোগসিদ্ধ শিষ্য শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজও তাঁহার অবতারত্ব প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার অন্য অনেক শিষ্যও তদ্রূপ করিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণের ভক্তশিষ্যগণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং ঘোষণা হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি সদ্‌গুরু-অবতার।

৯।১০।১৬ সাধারণ নরনারীগণের দ্বারা শ্রীবিজয়কৃষ্ণের ভগবত্তার বোধ

যোগসাধনায় সিদ্ধ নহেন এবং বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য বা শিষ্যা নহেন, এরূপ বহু নরনারীও বিজয়কৃষ্ণের ভগবত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেই সকল ঘটনার এখানে বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার জীবনী পাঠ করিলেই উক্তরূপ

বহু ঘটনা পাওয়া যাইবে। এই সকল নরনারীর সাক্ষ্যও বিজয়কৃষ্ণের অবতারত্বের প্রমাণ।

৯।১০।১৭ দেহত্যাগের পরেও শ্রীবিজয়কৃষ্ণের গুরুশক্তির কার্য্য

যুগধর্ম্ম-পুনঃপ্রতিষ্ঠার কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে বিজয়কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। কিন্তু জগতের নরনারীগণকে ধর্ম্মলাভ করাইবার জন্য তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরেও শ্রীদরবেশজী মহারাজ, শ্রীকুলদানন্দজী মহারাজ প্রমুখ যোগসিদ্ধ সুযোগ্য শিষ্যগণে, এবং তাঁহার শিষ্য নহেন, এরূপ সুযোগ্য যোগীগণেও তাঁহার গুরুশক্তির আবেশ করিয়া সদ্‌গুরুর কার্য্য করিতেছেন। সদ্‌গুরু-অবতার যাঁহাদের মধ্যে গুরুশক্তির আবেশ করেন, তাঁহারাও সদ্‌গুরু, কিন্তু তাঁহারা সদ্‌গুরু-অবতার নহেন; তাঁহারা শক্ত্যাবেশ অবতার। সদ্‌গুরু-গণও সুযোগ্য মহাপুরুষগণের মধ্যে গুরুশক্তির আবেশ করিতে পারেন; যাঁহাদের মধ্যে তাঁহারা এইরূপ আবেশ করেন, তাঁহারাও সদ্‌গুরু। জগতে এককালে একের অধিক সদ্‌গুরু-অবতার থাকেন না, কিন্তু সদ্‌গুরু একাধিক থাকিতে পারেন এবং থাকেন। বিজয়কৃষ্ণের গুরুশক্তি এইরূপ সদ্‌গুরু-পরম্পরায় কার্য্য করিয়া এখনও জগতের নরনারীগণকে ধর্ম্মলাভ করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যও অন্তর্দ্ধানের পরে এইরূপেই সদ্‌গুরু-পরম্পরায় জগতের নরনারীগণকে ধর্ম্মলাভ করাইতেন বলিয়া বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।" সদ্‌গুরু-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণও অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, কিন্তু আজিও কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিতে পাইতেছেন যে "অদ্যাপিও সেই লীলা করে বিজয়কৃষ্ণ।" বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, তিনি যে শক্তির কার্য্য আরম্ভ করিলেন, পাঁচশত বৎসর তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, তৎপরে আবার ধর্ম্মের গ্লানি হইবে। ধর্ম্মের গ্লানি ঘটাইয়া পুনঃস্থাপনের জন্য পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হওয়াও ভগবানের লীলা।

আমরা পাইলাম যে কৃষ্ণ সকল অবতারগণের আদি।

দশম অধ্যায়

"গোবিন্দঃ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল

১০।১।১ গোবিন্দ নামের অর্থসূত্র

কৃষ্ণের অন্য নাম গোবিন্দ। গোবিন্দ নামের তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝিতে হইবে। শ্রীমৎ স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশজী শ্রীশ্রীস্তবকৌস্তুভম্ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে গোবিন্দ নামের তাৎপর্য্য যে শ্লোকটীর দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অর্থ বুঝিলেই, কৃষ্ণ কেন গোবিন্দ নামে অভিহিত হইয়াছেন তাহা বুঝা যাইবে। এইজন্য, আমরা সেই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যার দ্বারা গোবিন্দ নামের তাৎপর্য্য বিবৃত করিতেছি।

জ্ঞানবিজ্ঞানমূলায় পরমানন্দরূপিণে।
বেদবেদান্তবেদ্যায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ শ্রীশ্রীস্তবকৌস্তুভম্ ২।৪

—"জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল, পরমানন্দরূপী, বেদবেদ্য, এবং বেদান্তবেদ্য গোবিন্দকে বার বার প্রণাম করি।" ইহাতে আমরা পাইলাম যে, কৃষ্ণ (১) জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল, (২) পরমানন্দরূপী, (৩) বেদবেদ্য, এবং (৪) বেদান্তবেদ্য বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ। আমরা প্রত্যেকটী কারণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা গোবিন্দ নামের তাৎপর্য্য বিবৃত করিব। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে "কৃষ্ণ জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল", এই তত্ত্ব আলোচিত হইবে। কৃষ্ণ জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল বলিতে ইহাই বুঝায় যে, কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞাতা দ্বিতীয় কেহই নাই, জ্ঞেয় বস্তু দ্বিতীয় কিছু নাই, এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বিতীয় কিছু নাই, এই কারণে কৃষ্ণ জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল। এক্ষণে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

১০।১।২ চিৎ জ্ঞাতা ও বিজ্ঞাতা

কৃষ্ণ জ্ঞানের মূল কারণ এবং বিজ্ঞানেরও মূল কারণ বলিয়া কৃষ্ণ গোবিন্দ।

জড়বস্তুকে এবং চিদ্বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা বিজ্ঞান। যাঁহারা বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শুনিয়া অথবা তাঁহাদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া জড়বস্তু অথবা চিদ্বস্তু সম্বন্ধে যে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা জ্ঞান। জীবাত্মার চিৎ জ্ঞাতা। জ্ঞান এবং বিজ্ঞান, উভয়ই লব্ধ হয় জ্ঞাতা চিতের দ্বারা। জীবাত্মার চিৎ সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ কৃষ্ণের চিতের অংশ। সুতরাং, জ্ঞাতৃত্বের এবং বিজ্ঞাতৃত্বের মূল কারণ কৃষ্ণ, অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞাতা এবং বিজ্ঞাতা দ্বিতীয় কেহ নাই।

১০।১।৩ সচ্চিদানন্দ জ্ঞেয় বস্তু

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ জ্ঞেয় বস্তু। যাহা কিছু অপ্রাকৃত বস্তু আছে তৎসমুদয় কৃষ্ণের প্রকাশরূপ, এবং যাহা কিছু প্রাকৃত বস্তু আছে তৎসমুদয় কৃষ্ণের মায়াশক্তির পরিণাম। এই সমস্তই জ্ঞেয় বস্তু। সুতরাং, সচ্চিদানন্দই জ্ঞেয় বস্তু। কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ; এইজন্য, কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞেয় বস্তু দ্বিতীয় কিছুই নাই।

১০।১।৪ জ্ঞাত ও বিজ্ঞাত সচ্চিদানন্দতত্ত্ব জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞাত তত্ত্ব জ্ঞান। যেহেতু সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ, তাঁহার প্রকাশরূপসমূহ এবং তাঁহার পরিণামরূপসমূহ জ্ঞেয়, এবং তৎসম্বন্ধে পরোক্ষভাবে জ্ঞাত তত্ত্ব জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত তত্ত্ব বিজ্ঞান, সেইজন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল কারণ কৃষ্ণ।

আমরা পাইলাম যে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান, এই তিনেরই মূল কারণ, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ। এইজন্য কৃষ্ণ জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল কারণ, এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল কারণ বলিয়া কৃষ্ণ গোবিন্দ। কৃষ্ণ জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল কারণ, এই তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহা বলা হইতেছে।

১০।১।৫ চিৎ জড়বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের মূল কারণ

জীবাত্মার চিৎ জড়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। যাঁহারা জড়বস্তুতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শ্রবণ

করিয়া অথবা তাঁহাদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মানবাত্মার চিৎ জ্ঞান লাভ করে। জড়বিজ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞাতা চিতের দ্বারা বিজ্ঞানলাভ করেন, এবং চিতের জ্ঞানশক্তির দ্বারা পরিচালিত বুদ্ধি, মন, এবং ইন্দ্রিয়বর্গ মৌখিক বাক্যের দ্বারা অথবা লিখিত বাক্যের দ্বারা সেই বিজ্ঞানকে প্রকাশ করেন। যিনি সেই বাক্য শ্রবণ অথবা অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতেছেন, তাঁহারও চিৎ স্বীয় জ্ঞানশক্তির দ্বারা পরিচালিত বুদ্ধি, মন, এবং ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করিতেছেন। সুতরাং, জড়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের মূল কারণ কৃষ্ণ।

১০।১।৬ চিৎ জড়বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞানের মূল কারণ

জীবাত্মার জ্ঞাতা চিৎ জড়বস্তু সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান লাভ করে, তাহা বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ এবং গবেষণার দ্বারা করিয়া থাকে। চিতের চেতনা বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়বর্গে থাকিয়া উহাদিগকে চেতন করে। সুতরাং, জড়বস্তু সম্বন্ধে বিজ্ঞানলাভের মূল কারণ কৃষ্ণ।

১০।১।৭ কৃষ্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভের প্রেরণাদাতা

সোহহম্ কৃষ্ণ স্বীয় চিতের অংশকে এবং অহম্-এর অংশকে জীবাত্মা করিয়া মায়িক দেহে রাখিয়াছেন। কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ এই যে জীবাত্মা, ইহার চিদংশ ত্রিগুণময় মায়িক দেহের অবিদ্যাপ্রভাবে বুদ্ধির সহিত আপনাকে অভিন্ন ভাবে। ইহাকেই চিতের অধ্যাস বলা হয়। বুদ্ধিতে অধ্যস্ত জীবাত্মা বলিতে বুদ্ধিতে অধ্যস্ত জীবাত্মার চিদংশই বুঝিতে হইবে। যেহেতু চিৎ এবং আনন্দই জীবাত্মা, সেইহেতু জীবাত্মাকেই বুদ্ধিতে অধ্যস্ত বলা হয়। বুদ্ধিতে অধ্যস্ত জীবাত্মা বুদ্ধির বিষয়ভোগ এবং সুখদুঃখকে আপনারই মনে করিয়া কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে দেহে অবস্থান করে। বুদ্ধিতে অধ্যস্ত জীবাত্মার বিষয়-ভোগজাত যে সুখদুঃখ, তাহা তাহার চিদংশের। জীবাত্মার আনন্দাংশ দৈহিক সুখ বা দুঃখ গ্রহণ করে না। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে মাধুর্য্য-স্নিগ্ধতা-সৌন্দর্য্য-স্বাদুতা-সৌরভ আছে, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা তৎসমুদয় ভোগ করিয়া দৈহিক সুখ প্রাপ্ত হয়, এবং বুদ্ধিতে অধ্যস্ত জীবাত্মার চিৎ তাহাকেই সুখ বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু জীবাত্মার আনন্দাংশ সেই দৈহিক সুখ গ্রহণ করে না। আনন্দাংশ আনন্দ অর্থাৎ আত্মিক সুখ চাহে। চিতের অজ্ঞানাচ্ছন্ন

অবস্থায় আনন্দ আত্মীয়বন্ধুগণের সহিত পারস্পরিক আদানপ্রদানের দ্বারা আত্মিক সুখই ভোগ করে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র সুখে সে তৃপ্ত হয় না ; সে কৃষ্ণকে চাহে এবং তাঁহার অনন্ত আনন্দ চাহে। এইজন্য অহম্ অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিৎকে অধ্যাত্ম জ্ঞানবিজ্ঞানলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সোহহম্ কৃষ্ণ স্বীয় অহম্-এর অংশকে মায়াময় দেহে আবদ্ধ রাখিয়া মায়াময় লীলা করিতেছেন, কিন্তু সেই অহমাংশকে চিরকাল মায়াময় লীলায় আবদ্ধ রাখিতে চাহেন না। তিনি তাহাকে অনিত্য মায়াময় লীলা হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য লীলায় আনিয়া স্বীয় আনন্দ সম্ভোগ করাইয়া স্বয়ংও আনন্দ সম্ভোগ করিতে চাহেন, কারণ এইরূপ আনন্দলীলাই তাঁহার অহম্-এর স্বভাব এবং আনন্দলীলার জন্যই তিনি বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। জীবাত্মার অহমাংশকে বিশ্বমায়া হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যলীলায় গ্রহণ করিবার জন্য কৃষ্ণ দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞানস্বরূপ অন্তর্য্যামী পরমাত্মা স্বরূপে জীবাত্মাকে শুভ প্রেরণা দিতেছেন। পরমাত্মা জীবাত্মার চিৎকে দেহাভিমান ত্যাগ করিতে, স্বীয় স্বরূপতত্ত্ব জানিতে, কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে, কৃষ্ণের সহিত স্বীয় সম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে, এবং কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে প্রেরণা দান করেন। জীবাত্মার আনন্দাংশ চিৎকে কৃষ্ণভজনায় প্রেরণা দান করিতেই থাকে ; অধিকন্তু, পরমাত্মাও তাহাকে এই প্রেরণা দান করেন। চিদংশ যখন আনন্দাংশের ইচ্ছার উক্তরূপ প্রেরণা এবং পরমাত্মার প্রেরণা অনুসারে চলে, তখন সে ঐ সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য স্বীয় জ্ঞানশক্তিকে বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া কার্য্যে নিয়োজিত করে এবং উহাদের দ্বারা উক্ত তত্ত্বসমুদয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞানলাভের ফলে চিৎ শ্রদ্ধাবান হইয়া ভজনসাধন আরম্ভ করে এবং যথাপ্রণালীতে ভজনসাধন করিবার ফলে ক্রমশঃ সে দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া মায়ামুক্ত হয় এবং আত্মদর্শন করিয়া আত্মবিজ্ঞান লাভ করে, তাহার পরেই আনন্দাংশের প্রেমের বিকাশ হয়, জীবাত্মা কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া ঐশীবিজ্ঞান লাভ করে। এখন আমরা পাইলাম যে, আধ্যাত্ম জ্ঞানবিজ্ঞানলাভের প্রেরণাদাতা কৃষ্ণ।

১০।১।৮ কৃষ্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞানের মূল কারণ : শাস্ত্র—অপরাবিদ্যা

কৃষ্ণ জীবাত্মাকে অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের প্রেরণা দিয়া যদি সেই জ্ঞান না দিতেন, তবে তাঁহার প্রেরণাদান নিষ্ফল হইত। জড়বস্তু ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষের

বিষয় বলিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞানবিজ্ঞানলাভ সহজ। কৃষ্ণ যদি প্রথমেই মানবকে অধ্যাত্মজ্ঞান না দিতেন, তাহা হইলে মানব কখনই তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিত না। মানবকে স্বীয় তত্ত্ব জানাইবার জন্য কৃষ্ণ সৃষ্টির পূর্ব্বেই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। সৃষ্টির পরেও তিনি ব্যাসদেবে স্বীয় জ্ঞানশক্তির আবেশ করিয়া তাঁহার দ্বারা যে সকল শাস্ত্র লিখাইয়াছেন তাহা সুবিদিত। মানব এই সকল শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা শ্রবণ করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করে। যদ্দ্বারা কৃষ্ণকে জানা যায় তাহাকে বিদ্যা বলা হয়। যে বিদ্যার দ্বারা কৃষ্ণের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহা অপরা বিদ্যা। অপরা শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট। ইহার দ্বারা কেবল জ্ঞান লাভ করা যায় বলিয়া ইহা অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যার দ্বারা কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিজ্ঞান লাভ করা যায় তাহার নাম পরাবিদ্যা। পরা শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। ইহার দ্বারা বিজ্ঞান লাভ করা যায় বলিয়া ইহা পরাবিদ্যা। শ্রুতি এবং স্মৃতি অথবা অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়নের বা শ্রবণের দ্বারা বিজ্ঞান লাভ করা যায় না, জ্ঞানই লাভ করা যায়, এইজন্য শ্রুতি সমুদয় শাস্ত্রকেই অপরাবিদ্যা বলিয়াছেন।

তস্মৈ স হোবাচ, দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি —পরা চৈবাপরা চ। মুণ্ডক। ১।১।৪।—"অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন, 'ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন যে, বিদ্যা দ্বিবিধ বলিয়া জানিতে হইবে—পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা।"

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ মুণ্ডক। ১।১।৫।—"পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ বিদ্যার মধ্যে অপরাবিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, এবং জ্যোতিষ, এই সমস্তই অপরাবিদ্যা। যে বিদ্যার দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা পরাবিদ্যা।" বেদ স্বয়ংই চারিটী বেদকে অপরাবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বেদান্ত বা উপনিষৎসমূহ উক্ত চারি বেদের অন্তর্গত। সুতরাং, বেদান্তও বেদেরই ঘোষণা অনুসারে অপরাবিদ্যা। বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন বা শ্রবণের দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিজ্ঞান লাভ করা যায় না, তাহা বেদই ঘোষণা করিয়াছেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। মুণ্ডক। ৩।২।৩ এবং

কঠ। ১।২।২৪।—"বেদ-বেদান্ত অধ্যয়নের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, অথবা বহু শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিজ্ঞান লাভ করা যায় না"। ছন্দোগ্য শ্রুতির সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে আছে, নারদ সনৎকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার কালে বলিলেন যে, তিনি চারি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত সম্বন্ধীয় বিদ্যা, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ বেদান্ত, ভূতবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র, এবং কলাশাস্ত্র, সমস্তই অবগত আছেন, কিন্তু তথাপি তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রুতির এই উক্তি হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র অপরাবিদ্যা। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ এবং স্বরূপ সমস্তই দেখাইয়া বলিলেন :

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ গীতা। ১১।৫৩

—"তুমি আমাকে যেরূপ দেখিলে, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, অথবা যজ্ঞদ্বারা আমাকে তদ্রূপ কেহ দেখিতে পায় না।" আমরা পাইলাম যে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং শ্রবণের দ্বারা কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করা যায় না কিন্তু জ্ঞান লাভ করা যায়। কৃষ্ণই ঐ সমস্ত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রেরণায় জীবাত্মার চিৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা শ্রবণের দ্বারা জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং, কৃষ্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞানের মূল কারণ।

১০।১।৯ জীবাত্মাকে এবং কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায়।

কৃষ্ণ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মূল কারণ, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। জীবাত্মা আপনিই আপনাকে প্রত্যক্ষ করে; এই আত্মদর্শনের দ্বারা জীবাত্মা আত্মবিজ্ঞান লাভ করে; জীবাত্মাই কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করে; এই কৃষ্ণদর্শনের দ্বারা জীবাত্মা ঐশী বিজ্ঞান লাভ করে। আত্মবিজ্ঞান এবং ঐশীবিজ্ঞান, এতদুভয়ই অধ্যাত্মবিজ্ঞান। প্রথম প্রশ্ন হইতেছে: জীবাত্মাকে এবং কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায় কিনা। উত্তর: অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায়। ইহার প্রথম প্রমাণ এই যে, সকল যুগেই অধ্যাত্মযোগসাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। সৃষ্টির পর হইতে আজও পর্য্যন্ত

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, সকল যুগের অধ্যাত্মযোগসাধনার ইতিহাসে দেখা যায় যে, সকল যুগেই সিদ্ধ যোগীগণ অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কলিযুগেরও আরম্ভ হইতে আজও পর্য্যন্ত অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এই সকল মহাপুরুষগণের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায়। ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ শাস্ত্র। সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান লাভ করা যায়। কয়েকটী শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্ অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিতং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥

মুণ্ডক ১।১।৬।—"জড়চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য, জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রহণীয়, জন্ম-রহিত, জড়রূপহীন, জড়চক্ষুকর্ণহস্তপদহীন, নিত্য, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অব্যয়, এবং সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ পরমেশ্বরকে ধীর ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ করেন।"

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ। শ্বেত ৬।৫

—"পরমেশ্বর আদি, পুরুষপ্রকৃতিরূপে বিশ্বের কারণ, ত্রিকালের অতীত, এবং অকল অর্থাৎ জড়-ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত হইলেও তাঁহাকে যোগীগণ প্রত্যক্ষ করেন।"

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ গীতা ১১।৫৪

—"হে পরন্তপ অর্জ্জুন, অনন্যা ভক্তির দ্বারা মানব আমাকে জানিতে পারে, প্রত্যক্ষ করিতে পারে, এবং আমার তত্ত্ববিজ্ঞান লাভ করিয়া আমাতে প্রবেশ করিতে পারে অর্থাৎ আমার নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে পারে।" আমরা পাইলাম যে, কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায়।

১০।১।১০ জীবাত্মা আপনাকে এবং কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করে।

জীবাত্মা এবং ঈশ্বর আত্মবস্তু, অর্থাৎ চিদ্বস্তু। মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গ জড়বস্তু। ইহাদের দ্বারা মানব জড়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং অধ্যয়ন ও শ্রবণের দ্বারা আত্মবস্তু সম্বন্ধে অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করিতে

পারে, কিন্তু আত্মবস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বোদ্ধৃত মুণ্ডক ১।১।৬ স্থত্রে ইহা শ্রুতি কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে। শ্রুতি অন্যত্রও বলিয়াছেন : ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ। কেন। ২।৩। —"নয়ন, বাক্য, এবং মনও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।" জীবাত্মা আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। "ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।" গীতা ১৩।২৪।—"যোগীগণের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মায় অর্থাৎ আপনার মধ্যে আত্মাকে দর্শন করে।" "আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে" বলিয়া গীতা জানাইয়াছেন যে জীবাত্মা আপনাকেও প্রত্যক্ষ করে এবং ঈশ্বরকেও প্রত্যক্ষ করে, কারণ জীবাত্মাও আত্মবস্তু এবং ঈশ্বরও আত্মবস্তু। গীতার চতুর্থ অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরবিষয়ক যে সংশয়হীন বিজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা যোগসিদ্ধির ফলে জীবাত্মাই লাভ করে। "তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধ কালেনাত্মনি বিন্দতি।" গীতা ৪।৩৯।—"যোগসিদ্ধ হইয়া মানব যথাকালে আত্মাতেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করে।" শ্রুতিও এই তত্ত্বই ঘোষণা করিয়াছেন।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌। কঠ ২।২।১২

এই শ্রুতি বাক্যের "তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি" এবং গীতার "আত্মনি আত্মনা আত্মানং পশ্যন্তি" একই অর্থবোধক। এই শ্রুতিবাক্যের অনুপশ্যতি শব্দের অর্থ, অনু = পরে, অর্থাৎ যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে, পশ্যন্তি = প্রত্যক্ষ করে। সমগ্র শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ, "পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা। তাঁহার একটীমাত্র রূপকেই তিনি বহু রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যে সকল ধীর ব্যক্তি যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে পরমেশ্বরকে আত্মায় প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখলাভ হয়, অন্য কাহারও হয় না।" জীবাত্মা ঈশ্বরের প্রতিবোধ, অর্থাৎ প্রতিরূপ বোধ; জীবাত্মাই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, এইজন্য শ্রুতি বলেন যে পরমেশ্বর প্রতিবোধবিদিত। "প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং বিন্দতে।" কেন ২।৪—"জীবাত্মা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং তখন অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।"

আত্মাত্মনি গৃহ্যতেহসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোহনুপশ্যতি। শ্বেত ১।১৫

—"সত্যাবলম্বন এবং অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা যোগী ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ

করেন ; তাঁহার আত্মার মধ্যেই ঈশ্বর গৃহীত হয়েন, অর্থাৎ যোগীর জীবাত্মাই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন।

১০।১।১১ কৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণদর্শন হয় : কৃষ্ণ স্বয়ংজ্যোতি

সকল শাস্ত্রই বলিয়াছেন যে পরমেশ্বর স্বয়ংজ্যোতি, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ; তিনি কৃপা করিয়া দর্শন না দিলে কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ কঠ ১।২।২৪

—"এই আত্মাকে, অর্থাৎ পরমেশ্বরকে, বেদাধ্যয়নের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, অথবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া বিজ্ঞান লাভ করা যায় না। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তাহার দ্বারাই তিনি লভ্য হয়েন এবং তাহাকেই তিনি স্বীয় তনূ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ প্রদর্শন করেন।" কঠশ্রুতির এই সূত্রটী এবং মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৩ সূত্রটী একই।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্। শ্বেত ৩।২০

"পরমেশ্বরের কৃপাতেই মায়িকব্যাপাররহিত, মহিমময় পরমেশ্বরকে দর্শন করা যায় এবং দর্শন করিবার পর সকল দুঃখের অবসান হয়।"

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্। গীতা ১৮।৫৬

কৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমার কৃপায় নিত্যসত্য এবং অব্যয় পদকে অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্যো একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
ভা ১০।১৪।২৯

ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "হে ভগবন্, আপনার চরণকমলের সামান্যমাত্রও কৃপা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাই আপনার মহিমার তত্ত্ব জানেন, অন্য কেহই দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারে না।" আমরা পাইলাম যে, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যাঁহাকে দর্শন দান করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। কৃষ্ণের কৃপায় জীবাত্মা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে : এইজন্যও কৃষ্ণ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মূল।

১০।১।১২ অধ্যাত্মযোগসাধনার ফলে কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়ঃ বিশেষ কৃপা

যাঁহারা কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতার সহিত অধ্যাত্ম-যোগসাধনা করেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই কৃপা করিয়া দর্শন দান করেন ; অধ্যাত্ম-যোগসাধনা না করিয়া এই কৃপা লাভ করা যায় না।

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোহথ বিদ্বান্। শ্বেত ৬।২১

—"যোগসাধনার প্রভাবে এবং পরমেশ্বরের কৃপায় পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্বেতাশ্বতর অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।" এতদ্বারা শ্রুতি জানাইলেন যে, যোগসাধনার ফলে পরমেশ্বরের কৃপা এবং দর্শনলাভ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায়। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ গীতা ৯।২৯

—"আমি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন ; আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই ; কিন্তু যাঁহারা ভক্তিযোগে আমার ভজনা করেন তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও তাঁহাদের মধ্যে থাকি।" এতদ্দ্বারা কৃষ্ণ ঘোষণা করিলেন যে, যদিও তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, তথাপি ভক্তের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা আছে। এই বিশেষ কৃপা কৃষ্ণের সমভাবাপন্নতার নিয়মের ব্যতিক্রম নহে, ইহাও তাঁহার সমভাবাপন্নতার নিয়মের অন্তর্গত একটী বিশেষ নিয়ম ; ইহা বিশেষ কৃপার নিয়ম (Law of special grace)। কৃষ্ণের ভক্ত সাধক কৃষ্ণের বিশেষ কৃপার নিয়মের কার্য্যের ফলে সকল প্রারব্ধভোগ এবং পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া কৃষ্ণকে নিত্যলীলায় লাভ কারতে পারে। যাহাতে মানবগণ তাঁহার এই বিশেষ কৃপা লাভ করিতে পারে, এইজন্য কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া মানবজাতিকে উপদেশ দিয়াছেন ঃ যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত। গীতা ৪।৪৩। —"হে ভারত, উত্তিষ্ঠ হও এবং যোগসাধনা অবলম্বন কর।" কৃষ্ণ সর্ব্বজীবে সমভাবাপন্ন ; সর্ব্বজীবের প্রতিই তাঁহার সমান কৃপা ; তাঁহার কৃপা ব্যতীত কোন জীব এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না ; কিন্তু তাঁহার আনন্দলীলার উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য সকল নরনারীকেই তাঁহার বিশেষ কৃপা দান করিবার জন্য তিনি উন্মুখ হইয়া আছেন ; যে কেহ তাঁহার উপদেশানুসারে অধ্যাত্মযোগসাধনা করেন, তাঁহাকেই তিনি এই বিশেষ কৃপা বিতরণ করেন, সুতরাং, বিশেষ কৃপা-বিতরণেও তাঁহার সমভাবাপন্নতার নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

১০।১।১৩ কৃষ্ণ সদ্‌গুরু

যাঁহারা কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়েন, তাঁহাদিগকে বিশেষ কৃপা করিবার জন্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অধ্যাত্মযোগসাধনায় দীক্ষা দান করেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবাত্মার চিতের পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, স্বীয় তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই তত্ত্বসমূহের জ্ঞান না হইলে চিৎ কৃষ্ণ ভজনে উন্মুখ হয় না। যাহাতে মানবের চিৎ এই সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাঁহার ভজনায় প্রবৃত্ত হয়, সেইজন্য কৃষ্ণ সৃষ্টির পূর্ব্বেই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সৃষ্টির পর স্মৃতিশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই অপরাবিদ্যার দ্বারা জীবাত্মার চিৎ স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করিতে চাহে। কিন্তু চিৎ স্বীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানশক্তির দ্বারা অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করিতে পারে না। অবিদ্যাশক্তি মায়াশক্তিরই বিশ্বমায়ায় কার্য্যকারীরূপ। মায়াশক্তি কৃষ্ণেরই; তিনিই মায়াশক্তির অধীশ্বর। তিনি ভিন্ন তাঁহার মায়াশক্তিকে বশীভূত করিবার আর কাহারও সাধ্য নাই। অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য জীবাত্মাকে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয়। কৃষ্ণ গীতায় এই উপদেশ দিয়াছেন, "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।" জীবাত্মার চিৎ যখন তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তখন তাহাকে তিনি বিশেষ কৃপা করিবার জন্য সদ্‌গুরু রূপে তাহাকে অধ্যাত্মযোগসাধনায় দীক্ষা দান করেন। আমরা পাইলাম, যে অপরাবিদ্যার দ্বারা জীবাত্মার চিৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, কৃষ্ণই সেই জ্ঞানদাতা, এবং যে অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা চিৎ কৃষ্ণের কৃপা এবং দর্শন প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞান লাভ করে, কৃষ্ণই সেই অধ্যাত্মযোগসাধনায় দীক্ষাদাতা সদ্‌গুরু। শ্রুতি এবং স্মৃতি সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন যে কৃষ্ণই সদ্‌গুরু। "তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা।" মুণ্ডক ২।১।৬—"পরমেশ্বর হইতে ঋকমন্ত্রসমূহ, সামমন্ত্রসমূহ, এবং যজুর্মন্ত্রসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরমেশ্বর হইতেই দীক্ষা অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগসাধনায় দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়।" "অহং জ্ঞানদো গুরুঃ।" ভাগবত ১০।৮০।৩২।—কৃষ্ণ শ্রীদামাকে বলিতেছেন, "আমি জ্ঞানদাতা গুরু।" "বন্ধুর্গুরুরহং সখে"। ভাগবত ১১।১৭।২৭।—কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন, "হে সখে, গুরুই বন্ধু, এবং আমিই গুরু।" গুরু পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত করান বলিয়া গুরুই যথার্থ বন্ধু এবং কৃষ্ণই গুরু। "আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ।" মনুসংহিতা।—"গুরু ঈশ্বরের মূর্ত্তি।" "গুরুরেব হরিঃ সাক্ষাৎ নান্য ইত্যব্রবীৎ

শ্রুতিঃ।" ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ।—"গুরু সাক্ষাৎ হরি, হরি হইতে ভিন্ন নহেন, ইহা শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন।"

সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তৃত্বাদীশ্বরঃ করুণানিধিঃ।

আচার্য্যরূপমাস্থায় দীক্ষয়া মোক্ষয়েৎ পশূন্॥ কুলার্ণব তন্ত্র

—"মানবকে সকল প্রকারের অনুগ্রহ করিতে করুণানিধি ঈশ্বরের শক্তি আছে। এইরূপ শক্তি থাকায় ঈশ্বর গুরুরূপে অবস্থিত থাকিয়া বদ্ধ মানবগণকে মুক্তিদান করেন।"

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুদেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ গুরুগীতা

—"গুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব, কারণ গুরু পরব্রহ্ম। গুরুদেবকে নমস্কার।" ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পরব্রহ্ম কৃষ্ণেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ; কৃষ্ণই গুরু; এইজন্য গুরুগীতা বলিলেন যে গুরুই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, এবং এইজন্যই ভাগবত বলিয়াছেন যে গুরু সর্ব্বদেবময়। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিয়া মানব অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করে; কৃষ্ণই সদ্‌গুরু; এইজন্যও কৃষ্ণ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মূল কারণ।

১০।১।১৪ দ্বন্দ্বলীলায় সদ্‌গুরু সারথি: দ্বন্দ্বপরিণয়ের লীলা

কৃষ্ণ সদ্‌গুরু-রূপে দ্বন্দ্বলীলায় জীবাত্মার সারথি। মায়াময় বিশ্বলীলাটী দ্বন্দ্বের লীলা। দ্বন্দ্বের অর্থ সংগ্রাম। দ্বন্দ্ব ত্রিবিধ: আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এবং আধ্যাত্মিক। এই ত্রিবিধ দ্বন্দ্বের অতীত হইলে জীবাত্মা ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে আরূঢ় হইয়া কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া মায়ামুক্ত হয় এবং তাঁহার সহিত পরিণয়, অর্থাৎ মিলন, প্রাপ্ত হয়। ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে আরূঢ় জীবাত্মা কর্ত্তৃক নিত্য কৃষ্ণপ্রাপ্তিই জীবাত্মার কৃষ্ণের সহিত মিলনলাভ বা পরিণয়লাভ। ত্রিগুণময় বিশ্ব অশুদ্ধ সত্ত্বা। অশুদ্ধ সত্ত্বাতেই দ্বন্দ্ব আছে। বিশ্বাতীত পরব্যোম, তত্রত্য গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ এবং সেই সকল ধামের অধিবাসীগণ ভাবাতীত ভাব। ভাবাতীত ভাবে দ্বন্দ্ব নাই; তথায় কেবলই পরিণয়। জীবাত্মা দ্বন্দ্বাতীত হইলে মায়াতীত হইতে পারে এবং তখন কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষরূপে লাভ করিয়া বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে কৃষ্ণের সহিত পরিণয়লীলা প্রাপ্ত হয়। পরিণয় প্রাপ্ত হইলে

পর জীবাত্মা অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে। জড়দেহের মধ্যে আবদ্ধ আছে জীবাত্মা। জীবাত্মা কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ। সোহহম্ কৃষ্ণের অহমাংশের অংশই জীবাত্মার অহম্। অহম্ চাহে কৃষ্ণের সহিত পরিণয়। কিন্তু সে দেহে আবদ্ধ, মায়ার বন্দী। জীবাত্মার চিৎকে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এবং আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া অহম্‌কে মায়াপুরী হইতে উদ্ধার করিয়া মায়াতীত পরমভাবের ভূমিতে কৃষ্ণের সহিত পরিণয় প্রাপ্ত করাইতে হয়। দ্বন্দ্বলীলার মধ্য দিয়া গিয়া এবং ইহাকে অতিক্রম করিয়া জীবাত্মাকে পরিণয়লীলা প্রাপ্ত হইতে হইবে, ইহা পরিণয়প্রাপ্তি সম্বন্ধে কৃষ্ণের দ্বারা বিহিত অলঙ্ঘ্য বিধান। ইহাই কৃষ্ণের দ্বন্দ্বপরিণয়ের লীলা। এই লীলার জন্য বিশ্বের সৃষ্টি। কৃষ্ণ সদ্‌গুরুরূপে দ্বন্দ্বলীলায় জীবাত্মার সারথি হইয়া জীবাত্মাকে দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত করিয়া পরিণয় লাভ করান।

১০।১।১৫ আধিভৌতিক দ্বন্দ্ব

"অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ।" গীতা ৮।৪। ক্ষরভাবই অধিভূত। ত্রিগুণময় দেহমাত্রই ক্ষরভাব। মানবদেহও ত্রিগুণময় জড়দেহ, সুতরাং মানবদেহও অধিভূত। এই অধিভূতের মধ্যে জীবাত্মা অবস্থান করে। কৃষ্ণের চিদানন্দের অতি ক্ষুদ্র অংশ জীবাত্মা স্বরূপতঃ নিত্যশুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত। কিন্তু অধিভূতের অবিদ্যাশক্তি কামক্রোধাদির দ্বারা জীবাত্মার চিতের স্বরূপজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া বুদ্ধির সহিত অভিন্নবোধ করায়। বুদ্ধি দেহের প্রধান অংশ বলিয়া বুদ্ধির সহিত অভিন্নতাবোধ দেহের সহিতই অভিন্নতাবোধ। দেহই অধিভূত ; এইজন্য দেহের সহিত অভিন্নতাবোধ অধিভূতের সহিতই অভিন্নতাবোধ। ইহাই জীবাত্মার দেহাভিমান। দেহাভিমানী জীবাত্মার চিৎ বুদ্ধির "আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা" ভাবটীকে নিজেরই বলিয়া ভাবে। এইরূপ জীবাত্মা দেহরূপ রথের রথী হইয়া থাকে এবং বুদ্ধি তাহার সারথ্য করে।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ কঠ ১।৩।৩-৪

—"জীবাত্মাকে রথি, দেহকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, এবং মনকে বল্গা বলিয়া

জানিবে। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, ভোগ্যবিষয়কে চারণভূমি, এবং শরীর-ইন্দ্রিয়-মনের সহিত যুক্ত জীবাত্মাকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন।" সারথি বুদ্ধি মন-লাগামে বদ্ধ ইন্দ্রিয়-অশ্বগণকে বিষয়গোষ্ঠে চরাইয়া বেড়ায়, এবং ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধির সহিত অভিন্ন-বোধবিশিষ্ট রথী জীবাত্মার চিৎ আপনাকেই কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাবে। এইরূপ কর্ত্তৃত্বের এবং ভোক্তৃত্বের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য মানব মানবের সহিত, মানবেতর প্রাণীগণের সহিত, এবং উদ্ভিজ্জাদির সহিতও নিত্যই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া থাকে। ভোগবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য মানব ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম, পঞ্চভূতের সহিতও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া তাহাদের শক্তিসমূহকে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়া তদ্দ্বারা অন্যের ধ্বংসসাধন করিয়া স্বীয় ভোগক্ষেত্রের বিস্তার এবং ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন করে। পরলোকেও স্বর্গভোগের কামনায় মানব পশুবধাদি নানারূপ যজ্ঞ করে, স্বর্গভোগ করিয়া আবার মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে। এই সমস্ত দ্বন্দ্বই অধিভূতের সহিত অধিভূতের দ্বন্দ্ব; এইজন্য এই সমস্তই আধি-ভৌতিক দ্বন্দ্ব। কৃষ্ণের দ্বন্দ্বলীলার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার মায়াশক্তি অধিভূতকে নিত্যদ্বন্দ্বময় করিয়া জীবাত্মার চিৎকে দ্বন্দ্বের মোহে মুগ্ধ করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ গীতা ৭।২৭

—"হে অর্জ্জুন, জড়দেহের উৎপত্তিকাল হইতেই কামক্রোধ হইতে সমুত্থিত দ্বন্দ্বের মোহবশতঃ জীব সম্মোহ প্রাপ্ত হয়।" মায়াশক্তি এই আধিভৌতিক দ্বন্দ্বের কারণ।

১০।১।১৬ আধিদৈবিক দ্বন্দ্ব

"পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।" গীতা ৮।৪। পুরুষ=জীবাত্মা। দেহরূপ পুরে জীবাত্মা অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে পুরুষও বলা হয়। অধিদৈবতম্=যাহা দেবতা-গণকে অধিকার করিয়া আছে তাহা অধিদৈবত। বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়গণ সমগ্র দেহের পরিচালক; এইজন্য ইহারা দেহের দেবতা। দেহ অধিভূত; এইজন্য ইহারা আধিভৌতিক দেবতা। ইহারা ত্রিগুণময় জড় বস্তু, ইহাদের নিজস্ব চেতনা নাই। দেহে জীবাত্মার অধিষ্ঠানহেতু জীবাত্মার চিতের দ্বারা ইহারা

সচেতন এবং সপ্রাণ হয়, এবং ইহাদের শক্তিসমূহ ক্রিয়াশীল হয়। এইজন্য, জীবাত্মা ইহাদিগকে অধিকার করিয়া আছে এবং জীবাত্মাই অধিদৈবত বা অধিদেবতা। অধিদেবতার দ্বারা সচেতন, সপ্রাণ, এবং সক্রিয় হইয়া দেহের দেবতাগণ মায়াশক্তির যন্ত্ররূপে অধিদেবতার অর্থাৎ জীবাত্মার চিৎকে দেহাভিমানী করিয়া আধিভৌতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত করিয়া রাখে। কিন্তু তাহার অহম্ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় না। অহম্ তাহাকে পরিণয়লীলায় লইয়া যাইবার জন্য চিৎকে দ্বন্দ্বাতীত হইতে প্রেরণা দান করে। দেহের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মাও চিৎকে উক্তরূপ শুভ প্রেরণা দান করেন। ইহার ফলে চিৎ আধিভৌতিক দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগৃহীত এবং বশীভূত করিতে না পারিলে আধিভৌতিক দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করা যায় না। আধিভৌতিক দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিবার জন্য জীবাত্মার চিৎ বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত ও বশীভূত করিবার জন্য উহাদের সহিত সংগ্রাম করে। ইহা আধিভৌতিক দেবতাগণের সহিত অধিদেবতার সংগ্রাম এবং ইহাই আধিদৈবিক দ্বন্দ্ব। জীবাত্মার ক্ষুদ্র চিৎ-কণিকা স্বীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানশক্তির দ্বারা দ্বন্দ্বময় অধিভূতের সৃষ্টিকর্ত্রী মহামায়ার অবিদ্যাশক্তির বলে বলীয়ান আধিভৌতিক দেবতাগণকে নিগৃহীত এবং বশীভূত করিতে পারে না এবং তাহাদের দ্বারা আধিভৌতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেই নীত হইয়া আধিভৌতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হয়। জীবাত্মার চিৎ স্বীয় শক্তিতে ইহাদিগকে নিগৃহীত করিতে পারে না, কৃষ্ণ তাহা ঘোষণা করিয়াছেন।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ গীতা ৩।৩৩

—"জ্ঞানী ব্যক্তিগণও ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সদৃশ কার্য্য করে। সকল প্রাণীই প্রকৃতির অনুসরণ করে। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আর কি করিবে?" "কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।" গীতা ৩।৫।—"সকলেই প্রকৃতিজাত গুণসমূহের প্রভাবে অবশ হইয়া কার্য্য করিতেছে।" অর্জ্জুনও হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন :

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ গীতা ৬।৩৪

—"হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, বিক্ষোভসৃষ্টিকারী, বলবান, এবং দৃঢ়। মনের

নিগ্রহ বায়ুর নিরোধের মতই সুদুষ্কর বলিয়া মনে করি।" আমরা পাইলাম যে, জীবাত্মার চিৎ আপন শক্তিতে মহামায়ার অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করিতে পারে না। এই অক্ষমতার জন্য দুর্ব্বল চিৎ কখনও আধিদৈবিক কখনও আধিভৌতিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই থাকে, কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" মুণ্ডক ৩।২।৪।—"পরমেশ্বর দুর্ব্বলের দ্বারা লভ্য নহেন।"

১০।১।১৭ আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব

মানবের মধ্যে দুই প্রকারের স্বভাব আছে। একটী অপরাপ্রকৃতির স্বভাব এবং একটী পরাপ্রকৃতির স্বভাব। অপরাপ্রকৃতির স্বভাবটী দৈহিক স্বভাব, কারণ দেহ অপরাপ্রকৃতি। পরাপ্রকৃতির স্বভাবটী জীবাত্মার স্বভাব, কারণ জীবাত্মা পরাপ্রকৃতি। জীবাত্মার স্বভাব জীবের অধ্যাত্ম। "স্বভাবোঽধ্যাত্ম-মুচ্যতে।" গীতা ৮।৩।—"আত্মার যে নিজস্ব ভাব তাহাই তাহার স্বভাব। আত্মার স্বভাব আত্মাকে অধিকার করিয়া আছে বলিয়া আত্মার স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়।" জীবাত্মার আনন্দাংশের ভাবই তাহার নিজস্ব ভাব। কৃষ্ণের সহিত পরিণয় প্রাপ্ত হইয়া প্রেমভাবে তাঁহার উপাসনা করিয়া স্বীয় আনন্দদিৎসাকে সার্থক করিয়া আনন্দলিপ্সার সার্থকতা সাধনের ইচ্ছাই জীবাত্মার অহম্-এর নিজস্ব ভাব, ইহাই তাহার স্বভাব, এবং ইহাই অধ্যাত্ম। চিৎ মায়াতীত হইলে অহম্-এর প্রেমবিকাশ হয় এবং পরিণয়েচ্ছা পূর্ণ হয় এবং চিতেরও বিজ্ঞানলাভ হয়। মহামায়ার অবিদ্যাশক্তির বলে বলীয়ান দৈহিক দেবতাগণের সহিত আধিদৈবিক দ্বন্দ্বে চিৎকে বিপর্য্যস্ত দেখিয়া অহম্ মহামায়ার অর্চ্চনা করে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। ভাগবত অহম্-এর এই প্রার্থনাকে শাশ্বত রূপ দিয়াছেন।

কাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ॥ ভাগবত ১০।২২।৪

আপনার দুর্ব্বলতায় এবং অক্ষমতায় কাতর হইয়া চিৎও কৃষ্ণের শরণ লইয়া তাঁহার চরণে প্রার্থনা করে। শ্রুতি চিতের এই প্রার্থনাকে শাশ্বত রূপ দিয়াছেন।

অসতো মা সদ্গময়। তমসা মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। বৃহ ১।৩।২৮ —"মায়াময় অশুদ্ধ সত্তা হইতে আমায় মায়াতীত শুদ্ধ সত্ত্বায় লইয়া চল।

অবিদ্যাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট অজ্ঞানান্ধকার হইতে আমায় বিজ্ঞানালোকে লইয়া চল। মায়াময় বিশ্বে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু হইতে আমায় মৃত্যুহীন নিত্যলীলার ধামে লইয়া চল।" মানবাত্মার যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখন কৃষ্ণ সদ্‌গুরুরূপে মানবকে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষাদানকালে সদ্‌গুরু জীবাত্মার চিতে স্বীয় জ্ঞানশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে বলবান করেন। ইহাই সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক শক্তিসঞ্চার।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ গীতা ১০।১১

—"যাহারা আমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাদিগকে কৃপা করিয়া আমি তাহাদের জীবাত্মার চিতে আমার জ্ঞানশক্তি সঞ্চারিত করিয়া অবিদ্যার দ্বারা উৎপন্ন অজ্ঞানান্ধকার নাশ করি।" সদ্‌গুরু দীক্ষাদান করিয়া স্বয়ং সারথ্য গ্রহণ করেন। যে অবিদ্যাশক্তির বলে দৈহিক দেবতাগণ বলবান, সদ্‌গুরুর সারথ্য এবং শক্তি প্রাপ্ত হইয়া বলবান চিৎ এখন সেই অবিদ্যাশক্তির সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করে। কৃষ্ণের সহিত পরিণয়লাভই তাঁহার সহিত জীবাত্মার অধ্যাত্মযোগ। অধ্যাত্মযোগ লাভ করিবার জন্য এই সংগ্রাম, এইজন্য ইহাই আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব। এই আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বই অধ্যাত্মযোগসাধনা, অর্থাৎ অধ্যাত্ম-যোগ-লাভের প্রয়াস। জীবাত্মার এই আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বই তাহার কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম। সারথি-সদ্‌গুরু মানবকে দ্বন্দ্ব এড়াইবার জন্য দ্বন্দ্বক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া যান না, পরন্তু ঘোরতর সংগ্রামের মধ্যে লইয়া গিয়া বলেন: "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।" গীতা ৩।৪৩।—"হে মহাবাহো, দুরভি-ভবনীয় শত্রু কামকে জয় কর।" তিনি তৎকালেই অভয় দানও করেন। "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" গীতা ১১।৩৩। আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই অভয়বাণীর অর্থ এই যে, "যখনই আমি সদ্‌গুরু-রূপে তোমার সারথ্য গ্রহণ করিয়াছি এবং তোমাতে আমার শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছি, তখনই কামক্রোধাদি শত্রুগণ নিহত হইয়াছে বলিয়াই জানিবে। কিন্তু তোমাকে স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে বধ করিতে হইবে।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও কৃষ্ণ সারথি হইয়াই ছিলেন, স্বয়ং যুদ্ধ করেন নাই। তাঁহার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে যুদ্ধ করিয়া, তাঁহার সারথ্যে এবং শক্তিতে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুন জয়ী হইয়া-

ছিলেন। আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও মানবকে ঐরূপেই সদ্‌গুরুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত তাঁহার আদেশ ও উপদেশ মত যোগসাধনা করিতে হইবে; তাহা হইলেই তাহার চিৎ আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বে অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করিয়া দ্বন্দ্বজয়ী হইবে। তখন চিৎ দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত হইবে, অহম্-এর প্রেমের বিকাশ হইবে, জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত পরিণয় প্রাপ্ত হইবে এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানও লাভ করিবে। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অধ্যাত্ম-যোগসাধনা করিয়া পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, দ্বন্দ্বপরিণয়ের লীলায় ইহা অলঙ্ঘ্য নিয়ম। এই নিয়মানুসারে কার্য্য না করিলে পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত না হইয়া কৃষ্ণের দর্শন পাইলেও মানব মুক্তি পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাকে মানব ও দানব সকলেই দর্শন করে, কিন্তু দ্বন্দ্বাতীত না হইয়া দর্শন করে বলিয়া, কৃষ্ণেরই বিধান অনুসারে, সেই দর্শনের ফলে তাহারা মুক্তি, পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ করে না। অর্জ্জুন এবং উদ্ধব কৃষ্ণের লৌকিক লীলার সখা ছিলেন, এবং কৃষ্ণের সহিত একত্র অবস্থান করিতেন এবং তাঁহাকে দর্শনও করিতেন। কিন্তু তাঁহারা সেই একত্রাবস্থান এবং দর্শনের ফলে মুক্তি, পরিণয়, এবং বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহারা অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত না হইয়া তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান এবং তাঁহাকে দর্শন করিতেন। কৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে এবং ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে যোগসাধনা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। যদি কৃষ্ণের সহিত একত্রাবস্থান এবং কৃষ্ণকে দর্শনের ফলে তাঁহারা পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আর যোগসাধনা করিবার উপদেশ দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তাঁহাকে দর্শনকারী নরনারীগণকে যোগসাধনা করিবার উপদেশ দিতেন।

১০।১।১৮ গুরুশক্তি

দ্বন্দ্বপরিণয়ের লীলায় জীবাত্মাকে দ্বন্দ্বাতীত করিয়া আপনার সহিত পরিণয় দান করিবার ইচ্ছায় কৃষ্ণ যখন সদ্‌গুরুরূপে কার্য্য করেন, তখন তিনি স্বীয় জ্ঞানশক্তিকে গুরুশক্তিরূপে কার্য্যকারী করেন। তিনি যে জীবাত্মাকে পরিণয়

দান করিতে ইচ্ছা করেন, সেই জীবাত্মার চিত্তে গুরুশক্তিরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সারথ্য করেন। জীবাত্মার আধ্যাত্মিক সংগ্রামে কৃষ্ণের গুরুশক্তির সারথ্য কৃষ্ণেরই সারথ্য, কারণ কৃষ্ণ এবং তাঁহার শক্তি অভিন্ন। কৃষ্ণ যে স্বয়ং আসিয়াই দীক্ষা দান করেন, তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সদ্গুরু-অবতার, যুগাবতার, এবং কৃষ্ণ অভিন্ন। অধ্যাত্মযোগসিদ্ধ যে মহাপুরুষ মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণের সহিত পরিণয় পাইয়া বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এইরূপ মহাপুরুষে কৃষ্ণ, তাঁহার যুগাবতার, অথবা তাঁহার সদ্গুরু-অবতার গুরুশক্তির আবেশ করেন; তখন সেই মহাপুরুষ সদ্গুরু হয়েন। সদ্গুরু কৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার। কৃষ্ণ এবং সদ্গুরু অভিন্ন। শিষ্যের নিকট সদ্গুরু কৃষ্ণের স্বরূপ, কৃষ্ণ স্বয়ং তাহা বলিয়াছেন ;

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েৎ সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ভাগবত ১১।১৭।২৭

—"গুরুকে আমি (কৃষ্ণ) বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ আমিই গুরু, ইহা জানিবে। গুরুকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না। গুরুকে মনুষ্য মনে করিয়া অসূয়া করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময় (সুতরাং গুরুর পূজায় সকল দেবতার পূজা হয়)।" সদ্গুরু দীক্ষাদানকালে শিষ্যের জীবাত্মার চিত্তে স্বীয় গুরুশক্তির সঞ্চার করেন। এই সঞ্চারিত গুরুশক্তি চিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চিৎকে শক্তিশালী করে এবং আধ্যাত্মিক সংগ্রামে সারথ্যও করে। ইহাই সদ্গুরুর সারথ্য। সদ্গুরুর দ্বারা সঞ্চারিত শক্তিতে শক্তিমান হইয়া এবং গুরুশক্তিকে সারথি ও সহায়রূপে পাইয়া চিৎ বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বে জয়ী হইয়া দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত হয়, এবং পরিণয় ও বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। গুরুশক্তিকে সহায় এবং সারথি রূপে না পাইলে পরিণয় ও বিজ্ঞান লাভ করিবার সাধ্য কোন জীবাত্মারই নাই। জীবাত্মার চিত্তে গুরুশক্তির সঞ্চার না করিয়া এবং সারথ্য না করিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংও যদি মানবের অন্তরে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার সেই বিদ্যমানতার ফলে জীবাত্মা পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। কৃষ্ণের জ্ঞানশক্তি সকল জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ; এই পরমাত্মা এবং কৃষ্ণ অভিন্ন ; এই পরমাত্মা জীবাত্মার চিৎকে শুভ প্রেরণাও দান করেন, কিন্তু শক্তিসঞ্চার এবং সারথ্য করেন না বলিয়া পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের অন্তরে বিদ্যমানতা স্বত্ত্বেও জীবাত্মা পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। সকল জীবের

হৃদয়াকাশে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে কৃষ্ণ বিদ্যমান রহিয়াছেন; প্রত্যেক প্রাণীর জীবাত্মা প্রতিদিন সুষুপ্তিতে সেই বামনরূপী কৃষ্ণের সহিত মিলনও প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বামন জীবাত্মার চিতে শক্তিসঞ্চার করেন না এবং সারথ্যও করেন না বলিয়া তাঁহার হৃদয়াকাশে বিদ্যমানতা এবং সুষুপ্তিতে তাঁহার সহিত প্রাত্যহিক মিলনলাভ সত্ত্বেও জীবাত্মা পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং দেখা গেল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কৃষ্ণ জীবাত্মার সারথি হইয়া তাহার চিতে শক্তিসঞ্চার করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবাত্মা দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত হইতে পারে না, এবং পরিণয় ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। সদ্‌গুরু যাহার সারথি হইয়াছেন, শ্রুতি সেইরূপ ব্যক্তিকে "বিজ্ঞানসারথি" বলিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"। সেই বিজ্ঞান সদ্‌গুরুরূপে যাঁহার সারথি, তিনি বিজ্ঞানসারথি।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ কঠ ১।৩।৩৯

—"বিজ্ঞান অর্থাৎ সদ্‌গুরু যাহার সারথি, বল্গারূপ মন তাহার আয়ত্তাধীন হয়। যেহেতু মন ইন্দ্রিয়গণের নায়ক, মন আয়ত্তাধীন হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণও আয়ত্তাধীন হয়। এইরূপ ব্যক্তি মায়াময় সংসারমার্গের পরপার প্রাপ্ত হয়, এবং বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে।" সংসারমার্গের পরপারপ্রাপ্তির অর্থ দ্বন্দ্বজয় এবং মুক্তিলাভ; বিষ্ণুর পরমপদ-প্রাপ্তির অর্থ পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্তি। আমরা শ্রুতি হইতে পাইলাম যে, কৃষ্ণের জ্ঞানশক্তি যখন সদ্‌গুরুর কার্য্য করে, তখন তাহারই নাম গুরুশক্তি, এবং গুরুশক্তি জীবাত্মাকে দ্বন্দ্বজয়ী এবং মায়াতীত করিয়া পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত করায়। কৃষ্ণের জ্ঞানশক্তি গুরুশক্তি রূপে কার্য্য করে, তাহার কারণ এইযে, কৃষ্ণের মায়াশক্তি দ্বন্দ্বলীলায় অবিদ্যাশক্তি-রূপে যে অজ্ঞানতা সৃষ্টি করিয়া জীবাত্মার চিৎকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া দেহাভিমানী করে, অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করিয়া সেই অজ্ঞানাচ্ছন্নতা দূর করিবার জন্য জ্ঞানশক্তিরই প্রয়োজন। জ্ঞানশক্তিই গুরুশক্তি, শ্রুতি নিরূপিত এই তত্ত্ব গীতাও ঘোষণা করিয়াছেন।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ গীতা ১০।১১

আত্মভাবস্থ জ্ঞানদীপের দ্বারা কৃষ্ণ অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন, ইহা বলিয়া

তিনি জানাইলেন যে তাঁহার জ্ঞানশক্তিকে গুরুশক্তিরূপে জীবাত্মার চিতে সঞ্চারিত করিয়া অজ্ঞানাচ্ছন্নতা দূর করেন। গুরুগীতা "গুরু" শব্দের যে অর্থ দিয়াছেন, তাহাতেও এই তত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে।

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞাননাশকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥ গুরুগীতা

—"গু-কারের অর্থ অজ্ঞানান্ধকার; রু-কারের অর্থ তেজঃ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি। গুরু অজ্ঞানান্ধকারনাশক জ্ঞানশক্তিস্বরূপ পরমেশ্বর, ইহাতে সংশয় নাই।" গুরুগীতা গুরুর স্তবেও এই তত্ত্ব আরও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তত্ত্বমালাবিভূষিতম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ গুরুগীতা

—"অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ মানবের জ্ঞাননেত্র যিনি জ্ঞানশক্তিরূপ অঞ্জনশলাকার দ্বারা জ্ঞানরূপ অঞ্জন প্রয়োগ করিয়া উন্মীলিত করেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি। যিনি জ্ঞানশক্তির দ্বারা সমারূঢ় অর্থাৎ যাঁহাতে কৃষ্ণের জ্ঞানশক্তির আবেশ হইয়াছে, তত্ত্ববিজ্ঞানরূপ রত্নের মালার দ্বারা যিনি বিভূষিত, যিনি ভোগ হইতে মুক্তি দান করেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি।" এক্ষণে আমরা পাইলাম যে, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের চিদংশের জ্ঞানশক্তি যখন সদ্‌গুরুরূপে কার্য্যকারী হয়, তখন তাহারই নাম গুরুশক্তি। কৃষ্ণ যে সকল জীবাত্মাকে দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত করিয়া পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার ইচ্ছায় কেবল তাহাদিগকেই, তাঁহার গুরুশক্তির দ্বারা আবিষ্ট সদ্‌গুরু দীক্ষা দান করেন এবং দীক্ষাদানকালে গুরুশক্তিরূপে সারথ্য গ্রহণ করেন এবং জীবাত্মার চিতে জ্ঞানশক্তির সঞ্চার করেন। এইজন্য, শাস্ত্র এবং মহাজনগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বহু জন্মের বহু সাধনালব্ধ পুণ্যের ফলে মানবের সদ্‌গুরুলাভ হয়, এবং যাঁহার সদ্‌গুরুলাভ হয়, তিনি নিশ্চয়ই দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত হইয়া পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ করেন। সদ্‌গুরুলাভও কৃষ্ণের কৃপা লাভ।

আমরা পাইলাম, যে গুরুশক্তির সহায়ে জীবাত্মা অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করে,

তাহা কৃষ্ণেরই শক্তি এবং কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন। এই কারণেও কৃষ্ণ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মূল কারণ।

১০।১।১৯ শক্তির আবেশ এবং শক্তির সঞ্চার

শক্তির আবেশ ও শক্তির সঞ্চার একই বস্তু নহে। কৃষ্ণ অথবা তাঁহার অবতার যে মহাপুরুষের মধ্যে শক্তির আবেশ করেন, তিনি অথবা তাঁহার অবতার সেই শক্ত্যাবেশ-অবতারের মধ্যে সেই শক্তিরূপে অবস্থিত থাকেন, এবং যে কার্য্য সাধনের জন্য সেই শক্তির আবেশ করেন, সেই কার্য্য মানবসমাজের কল্যাণের জন্য সাধিত হয়, যাঁহার মধ্যে শক্তির আবেশ করেন তাঁহার নিজের কল্যাণের জন্য নহে। সদ্‌গুরু শক্ত্যাবেশ অবতার, কারণ কৃষ্ণ তাঁহার মধ্যে মানবসমাজের কল্যাণের জন্য গুরুশক্তির আবেশ করেন, তাঁহার নিজের কল্যাণের জন্য নহে। সদ্‌গুরু শিষ্যের মধ্যে যে গুরুশক্তির সঞ্চার করেন, তাহা সার্ব্বজনীন কল্যাণের জন্য নহে, তাহা কেবল শিষ্যের ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য, অর্থাৎ, সেই সঞ্চারিত শক্তির দ্বারা কেবল সেই শিষ্যই দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত হইয়া পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্যের মধ্যে সেই শক্তির সঞ্চার করিতে পারে না। এইজন্য, সদ্‌গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হইলেই কেহ সদ্‌গুরু এবং শক্ত্যাবেশ-অবতার হয় না।

১০।১।২০ সদ্‌গুরুদত্ত নাম : পরাবিদ্যা

আমরা পাইয়াছি যে, সদ্‌গুরু দীক্ষাদানকালে গুরুশক্তিরূপে শিষ্যের সারথ্য গ্রহণ করেন এবং শিষ্যের চিত্তে জ্ঞানশক্তির সঞ্চার করেন। দীক্ষাদানকালে তিনি শিষ্যকে অন্তরঙ্গ সাধনার জন্য যে নাম দান করেন, সেই নাম এবং কৃষ্ণ অভিন্ন, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং আমরা পাইলাম যে, সদ্‌গুরু-দত্ত নাম, নামদাতা সদ্‌গুরু, এবং নামী কৃষ্ণ, এই তিনই অভিন্ন। সদ্‌গুরু এবং তাঁহার দত্ত নাম অভিন্ন বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত নামেও গুরুশক্তি আছে। দীক্ষাদানকালে সদ্‌গুরু নামরূপে শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান থাকেন এবং নামই সারথ্য করেন। নাম, সদ্‌গুরু এবং তাঁহার গুরুশক্তি অভিন্ন বলিয়া নামের সারথ্যই গুরুশক্তির সারথ্য, গুরুশক্তির সারথ্যই সদ্‌গুরুর সারথ্য, এবং সদ্‌গুরুর সারথ্যই কৃষ্ণের সারথ্য। নামের অজপাসাধনার দ্বারা চিৎ নামের সহিত যুক্ত

হইয়া থাকে। এইরূপে চিতের সহিত যুক্ত নাম সারথ্যও করিতে থাকেন এবং চিতে জ্ঞানশক্তির সঞ্চারও করিতে থাকেন। চিৎ যখন এইরূপে অন্তরঙ্গ নামসাধনা করিতে থাকে, তখন অহম্ নামানন্দ সম্ভোগ করে। দৃঢ় নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের সহিত চিৎ নামসাধনা করিতে করিতে নামের শক্তিতে ক্রমশঃ অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করে এবং তাহার ফলে বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করিতে সমর্থ হয় এবং দ্বন্দ্বাতীত হয়। যোগীগণের জীবাত্মা যখন এই অবস্থা লাভ করে, তখন নাম ও নামদাতা সদ্‌গুরু নামীর স্বরূপে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ কৃষ্ণ রূপে দর্শন দান করেন। তখন জীবাত্মা মায়াতীত হইয়া মুক্তিলাভ করে; ইহার পর তাহার প্রেমের বিকাশ হয় এবং সে পরিণয় ও বিজ্ঞান লাভ করে। আমরা পাইলাম যে, সদ্‌গুরুদত্ত নামের অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বারা জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত পরিণয় লাভ করিয়া বিজ্ঞান লাভ করে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যদ্দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা পরাবিদ্যা। সদ্‌গুরুদত্ত নাম পরাবিদ্যা।

আমরা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মূল সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব প্রাপ্ত হইলাম, তাহা হইতে প্রমাণিত হইল যে কৃষ্ণ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মূল; ইহা কৃষ্ণের গোবিন্দ নামের অন্যতম কারণ।

১০।১।২১ সদ্‌গুরুদত্ত নাম এবং অন্যত্র প্রাপ্ত নাম: ইষ্টনাম

প্রশ্ন হইতে পারে: যখন কৃষ্ণ নাম এবং কৃষ্ণ অভিন্ন, তখন শাস্ত্রে বা অন্য কোন পুস্তকে অথবা যে কোন লোকের নিকটে প্রাপ্ত কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণ অভিন্ন। তাহা হইলে সদ্‌গুরুদত্ত নাম সাধনার দ্বারা মানব যেমন মায়ামুক্ত হইয়া পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অন্যত্র প্রাপ্ত নাম সাধনার দ্বারাও হইবে না কেন? উত্তর: কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণনাম অভিন্ন ইহা সত্য। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ গুরুশক্তির সঞ্চার না করিয়া যদি স্বয়ংও মানবের অন্তরে বিদ্যমান থাকেন অথবা প্রত্যক্ষ দর্শনও দান করেন, তথাপি মানব মায়ামুক্ত হইতে পারে না। ইহাও বলা হইয়াছে যে, বস্তুতঃ কৃষ্ণ প্রত্যেক জীবের মধ্যে পরমাত্মারূপে এবং বামনরূপেও নিয়ত বিদ্যমান আছেন, এবং প্রত্যেক জীব প্রতিদিন সুষুপ্তিতে বামনরূপী কৃষ্ণের সহিত মিলনও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কৃষ্ণের উক্তরূপ বিদ্যমানতার অথবা তাঁহার সহিত সুষুপ্তিতে প্রাত্যহিক মিলনের ফলেও কোন জীব মায়ামুক্ত

হইতে পারে না; কারণ কৃষ্ণ উক্তরূপে বিদ্যমান থাকেন কিন্তু গুরুশক্তির সঞ্চার করেন না। গুরুশক্তির সঞ্চার না করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণের বিদ্যমানতাও যদি মায়ামুক্ত না করে, তবে তাঁহার সহিত অভিন্ন তাঁহার নামও গুরুশক্তির সঞ্চার না করিয়া মানবের অন্তরে অথবা জিহ্বা কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে বিদ্যমান থাকিলেও মানবকে মায়ামুক্ত করেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ যাহাকে কৃপা করিয়া পরিণয় এবং বিজ্ঞান দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই সদ্‌গুরুরূপে শক্তিসমন্বিত নাম দান করেন এবং তাহার চিত্তে গুরুশক্তির সঞ্চার করেন। দ্বন্দ্বপরিণয়ের লীলায় গুরুশক্তির সহায়তায় দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া পরিণয় লাভ করিতে হইবে, ইহাই কৃষ্ণের বিধান। স্বয়ং কৃষ্ণও মায়াময় বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া এই বিধান লঙ্ঘন করেন না। কৃষ্ণ, কৃষ্ণচৈতন্য, বিজয়-কৃষ্ণ প্রভৃতি সকল অবতারই সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই নিয়মের অলঙ্ঘ্যতা শিক্ষা দিয়াছেন। শাস্ত্রে বা পুস্তকে পড়িয়া, অথবা সদ্‌গুরু নহেন এমন কাহারও নিকট শুনিয়া যে নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে নাম গুরুশক্তির সঞ্চার করেন না। যে নাম মানবকে দ্বন্দ্বাতীত করিবার জন্য মানবাত্মার চিত্তে জ্ঞানশক্তি সঞ্চার করেন এবং দ্বন্দ্বলীলায় সারথ্য করেন, তাহাকে শক্তিসমন্বিত নাম বলা হয়। সদ্‌গুরু ব্যতীত অন্য কেহ এইরূপ শক্তিসমন্বিত নাম দিতে পারেন না। এইজন্য, অন্যত্র প্রাপ্ত নামসাধনা করিয়া মানব দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত হইয়া পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। কৃষ্ণের সহিত পরিণয় প্রাপ্তি মানবের ইষ্ট, অর্থাৎ পরম কল্যাণ। সদ্‌গুরুদত্ত নাম সাধনা করিয়া মানব এই ইষ্ট লাভ করে বলিয়া সদ্‌গুরুদত্ত নামকে ইষ্টনাম বলা হয়। সদ্‌গুরু ইষ্টনাম এবং ইষ্ট দান করেন, এবং তিনি ও ইষ্টনাম অভিন্ন বলিয়া সদ্‌গুরুকে ইষ্টদেব বলা হয়। ইষ্টদেবের নিকট এই ইষ্টনাম প্রাপ্ত হইয়া সেই নামের অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বারাই মায়াতীত এবং পরিণয়প্রাপ্ত হওয়া যায়। শক্তিসমন্বিত ইষ্টনামই ভাগবতের ১১।২।৩৮ শ্লোকে উল্লিখিত "স্বপ্রিয়নাম"। এই শ্লোকে ভাগবত বলিয়াছেন যে স্বপ্রিয়নামের সাধনার ফলেই মানবের প্রেমবিকাশ এবং পরিণয়প্রাপ্তি হয়। মানব ইষ্টনাম দিতে পারে না, কেবলমাত্র সদ্‌গুরু ভগবানই ইহা দিতে পারেন। এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে : ইষ্টনাম ব্যতীত যদি ইষ্টলাভ না হয় তবে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের কোন ফল আছে কি? উত্তর : অতীব শুভ ফল আছে। শাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, হেলায় কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা

কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করিলেও শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; শ্রদ্ধার সহিত করিলে যে অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তাঁহার নাম-গুণ-লীলাও মঙ্গলময়। মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে শুভ ফল হইবেই, কারণ বস্তুগুণ কখনও ব্যর্থ হয় না। কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন এবং শ্রবণ নববিধা ভক্তিসাধনার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সাধনা। ইহার দ্বারা মানব মায়ামুক্ত হইতে না পারিলেও, মানব নামকীর্ত্তন করিলে তাহার পাপক্ষয় হয় এবং ক্রমশঃ তাহার সত্ত্বগুণ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তির মধ্যে দৈবী প্রকৃতি আসুরী প্রকৃতিকে অভিভূত করে। দৈবী প্রকৃতি এবং আসুরী প্রকৃতি উভয়ই মায়াবদ্ধ অবস্থার অন্তর্গত হইলেও মায়াবদ্ধ অবস্থায় দৈবী প্রকৃতি লাভ একটী বিরাট লাভ। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন এবং শ্রবণের ফলে মানব ক্রমশঃ দৈবী প্রকৃতি লাভ করে, এবং অধিকতর নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে থাকে। কৃষ্ণ বলিয়াছেন:

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ গীতা ৯।১৪

—"দৈবীপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দৃঢ় নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত আমার কীর্ত্তন করে, আমাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করে, এবং আমাতে নিত্য অবহিত হইয়া আমার ভজনা করে।" এইরূপ ভজনার ফলে ক্রমশঃ মানবের মন কৃষ্ণগত হয় এবং অধিকতর আনন্দের সহিত সে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতে থাকে।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ গীতা ১০।৯

—কৃষ্ণ বলিতেছেন, "মদ্গতচিত্ত এবং মদ্গতপ্রাণ ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া এবং আমারই কীর্ত্তন করিয়া তৃপ্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়।" নামকীর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া মানব কৃষ্ণে আত্মনিবেদন করে এবং কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু নিজের শক্তিতে মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া অতিশয় কাতর হয়; তখন কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সদ্গুরুরূপে তাহাকে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষার পর মানব গুরুশক্তির সহায়ে দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়ামুক্ত হইয়া পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ করে। ইহা কৃষ্ণের ঘোষণা।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ গীতা ১০।১০-১১

আমরা পাইলাম যে, কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন এবং শ্রবণ অতীব শুভফলদায়ক। জগতের সকল নরনারীই সদ্‌গুরু লাভ করিতে পারে না, কিন্তু সকল নরনারী কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া দৈবীপ্রকৃতি লাভ করিয়া জগতকে দেবভূমিতে পরিণত করিতে পারে। ইহাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সদ্‌গুরুদত্ত যোগসাধনায়ও দ্বিবিধ নাম সাধনই আছে; ইষ্টনামের অজপা সাধনা—ইহাই মূল অধ্যাত্ম যোগসাধনা, এবং ইহাই অন্তরঙ্গ নামসাধনা; কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন এবং শ্রবণ, ইহা বহিরঙ্গ নামসাধনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ পরমানন্দরূপী

১০।২।১ দেহাভিমানী মানবের পরমানন্দস্বরূপ বুঝিবার উপায়

অধ্যাত্মযোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যে সকল মানব কৃষ্ণের সহিত পরিণয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পরমানন্দরূপী কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবাত্মার চিৎ কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষরূপে জানিতেছেন এবং আনন্দ বা অহম্ কৃষ্ণকে পরমানন্দরূপে সম্ভোগ করিতেছেন। কৃষ্ণের পরমানন্দস্বরূপ তাঁহারাই জানেন এবং বুঝেন, কিন্তু তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারেন না, কারণ তাহা বর্ণনাতীত। যে সকল মানবের চিৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন, সেই সকল দেহাভিমানী মানবকে কৃষ্ণের পরমানন্দস্বরূপটীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে তাহার দেহাভিমানী অবস্থায় লব্ধ আনন্দের স্বরূপ বুঝিতে হয়। এইটী বুঝিলে পরমানন্দ কি, তৎসম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়, এবং তখন পরমানন্দ-

স্বরূপ কি, তাহা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারে। এইজন্য, আমরা প্রথমে দেহাভিমানী মানবের দ্বারা লব্ধ আনন্দের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

১০।২।২ আত্মিক সুখ এবং দৈহিক সুখ

অনন্দকে সুখও বলা হয়। "ভূমৈব সুখম্", এই শ্রুতিবাক্যের সুখের অর্থ আনন্দ। কৃষ্ণই শ্রুতির ভূমানন্দ, এবং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের আনন্দই এই শ্রুতিকথিত ভূমাসুখ। আনন্দ চিন্ময় রস এবং চিদ্বস্তু, অর্থাৎ আত্মিক বস্তু। সুতরাং, আনন্দকে যখন সুখ নামে অভিহিত করা হয়, তখন সুখের অর্থ আত্মিক সুখ বা আনন্দ। আত্মিক সুখ আনন্দ, সুতরাং আত্মিক সুখ চিন্ময় রস। আত্মিক সুখ বা আনন্দ আত্মাতেই আছে, আত্মাই দান করে, এবং আত্মাই সম্ভোগ করে। দেহমাত্রেই জড়বস্তু ; জড়দেহে আত্মিক সুখ নাই, জড়দেহ আত্মিক সুখ দিতে পারে না, এবং জড়দেহ আত্মিক সুখ সম্ভোগ করিতে পারে না। আত্মিক সুখ ব্যতীত আরও এক প্রকারের সুখ আছে ; ইহাকে দৈহিক সুখ বলা হয়। জড়দেহ কাম্য জড়বস্তুর সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধিতে যে তৃপ্তিদায়ক বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাই দৈহিক সুখ। দৈহিক সুখ জড়দেহেই আছে, জড়দেহেই উৎপন্ন হয়, এবং জড়দেহই ভোগ করে। গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে ইচ্ছা-দ্বেষ এবং সুখ-দুঃখকে ক্ষেত্রের অর্থাৎ জড়দেহের অংশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইচ্ছা-দ্বেষ এবং সুখ-দুঃখ দৈহিক বস্তু এবং জড় বস্তু। ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল ভোগ্য বিষয় পাইবার ইচ্ছাই এই ইচ্ছা ; ইহারই অন্য নাম কাম। নরনারীর পরস্পরের সঙ্গলাভের ইচ্ছাই কাম নামে সাধারণ্যে পরিচিত। বস্তুতঃ, কেবল এই ইচ্ছাই কাম নহে ; যে কোন ভোগ্যবিষয় পাইবার ইচ্ছাই কাম। এই কাম রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এবং ত্রিগুণময় দেহের অংশ। দ্বেষ কামের বিপরীত। দ্বেষের অর্থ প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি বিরক্তি। কামের সহিত আছে সুখ, দ্বেষের সহিত আছে দুঃখ। কাম বিষয়ভোগের দ্বারা চরিতার্থ হইলেই বুদ্ধিতে সুখের উদয় হয়। বুদ্ধিতে যতক্ষণ এই সুখ নামক তৃপ্তিদায়ক বিকার থাকে ততক্ষণ বুদ্ধি সুখভোগ করে। ইহাই দেহের সুখভোগ। প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি বিরক্তিই দ্বেষ। প্রতিকূল বিষয় বলিতে কেবল অপ্রীতিকর বস্তুই বুঝায় না ; অনুকূল বিষয়ের অভাব, অপ্রাপ্তি, এবং যাহা অনুকূল বিষয় প্রাপ্তির বিঘ্ন, তাহাও প্রতিকূল বিষয়।

এইরূপ প্রতিকূল বিষয়ের প্রাপ্তিতে বুদ্ধিতে যে অপ্রীতিকর বিকার উৎপন্ন হয়, তাহা দুঃখ। বুদ্ধি এই দৈহিক সুখদুঃখ ভোগ করে। দেহাভিমানী জীবাত্মার চিৎ বুদ্ধির সহিত আপনাকে অভিন্ন ভাবে বলিয়া বুদ্ধির সুখদুঃখকে স্বীয় সুখ-দুঃখ বোধ করে।

১০।২।৩ দেহাভিমানী মানবের আত্মিক সুখ

আমরা পাইয়াছি যে আত্মিক সুখ এবং আনন্দ একই বস্তু এবং ইহা চিন্ময় রস। জীবাত্মার অহম্ চিন্ময় বস্তু। মানব দেহাভিমানী হইলেও,অর্থাৎ তাহার জীবাত্মার চিৎ দেহাভিমানী হইলেও তাহার অহম্ দৈহিক সুখ গ্রহণ করে না এবং চাহেও না। চিন্ময় অহম্ চিন্ময় রসকেই শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর, এই পঞ্চবিধভাবে, অন্ততঃ উহাদের কোন এক ভাবে চাহে। কিন্তু এক জীবাত্মার অহম্ অন্য জীবাত্মার অহম্‌কে উহা দান করিলে তবে উহা প্রাপ্ত হয়। এক জীবাত্মার অহম্-এর সহিত অন্য একটী জীবাত্মার অহম্-এর শান্তভাবে যে চিন্ময় রসের আদানপ্রদান হয় তাহা শান্ত রস, দাস্যভাবে হইলে দাস্যরস, সখ্যভাবে হইলে সখ্যরস, বাৎসল্যভাবে হইলে বাৎসল্যরস, এবং মধুর-ভাবে হইলে মধুর রস। এই পঞ্চবিধ রসই আত্মিক সুখ। জীবাত্মার চিতের অজ্ঞানাচ্ছন্নতাবশতঃ মানব যখন দেহাভিমানী অবস্থায় থাকে, তখনও তাহার জীবাত্মার অহম্ আদানপ্রদানের দ্বারা আত্মিক সুখই সম্ভোগ করে। কিরূপে তাহা করে, তাহা বিবৃত করা হইতেছে। যখন কোন মানব অন্য কোন মানবের সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা করে, তখন তাহাদের অহম্-এর মধ্যে শান্ত রসের আদানপ্রদান হয়; এইরূপে দেহাভিমানী মানব শান্তরস সম্ভোগ করে। জগতে বহু মানবের সহিত বহু মানবের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ আছে; প্রভু এবং ভৃত্য পরস্পরকে স্ব স্ব যোগ্য সেবা-যত্ন করিবার কালে প্রভুর অহম্ এবং ভৃত্যের অহম্ পারস্পরিক আদানপ্রদানের দ্বারা দাস্যরস সম্ভোগ করে; এইরূপে দেহাভিমানী মানবের অহম্ দাস্যরস প্রাপ্ত হয়। জগতে মানব মানবের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়; সখাগণের অহম্ পারস্পরিক আদান-প্রদানের দ্বারা সখ্যরস সম্ভোগ করে; এইরূপে দেহাভিমানী মানবের অহম্ সখ্যরস প্রাপ্ত হয়। জগতের পিতা-মাতা এবং সন্তানের অহম্ পারস্পরিক আদান-প্রদানের দ্বারা বাৎসল্যরস সম্ভোগ করে; এইরূপে দেহাভিমানী মানবের অহম্

বাৎসল্যরস প্রাপ্ত হয়। জগতের নর-নারীর অহম্ পারস্পরিক আদানপ্রদানের দ্বারা মধুর রস সম্ভোগ করে; এইরূপে দেহাভিমানী মানবের অহম্ মধুর রস প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক দেহাভিমানী মানবের ব্যক্তিগত জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার দেহের দৈহিক সুখের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা তাহার আত্মিক অহম্-এর আত্মিক সুখের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর; বস্তুতঃ, তাহার আত্মিক অহম্-এর আত্মিক সুখের আকাঙ্ক্ষাই প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা; আত্মিক সুখই প্রিয়তম সুখ, এবং সে যাহার নিকট হইতে আত্মিক সুখ প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তিই তাহার প্রিয়তম বস্তু। এইজন্যই জগতে প্রভু-ভৃত্য পরস্পরের জন্য, সখাগণ পরস্পরের জন্য, পিতামাতা এবং সন্তান পরস্পরের জন্য এবং পতিপত্নী পরস্পরের জন্য ধন মান ঐশ্বর্য্য সম্পদ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া দেয়; এরূপ বহু ঘটনা জগতে নিত্যই ঘটিতেছে। অর্থ দেহাভিমানী মানবের অতি প্রিয় বস্তু; কিন্তু সখার, পতির, পত্নীর, পিতার, মাতার, অথবা সন্তানের পীড়া হইলে অথবা অন্য কোনরূপ প্রাণ-সংশয়কর বিপদ উপস্থিত হইলে তাহার জীবনরক্ষার জন্য মানব যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেছে, এরূপ বহু ঘটনা জগতে নিত্য ঘটিতেছে। ইহার কারণ এই যে, মানব দেহাভিমানী হইলেও আত্মিক সুখই তাহার প্রিয়তম সুখ, এবং যাহার সহিত সেই সুখের আদানপ্রদান হয়, সে তাহার প্রিয়তম বস্তু। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রভু-ভৃত্যের, সখাগণের, মাতাপিতা-সন্তানের, পতিপত্নীর পরস্পরের প্রিয়তমত্বের কারণ তাহাদের দেহ নহে, তাহাদের জীবাত্মার অহম্। শ্রুতি নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে এই তত্ত্বই ঘোষণা করিয়াছেন :

> ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।...ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। বৃহদারণ্যক। ২।৪।৫ এবং ৪।৫।৬

এই শ্রুতিবাক্যের মর্ম্মার্থ এই যে :—"পতি ও পত্নী পরস্পরের প্রিয় হয়; তাহাদের পরস্পরের দেহের প্রতি দেহের কাম তাহাদের এই প্রিয়ত্বের কারণ

নহে ; ইহার কারণ, পতির দেহে জীবাত্মা আছে এবং পত্নীর দেহে জীবাত্মা আছে ; তাহাদের উভয়েরই জীবাত্মার অহম্-এর আত্মিক সুখ পাইবার আকাঙ্ক্ষা আছে ; এই আকাঙ্ক্ষাই মানবের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা ; পতির আত্মিক অহম্ এবং পত্নীর আত্মিক অহম্ পারস্পরিক আদানপ্রদানের দ্বারা এই আত্মিক সুখ প্রাপ্ত হয় ; এইজন্য পতির আত্মিক অহম্ এবং পত্নীর আত্মিক অহম্ পরস্পরের প্রিয় ; এই আত্মিক প্রিয়তার জন্যই পতিপত্নী পরস্পরের প্রিয় হয়। মাতাপিতাসন্তান, সখাগণ, প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। বিত্তসম্পদ মানবের স্বীয় দৈহিক কামের সার্থকতায় সহায়তা করে বলিয়া যে বিত্তসম্পদ মানবের প্রিয় হয়, তাহা নহে। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য বা মধুর রস যাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিত্তসম্পদের দ্বারা মানব তাহাকে সুখী করিতে পারে বলিয়াই বিত্তসম্পদ তাহার নিকট প্রিয় হয়। সুতরাং, জগতে মানবের যাহা কিছু প্রিয়বস্তু আছে, তৎসমুদয়েরই প্রিয়তার কারণ আত্মার প্রতি আত্মার প্রিয়তা—আত্মিক অহম্-এর প্রতি আত্মিক অহম্-এর প্রিয়তা।" এই যে তত্ত্ব আমরা পাইলাম, ইহা যে কেবল দেহাভিমানী মানব সম্বন্ধেই সত্য তাহা নহে, মানবেতর প্রাণীগণ সম্বন্ধেও সত্য। প্রাণীজগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, হস্তী অশ্ব কুক্কুর পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণ প্রভুর, সখার, স্বামীর, জায়ার, এবং সন্তানের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে। দেহাভিমানী মানব, এবং মানবেতর প্রাণীগণও, এইরূপে পারস্পরিক আদানপ্রদানের দ্বারা আত্মিক সুখ প্রাপ্ত হয়, এবং প্রতিদিন সুষুপ্তিতে সর্ব্বরস কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াও আত্মিক সুখ প্রাপ্ত হয় বলিয়াই জীবাত্মা দেহে থাকিতে পারে ; নতুবা দেহ কামের বশে বিষয় ভোগ করিয়া যতই দৈহিক সুখ ভোগ করুক না কেন, তথাপি দেহের মৃত্যু হইতে।

১০।২।৪ পরমানন্দ

আমরা পাইলাম যে, আত্মিক সুখ বা আনন্দ শ্রেষ্ঠতম সুখ ; ইহাই সকল জীবের প্রিয়তম, বাঞ্ছিততম, এবং প্রয়োজনীয়তম বস্তু। আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে, এই আনন্দ চিন্ময় রস, ভাবাতীত ভাব, পরমভাব। দেহাভিমানী মানবের আত্মিক অহম্ পারস্পরিক আদানপ্রদানের দ্বারা যে প্রিয়তম, বাঞ্ছিত-তম, প্রয়োজনীয়তম আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তাহা পরমভাব বলিয়া সেই আনন্দ

পরমানন্দ। কিন্তু জীবাত্মা কৃষ্ণের চিদানন্দের অতি ক্ষুদ্র অংশ, অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, শ্রুতিবাক্য (শ্বেত ৫।৯) হইতে আমরা এই তত্ত্ব পাইয়াছি। জীবাত্মার অতি ক্ষুদ্র অহমে যে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস আছে তাহাও অতি ক্ষুদ্র এবং, এই কারণে, মানবগণ পরস্পরের নিকট হইতে যে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি ক্ষুদ্র; দেহের নশ্বরতাহেতু তাহা ক্ষণস্থায়ী; দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে অবস্থানহেতু স্বার্থের দ্বন্দ্ব সেই ক্ষুদ্র পরমানন্দের সম্ভোগেও অন্তরায় হয়। এইজন্য, জীবাত্মার অহম্ এই ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী পরমানন্দে তৃপ্ত হইতে পারে না, সোঽহম্ কৃষ্ণকে লাভ করিয়া তাঁহার অনন্ত পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে চাহে এবং কৃষ্ণের সহিত পরিণয়লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকে। এই তত্ত্বটীকে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ একটী সুন্দর উপমার দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "জনশ্রুতি আছে যে, চাতক কখনও পার্থিব জল পান করে না; সে ঊর্দ্ধমুখে ফটিক জলের আশায় আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে। পিপাসায় প্রাণ গেলেও চাতক পৃথিবীস্থ জলাশয়সমূহের জল পান করে না। ফটিক জল না হইলে সে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তবু অন্য জলে সে তৃপ্ত হয় না।...আমাদের আত্মার স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাও চাতকের মত পৃথিবীর কোন সুখে চিরাসক্ত—চিরতৃপ্ত থাকিতে পারে না। আত্মা ঊর্দ্ধমুখে সেই পরমেশ্বরের প্রেম-ফটিক জলের জন্য লালায়িত। যতদিন তাহা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহার তৃপ্তি নাই।" দেহাভিমানী মানব অজ্ঞানাচ্ছন্নতাবশতঃ আত্মিক অহম্-এর এই অতৃপ্তির এবং উৎকণ্ঠার কারণ বুঝিতে পারে না; এইজন্য সর্ব্ববিধ জাগতিক সুখভোগের মধ্যে থাকিয়াও তাহার অন্তরাত্মায় একটী অতৃপ্তির দুঃখ অনুভব করে। অর্থসম্পদ, যশমান, আত্মীয়পরিজন প্রভৃতি কাম্যবস্তুসমূহ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন দেহাভিমানী মানবের নিকট গিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "তুমি কি সব পাইয়া আকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া পরাশান্তি পাইয়াছ?" তাহার নিকট উত্তর পাওয়া যাইবে, "না, আমি সব পাই নাই, আকাঙ্ক্ষাহীন হই নাই, এবং পরাশান্তি পাই নাই।" জগতের সকল বস্তু, এমন কি সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হইলেও জীবাত্মার অহম্-এর "সব" পাইবার, অর্থাৎ ভূমা পরমানন্দকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়; কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনন্ত আনন্দ সম্ভোগ করিলে এই "সব" পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। প্রাচীন কাল হইতে আজও পর্য্যন্ত জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা

করিলে দেখা যাইবে, প্রভূত অর্থসম্পদ, যশমান, আত্মীয়পরিজন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন কত ব্যক্তিও ভূমা পরমানন্দ লাভ করিয়া "সব" পাইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য তৎসমুদয়ই ত্যাগ করিয়াছেন। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা দেহাভিমানী মানব যখন বুঝিতে পারে যে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত না হইলে তাহার অহম্-এর "সব" পাইবার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না, তখন সে কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য যত্নবান হয়।

১০।২।৫ পরমানন্দরূপী কৃষ্ণ রসরাজ

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের সর্ব্বরস আনন্দই অনন্ত পরমানন্দ। অন্দরলীলায় কৃষ্ণ পরমানন্দরূপী। অন্দরলীলায় পরমানন্দরূপী কৃষ্ণ রসরাজ। অন্দরলীলার পরিকরগণের সহিত তাঁহার অনন্ত পরমানন্দের নিত্য আদান প্রদান। অন্দর-লীলার দাস্যভাবের পরিকরগণের সহিত লীলায় পরমানন্দরূপী কৃষ্ণ নিত্য দাস্য-রসরূপী প্রভু, বাৎসল্যভাবের পরিকরগণের সহিত লীলায় নিত্য বাৎসল্যরসরূপী গোপাল, সখ্যভাবের পরিকরগণের সহিত লীলায় নিত্য সখ্যরসরূপী রাখাল, মধুরভাবের পরিকরগণের সহিত লীলায় নিত্য মধুররসরূপী রসরাজ স্মরতনাথ। ইহাই কৃষ্ণের পরমানন্দরূপ। সর্ব্বত্র সকল লীলাতেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের আনন্দ অনন্ত পরমানন্দ; কিন্তু গোবিন্দ নামের অর্থসূত্রে কৃষ্ণের যে পরমানন্দস্বরূপটী সূচিত হইয়াছে, তাহা অন্দরলীলায় কৃষ্ণের এই কেবল পরমানন্দস্বরূপ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ বেদবেদ্য

১০।৩।১ কৃষ্ণ বেদের প্রতিপাদ্য

কৃষ্ণের গোবিন্দ নামের অর্থসূত্রে আমরা পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ বেদবেদান্তবেদ্য, ইহা তাঁহার গোবিন্দ নামের অন্যতম কারণ। বেদ ও বেদান্ত ভিন্ন নহে, কারণ বেদান্ত বেদের অন্তর্গত, তথাপি বেদবেদান্তবেদ্য বলিবার কারণ এই যে, ঋক্ সাম যজুঃ অথর্ব্ব এই চারিবেদের প্রত্যেকটী আবার দুইভাগে বিভক্ত।

পূর্ব্বভাগ বা প্রথমভাগ কর্ম্মকাণ্ডাত্মক, এবং উত্তরভাগ বা শেষভাগ জ্ঞানকাণ্ডাত্মক। শেষভাগকে বেদান্ত বলা হয়। কর্ম্মকাণ্ডাত্মক পূর্ব্বভাগও পরাৎপর পরমেশ্বর কৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদান্তও পরাৎপর পরমেশ্বর কৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইবার জন্য অর্থসূত্রে "বেদবেদান্তবেদ্য" বলা হইয়াছে। বেদ কৃষ্ণকে প্রতিপাদন করিয়াছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া কৃষ্ণ বেদবেদ্য। কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ কৃষ্ণকে যজ্ঞব্রহ্ম, অধিযজ্ঞ, এবং যজ্ঞেশ্বর রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

১০।৩।২ বৈদিক যজ্ঞ ঃ বেদবিহিত প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম্ম

গো শব্দের একটী অর্থ বেদ, অন্য একটী অর্থ যজ্ঞ। কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ যে সকল যজ্ঞের বিধান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতকগুলির অনুষ্ঠানের দ্বারা ইহলোকে অভিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য কতকগুলির অনুষ্ঠানের দ্বারা মৃত্যুর পরে স্বর্গলোক লাভ করা যায়। এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে ঃ বেদের কর্ম্মকাণ্ড ইহলোকে এবং পরলোকে যে সকল সুখপ্রাপ্তির বিধান করিয়াছেন তৎসমুদয়ই বিষয়সুখ ; মানব কামনাতৃপ্তির জন্য এই সকল সুখ চাহিয়া থাকে। শাস্ত্রই বলিয়াছেন ঃ

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ভাগবত ৯।১৯।১৩-১৪

—রাজা যযাতি দেবযানীর সহিত বহুদিন কামোপভোগের পর বলিতেছেন, "পৃথিবীতে যত ধান্যযবগোধূমাদি শস্য আছে, যত স্বর্ণ আছে, যত পশু আছে, এবং যত নারী আছে, তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইলেও কামনাপরবশ পুরুষের মন তৃপ্ত হইতে পারে না ; কারণ বিষয়সমূহের উপভোগের দ্বারা কাম কখনও নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু, যতবার ঘৃত সিঞ্চন করা যায়, অগ্নি যেমন ততবারই প্রজ্জ্বলিত হইয়া বর্দ্ধিতই হইতে থাকে, তদ্রূপ পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগের দ্বারা কামনা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়।" সুতরাং, বেদ কাম্যবস্তুপ্রাপ্তির বিধান করিয়া মানবের কামনাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কৃষ্ণকে প্রতিপাদন করিলেন কিরূপে ? গীতায় কৃষ্ণই বলিয়াছেন ঃ "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" গীতা

২।৪৫।—"ত্রিগুণময় দেহের ত্রিগুণময় ভোগ বিধান কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদের বিষয়। হে অর্জ্জুন, তুমি ত্রিগুণের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত হও।"

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ গীতা ৯।২১

—"সকাম ব্যক্তিগণ বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করে, কিন্তু যতদিন তাহাদের যজ্ঞলব্ধ পুণ্য থাকে ততদিনই তাহারা স্বর্গে সুখ ভোগ করে, পুণ্যক্ষয় হইলেই আবার মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে, ভোগকামনা-পরবশ ব্যক্তিগণ বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।" কৃষ্ণ ঘোষণা করিলেন যে স্বর্গভোগও নশ্বর; পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা ত দূরের কথা, পুনর্জন্ম হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। তাহা হইলে কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ কৃষ্ণকে প্রতিপাদন করিলেন কিরূপে? উত্তর: উক্ত শ্লোকগুলিতে কৃষ্ণ বেদের নিন্দা করেন নাই; কামনামূলক বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মানব মায়াতীত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে না, অনন্যচিন্ত হইয়া কৃষ্ণের ভজনার দ্বারাই মানব তাঁহার কৃপায় মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন। গীতায় কৃষ্ণ জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, এবং ভক্তিযোগ, এই ত্রিবিধ যোগের যুগপৎ সাধনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। গীতার কর্ম্মযোগের অর্থ কর্ম্মত্যাগ নহে; কর্ম্মফলের বাসনা না রাখিয়া এবং কর্ম্মফল কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য কৃষ্ণের প্রীতিজনক কর্ম্মানুষ্ঠানই গীতার কর্ম্মযোগ, এবং ইহাই নিবৃত্তিমার্গের কর্ম্ম। কিন্তু মানবদেহের ত্রিগুণময়ত্বহেতু মানবের বুদ্ধিতে স্বতঃই বিষয়-ভোগের কামনার উদয় হয়। ইহাই মানবের দৈহিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির বশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম্ম। মানব যদি অসংযত প্রবৃত্তির বশে তাহার প্রবৃত্তিমার্গ নিজেই গঠন করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার প্রবৃত্তি ক্রমশঃই উদ্দাম হইতে থাকে, কারণ ভোগের দ্বারা কামনা নিবৃত্ত না হইয়া অধিকতর উদ্দাম হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কামপরবশ যথেচ্ছাচারী মানব স্বগঠিত প্রবৃত্তিমার্গে চলিতেছে বলিয়া জগতে নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই আছে এবং লোকক্ষয়কারী হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে। মানব যদি চিরকাল স্বগঠিত প্রবৃত্তিমার্গেই চলে, সে কখনও নিবৃত্তিমার্গে

আসিতেই পারিবে না, সুতরাং কখনই কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। প্রবৃত্তিপরবশ মানব সহসা নিবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করিতে পারে না। প্রবৃত্তিকে সর্ব্বদা সংযত করিয়া অভ্যাসের দ্বারা মানব অবশেষে প্রবৃত্তিকে সুসংযত করিতে পারে এবং তখন নিবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করিতে পারে। প্রবৃত্তিপরবশ মানব কামনা-মূলক কর্ম্ম করিবেই, কিন্তু যেরূপভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রবৃত্তি উদ্দাম না হইয়া ক্রমশঃ সংযত হইয়া আসিবে, কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদে কৃষ্ণ সেইরূপভাবে কামনামূলক কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন। বেদবিহিত এই সকল কর্ম্মকে যজ্ঞ বলা হয়। এই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান বেদবিহিত প্রবৃত্তিমার্গ। বেদ কৃষ্ণেরই দান, সুতরাং বেদবিহিত প্রবৃত্তিমার্গ তাঁহারই বিধান। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক বিহিত প্রবৃত্তিমার্গে চলিতে হইলে মানবকে ত্যাগের অভ্যাস করিতে হয়।

১০।৩।৩ বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা ত্যাগের অভ্যাস ঃ যজ্ঞনীতি

সাধারণতঃ মানব যথেচ্ছাচারী এবং স্বার্থপর থাকে। সে নিজের চারিদিকে স্বার্থের উচ্চ প্রাচীর গড়িয়া লইয়া সেই গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া কেবল নিজের ভোগের জন্য প্রচুর ধনসম্পদ লাভের আশায় কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মলব্ধ সমগ্র ধনসম্পদের কতকাংশ নিজ প্রিয় আত্মীয়স্বজনসহ ভোগ করে এবং কতকাংশ সঞ্চয় করিয়া রাখে। শাস্ত্র এইরূপ কার্য্যকে পাপকার্য্য বলিয়াছেন এবং যাহারা এইরূপ কার্য্য করে, তাহাদিগকে চোর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। "কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।" ঋক্ ১০, ১১৭, ৬—"যে কেবল নিজেই খায়, সে কেবল পাপই করে।" "অঘং স কেবলং ভুংক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।" মনু ৩।১১৮—"যে কেবল আপনার জন্য রন্ধন করে, সে পাপ ভোগ করে।" ভুঞ্জতে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।" গীতা ৩।১৩—"যাহারা কেবল নিজের জন্য রন্ধন করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে।"

যাবদ্ ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥ ভাগবত ৭।১৪।৮

—"যে পরিমাণ অর্থে উদরপূর্ণ ভোজন হয়, অর্থাৎ সহজ ও সরলভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ হয়, সেই পরিমাণ অর্থেই মানবের অধিকার। যে ব্যক্তি তদতিরিক্ত ধন আত্মসাৎ করে, সে চোর এবং দণ্ডের যোগ্য।" এই নীতি

অনুসারে জগতের অনেক মানবই চোর। আমরা পাইলাম যে, মানবের স্বোপার্জ্জিত ধনসম্পদের মধ্যেও অন্যের প্রাপ্য অংশ আছে, এবং যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা না দিয়া সমগ্র স্বোপার্জ্জিত ধনসম্পদকেও আত্মসাৎ করিলে চুরি করা হয়। শাস্ত্র কেবল স্বোপার্জ্জিত ধনসম্পদ সম্বন্ধেই ইহা বলেন নাই; যে মানব স্বীয় চেষ্টায় জ্ঞান লাভ করিয়া অন্যকে সেই জ্ঞান দান করে না, এরূপ মানবকে শাস্ত্র "জ্ঞানখল" বলিয়াছেন (ভাগবত। ১০।২।১৯)। জ্ঞানখল শব্দের অর্থ জ্ঞানবঞ্চক। স্বয়ং জ্ঞান লাভ করিয়া অজ্ঞানীকে সেই জ্ঞান দান না করিলে তাহাকে সেই জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করা হয়। যাহারা অজ্ঞানীকে লব্ধ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করে তাহারা জ্ঞানখল বা জ্ঞানবঞ্চক, ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা। ঋষিমুণিগণ লব্ধ জ্ঞান অজ্ঞানীগণকে দিবার জন্যই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ভগবানও তাঁহার অনন্ত জ্ঞান অজ্ঞান মানবকে দিবার জন্য বেদবেদান্ত গীতা প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাইলাম যে, অর্জ্জিত ধনসম্পদ বা জ্ঞান দান না করিলে চৌর্য্য হয়। অর্জ্জিত ধনসম্পদ এবং জ্ঞান কাহাদের প্রাপ্য এবং কাহাদিগকে দান করিতে হইবে, বেদ তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং তদনুসারে পঞ্চবিধ যজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। যজ্ঞকারী ব্যক্তি যে বস্তু দান করে, সেই বস্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে যজ্ঞের দ্বারা ত্যাগের অভ্যাস হইতে থাকে। বেদ যজ্ঞের দ্বারা সংসারী মানবগণের জন্য এই যে দ্রব্যত্যাগের নীতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ইহাই বৈদিক যজ্ঞনীতি। এই যজ্ঞনীতি ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিবৃত্তিমার্গের নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুসরণের নিমিত্ত যজ্ঞনীতির অনুসরণ প্রাথমিক ক্রিয়া। সংসারী মানবগণ যজ্ঞনীতির অনুসরণ করিলে আধুনিক জগতের সমানাধিকার নীতির (Communism) এবং ধনিকনীতির (Capitalism) মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়। সমানাধিকারনীতির অনুসরণকারীগণ বলেন, জগতের সকল সম্পদে সকল মানবের সমান অধিকার আছে, কোন এক জন অধিক ধন অধিকার করিয়া অন্যকে তাহার ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, একের দ্বারা অন্যকে বঞ্চনা নিবারণ করিবার জন্য রাষ্ট্রকে সমস্ত সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করিয়া সকলকে তাহা বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। ধনিকনীতির অনুসরণকারীগণ বলেন, জগতের সকল সম্পদে সকল মানবের সমান অধিকার থাকা মানিয়া লইলেও,

কোনও একজন স্বীয় বুদ্ধিশক্তি এবং দৈহিক শক্তির দ্বারা যদি অধিক সম্পদ উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার স্বোপার্জ্জিত সেই সম্পদে তাহার অধিকার আছে, সে অন্য ব্যক্তির উপার্জ্জনের অক্ষমতার জন্য দায়ী নহে, রাষ্ট্র সকল সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করিতে পারে না, এরূপ করিলে প্রত্যেক মানবের বুদ্ধিশক্তিকে এবং দৈহিক শক্তিকে ব্যাহত করা হইবে। বৈদিক যজ্ঞনীতি অনুসারে, সংসারী মানব স্বীয় বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের দ্বারা অধিক সম্পদ উপার্জ্জন করিতে পারে, এরূপ করিবার অধিকার তাহার আছে, কিন্তু তাহার নিজের এবং গৃহস্থ পরিজনগণের সহজ ও সরলভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন, স্বোপার্জ্জিত সম্পদের মধ্যে কেবলমাত্র সেই পরিমাণই সে উক্তরূপ নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিতে পারে, তাহার অতিরিক্ত সম্পদ স্বোপার্জ্জিত হইলেও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরহিতার্থে ত্যাগ করিতে হইবে। জগতের সকল মানব বৈদিক যজ্ঞনীতির অনুসরণ করিলে জগতে Cummunism এবং Capitalism এর দ্বন্দ্ব থাকে না।

১০।৩।৪ পঞ্চযজ্ঞ

বেদবিহিত পঞ্চযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া প্রদর্শিত হইতেছে, কিরূপে সর্ব্ববিধ যজ্ঞই দ্রব্যত্যাগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই পঞ্চবিধ যজ্ঞের নাম :—(১) নৃযজ্ঞ (২) ভূতযজ্ঞ (৩) পিতৃযজ্ঞ (৪) ঋষিযজ্ঞ (৫) দেবযজ্ঞ। এই সকল যজ্ঞের মধ্যে কতকগুলির বিশেষ বিবরণ এবং ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, তজ্জন্য সেই-গুলিকে স্মার্ত্ত যজ্ঞ বলা হয়। যে সকল যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ এবং ব্যবস্থা শ্রুতিতে আছে, সেইগুলিকে শ্রৌত যজ্ঞ বলা হয়। স্মার্ত্ত যজ্ঞ শ্রৌত যজ্ঞ হইতে বিভিন্ন নহে। স্মার্ত্ত যজ্ঞগুলির মূল নীতি বেদেই আছে, স্মৃতিশাস্ত্র তৎসমুদয়কে বিস্তৃত-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য, উক্ত পঞ্চবিধ যজ্ঞই বেদবিহিত যজ্ঞ। নৃযজ্ঞের অর্থাৎ মনুষ্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানে মানবকল্যাণে দ্রব্যত্যাগ করিতে হয়। বেদ ইহার সাধারণ নাম দিয়াছেন ইষ্টাপূর্ত্ত। মনুষ্যের কল্যাণের নিমিত্ত পুষ্করিণী এবং কূপ খনন, পথনির্ম্মাণ, বৃক্ষরোপণ, পান্থশালা, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা, চিকিৎসা-লয়, আতুরাশ্রম, বিদ্যালয়, মঠ প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ এবং পরিচালনা, অন্নসত্রস্থাপন, ব্রাহ্মন, সাধুসজ্জন, অতিথি, অনাথ, আতুর, দরিদ্র, সকলের যথাযোগ্য সেবা এবং সকলকে যথাযোগ্য অন্নবস্ত্র এবং অর্থাদি দান—

এই সকল এবং এবম্বিধ জনহিতকর কার্য্যসকল ইষ্টাপূর্ত্ত যজ্ঞ এবং এইগুলির প্রত্যেকটী এক-একটী নৃযজ্ঞ। বেদ জলাশয়, বৃক্ষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মন্ত্র, বিধি প্রভৃতি দিয়াছেন। ভূতযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ভূতগণের অর্থাৎ সকল প্রণীগণের কল্যাণে দ্রব্যত্যাগ করিতে হয়। পশুপক্ষীগণকে আহার্য্যপানীয় দান, রুগ্ন বৃদ্ধ অক্ষম গোমহিষাদি পশুগণের আশ্রয় এবং চিকিৎসার জন্য পশুশালা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভূতযজ্ঞের অন্তর্গত। পিতৃযজ্ঞে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত দ্রব্যত্যাগ করিতে হয়। তর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পিতৃযজ্ঞের অন্তর্গত। পিতৃপুরুষগণের তর্পণ শ্রাদ্ধ যাহাতে লোপ না পায়, তজ্জন্য বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, পুত্রপালন প্রভৃতিও পিতৃযজ্ঞের অন্তর্গত। ইহার জন্য মানবকে কত ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, তাহা সকলেরই সুবিদিত। ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন, এবং অধ্যাপনা অর্থাৎ অজ্ঞানীগণকে অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানদান, ঋষিযজ্ঞ। দেবযজ্ঞে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ করিতে হয়। মন্দির এবং দেবতা প্রতিষ্ঠা, উপচারসহ দেবতার পূজা, হোম, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দেবযজ্ঞ। রাজসূয় যজ্ঞ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ দেবযজ্ঞের মধ্যে বৃহত্তম। এই দুইটী বিরাট যজ্ঞের যে কোনটীর অনুষ্ঠানে এককালে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, কারণ রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে মানবের এবং মানবেতর প্রাণীগণের কল্যাণের জন্য বহুবিধ কার্য্য করিতে হয়, পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ-শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এবং শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও করিতে বা করাইতে হয়। বেদ এই সকল যজ্ঞের বিধি, বিধান, অনুষ্ঠানপ্রণালী, মন্ত্র প্রভৃতি দিয়াছেন।

১০।৩।৫ বৈদিক প্রবৃত্তিমার্গ বৈদান্তিক নিবৃত্তিমার্গের সোপান

আমরা পাইলাম যে, সকল বৈদিক যজ্ঞেই ত্যাগস্বীকার আছে। যজ্ঞকারী মানব যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবার কামনায় এই ত্যাগ স্বীকার করে, কিন্তু তাহা হইলেও সে যথেচ্ছাচারী হইতে পারে না, তাহার উদ্দাম প্রবৃত্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে, সে ক্রমশঃ ত্যাগে অভ্যস্ত হয়, এবং তাহার স্বার্থের গণ্ডী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে অবশেষে লুপ্ত হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলিয়া গীতা যজ্ঞকে পাবন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধকারী বলিয়াছেন।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞ দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ গীতা ১৮।৫

—"যজ্ঞ দান তপস্যা রূপ কর্ম্ম কদাচ পরিত্যাজ্য নহে; উহা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য, কারণ উহা বিবেকী মনুষ্যগণের চিত্তকে শুদ্ধ করে।"

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। গীতা ৩।১৩

—"যাহারা যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ধনসম্পদ ভোগ করে, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।" আমরা পাইলাম যে, গীতা বেদকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ঘোষণা করিয়া, ত্রিগুণাতীত হইবার উপদেশ দিয়া, আবার বেদবিহিত যজ্ঞকে পাবন ও পাপনাশকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিলেন। ইহা পরস্পরবিরোধী উপদেশ নহে। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার জন্য মানবকে নিবৃত্তিমার্গ-অবলম্বনে ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে, কিন্তু ত্রিগুণময় দেহ-বিশিষ্ট মানবের পক্ষে সহসা ইহা সম্ভব নহে। ত্রিগুণপ্রভাবে মানব বিষয়ভোগের কামনা এবং বিষয়ভোগ করিবেই; সে যথেচ্ছাচারী হইলে এই কামনা এবং ভোগ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে না এবং তাহার সেই ভোগ সম্পূর্ণ ত্যাগহীন ভোগ হইবে। বৈদিক প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে ভোগের এবং ত্যাগের পথে চলিতে চলিতে ত্যাগ তাহার অভ্যস্ত হইবে এবং সে ক্রমশঃ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে পারিবে। যতদিন মানব নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিবার অবস্থা না প্রাপ্ত হয়, ততদিন তাহাকে বৈদিক প্রবৃত্তিমার্গ অনুসারে চলিতে হইবে। এইজন্য গীতা বলিয়াছেন ঃ

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ গীতা ১৬।২৩ ২৪

—"যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বীয় কামনা অনুসারে কার্য্য করে, সে সিদ্ধি, সুখ, এবং পরম গতি প্রাপ্ত হয় না। কি তোমার কার্য্য এবং কি অকার্য্য, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্র যে কর্ম্মের বিধান দিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া সেই কর্ম্ম করাই তোমার উচিত।" ইহাই বেদান্তেরও উপদেশ।

মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থা সুকৃতস্য লোকে॥ মুণ্ডক ১।২।১

—"মনস্বী ব্যক্তিগণ বেদমন্ত্রসমূহের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞ, বিহিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাই যথার্থ কর্ম্ম। বেদত্রয়ে যজ্ঞসমূহ

বহু প্রকারে বিবৃত হইয়াছে। তোমরা যথোপযুক্ত ভোগকামনায় সেই সকল কর্ম্মের নিয়ত অনুষ্ঠান কর। এইরূপে শুভকর্ম্মকারী তোমাদের ইহপরলোকে ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানই উপায়।" নিবৃত্তিমার্গের শাস্ত্র বেদান্তও প্রবৃত্তিপরবশ মানবকে বৈদিক প্রবৃত্তিমার্গই অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন, কারণ তাহা না করিলে মানব সহসা নিবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করিতে পারে না। যখন মানব নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিবে, তখন তাহাকে ত্রিগুণাত্মক বেদ এবং ভোগকামনামূলক বৈদিক যজ্ঞ ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই গীতার উপদেশ। সুতরাং, গীতা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে এবং তাহা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া পরস্পরবিরোধী উপদেশ দেন নাই, পর পর যে অবস্থার মধ্য দিয়া মানবকে নিবৃত্তিমার্গে আসিতে হইবে, তাহারই উপদেশ দিয়াছেন। মায়াময় বিশ্বের দ্বন্দ্বলীলায় দ্বন্দ্ব অপরিহার্য্য এবং পরিণয়ও প্রাপ্ত হইতে হইবে। দ্বন্দ্ব ও পরিণয় দুই-ই কৃষ্ণের ইচ্ছা। দ্বন্দ্বলীলায় বৈদিক প্রবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করিলে মানব সহজে বৈদান্তিক নিবৃত্তিমার্গে আসিয়া দ্বন্দ্বাতীত হইতে এবং পরিণয় লাভ করিতে পারিবে, এইজন্য কৃষ্ণ বিশ্বসৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই বেদ প্রকাশ করিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ডাত্মক প্রথমভাগে প্রবৃত্তিমার্গ বিধান করিয়া জ্ঞানকাণ্ডাত্মক শেষভাগে নিবৃত্তিমার্গ বিধান করিয়াছেন। সুতরাং, বেদপ্রকাশক কৃষ্ণ বেদের নিন্দা করিতে পারেন না এবং করেনও নাই। অর্জ্জুনকে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করাইবার জন্য কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদের প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদান্তের নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

১০।৩।৬ কৃষ্ণ বেদের যজ্ঞব্রহ্ম

এই বিশ্ব কৃষ্ণের অপরব্রহ্মরূপ। জীব জগৎ এবং কর্ম্ম লইয়া বিশ্ব। সুতরাং কর্ম্মও অপরব্রহ্ম। বেদ কর্ম্মকে ত্যাগের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া কর্ম্মের যে রূপ দিয়াছেন, তাহাই বৈদিক যজ্ঞ; অতএব যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত—"যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ" গীতা ৩।১৪। কর্ম্ম অপরব্রহ্মের অন্তর্গত; যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত; এইজন্য যজ্ঞও অপরব্রহ্ম। অপরব্রহ্ম যজ্ঞই যজ্ঞব্রহ্ম। যজ্ঞব্রহ্ম কৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিহিত, এবং কৃষ্ণ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন—"সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" গীতা ৩।১৫। বেদ যজ্ঞব্রহ্মরূপে কৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ"। গীতা ৯।১৬।

১০।৩।৭ কৃষ্ণ অধিযজ্ঞ

মানব যাহাতে স্বীয় কামনানুরূপ প্রবৃত্তিমার্গে চলিয়া যথেচ্ছাচারী না হয়, এবং যাহাতে সে বৈদিক প্রবৃত্তিমার্গ অনুসারে চলিয়া ক্রমশঃ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া দ্বন্দ্বাতীত হইয়া কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়, এইজন্য সকল মানবদেহের মধ্যে পরমাত্মারূপে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণ মানবকে বৈদিক প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে ত্যাগ-সমন্বিত যজ্ঞ করিবার প্রেরণা দান করেন। শ্রুতি বলেন: "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে।" তৈত্তিরীয় ২।৫।—"বিজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা যজ্ঞের প্রচারক এবং প্রয়োজক।" উক্তরূপে প্রেরণাদাতা পরমাত্মাকেই অধিযজ্ঞ বলা হয়, এবং কৃষ্ণই এই অধিযজ্ঞ-পরমাত্মা ;

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর। গীতা ৮।৪

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ, আমিই মানবদেহে অবস্থিত অধিযজ্ঞ।" বেদ অধিযজ্ঞরূপে কৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

১০।৩।৮ কৃষ্ণ যজ্ঞেশ্বর

বেদ যজ্ঞভোক্তা এবং যজ্ঞফলদাতা যজ্ঞেশ্বর রূপে কৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে পরমেশ্বর কৃষ্ণ কর্ম্মফলদাতা।

একো বহূণাং যো বিদধাতি কামান্। কঠ ২।২।১৩ শ্বেত ৬।১৩

—"এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর কাম্যকর্ম্মসমূহের ফল দান করেন।" এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে: বৈদিক যজ্ঞ দেবতাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, দেবতাগণ যজ্ঞভোক্তা এবং যজ্ঞের ফলদাতা। তাহা হইলে কৃষ্ণ কিরূপে যজ্ঞভোক্তা এবং যজ্ঞফলদাতা হইলেন? উত্তর: রাজা রাজ্যব্যাপারনির্ব্বাহের জন্য যাঁহাদের মধ্যে স্বীয় রাজশক্তির সঞ্চার করেন, তাঁহাদিগকে রাজপুরুষ বলা হয়। তাঁহারা রাজশক্তিরই বিবিধ রূপ এবং রাজশক্তিতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন করেন। তদ্রূপ জগৎব্যাপারনির্ব্বাহের জন্য কৃষ্ণ স্বীয় অনন্ত শক্তিকে বিবিধ রূপে কার্য্যকারী করিয়া রাখিয়াছেন। দেবতাগণ কৃষ্ণের শক্তির কার্য্যকারী রূপ। এক এবং অদ্বিতীয় কৃষ্ণের শক্তিই ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম প্রভৃতি দেবতারূপে জগৎব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছেন। "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" ঋক্ ১।১৬৪।৪৬—"এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই বিপ্রগণ ইন্দ্র অগ্নি যম প্রভৃতি বহু প্রকারের নাম দিয়া থাকেন" "যো দেবানাং নামধা এক এব।"

ঋক্ ১০।৮২।৩—"এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর অনেক দেবতার নাম ধারণ করিয়াছেন।" গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন: "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে-হন্যদেবতাঃ।" গীতা ৭।২০—"ভোগকামনায় যাহাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়, তাহারা অন্য দেবতার ভজনা করে।" তাহারা অন্য দেবতার নিকট হইতে যে যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়, তাহা সেই দেবতারূপে কৃষ্ণই দান করেন, ইহাও কৃষ্ণ গীতায় ঘোষণা করিয়াছেন। "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।" গীতা ৭।২২—"তাহারা সেই দেবতাগণের নিকট হইতে যে যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়, তাহা আমারই দ্বারা বিহিত, অর্থাৎ সেই দেবতারূপে আমিই তাহা দান করি।" আমরা পাইলাম যে, কৃষ্ণ যজ্ঞফলদাতা। তিনি যজ্ঞভোক্তা, তাহাও তিনি গীতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। "অহং হি সর্ব্বযাজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুরেব চ।" গীতা ৯।২৪—"আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা।" সুতরাং, যজ্ঞে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যসমূহের কৃষ্ণই তত্তৎ দেবাতারূপে ভোক্তা এবং কৃষ্ণই যজ্ঞফলদাতা। কৃষ্ণ যজ্ঞভোক্তা এবং যজ্ঞফলদাতা বলিয়া তিনি যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণকে শাস্ত্র যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনা॥
বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে॥ ভাগবত ১১।৫।২৫-২৬

—"কৃষ্ণ আপনাকে সকল দেবতারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাকে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদীগণ ত্রয়ী বিদ্যার দ্বারা, অর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত যজ্ঞের দ্বারা পূজা করেন, এবং তাঁহাকে বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত, এবং উরুগায় ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন।" "বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজ-ধর্ম্মসেতুঃ।" ভাগবত ১১।৪।৫—"জগতের স্থিতিসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণই ক্রতুপতি অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর, এবং দ্বিজধর্ম্মপালক বিষ্ণু।"

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হার এষ সাধু নিরূপিতঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্বিষ্ণুং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ॥ ভাগবত ১০।৮৪।৩৫

"বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে যজ্ঞদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। শাস্ত্রনিরূপিত এই তত্ত্ব উত্তম।"

কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ যজ্ঞব্রহ্ম, অধিযজ্ঞ, এবং যজ্ঞেশ্বর রূপে কৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইজন্য কৃষ্ণ বেদবেদ্য। ইহা কৃষ্ণের গোবিন্দ নামের অন্যতম কারণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ বেদান্তবেদ্য

১০।৪।১ বেদান্তের দ্বারাই প্রমাণিত

বেদ পূর্ব্বভাগে বহু মন্ত্রাদির দ্বারা যজ্ঞের বিধান দিয়া উত্তরভাগে অর্থাৎ বেদান্তে নিবৃত্তিমার্গের নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা লভ্য পরব্রহ্মের তত্ত্বও নিরূপণ করিয়াছেন। সমগ্র বেদান্ত পরব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদয় কৃষ্ণেরই তত্ত্ব। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বেদান্তের উক্তি হইতেই পাইয়াছি যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম; এইজন্য এখানে সেই উক্তিসমূহের পুনরুক্তি অনাবশ্যক। কৃষ্ণ বেদান্তবেদ্য, বেদান্তই তাহার প্রমাণ, ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি।

১০।৪।২ মহাদেবের দ্বারা প্রমাণিত

কৃষ্ণ যোগমায়ার অধীশ্বর বলিয়া শাস্ত্র কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলিয়াছেন। মহাদেব শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া শাস্ত্র মহাদেবকে যোগীশ্বর বলিয়াছেন। তাঁহার অন্য নাম শিব, রুদ্র, প্রভৃতি। রুদ্র কৃষ্ণের উপাসক; তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণোপাসনার প্রণালী অনুসারে যাঁহারা কৃষ্ণের উপাসনা করেন, রুদ্রের নামানুসারে তাঁহাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নাম রুদ্রসম্প্রদায়। শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে মহাদেব কৃষ্ণকে রাসলীলায় প্রাপ্ত হইবার জন্য গোপীদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রে নানাস্থানে কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রাধাতন্ত্রে তিনি বলিয়াছেন: "কৃষ্ণস্য নখচন্দ্রাভা কোটিব্রহ্মসমপ্রভা।" রাধাতন্ত্র ২১।১৭

দেবাদিদেব মহাদেবের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।৩ ব্রহ্মার দ্বারা প্রমাণিত

বেদান্ত বলিয়াছেন: "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।" শ্বেত ৬।১৮—"পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বেদসমূহ শিক্ষা দিয়াছিলেন।" বেদান্ত ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মা পরমেশ্বর হইতে বেদবেদান্ত প্রাপ্ত হইয়া দেবতাগণকে এবং মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদুস্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ॥ শ্বেত ৫।৬

—"পরমেশ্বর হইতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা হইতে প্রাচীন দেবতাগণ এবং ঋষিগণ বেদের গুহ্যাংশ উপনিষৎ সমূহে গূঢ়ভাবে নিহিত ব্রহ্মযোনিকে অর্থাৎ বেদের এবং ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা পরব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ব্রহ্মময় হইয়া অমর হইয়াছিলেন।" ছান্দোগ্য শ্রুতির অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ড হইতে দ্বাদশ খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট বেদান্ত নির্ণীত ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা বেদান্ত হইতেই পাইলাম যে, ব্রহ্মা প্রথম বেদান্ত-তত্ত্বজ্ঞাতা এবং প্রথম বেদান্ততত্ত্বপ্রচারক। সেই ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতাগণসহ কংসের কারাগৃহে কৃষ্ণের যে স্তুতি করিয়াছেন, যাহা ভাগবতে গর্ভস্তুতি নামে খ্যাত (ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ। ২য় অধ্যায়) তাহাতে তাঁহারা সকলেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। গো-গণ এবং গো-পালক-গণকে অপহরণ করিবার পর ব্রহ্মা কৃষ্ণকে যে স্তুতি করিয়াছেন, যাহা ভাগবতে ব্রহ্মস্তুতি নামে খ্যাত (ভাগবত ১০ম স্কন্ধ। ১৪শ অধ্যায়), তাহাতে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। শাস্ত্রে আরও নানাস্থানে এইরূপ ঘোষণা আছে। আমরা পাইলাম যে, বেদান্তই ঘোষণা করিয়াছেন যে স্বয়ং পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং সুর-নর সকলেই ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদান্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং, বেদান্ত অনুসারেই যিনি আদি বেদান্ততত্ত্ববেত্তা এবং আদি বেদান্ত-প্রচারক, সেই ব্রহ্মার উক্তির দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।৪ দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা প্রমাণিত

বেদান্তই বলিয়াছেন যে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদান্তনির্ণীত

পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ এবং গোবর্দ্ধন ধারণ করিবার পরে ইন্দ্র কৃষ্ণকে যে স্তুতি করিয়াছিলেন (ভাগবত ১০ম স্কন্ধ। ২৭ অধ্যায়) তাহাতে এবং শাস্ত্রের অন্য নানা স্থানেও তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে কৃষ্ণই বেদান্তের পরব্রহ্ম। আমরা পাইলাম যে, বেদান্ত অনুসারেই যিনি বেদান্তের পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ সেই ইন্দ্রের দ্বারা প্রামাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।৫ ধর্ম্মরাজ যমের দ্বারা প্রমাণিত

বেদান্ত অনুসারেই ধর্ম্মরাজ যম বেদান্তনির্ণীত পরব্রহ্মতত্ত্ববেত্তা এবং তিনিই কঠোপনিষদে পরব্রহ্মতত্ত্ববক্তা। তিনি নাচিকেতাকে যে পরব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, কঠোপনিষদে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত উপনিষদে যম বিষ্ণুকে পরব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোহধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ কঠ ১।৩।৯

এই শ্লোক পূর্ব্বেই উদ্ধৃত এবং অনূদিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মৃত গুরুপুত্রকে আনয়ন করিবার জন্য যখন সংযমনী নামক যমপুরীতে গমন করিলেন, যম তখন কৃষ্ণের যে স্তুতি করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে কৃষ্ণই বিষ্ণু। বেদান্ত অনুসারেই যিনি বেদান্তের পরব্রহ্মতত্ত্ববেত্তা এবং কঠোপনিষদের পরব্রহ্মতত্ত্ব-বক্তা, সেই যমের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।৬ দেবতা বরুণের দ্বারা প্রমাণিত

বরুণের অনুচরগণ নন্দমহারাজকে বরুণালয়ে লইয়া যাইবার পর কৃষ্ণ তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য বরুণালয়ে গমন করিয়াছিলেন। তখন বরুণ কৃষ্ণের যে স্তুতি করিয়াছেন, (ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ। ২৮ অধ্যায়) তাহাতে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে কৃষ্ণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, অর্থাৎ বেদান্তের পরব্রহ্ম। আমরা পাইলাম যে, বেদান্ত অনুসারেই যিনি বেদান্ত-নির্ণীত পরব্রহ্মতত্ত্ববেত্তা, সেই বরুণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।৭ দেবর্ষি নারদের দ্বারা প্রমাণিত

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে যে নারদ পরব্রহ্মতত্ত্ব

জ্ঞাত হইবার জন্য সনৎকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সনৎকুমার নারদকে পরব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতির নারদ-সনৎ-কুমার সংবাদ। ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, নারদ সনৎকুমারের নিকট হইতে বেদান্তনির্ণীত পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে বধ করিবার পরে নারদ তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে যে স্তুতি করিয়াছেন (ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ। ৩৭ অধ্যায়) তাহাতে, ভাগবতের অন্যান্য স্থানেও, এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও নারদ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতেও, তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। বেদান্ত অনুসারেই যিনি বেদান্ত-নির্ণীত পরব্রহ্মতত্ত্ববেত্তা, সেই নারদের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।৮ বেদব্যাসের দ্বারা প্রমাণিত

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদের বিভাগকর্ত্তা এবং ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা। তাঁহাকে বেদব্যাস বলা হয়। বলাই বাহুল্য যে তিনি বেদান্তের পরব্রহ্মতত্ত্ব-বেত্তা। তিনি মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা। তিনি মহাভারতে, ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণেও কৃষ্ণকে বেদান্তনির্ণীত পরব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বেদান্তের পরব্রহ্মতত্ত্ববেত্তা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।৯ শুকদেবের দ্বারা প্রমাণিত

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব জন্মাবধি মায়াতীত ; তিনি বেদান্তনির্ণীত পরব্রহ্ম-তত্ত্ববেত্তা। তিনি জানিতেন যে পরব্রহ্মকে জ্ঞাত না হইলে মানব মুক্তি পাইতে পারে না ; ব্রহ্মশাপগ্রস্থ পরীক্ষিতকে সপ্ত দিবসের মধ্যে মুক্ত করিবার জন্য শুকদেব তাঁহাকে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা শ্রবণ করাইলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে শুকদেব কৃষ্ণকে বেদান্তনির্ণীত পরব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন। ভাগবতের বহু স্থানে শুকদেব ঘোষণা করিয়াছেন যে কৃষ্ণ বেদান্তনির্ণীত পরব্রহ্ম। আমরা পাইলাম, বেদান্তনির্ণীত পরব্রহ্মতত্ত্ববেত্তা শুকদেবের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।১০ ঋষিগণের দ্বারা প্রমাণিত

কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন, তৎকালে একদা সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই গ্রহণোপলক্ষে তীর্থকার্য্য করিবার জন্য দ্বারকাবাসী স্বজনগণের সহিত কৃষ্ণ স্যমন্তপঞ্চক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রকে স্যমন্তপঞ্চক বলা হয়। মহাভারতোক্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই কুরুক্ষেত্র স্যমন্তপঞ্চক নামে একটী তীর্থক্ষেত্র ছিল, কারণ এইস্থানে ভগবান পরশুরাম যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অবস্থানকালে কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, পরশুরাম, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য, বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণ কৃষ্ণের নিকট আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বেদান্তনির্ণীত পরব্রহ্মতত্ত্ববেত্তা। ইঁহাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে, সনৎকুমার ছান্দোগ্য উপনিষদে, বামদেব ঐতরেয় উপনিষদে, এবং অঙ্গিরা মুণ্ডক উপনিষদে পরব্রহ্মতত্ত্ববক্তা। তৎকালে এই সকল ঋষিগণ যে স্তবের দ্বারা কৃষ্ণকে স্তুতি এবং প্রণাম করিয়াছিলেন (ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ। ৮৪ অধ্যায়) তাহাতে তাঁহারা নিঃসংশয়রূপে ঘোষণা করিয়াছেন যে কৃষ্ণ পরব্রহ্ম। আমরা পাইলাম যে, বেদান্তনির্ণীত পরব্রহ্মতত্ত্বের বেত্তা এবং বেদান্তে পরব্রহ্মতত্ত্ববক্তা ঋষিগণ কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।১১ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত

পৌরাণিক যুগের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল শ্রেষ্ঠ বেদান্ততত্ত্ববেত্তাই কৃষ্ণকে বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুবিখ্যাত, এইরূপ আচার্য্যস্থানীয় কয়েকজনের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথমেই আচার্য্য শ্রীশঙ্করের উল্লেখ করা যাউক। শ্রীশঙ্করাচর্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। এই কথা শুনিয়া হয়ত কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিবেন: "শ্রীশঙ্কর মায়াবাদের স্রষ্টা। মায়াবাদ অনুসারে বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম নির্গুণ, নিঃশক্তি, নিরাকার, এবং নির্ব্বিশেষ। কিন্তু কৃষ্ণ সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, সর্ব্বশক্তিমান, মায়ার অধীশ্বর, এবং

সবিশেষ। মায়াবাদের ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ, কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সুতরাং, কৃষ্ণ মায়াবাদের ব্রহ্ম নহেন। তাহা হইলে, মায়াবাদের স্রষ্টা শ্রীশঙ্করের দ্বারা কিরূপে প্রমাণিত হইল যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম? উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই প্রশ্ন হইতেছে, দেবতাগণ ঋষিগণ এবং শ্রীশঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সকল সুবিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্যগণও কৃষ্ণকে বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। গীতা, ভাগবত এবং অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রও তাহাই ঘোষণা করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীশঙ্কর যদি বলেন যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম নহেন, তাহা হইলে কি সকল দেবতাগণকে, ঋষিগণকে, ধর্ম্মাচার্য্যগণকে এবং স্মৃতিশাস্ত্রকেও ভ্রান্ত মনে করিয়া শ্রীশঙ্করকেই অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, শ্রীশঙ্করকেই অভ্রান্ত মনে করিয়া তাঁহাদিগকে এবং স্মৃতিশাস্ত্রকে ভ্রান্ত মনে করা যাইতে পারে না। যাহা হউক এইরূপ প্রশ্নোত্তরের আবশ্যকই হইবে না। আমরা দেখাইতেছি যে, শ্রীশঙ্করের স্বষ্ট মায়াবাদ তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত নহে: তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম: তিনি ভক্তিযোগে কৃষ্ণেরই ভজনা করিয়াছেন এবং মানবজাতিকে তাহাই করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মায়াবাদ স্বষ্টি করিবার বিশেষ কারণ ছিল। আমরা প্রথমে শ্রীশঙ্কর কর্ত্তৃক মায়াবাদ স্বষ্টির কারণ বিবৃত করিয়া পরে তাঁহারই উক্তি হইতে প্রমাণ করিব যে তিনি কৃষ্ণকে বেদান্তের পরব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি ভক্তিযোগে কৃষ্ণের ভজনা করিয়াছেন এবং মানব জাতিকে তাহাই করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

১০।৪।১২ মায়াবাদ স্বষ্টির কারণ—ভারতীয় বৌদ্ধগণকে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন

এই গ্রন্থে "ঈশ্বরঃ" এবং "পরমঃ" শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় আমরা বেদান্ত হইতে বহু বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে বেদান্তের পরব্রহ্ম কেবলই নির্গুণ এবং নিরাকার নহেন এবং নিঃশক্তিও নহেন; পরন্তু, বেদান্তের পরব্রহ্ম সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান, এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। বেদান্তবাক্য উদ্ধার করিয়া আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে বেদান্ত অনুসারে পরব্রহ্মই ঈশ্বর, মায়াধীশ, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বের পালক, এবং বিশ্বের প্রলয়কর্ত্তা। মহামনস্বী আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তের এই পরব্রহ্মতত্ত্ব উত্তমরূপেই জ্ঞাত ছিলেন, তথাপি তিনি বেদান্তবিরুদ্ধ

মায়াবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, ইহার মূলে একটী গভীর উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীশঙ্করের আবির্ভাবের কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্দ্ধন প্রায় সমগ্র ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের, বিশেষতঃ হর্ষবর্দ্ধনের চেষ্টায় অধিকাংশ ভারতবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীশঙ্করের আবির্ভাবকালেও অধিকাংশ ভারতবাসী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এক এবং অদ্বিতীয় ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম; সনাতন ধর্ম্ম সার্ব্বকালীক এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্ম বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক সনাতনধর্ম্ম পরবর্ত্তীকালে হিন্দুধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বেদ মানে না, এইজন্য বৌদ্ধগণ অহিন্দু। ভারত হইতে অবৈদিক, সুতরাং অহিন্দু, বৌদ্ধধর্ম্মকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র ভারতে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই ছিল শ্রীশঙ্করের লক্ষ্য এবং ব্রত। বৌদ্ধগণকে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া না আনিলে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। বৌদ্ধধর্ম্মে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকৃত হয় নাই এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকৃত হয় নাই। বাসনা এবং বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া দুঃখ-শোক-জরা-মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ লাভই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল নীতি। বৌদ্ধের নির্ব্বাণের অর্থ, পরমকারণে বিলীন হইয়া অস্তিত্বহীন হওয়া; এইজন্য বৌদ্ধসাধনায় নির্ব্বিকল্প সমাধিই পরম সিদ্ধি এবং মৃত্যুর পর নির্ব্বিকল্প স্থিতিই পরম গতি। বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের উপাসনা নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তাঁহার ভজনা সম্বলিত ধর্ম্মমত বৌদ্ধধর্ম্মমত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; বৌদ্ধগণকে এরূপ ধর্ম্মমত গ্রহণ করান সহজ হইত না। তাহাদের ধর্ম্মমতের অনুরূপ ধর্ম্মমতে তাহারা সহজেই আকৃষ্ট হইবে এবং উহা গ্রহণ করিলে তাহাদের ধর্ম্মমতে কোন বাহ্যিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে না বলিয়া তাহারা উহা সহজেই গ্রহণ করিবে, এই উদ্দেশ্যে শ্রীশঙ্কর তাহাদের ধর্ম্মমতের অনুরূপ যে ধর্ম্মমত সৃষ্টি করিলেন, তাহারই নাম মায়াবাদ। মায়াবাদেও ঈশ্বরের ভজনা নাই; বিষয়াসক্তি এবং বাসনা ত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভই মায়াবাদের লক্ষ্য। মায়াবাদের মোক্ষও, বৌদ্ধের নির্ব্বাণের ন্যায়, পরম কারণে বিলীন হইয়া অস্তিত্বহীন হইয়া যাওয়া; এইজন্য, মায়াবাদীর মতে নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধনার পরম সিদ্ধি এবং মৃত্যুর পরেও নির্ব্বিকল্প স্থিতিই পরম গতি। কিন্তু কেবল মায়াবাদটীকে স্বীকার করিয়া লইলেই বৌদ্ধগণ হিন্দু

হইত না, তাহাদের বেদ মানিয়া লইবারও প্রয়োজন ছিল, কারণ বেদ না মানিবার জন্যই বৌদ্ধ অহিন্দু। এই কারণে শ্রীশঙ্কর বেদান্তের সূত্রসমূহের মুখ্য অর্থ এবং অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থ এবং মায়াবাদের অনুকূল অভিপ্রায় কল্পনা করিয়া মায়াবাদ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রচার করিলেন যে মায়াবাদ বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত মায়াবাদকে গ্রহণ করিলে বেদকেও গ্রহণ করা হয় এবং বেদকে মানিলেই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। ইহাই ছিল মায়াবাদকে বেদান্ত ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিবার কারণ। তখন বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার ছিল না বলিয়া বেদান্ত পড়িতে পারে এরূপ লোক ছিল অতীব বিরল, এবং মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় বেদান্তের হস্তলিখিত পুঁথিও ছিল অতিশয় দুর্লভ। সুতরাং, বেদান্ত পাঠ করিয়া বেদান্ততত্ত্ব জ্ঞাত হইবার মত লোকও ছিল অতীব বিরল। এরূপ অবস্থায় শ্রীশঙ্করের কথার উপরেই লোক মায়াবাদকে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মমত বলিয়া গ্রহণ করিল। ভারতীয় বৌদ্ধগণ মায়াবাদ স্বীকার করিয়া লইল; মায়াবাদ স্বীকারের ফলে বেদকেও স্বীকার করা হইল। এইরূপে ভারতীয় বৌদ্ধগণ হিন্দু হইল; শ্রীশঙ্করের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। মায়াবাদের ব্রহ্ম শ্রীশঙ্করের কল্পিত ব্রহ্ম, বেদান্তের ব্রহ্ম নহেন; কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে শ্রীশঙ্কর বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন না। বৌদ্ধগণকে হিন্দু করিবার জন্য মায়াবাদ ছিল বৌদ্ধগণের বিরুদ্ধে তাঁহার শাস্ত্রযুদ্ধ। যুদ্ধে কৌশলও অবলম্বন করিতে হয়। গৌণ অর্থ কল্পনা ছিল তাঁহার শাস্ত্রযুদ্ধের কৌশল। শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে বৌদ্ধমতকেই বেদান্তের আবরণে প্রচ্ছন্ন করিয়া তাহার মায়াবাদ নাম দিয়া তদ্দ্বারাই তিনি বৌদ্ধগণকে বেদের শাসনাধীনে আনিয়া হিন্দু করিয়াছিলেন।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিণা॥ পদ্মপুরাণ।
উত্তরখণ্ড ২৫।৭

—মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। আমিই কলিযুগে ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে মায়াবাদপ্রবর্ত্তনকারী।" মায়াবাদ যথার্থ বেদান্ততত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, উহা কল্পিত মতবাদ, এইজন্য মায়াবাদকে অসৎ শাস্ত্র বলা হইল। বেদান্তের কল্পিত ব্যাখ্যার আবরণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতকে মায়াবাদ নামে প্রচারিত করায় মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা

হইল। মহাদেব ঘোষণা করিলেন যে, তিনিই শ্রীশঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবাদের প্রবর্ত্তনকারী। শ্রীশঙ্কর ব্রাহ্মণ; তজ্জন্য মহাদেব বলিলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিতে মায়াবাদপ্রবর্ত্তনকারী। মহাদেব ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে মায়াবাদ প্রচার করেন, ইহার কারণ এই যে ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈদিক হিন্দুধর্ম্মই প্রচারিত হয় এবং তাহা গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, অর্থাৎ বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। আমরা শাস্ত্র হইতেও প্রমাণ পাইলাম যে, মহাদেবের অবতার শ্রীশঙ্কর মায়াবাদ রূপ অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা ভারতীয় বৌদ্ধগণকে হিন্দুধর্ম্মে আনিয়াছিলেন। ইহাই ছিল শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এখানে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারেঃ বুদ্ধদেব যদি বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তবে হিন্দুশাস্ত্র কেন তাঁহাকে দশাবতারের মধ্যে গণনা করিলেন? উত্তরঃ বুদ্ধদেব স্বয়ং কখনও বেদকে এবং ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন নাই। ললিতবিস্তার নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বিবৃত আছে যে, বুদ্ধদেব সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রহ্মে স্থিতি-লাভ করিয়াছি।" ব্রহ্মতত্ত্বই বেদান্ততত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব। যোগসিদ্ধ অবস্থায় এইরূপ ব্রহ্মে স্থিতিকে গীতাও ব্রাহ্মী স্থিতি বলিয়াছেন (গীতা ২।৭২)। বুদ্ধদেব স্বয়ং যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহার মূল কথা জীবে দয়া, অহিংসা, সত্য-পালন, বাসনাত্যাগ এবং নির্ব্বাণপ্রাপ্তি। বেদান্ত এবং অন্য সকল হিন্দুশাস্ত্রও এই সকল উপদেশ দিয়াছেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর বুদ্ধদেব যখন স্বয়ং ঐ সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন তিনি কখনও বলেন নাই যে তিনি হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র অবৈদিক নূতন একটী ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন; কোন ভারত-বাসীও এরূপ মনে করেন নাই, কাহারও ঐরূপ মনে করিবার কারণও ছিল না। বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধপ্রচারকগণ বেদকে অস্বীকার করিয়া বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমতকে বৌদ্ধধর্ম্ম নামে একটী স্বতন্ত্র অবৈদিক ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন। এইরূপে বৌদ্ধগণ অহিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য শ্রীশঙ্কর মায়াবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং ভারতের বেদান্তের মোক্ষসাধনধর্ম্মই প্রচারিত করিয়াছিলেন এবং বেদের সহিত তাঁহার বিরোধ ছিল না। সুতরাং, হিন্দুশাস্ত্র বুদ্ধদেবকে দশাবতারের মধ্যে গণনা করিয়া বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করেন নাই এবং হিন্দুশাস্ত্র বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী কালের অবৈদিক এবং নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মকে বৈদিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

১০।৪।১৩ মায়াবাদের "জগন্মিথ্যা" শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত মত নহে

শ্রীশঙ্কর কেন মায়াবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা আমরা পাইলাম। এক্ষণে আমরা দেখাইতেছি যে, মায়াবাদ শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত নহে। মায়াবাদ অনুসারে জগৎ মিথ্য, অর্থাৎ জগতের অস্তিত্বই নাই, কেবল অজ্ঞানতা বশতঃ জগতের অস্তিত্ব কল্পিত হয়। আমরা সৎ সম্বন্ধে আলোচনাকালে বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে পরব্রহ্ম নিত্যসত্য এবং তাঁহার পরিণাম জগতও নিত্যসত্য, মহাপ্রলয়েও জগতের ধ্বংস হয় না, বীজরূপে পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে এবং কল্পারম্ভে পুনরাবর্ত্তিত হয়। ইহাই শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত। ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৬-১৮ সংখ্যক সূত্রত্রয়ের ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্কর জগতকে নিত্যসত্য বলিয়াছেন। তিনি বলেন :

> সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ……ইত্যাদাবিদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ, কারণাৎ কার্যস্যানন্যত্বং, যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে, ন তৎ তত উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈল্যম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তে-রনন্যত্বাদুৎপন্নমপ্যনন্যদেব কারণাৎ কার্য্যমিত্যবগম্যতে। যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি।

—"হে সৌম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ-ই ছিল।—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কারণের সহিত "ইদং" শব্দের দ্বারা সূচিত জগতের সামানাধিকরণ্য (মূলগত অভিন্নতা) নিরূপিত হওয়ায় হইাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কার্য্য এবং কারণ ভিন্ন নহে। যে বস্তু যাহার মধ্যে যদাত্মকরূপে বিদ্যমান থাকে না, সেই বস্তু তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না, যেমন সিকতা (বালুকা) হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না। সুতরাং, কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যেমন কারণের সহিত অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে, উৎপত্তির পরেও তদ্রূপ অভিন্ন। অতীত, বর্ত্তমান, এবং ভবিষ্যৎ, এই ত্রিকালের কোন সময়েই যেমন পরম কারণ ব্রহ্মের সত্ত্বার ব্যাভিচার নাই, অর্থাৎ সত্ত্বা লুপ্ত হয় না, তদ্রূপ কার্য্যভূত জগতেরও সত্ত্বার অতীত বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন কালেই ব্যাভিচার নাই, অর্থাৎ সত্ত্বা লুপ্ত হয় না।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে শ্রীশঙ্কর ঘোষণা করিলেন যে জগৎ মিথ্যা নহে, জগতের সত্ত্বা আছে, এবং সেই সত্ত্বা কখনও লুপ্ত হয় না, অর্থাৎ জগৎ নিত্যসত্য। আমরা পাইলাম যে,

মায়াবাদের "জগন্মিথ্যা" শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত মত নহে, উহা কেবল মায়াবাদের জন্যই কল্পিত মত।

১০।৪।১৪ মায়াবাদের "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত মত নহে

মায়াবাদের "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত মত নহে; ইহাও মায়াবাদের নিমিত্ত তাঁহার কল্পিত মত। ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।৪৩ সূত্রের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত মত প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা নিম্নে সূত্র এবং শ্রীশঙ্করের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিলাম।

অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে। ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪৩। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন:

"জীবেশ্বরয়োরুপকার্য্যোপকারকভাব উক্তঃ। স চ সম্বন্ধয়োরেব লোকে দৃষ্টঃ।...জীবেশ্বরয়োঃ কিং স্বামিভৃত্যবৎ সম্বন্ধ? অহোস্বিৎ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ?.. অতো ব্রবীতি অংশ ইতি। জীব ঈশ্বরস্যাংশো ভবিতুমর্হতি, যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গঃ।...নানাব্যপদেশাৎ। "সোহন্বেষ্টব্যঃ" "স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"...ইতি চৈবাঞ্জাতীয়কো ভেদ নির্দ্দেশো নাসতি ভেদে যুজ্যতে। ননু চায়ং নানাব্যপদেশঃ সুতরাং স্বামিভৃত্যস্বারূপ্যে যুজ্যত ইতি আহ অন্যথা চাপীতি। ন চ নানাব্যপদেশাদেব কেবলাংশত্বপ্রতিপত্তিঃ। কিন্তর্হি? অন্যথা চাপি ব্যপদেশো ভবত্যনানাত্বস্য প্রতিপাদক। তথাহি একে শাখিনো দাশকিতাবিভাং ব্রাহ্মণ আমনন্তি আথর্ব্বণিকা ব্রহ্মসূক্তে—ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত ইত্যাদিনা।...ইতি হীনজন্তূদাহরণেন সর্ব্বেষামেব নামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতপ্রবিষ্টানাং জীবানাং ব্রহ্মত্বমাহুঃ।...চৈতন্যাঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োহগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যমংশত্বাবগমঃ।"

—"জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে উপকার্য্য এবং উপকারক ভাব বেদান্তে উক্ত হইয়াছে। জগতেও উপকার্য্য-উপকারক ভাবের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে কি স্বামিভৃত্যবৎ সম্বন্ধ, অথবা অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ সম্বন্ধ? বেদান্তে এই উভয়বিধ সম্বন্ধই উক্ত হইয়াছে, এইজন্য বলিতেছি যে জীব ঈশ্বরের অংশ। জীব ঈশ্বরের অংশ, যেমন বিস্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ। বেদান্ত নানাসূত্রে ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে ভেদ থাকাও নিরূপণ করিয়াছেন। ঈশ্বর জীবের দ্বারা

অন্বেষণীয়, ঈশ্বর জীবের দ্বারা বিজ্ঞেয়, এইরূপ যে সকল উক্তি বেদান্ত করিয়াছেন, ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে ভেদ না থাকিলে বেদান্তকর্তৃক ঐ সকল উক্তি করা যুক্তিযুক্ত হইত না। বেদান্ত নানাস্থত্রে এই যে ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা স্বামিভৃত্যরূপেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে জীবকে কিরূপে ঈশ্বরের অংশ বলা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, বেদান্ত কেবল যে ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নহে; বেদান্ত নানাস্থত্রে ঈশ্বর ও জীবের অভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধও নিরূপণ করিয়াছেন। বেদের অথর্ব্ব নামক শাখা ব্রহ্মের ভৃত্যভাবে, ধূর্ত্তভাবে, এবং অন্যবিধ ভাবেও বিদ্যমানতা ঘোষণা করিয়াছেন; অথর্ব্ববেদের ব্রহ্মস্থক্তে আছে, 'দাশগণ (=কৈবর্ত্তগণ) ব্রহ্ম, দাসগণ (=ভৃত্যগণ) ব্রহ্ম, কিতবগণ (=ধূর্ত্তগণ) ব্রহ্ম, ইত্যাদি।' এই সকল উক্তির দ্বারা শ্রুতি নামরূপবিশিষ্ট স্থূল এবং স্থক্ষ্ম দেহে প্রবিষ্ট সকল জীবেরই ব্রহ্মত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। যেমন অগ্নির সহিত বিস্ফুলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে ভেদ নাই, তদ্রূপ ঈশ্বরের সহিত জীবের চৈতন্য বিষয়ে কোন ভেদ নাই। বেদান্ত ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই নির্ণয় করিয়াছেন; অতএব জীব ব্রহ্মের অংশ, ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে শ্রীশঙ্কর ঘোষণা করিলেন যে বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ; ব্রহ্ম অংশী এবং জীব ব্রহ্মের অংশ। ইহাই শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত। স্থতরাং, তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতে "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" মতবাদের, অর্থাৎ অদ্বৈতবাদের বা অভেদবাদের স্থান নাই। তাঁহার এই ব্যক্তিগত মত প্রমাণ করিতে তাঁহার আরও কয়েকটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ব্রহ্মস্থত্রের ২।৩।৪৫ স্থত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন:

শাস্ত্রাত্তু অংশাশিত্বমীশিত্রীশিতব্যভাবশ্চ নিশ্চীয়তে।

—"শাস্ত্র ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে অংশাংশিত্ব এবং ঈশিতৃ-ঈশিতব্য ভাব নিশ্চয়রূপে নিরূপণ করিয়াছেন।" ব্রহ্মস্থত্রের ৩।২।২৭ স্থত্রের শ্রীশঙ্কর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ। ব্রহ্মস্থত্র ৩।২।২৭

শ্রীশঙ্করের ব্যাখ্যা: ক্বচিজ্জীবপ্রাজ্ঞয়োর্ভেদো ব্যপদিশ্যতে "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি ধ্যাতৃধ্যাতব্যত্বেন দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যত্বেন; "পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইতি গন্তৃগন্তব্যত্বেন; "যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো

যময়তি” ইতি নিয়ন্তৃনিয়ন্তব্যত্বেন চ। ক্বচিত্তু তয়োরেবাভেদো ব্যপদিশ্যতে, “তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইতি। তত্রৈবমুভয়ব্যপদেশে সতি যদ্যভেদ এবৈকান্ত পরিগৃহ্যেত, ভেদব্যপদেশো নিরালম্বন এব স্যাৎ। অত উভয়ব্যপদেশদর্শনা-দহিকুণ্ডলবদত্র তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। যথাহহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বা-দীনি চ ভেদঃ, এবমিহাপীতি।—“কোন কোন শ্রুতিতে জীব এবং ব্রহ্মের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে, যথা, “অতঃপর ধ্যায়মান, অর্থাৎ ধ্যাতা, জীব নিষ্কল ব্রহ্মকে দর্শন করে”—এই শ্রুতিবাক্যের মধ্যে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ধ্যাতৃধ্যাতব্যত্ব এবং দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যত্ব ভাব নিরূপিত হইয়াছে; “আরাধনাকারী জীব পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়”—এই শ্রুতিবাক্যের মধ্যে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে গন্তৃগন্তব্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে; “যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন”—এই শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে নিয়ন্তৃনিয়ন্তব্যত্ব ভাব নিরূপিত হইয়াছে। আবার কোন কোন শ্রুতিবাক্যে জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে অভেদও উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা, “তুমি ব্রহ্ম হইতেছ,” “আমি ব্রহ্ম হইতেছি” ইত্যাদি। বেদান্তে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়বিধ সম্বন্ধই নিরূপিত হওয়ায় কেবলমাত্র অভেদ সম্বন্ধটীকেই শ্রুতিসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে ভেদ-সম্বন্ধ-জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যসমূহ অর্থহীন হইয়া যায়। অতএব বেদান্ত যখন ভেদাভেদ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, তখন ভেদাভেদতত্ত্বকে অহিকুণ্ডলতত্ত্বের ন্যায় নিরূপণ করিতে হইবে। যেমন সর্পরূপে অভেদ, কিন্তু কুণ্ডলীকৃত অবস্থা, ফণাযুক্ত অবস্থা, লম্বমান অবস্থা প্রভৃতি অবস্থাভেদে ভেদ, তদ্রূপ জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থাভেদে ভেদাভেদ।” মায়াবাদ অনুসারে “জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ”, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন; এইজন্য মায়াবাদকে অভেদবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলা হয়; এই মতবাদ অনুসারে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে গন্তৃ-গন্তব্য, জ্ঞাতৃ-জ্ঞাতব্য, ধ্যাতৃ-ধ্যাতব্য, নিয়ন্তৃ-নিয়ন্তব্য, দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্য, অংশী-অংশ, প্রভু-দাস, উপাস্য-উপাসক প্রভৃতি বেদান্তনিরূপিত সম্বন্ধ নাই এবং থাকিতেও পারে না। শ্রীশঙ্করের উক্তি হইতে আমরা পাইলাম যে, বেদান্তনিরূপিত ভেদাভেদ সম্বন্ধতত্ত্বই তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত।

১০।৪।১৫ শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম

মায়াবাদের কেবল নির্গুণ, নিঃশক্তি, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, জ্ঞানস্বরূপ

পরব্রহ্ম শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতের পরব্রহ্ম নহেন; তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতে পরব্রহ্ম সগুণ-নিগুণ, সাকার-নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান, সবিশেষ, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; কৃষ্ণই পরব্রহ্ম, এবং ভক্তিযোগে কৃষ্ণের ভজনাই ধর্ম্ম-সাধনা। শ্রীশঙ্করের রচিত "প্রবোধ-সুধাকরঃ" গ্রন্থই তাঁহার এই ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতের অখণ্ডনীয়, নিশ্চিত প্রমাণ; তথাপি তাঁহার অন্যান্য উক্তি হইতেও তাঁহার এই ধর্ম্মমত প্রমাণ করা হইতেছে। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন: "সন্তি উভয়লিঙ্গা শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ।"—"ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশক শ্রুতিবাক্যসমূহ নিরূপণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ, অর্থাৎ, ব্রহ্ম সগুণ-নির্গুণ এবং সাকার-নিরাকার।" সুতরাং, শ্রীশঙ্করের মতে বেদান্তের ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ না হইলে সগুণ-নির্গুণ এবং সাকার-নিরাকার হইতে পারেন না। তাঁহার এই মত তিনি গায়ত্রীর ব্যাহৃতিত্রয়ের ব্যাখ্যাতেও ব্যক্ত করিয়াছেন। গায়ত্রীমন্ত্র সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং বেদ-বেদান্তও শিক্ষা দিয়াছিলেন। গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণসন্তান গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোরজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ॥ ব্রহ্মসংহিতা ৩৬

—"গায়ত্রীমন্ত্র গানকারী কৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা উক্ত মন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে আদিগুরু কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১২।১ সূত্রে এবং ব্রহ্মসূত্রের ১।১।২৫-২৭ সূত্রত্রয়ে গায়ত্রী-মন্ত্রকে পরব্রহ্মের মন্ত্ররূপ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং এইজন্য গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিলে মুক্তিলাভ হয়, তাহাও শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন। "গায়তি চ ত্রায়তে চ।" ছান্দোগ্য ৩।১২।১।—"এই মন্ত্র গান করিলে জীব ত্রাণ অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে; এইজন্য ইহার নাম গায়ত্রী।" পরব্রহ্মের এই মন্ত্ররূপের "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" এই তিনটী ব্যাহৃতির ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন:

ভূরিতি সন্মাত্রমুচ্যতে। ভুবরিতি ভাবয়তি প্রকাশয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপমুচ্যতে। সুব্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বরিতি সুষ্ঠু সর্ব্বৈর্ব্রিয়মাণ সুখস্বরূপমুচ্যতে।

—"ভূঃ, এই ব্যাহৃতির অর্থ সৎ। ভুবঃ, এই ব্যাহৃতির অর্থ, যাহা সমুদয়

বস্তুকে প্রকাশ করে ; এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে ইহার অর্থ চিৎ। স্বঃ এই ব্যাহৃতির অর্থ, সর্ব্ববরেণ্য অর্থাৎ সকলের উপাস্য আনন্দস্বরূপ।" আমরা পাইলাম যে, শ্রীশঙ্করের মতে বেদান্তের পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ এবং সকলের উপাস্য। উপাস্য সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম কেবল নির্গুণ নিরাকার নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারেন না। শ্রীশঙ্কর স্বরচিত "বিবেকচূড়ামণি" নামক গ্রন্থের প্রারম্ভেই সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরম্।

গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্‌গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥ বিবেকচূড়ামণি ১

—"সমগ্র বেদান্তের সিদ্ধান্ত যাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে, যিনি বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যিনি পরমানন্দস্বরূপ, এবং যিনিই সদ্‌গুরু, সেই গোবিন্দকে আমি প্রণাম করি।" আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে কৃষ্ণই গোবিন্দ। শ্রীশঙ্কর ঘোষণা করিলেন যে, সমগ্র বেদান্ত কৃষ্ণেরই তত্ত্ব গোচর করিয়াছেন, এবং, কৃষ্ণ বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। উক্ত শ্লোকে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া শ্রীশঙ্কর ইহাও নিঃসংশয়রূপে জানাইলেন যে, কৃষ্ণ উপাস্য, তিনি কৃষ্ণের উপাসক, তিনি ভক্তিযোগে কৃষ্ণের ভজনা করেন, কৃষ্ণ অংশী তিনি অংশ, তিনি কৃষ্ণের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন নহেন, এবং অদ্বৈতবাদ তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মের মতবাদ নহে। তিনি যদি আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়াই মনে করিতেন তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণের উপাসনা এবং কৃষ্ণকে প্রণাম করিতেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতে ভেদাভেদ সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধ অনুসারে তিনি আপনাকে কৃষ্ণের উপাসক জানিয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। ভক্তিযোগে কৃষ্ণের ভজনাই তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনা। তাহা না হইলে গ্রন্থারম্ভকালে সর্ব্বাগ্রে তিনি ভক্তিভরে কৃষ্ণকে প্রণাম করিতেন না। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতে সবিকল্প সমাধি যোগসাধনার পরম সিদ্ধি এবং মৃত্যুর পরে নিত্য সবিকল্প স্থিতিতে পরমানন্দসম্ভোগই পরম গতি। পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বাক্যে আমরা পাইয়াছি যে শ্রীশঙ্কর রুদ্রের অবতার। রুদ্র পরম কৃষ্ণপ্রেমিক। তাঁহার অবতার শ্রীশঙ্কর যে পরম কৃষ্ণপ্রেমিক তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি যে কেবল নিজেই কৃষ্ণপ্রেমিক ছিলেন তাহা নহে, তিনি সকলকেই ভক্তিযোগে কৃষ্ণের ভজনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে মায়াবাদ সৃষ্টি

করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইবার পরেও মায়াবাদ থাকিয়া গেল, কারণ তিনি উদ্দেশ্যটী প্রকাশ করেন নাই, করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। মায়াবাদ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পরেও উদ্দেশ্যটী গোপন থাকায় লোকে মায়াবাদকে প্রকৃত বৈদান্তিক ধর্ম্ম মনে করিয়া মায়াবাদকে অনুসরণ করিতে লাগিল। যাহা যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হয়, তাহা সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলেই কুফলপ্রসূ হয়। বৌদ্ধকে হিন্দু করিবার জন্য মায়াবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল, যথার্থ বেদান্ততত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য নহে এবং যথার্থ বেদান্তধর্ম্মসাধনার জন্যও নহে। শ্রীশঙ্কর যখন দেখিলেন যে লোকে মায়াবাদসৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানিয়া মায়াবাদকে যথার্থ বেদান্ততত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে ধর্ম্মসাধনা করিতেছে, তখন আবার তিনি ভারতবাসীকে ভক্তিযোগে কৃষ্ণভজনার ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিলেন: "মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"—"যদি মোক্ষলাভই তোমার লক্ষ্য হয়, তবু তোমাকে ভক্তিযোগের সাধনাই করিতে হইবে, কারণ মোক্ষলাভের জন্যও ভক্তিযোগের সাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" মানবকে ভক্তিযোগে কৃষ্ণের ভজনা করাইবার জন্য তিনি স্তব এবং স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্র" জনগণকে কৃষ্ণভজনায় উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তূর্য্য-নিনাদসদৃশ। স্তোত্রটী দীর্ঘ, কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে।

দিনমপি রজনী সায়ম্প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কাল ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে॥ ১॥
ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে॥ ৫॥

—"দিবসরজনী, প্রাতঃসন্ধ্যা, শীতবসন্ত পুনরায় আসিয়াছে। কাল ক্রীড়া করিতেছে। আয়ু বিগত হইতেছে। তথাপি মানব বিষয়ভোগের আশা ত্যাগ করিতেছে না। ওরে মূঢ়মতি মানব! গোবিন্দের ভজনা কর্, গোবিন্দের ভজনা কর্, গোবিন্দের ভজনা কর্॥ ১॥ যে ব্যক্তি ভগবদ্গীতা স্বল্পমাত্রও পাঠ করিয়াছে, বিন্দুমাত্র গঙ্গাজল পান করিয়াছে, একবারও কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছে, সে যমের অধিকারের অতীত হইয়াছে। ওরে মূঢ়মতি মানব! গোবিন্দের

ভজনা কর্, গোবিন্দের ভজনা কর্, গোবিন্দের ভজনা কর্।" কৃষ্ণ মুর নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের অন্য নাম মুরারি। কৃষ্ণই গোবিন্দ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "মূঢ়মতি" শব্দটীর দ্বারা শ্রীশঙ্কর কেবল বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণকেই সম্বোধন করেন নাই ; যাহারা মায়াবাদসৃষ্টির উদ্দেশ্য না জানিয়া এবং না বুঝিয়া মায়াবাদকে যথার্থ ধর্ম্মমত মনে করিয়া কৃষ্ণের ভজনা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের প্রতিও "মূঢ়মতি" শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতে সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, সর্ব্বশক্তিমান, সবিশেষ, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম এবং ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের ভজনার দ্বারাই মানব মুক্তি ও প্রেম লাভ করিতে পারে, ইহা "প্রবোধ-সুধাকরঃ" গ্রন্থ হইতেও প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ।

নিত্যানন্দৈকরসং সচ্চিন্মাত্রং স্বয়ংজ্যোতিঃ।
পুরুষোত্তমমজমীশং বন্দে শ্রীযাদবাধীশম্ ॥ প্রঃ সুঃ।১
শুধ্যতি হি নান্তরাত্মা কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিমৃতে।
বসনমিব ক্ষারোদৈর্ভক্ত্যা প্রক্ষাল্যতে চেতঃ ॥ প্রঃ সুঃ। ১৬৭

—"নিত্যানন্দময়, একরস, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, জন্মরহিত, পুরুষোত্তম শ্রীযদুকুলপতি ঈশ্বরকে আমি বন্দনা করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে ভক্তি ব্যতীত অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না, ইহা নিশ্চয়। ক্ষারজলে বস্ত্র যেমন মলমুক্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তির দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়।" শ্রীশঙ্কর এই গ্রন্থের ১৭২ হইতে ১৭৫ সংখ্যক শ্লোকচতুষ্টয়ে কৃষ্ণভজনার নিমিত্ত যে ভক্তি-যোগের উপদেশ দিয়াছেন, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু কর্তৃক প্রদত্ত ভক্তি-যোগোপদেশের সহিত তাহার প্রভেদ নাই।

স্বধর্ম্মাচরণং কৃষ্ণপ্রতিমার্চ্চনোৎসবো নিত্যম্।
বিবিধোপচারকরণৈর্হরিদাসৈঃ সঙ্গমঃ শশ্বৎ ॥
কৃষ্ণকথাসংশ্রবণে মহোৎসবঃ সত্যবাদশ্চ।
পরযুবতৌ দ্রবিণে বা পরাপবাদে পরাঙ্মুখতা ॥
গ্রাম্যকথাসূদ্বেগঃ সুতীর্থগমনেষু তাৎপর্য্যম্।
যদুপতিকথাবিয়োগে ব্যর্থং গতমায়ুরিতি চিন্তা ॥
এবং কুর্ব্বতি ভক্তিং কৃষ্ণকথানুগ্রহোৎপন্না।
সমুদেতি সূক্ষ্মভক্তির্যস্মা হরিরন্তরাবিশতি ॥ প্রঃ। সুঃ ১৭২-১৭৫

—"স্বধর্ম্মাচরণ, বিবিধ উপচারের দ্বারা নিত্য কৃষ্ণপ্রতিমার অর্চ্চনা ও উৎসব, সর্ব্বদা হরিভক্তগণের সহিত সঙ্গ, কৃষ্ণকথাশ্রবণে মহানন্দ, সত্যবাদিতা, পরস্ত্রীতে পরধনে এবং পরনিন্দায় পরাঙ্মুখতা, গ্রাম্যকথায় অনিচ্ছা, সুতীর্থগমনে তৎপরতা, কৃষ্ণকথা শুনিতে না পাইলে 'জীবন বৃথা চলিয়া যাইতেছে' এইরূপ বোধ, এই প্রকার ভক্তির সহিত কৃষ্ণভজনা করিতে থাকিলে অন্তরে সেই সূক্ষ্মভক্তির, অর্থাৎ প্রেমের, উদয় হয় যদ্দ্বারা অন্তরে কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েন।" বস্তুতঃ, শ্রীশঙ্কর যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অগ্রদূত রূপে পূর্ব্বে আসিয়া বৌদ্ধগণকে বৈদিক ধর্ম্মে আনিয়া যুগধর্ম্ম কি তাহা জানাইয়া গিয়াছিলেন, এবং পরে যথা-কালে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত কি, তাহা আমরা পাইলাম। শ্রীশঙ্কর মায়াবাদসৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ না করিলেও, সর্ব্বমানবকে ভক্তিযোগে কৃষ্ণভজনা করিতে উপদেশ দিয়া স্বরচিত মায়াবাদের বিরুদ্ধে তিনি স্বয়ংই সর্ব্বপ্রথমে লেখনী ধারণ করিয়া-ছিলেন। তিনি জগদ্‌গুরু ; মায়াবাদপ্রবর্ত্তনের জন্য তিনি জগদ্‌গুরু নহেন ; যখন ভারতে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বৈদিক সনাতন হিন্দুধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তখন তিনি বৌদ্ধভারতকে হিন্দুভারত করিয়া, হিন্দু ভারতে "ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে" এই ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া ভারতীয় জনগণকে কৃষ্ণভজনায় উদ্বুদ্ধ এবং নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীশঙ্কর জগদ্‌গুরু। তার্কিক পণ্ডিতগণ তাঁহার মায়াবাদভাষ্য পাঠ করেন এবং তর্ক করেন, কিন্তু যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ মায়াবাদের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না; তাঁহারা জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করের "ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে"—এই উপদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া গোবিন্দভজনায় ব্রতী হয়েন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এখনও যাঁহারা সম্প্রদায়ানুরোধে আপনাদিগকে মায়াবাদী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও কেবল বাহিরে তর্কক্ষেত্রে মায়াবাদী এবং অদ্বৈতবাদী, কিন্তু অন্তরে মায়াবাদী এবং অদ্বৈতবাদী নহেন ; কারণ, এমন মায়াবাদী দৃষ্টিগোচর হয়েন না যিনি ভক্তিযোগে ভগবান শিবের, অথবা ভগবতী মহামায়ার, অথবা কৃষ্ণের অন্য কোন ভগবান বা ভগবতী স্বরূপের, অথবা স্বয়ং কৃষ্ণের ভজনা করেন না। যেখানে ভক্তিযোগে ভগবানের বা ভগবতীর ভজনা আছে, অথবা গুরুর ভজনাও আছে, সেখানে অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ অভেদবাদ নাই, সেখানে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ ভেদাভেদবাদই আছে।

আমরা পাইলাম যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।১৬ আচার্য্য শ্রীরামানুজের দ্বারা প্রমাণিত : বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

আচার্য্য শ্রীশঙ্করের পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য শ্রীরামানুজের দ্বারা মায়াবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে মায়াবাদ বেদান্ততত্ত্ব নহে, উহা কল্পিত মতবাদ। তাঁহার ধর্ম্মমতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। এই মতানুসারে বেদান্তের পরব্রহ্ম সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান, সবিশেষ, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; এবং বাসুদেব-কৃষ্ণ বেদান্তের পরব্রহ্ম। আচার্য্য শ্রীরামানুজের মতে জগৎ সত্য; জীব পরব্রহ্মর অংশ; বাসুদেব-কৃষ্ণ উপাস্য, জীব উপাসক; ভক্তিযোগে বাসুদেব-কৃষ্ণের ভজনাই জীবের ধর্ম্ম; এবং ভক্তির দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণকে শ্রীসম্প্রদায় বলা হয়। আচার্য্য শ্রীরামানুজের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।১৭ আচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের দ্বারা প্রমাণিত : ভেদাভেদবাদ

আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মমতকে ভেদাভেদবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদও বলা হয়। তাঁহার মতানুসারেও জগৎ সত্য; বেদান্তের পরব্রহ্ম সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান, সবিশেষ, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; এবং কৃষ্ণ বেদান্তের পরব্রহ্ম। তাঁহার ভেদাভেদবাদ অনুসারে কৃষ্ণ অংশী, জীব অংশ; কৃষ্ণ উপাস্য, জীব উপাসক; ভক্তিযোগে কৃষ্ণভজনাই জীবের ধর্ম্ম। ইহাই বেদান্ত নিরূপিত তত্ত্ব। শ্রীনিম্বার্কের মতাবলম্বীগণকে নিম্বার্ক সম্প্রদায় বলা হয়। আচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।১৮ শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত : ভেদবাদ

শ্রীমধ্বাচার্য্যও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বেদান্ত অনুসারে পরব্রহ্ম, জীব ও জগৎ তিনই সত্য এবং তিনই নিত্য; জীব পরব্রহ্মের অংশ এবং পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন; পরব্রহ্ম উপাস্য এবং জীব উপাসক; ভক্তিযোগে

তাঁহার উপাসনাই জীবের ধর্ম্ম ; এবং কৃষ্ণ পরব্রহ্ম। এই মতবাদকে ভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ বলা হয় এবং এই মতাবলম্বীগণকে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় বলা হয়। শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।১৯ শ্রীবল্লভাচার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত : শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

শ্রীবল্লভাচার্য্যও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, পরব্রহ্ম, জীব, এবং জগৎ তিনই সত্য ; জীব ও জগৎ পরব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ; পূর্ণবস্তুর সহিত তাহার অংশের যে সম্বন্ধ, পরব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ জীব পরব্রহ্মের অংশ ; কৃষ্ণ বেদান্তের পরব্রহ্ম ; কৃষ্ণ উপাস্য, জীব উপাসক ; ভক্তিযোগে কৃষ্ণভজনাই জীবের ধর্ম্ম। শ্রীবল্লভাচার্য্যের এই ধর্ম্মমতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয় এবং এই মতাবলম্বী-গণকে বল্লভসম্প্রদায় বলা হয়। শ্রীবল্লভাচার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।২০ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা প্রমাণিত : অচিন্ত্য ভেদাভেদ

পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণের তিরোধানের প্রায় চারিশত বৎসর পরে যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতে নিদারুণ ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি যুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মমত পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। তিনি ভারত-বিখ্যাত মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের এবং অন্য অসার ধর্ম্মমতাবলম্বীগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া উপনিষৎসমূহের এবং ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ অনুসারে ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মমত সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তৎকালীন ভারতের সর্ব্বপ্রধান মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমহাপ্রভুর ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা কৃষ্ণকে বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। শুধু তাঁহারাই নহেন ; শ্রীমহাপ্রভু প্রায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্রই তাঁহার ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং সকলেই তাঁহার মতকে যথার্থ বেদান্ততত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। তাঁহার উক্তি :

বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥
গৌণ, মুখ্য বৃত্তি, কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥ চৈঃ চঃ। মধ্য ২০শ পরিঃ।

যুগাবতার শ্রীমহাপ্রভুর দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।২১ গোস্বামীপাদগণের দ্বারা প্রমাণিত

গোস্বামীপাদগণ শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিয়াছেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমতকে প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বৃন্দাবন দাস, সনাতন গোস্বামী, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, জীব গোস্বামী, নরোত্তম দাস, এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই প্রমাণ করিয়াছেন যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।২২ সুবিখ্যাত সাহিত্যিকগণের দ্বারা প্রমাণিত

ভারতের যে সকল ভাষার সাহিত্য আছে, প্রায় তৎসমুদয়েই কৃষ্ণ সম্বন্ধে কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত সহিত্যে বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, রূপ গোস্বামীর লতিতমাধব এবং বিদগ্ধ-মাধব, কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়, প্রকাশানন্দের (ইঁহারই শ্রীমহাপ্রভুদত্ত নাম প্রবোধানন্দ) চৈতন্যচন্দ্রামৃত এবং বৃন্দাবনশতক, জীবগোস্বামীর গোপাল-চম্পু, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যে কৃষ্ণ পরব্রহ্ম এবং স্বয়ং ভগবান রূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন। সুরদাস, রঙ্গীলাল, হরিদাস, ঘনশ্যাম প্রভৃতি কবিগণের হিন্দীকাব্যে কৃষ্ণ পরব্রহ্ম এবং স্বয়ং ভগবান রূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ-দাস প্রভৃতি কবিগণের কৃষ্ণলীলাগান বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পদ। উক্ত কবিগণও কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম এবং স্বয়ং ভগবান বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত এবং ধর্ম্মতত্ত্ব নামক প্রবন্ধদ্বয়ে কৃষ্ণকে বেদান্তের পরব্রহ্ম, পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করা হইতেছে। ঋষিগণকে এবং অন্য অবতারগণকে

আদর্শচরিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন ঃ "কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়, যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রামলক্ষণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমময় চরিত্র কখনও মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। এই তত্ত্বটা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যও আমি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্যশিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।" এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "ধর্ম্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।"

১০।৪।২৩ সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বারা প্রমাণিত

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। তিনি কোন গ্রন্থ লিখিয়া পরব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সাধকজীবনের ইতিহাস এবং তাঁহার মৌখিক উপদেশ হইতে তাঁহার ভাব ও মত জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহার সাধনার ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, বাল্যকালে তিনি আপন গ্রামে কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক যাত্রা, গান, কীর্ত্তন, কথকতা প্রভৃতি শুনিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে পৌরহিত্য গ্রহণ করেন। এখন হইতে তিনি জগজ্জননী মাহামায়ার অর্চ্চনায় বিভোর হইলেন। ঐকান্তিক ভক্তির সহিত মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়াই তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইলেন। ইহার পর জগজ্জননী তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "তুই ভাবমুখে থাক্"। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ মধুরভাবে কৃষ্ণের আরাধনা এবং কৃষ্ণের সহিত মিলন সম্ভোগ করেন। সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ নরলীলায় লোকশিক্ষার নিমিত্ত সাধনা করিয়াছিলেন। মুক্তি, প্রেমবিকাশ এবং পরিণয় লাভের জন্য প্রথমে কিরূপে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তিহীন হইয়া শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রার্থনায় মহামায়ার অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় গোপীগণও এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। অতঃপর মধুরভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়াছেন যে মহামায়ার কৃপায় মুক্তিলাভের পরে প্রেমের বিকাশ হয় এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনসম্ভোগ করা যায়। ইহার পরে তিনি তোতাপুরীনামক অদ্বৈতবাদী (মায়াবাদী) সন্ন্যাসীর উপদেশে

অদ্বৈতবাদের সাধনপন্থা অনুসারে সাধন করিয়াছিলেন, তৎপরে ইস্‌লামধর্ম্মের পন্থানুসারে সাধন করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে খৃষ্টধর্ম্মের পন্থানুসারে সাধন করিয়াছিলেন। তোতাপুরীর উপদিষ্ট পন্থানুসারে সাধন করিয়া তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ছিলেন, তখন আবার মহামায়া তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, "তুই ভাবমুখে থাক্।" খৃষ্টধর্ম্মের পন্থানুসারে সাধনার পরেও মহামায়া পুনরায় ঐ আদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে মহামায়া তিনবার তাঁহাকে ভাবমুখে থাকিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এই আদেশানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ অবশিষ্ট জীবনকাল ভাবমুখেই ছিলেন।

১০।৪।২৪ শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চমপুরুষার্থের ধর্ম্মসাধনা শিক্ষা দিয়াছেন

শ্রীরামকৃষ্ণ মধুরভাবে কৃষ্ণের সহিত মিলনসম্ভোগ সত্ত্বেও তোতাপুরীর উপদেশে অদ্বৈতবাদের সাধনা করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্বল্পকাল স্থিত হইয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদীগণ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে: "কৃষ্ণ বেদান্তের পরব্রহ্ম নহেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সাধনা পরম সাধনা নহে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া পরম প্রাপ্তি নহে, অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মই বেদান্তের পরব্রহ্ম, অদ্বৈতাবাদের সাধনাই পরম সাধনা, এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিই পরম সিদ্ধি।" কৃষ্ণের সহিত মিলন সম্ভোগ হইবার পরেও শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদের সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া যদি উক্তরূপ যুক্তির অবতারণা হইতে পারে, তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু অদ্বৈতবাদের সাধনার পরে তিনি ইস্‌লামধর্ম্মের সাধনা করিয়াছিলেন, সেইহেতু ইস্‌লামধর্ম্মের সাধনা কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনা এবং অদ্বৈতবাদের সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আবার, যেহেতু তিনি সর্ব্বশেষে খৃষ্টধর্ম্মসাধনা করিয়াছিলেন, সেইহেতু খৃষ্টধর্ম্ম সাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এইরূপ যুক্তি যে সম্পূর্ণ অসার, তাহা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যথার্থ তত্ত্ব এই যে, কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তিই যে পরমা সিদ্ধি, তাহা দৃঢ়রূপে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি অদ্বৈতবাদের সাধনা, ইস্‌লামধর্ম্মের সাধনা, এবং খৃষ্টধর্ম্মের সাধনা করিয়া এবং সেই সকল সাধনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভোগেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উক্ত ত্রিবিধ সাধনার পরে তাঁহাকে ভাবমুখে থাকিবার জন্য পুনরায় আদেশ দিয়া মহামায়া তাঁহার দ্বারা এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, পঞ্চপুরুষার্থের সাধনাই যথার্থ সাধনা, ইহাই যুগ-

ধর্ম্মেরও সাধনা এবং অন্য কোন সাধনা যথার্থ সাধনা নহে এবং যুগধর্ম্মের সাধনাও নহে। ভাবমুখে থাকার অর্থ বুঝিলে এই তত্ত্বটী পরিস্ফুট হইবে।

১০।৪।২৫ "ভাবমুখে থাকার" অর্থ

৯।৭।২৫ এবং ৯।৭।২৬ অনুচ্ছেদদ্বয়ে ভাবাতীত ভাব, নির্ব্বিকল্প সমাধি, এবং সবিকল্প সমাধি বিবৃত হইয়াছে। সিদ্ধযোগী মায়াময় ক্ষরভাবের ভূমিকে অতিক্রম করিয়া ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে আরূঢ় হইলেই তাঁহার দৈহিক অহম্‌ (কাঁচা আমি) লয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয়, এবং যোগী নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। কেবল মোক্ষকামী সাধক এই নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থাতেই থাকিয়া যান। কিন্তু পঞ্চমপুরুষার্থকামী সাধক এই অবস্থায় থাকিয়া তৃপ্ত হয়েন না; প্রেমোপাসনার দ্বারা কৃষ্ণের সহিত আনন্দের আদানপ্রদানের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েন। তখন তাঁহার প্রেমের বিকাশ হয় এবং সেই অবস্থায় তাঁহার আত্মিক অহম্-এর (পাকা আমির-র) জাগরণ হয় অর্থাৎ ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে সবিকল্প সমাধিতে কৃষ্ণের প্রেমোপাসনা করিয়া তাঁহার সহিত আনন্দের আদানপ্রদানে ক্রিয়াশীল হয়। ইহাই পঞ্চমপুরুষার্থলাভ। কাঁচা আমি-র লয় হইয়া নির্ব্বিকল্প স্থিতি লাভ না হইলে ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা প্রেম-বিকাশ, পাকা আমি-র জাগরণ, সবিকল্প স্থিতিতে প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণের প্রেমোপাসনা, তাঁহার সহিত আনন্দের আদানপ্রদান, এবং বিজ্ঞানলাভ হইতে পারে না। পঞ্চমপুরুষার্থপ্রাপ্ত সিদ্ধযোগীর ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে অবস্থিত জীবাত্মা সবিকল্প সমাধিতে পরমভাব কৃষ্ণকে প্রেমভাবে সেবা এবং আরাধনা করিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন, সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পরে পরমভাবের সহিত ঐরূপ মিলনের জন্য উন্মুখ থাকেন, এবং তাঁহার বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়গণও পরমভাবমুখী হইয়া থাকে; এইজন্য তখন তাঁহার বাক্য কার্য্য এবং চিন্তাও পরমভাবমুখী হইয়া থাকে। তিনি কৃষ্ণকথা কহেন, কৃষ্ণের প্রীতিকর কার্য্য করেন, এবং কৃষ্ণকে চিন্তা করেন। এইরূপ অবস্থায় স্থিতিই ভাবমুখে থাকা। ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সম্বন্ধতত্ত্ব, যোগসাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের কথা কৃষ্ণকথা। যোগসাধনা এবং যোগসাধনার জন্য মানবকে উপদেশদান কৃষ্ণের প্রীতিকর কার্য্য। যাঁহারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়িয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের কৃষ্ণকথার পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট যাইতেন, তিনি

তাঁহাদিগকে কামিনীকাঞ্চনে অনাসক্ত হইয়া শুদ্ধাভক্তিযোগে ভগবানের ভজনা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি ভাবমুখে ছিলেন বলিয়াই তাঁহার দ্বারা ঐসকল কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছিল, প্রেমভাবহীন নির্ব্বিকল্প স্থিতিতে থাকিলে হইত না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবাত্মা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হয়। সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের মুক্তিলাভ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; লোকশিক্ষার জন্য তিনি দেখাইয়াছেন যে মহামায়ার প্রথম দর্শনের পর মুক্তাবস্থা হইলেই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম নির্ব্বিকল্প সমাধির পর মহামায়া তাঁহাকে ভাবমুখে থাকিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন; আবার যখন তিনি তোতাপুরীর উপদেশে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখনও মহামায়া তাঁহাকে ভাবমুখে থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মসাধনার পরে মহামায়া তৃতীয়বার তাঁহাকে ভাবমুখে থাকিবার আদেশ দিয়াছিলেন। মহামায়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবমুখে থাকিতে আদেশ দিয়া, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে থাকিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, তোতাপুরীর উপদিষ্ট নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম বেদান্তের পরব্রহ্ম নহেন, নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগ-সাধনার পরম সিদ্ধি নহে, পরন্তু সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম এবং সবিকল্প সমাধি যোগসাধনার পরম সিদ্ধি।

১০।৪।২৬ শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির দ্বারাও প্রামণিত

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অদ্বৈতবাদ বলিয়া কোন তত্ত্ব নাই, কিন্তু ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে আরূঢ় পঞ্চমপুরুষার্থপ্রাপ্ত জীবাত্মার অদ্বৈতভাব হয়। রাসলীলায় গোপীগণের আপনাদিগকে কৃষ্ণভাবনায় এই অদ্বৈতভাব প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করেন নাই, অদ্বৈতভাবকে সাধনায় লব্ধ চরম প্রাপ্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাকে অদ্বৈতভাবের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "উহা শেষ কথা রে শেষ কথা, ঈশ্বরপ্রেমের চরম পরিণতি: সর্ব্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে রাম এবং কৃষ্ণ বলিয়া যখন ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিজের অদ্বৈতভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি জানাইয়াছেন যে মায়াবাদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম নহেন, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ

বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, কারণ ঈশ্বরপ্রেম মায়াবাদের কেবল নির্গুণ নিরাকার নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি হইতে পারে না, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতিই হইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য উক্তি হইতেও ইহাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তিরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্ব্বদা অভেদভাবে অবস্থিত।" এতদ্দ্বারা মায়াবাদের নিঃশক্তি এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অস্বীকৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধের ন্যায় ভাগবত, ভক্ত ও ভগবানরূপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিত্যযুক্ত—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান তিনে এক একে তিন।" এতদ্দ্বারা তিনি মায়াবাদের কেবল অভেদবাদ অস্বীকার করিয়া ভেদাভেদসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণতত্ত্বকে পরাতত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সচ্চিদানন্দ যে কি পদার্থ তা কেউ বল্‌তে পারে না। তাই তিনি প্রথমে হলেন—অর্দ্ধনারীশ্বর! কেন? না দেখাবেন বলে যে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই আমি। তারপর তা থেকে আরও এক থাক্ নেবে আলাদা আলাদা পুরুষ ও আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন।" বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত ১।৪।৩ সূত্র ("স বৈ নৈব রেমে—" ইত্যাদি) যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিও ঠিক সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছে। এতদ্দ্বারা তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, তিনিই রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি, এই যুগলমূর্ত্তি তাঁহার অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি, এবং রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব পরাতত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "কামগন্ধহীন না হলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই গোপীদের মনে কোটী কোটী রমণসুখের অধিক আনন্দ হ'ত, দেহবুদ্ধি হারিয়ে যেত—তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাদের মনে উদয় হতে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হতে দিব্য জ্যোতি বাহির হয়ে তাদের শরীরকে স্পর্শ ক'রে, প্রতি রোমকূপে যে তাদের রমণসুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত!" এবিষয়ে আমারা পূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি তাহার সম্পূর্ণ পরিপোষক। আমরা পাইলাম যে, কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে

যে, প্রেমবিকাশ, এবং সবিকল্প স্থিতিতে কৃষ্ণের সহিত মিলনসম্ভোগ যোগ-সাধনার চরম ও পরম প্রাপ্তি।

১০।৪।২৭ সদ্‌গুরু-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণের দ্বারা প্রমাণিত

পূর্ব্বেই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে তিনি কৃষ্ণ-তত্ত্বকে পরাতত্ত্ব বলিয়া, এবং পঞ্চমপুরুষার্থকে সাধনার পরম প্রাপ্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এইজন্য, তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে পুনরালোচনা অনাবশ্যক। সদ্‌গুরু-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।২৮ মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের দ্বারা প্রমাণিত

শ্রীঅরবিন্দ যেমন মহান্ যোগী তেমনি শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান। তিনি ধর্ম্মবিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এইজন্য পরব্রহ্ম, পরমসাধনা, এবং পরমপ্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার মত তৎপ্রণীত গ্রন্থ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি গীতার The Message of the Gita নামক যে ইংরাজী ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ পরব্রহ্ম, পরাতত্ত্ব, এবং পুরুষোত্তম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ভক্তিযোগে কৃষ্ণকে লাভ করাই পরমপ্রাপ্তি বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার গীতাভাষ্যের ২৯।৫, ১৫।১৭, ১৮।৫৫ শ্লোকের ভাষ্যগুলি পাঠ করিলে আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তাঁহার Life Divine নামক ইংরাজীগ্রন্থেও তিনি এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমরা পাইলাম, শ্রীঅরবিন্দের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।

১০।৪।২৯ স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত

পরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা গীতা ভাগবত প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে, স্মৃতিশাস্ত্র কৃষ্ণকে বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সেইজন্য এখানে এই বিষয়ের বিস্তৃত পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন: 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ।" গীতা ১৫।১৫।—"সমগ্র বেদের দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্য।"

সমগ্র বেদ বলিতে বেদান্তও বুঝায়, কারণ বেদান্ত বেদের অন্তর্গত। এই বাক্যের দ্বারা গীতা ঘোষণা করিয়াছেন যে, বেদ-বেদান্ত যে পরব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, কৃষ্ণ সেই পরব্রহ্ম। শ্রীমদ্ভাগবতেও কৃষ্ণ বলিয়াছেন :

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ভাগবত ১১।২১।৪৩

—"বেদ আমাকে যজ্ঞরূপে বিধান করে, আমাকেই দেবতারূপে নির্দ্দেশ করে, এবং আমাকেই আকাশাদি রূপে প্রকাশ করে। শব্দময় বেদ মায়াময় জগতের নিষেধ করিয়া আমার অবতারাদি ভেদকে অনুবাদ করতঃ পরে কৃষ্ণরূপে আমাকে অবলম্বন করিয়া প্রসন্ন হয়। এই পর্য্যন্ত সকল বেদের তাৎপর্য্য।" এতদ্দ্বারা ভাগবত ঘোষণা করিলেন যে কৃষ্ণ বেদ-বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। বিষ্ণুপুরাণ ঘোষণা করিয়াছেন :

যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ। বিষ্ণুপুরাণ ৪।১১।২

—"পরব্রহ্ম নরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। সেই পরব্রহ্মের নাম কৃষ্ণ। তিনিই মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রও এই তত্ত্বই ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা পাইলাম, স্মৃতিশাস্ত্র কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। সকল শাস্ত্র এবং মহাজন কর্ত্তৃক উক্তরূপ ঘোষণা সত্ত্বেও যদি কেহ মনে করেন যে বেদান্তের পরব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ কেবল জ্ঞানস্বরূপ, তাহা হইলে বলিতে হয়, "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ !!!"

কৃষ্ণ বেদান্তবেদ্য, ইহা তাঁহার গোবিন্দ নামের অন্যতম কারণ। আমরা পাইলাম, কৃষ্ণ জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল, বেদবেদ্য, বেদান্তবেদ্য, এবং পরমানন্দরূপী বলিয়া তিনি গোবিন্দ।

একাদশ অধ্যায়

"সর্ব্বকারণকারণম্"

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিণামবাদ

১১।১।১ বিশ্ব কৃষ্ণের পরিণাম

আলোচ্য ঈশ্বরসূত্রে কৃষ্ণকে "সর্ব্বকারণকারণম্" বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সমগ্র স্থাবরজঙ্গমপূর্ণ বিশ্বের কারণ পুরুষ ও প্রকৃতি ; কৃষ্ণ পুরুষ-প্রকৃতিরও কারণ, এইজন্য কৃষ্ণ সর্ব্বকারণেরও কারণ। পুরুষ-প্রকৃতি সমগ্র বিশ্বের কারণ বলিয়া পুরুষ-প্রকৃতিকে সর্ব্বকারণ বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ সর্ব্ব-কারণেরও কারণ বলিয়া কৃষ্ণকে "সর্ব্বকারণকারণম্" বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ "সর্ব্বকারণকারণম্" বলিয়া তিনি পরমকারণ এবং সমগ্র বিশ্বের মূল কারণ। কৃষ্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু সৃষ্টির অর্থ এরূপ নহে যে, কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্ম্মাণ করে, স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণ লইয়া কুণ্ডল নির্ম্মাণ করে, কৃষ্ণ সেইরূপ আপনা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু লইয়া এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর কৃষ্ণই ছিলেন, দ্বিতীয় কোন বস্তুই ছিল না, এবং এই বিশ্ব তাঁহারই মধ্যে ছিল। বৃহদারণ্যক শ্রুতি ১।৪।১ সূত্রে বলিয়াছেন : "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোহনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোহ-পশ্যৎ।"—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব পুরুষের ন্যায় রূপবিশিষ্ট এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বররূপেই ছিল। তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আপনাকে ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিলেন না।" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি।" ঐতরেয়। ১।১।১—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বররূপেই ছিল। অন্য কিছুই ছিল না। তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমি লোকসমূহ সৃজন করিব'।" আদিম সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তু না থাকায় কুম্ভকার বা স্বর্ণকারের

ন্যায় আপনা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু লইয়া কৃষ্ণ বিশ্বস্থষ্টি করেন নাই। তিনি আপনাকেই বিশ্বরূপে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার আপনাকে বিশ্বরূপে পরিণত করাকেই তাঁহার বিশ্বস্থষ্টি বলা হয়। এইজন্য শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্র বলিয়াছেন যে বিশ্ব কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কৃষ্ণ অন্য কোন বস্তুর দ্বারা স্থষ্টি করিয়াছেন, এরূপ কথা কোন শাস্ত্রই বলেন নাই। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি স্থত্রে উপনিষৎ এবং ব্রহ্মস্থত্র বলিয়াছেন, "যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে"। বেদান্ত এই তত্ত্ব উপমার দ্বারাও বুঝাইয়া বলিয়াছেন; যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় (মুণ্ডক ২।১।১), যেমন জীবিত মানবের দেহ হইতে কেশ উদ্গত হয়, যেমন উর্ণনাভ হইতে জাল উৎপন্ন হয় (মুণ্ডক ১।১।৭), তদ্রূপ পরমেশ্বর হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। পরমেশ্বর বিশ্বরূপে পরিণত হয়েন বলিয়া বিশ্ব তাঁহার পরিণাম। এইজন্য স্থষ্টিতত্ত্বকে পরিণামবাদ বলা হয়। শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্র পরিণামবাদ নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রহ্মস্থত্র শ্রুতির এবং স্মৃতির এই তত্ত্বকে স্থত্রাকারে ঘোষণা করিয়াছেন। "আত্মকৃতে পরিণামাৎ।" ব্রহ্মস্থত্র ১।৪।২৬—"পরমেশ্বর আপনাকেই বিশ্বরূপে পরিণত করিয়া বিশ্বস্থষ্টি করিয়াছেন।" এই পরিণামবাদ নিরূপণ করিয়া শ্রুতি এবং স্মৃতি ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, কৃষ্ণ বিশ্বের পরম কারণ, তিনি ভিন্ন বিশ্বের দ্বিতীয় কারণ নাই, এবং বিশ্বে স্থূল, স্থক্ষ্ম, স্থক্ষ্মতর, স্থক্ষ্মতম যাহা কিছু বস্তু আছে, তৎসমুদয় কৃষ্ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই তত্ত্বও ব্রহ্মস্থত্রে ঘোষিত হইয়াছে। "যোনিশ্চ হি গীয়তে।" ব্রহ্মস্থত্র ১।৪।২৭।—শ্রুতি এবং স্মৃতি, সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন যে পরমেশ্বর বিশ্বের মূল এবং পরম কারণ।" কৃষ্ণ আপনাকে বিশ্বরূপে পরিণত করিয়াও স্থষ্টির পূর্ব্বে যেমন অনন্ত ছিলেন, তেমনই অনন্তই আছেন, কারণ অনন্ত হইতে অনন্ত বিয়োগ করিলেও অনন্তই অবশিষ্ট থাকে। কৃষ্ণ অব্যয় বীজ, এইজন্য তাঁহার কোন ক্ষয় নাই। কৃষ্ণ আপনাকেই কিরূপে বিশ্বরূপে পরিণত করিলেন, আমরা ক্রমশঃ তাহা বিবৃত করিতেছি।

১১।১।২ শক্তির পরিণাম জড় বস্তু

বিশ্ব কৃষ্ণের পরিণাম বলিতে, কৃষ্ণের ত্রিবিধ ঐশী শক্তির পরিণাম বুঝায়। শক্তির পরিণাম বলিতে, শক্তির কার্য্যাবস্থা বুঝায়। শক্তির কার্য্যাবস্থা শক্তির

বিকার। জড়বস্তু কৃষ্ণের মায়াশক্তির পরিণাম। জড়বস্তুতে যে জ্যোতি ও উত্তাপ আছে তাহা কৃষ্ণের জ্ঞানশক্তির পরিণাম। জড়বস্তুতে চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট যে সৌন্দর্য্য, জিহ্বার দ্বারা অস্বাদ্য যে মাধুর্য্য, নাসিকার দ্বারা আস্বাদ্য যে সৌরভ, কর্ণের দ্বারা আস্বাদ্য যে মাধুর্য্য, এবং ত্বকের দ্বারা আস্বাদ্য যে স্নিগ্ধতা আছে, তাহা কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির পরিণাম। শক্তির সকল পরিণামই জড়বস্তু; ইহাদের মধ্যে কোনটী স্থূল, কোনটী সূক্ষ্ম, কোনটী সূক্ষ্মতর, এবং কোনটী সূক্ষ্মতম জড় বস্তু। শক্তি পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তাহা জড় বস্তুতে পরিণত হয়; কিন্তু শক্তি পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়া কেবল প্রকাশ প্রাপ্ত হইলে সেই প্রকাশপ্রাপ্ত শক্তি জড়বস্তু নহে; তাহা জড়াতীত শক্তির জড়াতীত প্রকাশরূপ। অপ্রাকৃত পরব্যোম এবং গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ সন্ধিনী-শক্তির প্রকাশরূপ, এইজন্য তৎসমুদয় জড়বস্তু নহে। বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল বস্তু শক্তির পরিণাম বলিয়া তৎসমুদয় জড় বস্তু। ঈশ্বরের সকল শক্তিই চিচ্ছক্তি এবং চিদ্বস্তু, কিন্তু চিচ্ছক্তির পরিণাম জড়বস্তু, চিদ্বস্তু নহে।

১১।১।৩ শূন্যবাদ অসার ও অসত্য

বিশ্বোৎপত্তি সম্বন্ধে শূন্যবাদ নামক একটী মতবাদ আছে। এই মতবাদ অনুসারে বিশ্বোৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্য (Nothingness, non-existence) ছিল; সেই শূন্য হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের অনন্ত পুরুষমূর্ত্তির সান্দ্রী-করণের ফলে যে স্থানের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা শূন্য (Void) ছিল, এবং ঈশ্বর সেই শূন্য স্থানকে আপনা হইতে উদ্ভূত সৃষ্টির দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। পরব্যোম এবং প্রাকৃত বিশ্ব শূন্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া শূন্য স্থানকে পূর্ণ করিয়াছে। শূন্য (Nothing) হইতে বস্তু (Thing) উৎপন্ন হইতে পারে না। জড়বিজ্ঞান অনুসারেও শূন্যবাদ ভ্রান্ত এবং অসার। শ্রুতিও শূন্যবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। "কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ছান্দোগ্য। ৬।২।২—"হে সোম্য, অসৎ (= অনস্তিত্ব = non-existence) হইতে সৎ (= অস্তিত্ব = existence) কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? হে সোম্য বস্তুতঃ সৃষ্টির পুর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন।" "নাসতঃ, অদৃষ্টত্বাৎ।" ব্রহ্মসূত্র ২।২।২৬—"অসৎ হইতে বিশ্বের

উৎপত্তি হয় নাই, কারণ অসৎ হইতে কোন বস্তুর উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না।" বেদান্তে এবং অন্য শাস্ত্রেও "অসৎ" শব্দটী ব্যক্ত বস্তুর অব্যক্ত কারণাবস্থাকে বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং "সৎ" শব্দটী ব্যক্ত বস্তুকেও বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে বেদান্তে এবং অন্য শাস্ত্রেও কোন কোন স্থানে বলা হইয়াছে যে অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত কারণাবস্থা হইতে সৎ অর্থাৎ কার্য্যাবস্থা অভিব্যক্ত হয়। ঐ সকল শাস্ত্রবাক্যে অসৎ শব্দ শূন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। শাস্ত্র এবং জড়-বিজ্ঞানও বিশ্বের সৎ-কারণ নির্ণয় করিয়াছে এবং শূন্যবাদকে অসার ও অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

১১।১।৪ ইতরেতরাধ্যাসবাদ অসার ও অসত্য

ইতরেতরাধ্যাসবাদ মায়াবাদীর মতবাদ। মায়াবাদ অনুসারে জগৎ মিথ্যা, জগতের বাস্তব সত্ত্বাই নাই। যাহার বাস্তব সত্ত্বাই নাই, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না ; যাহার বাস্তব সত্ত্বা আছে তাহার উৎপত্তিও অবশ্যই আছে ; কেবল মূল ও পরম কারণের উৎপত্তি নাই। মায়াবাদ অনুসারে জগতের বাস্তব সত্ত্বা না থাকায় জগতের উৎপত্তিই হয় নাই। এইজন্য, মায়াবাদীর ইতরেতরাধ্যা-সবাদটী জগতের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদ নহে, জগতের অনস্তিত্ব-বিষয়ক মতবাদ। মায়াবাদী বলেন, জগতের বাস্তব সত্ত্বাই নাই ; জগৎ আছে বলিয়া যে মনে হয়, তাহা ভ্রম মাত্র ; যেমন, রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন সর্প না থাকিলেও সর্প আছে বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ, যদিও জগতের বাস্তব সত্ত্বাই নাই, তথাপি জগৎ আছে বলিয়া ভ্রম হয়। ইতরেতরাধ্যাসবাদ এইরূপ ভ্রমের কারণনির্ণায়ক মতবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব নহে। এইরূপ ভ্রমকে অধ্যাস বা বিবর্ত্ত বলা হয়। এই অধ্যাস কাহার হয় এবং কিরূপে হয়, তাহাও ইতরেতরাধ্যাসবাদে বলা হইয়াছে। ইতরেতর শব্দের অর্থ পরস্পর। ইতরেতর অধ্যাসের অর্থ পরস্পরের অধ্যাস। পরস্পর শব্দের দ্বারা যে দুইটী বস্তুকে নির্ণীত করা হইয়াছে তাহা ব্রহ্ম এবং মায়া। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ মায়াকে দেখিয়া ব্রহ্মের মনে হইতেছে যে মায়াই স্থাবরজঙ্গমময় বিশ্ব ; ইহা ব্রহ্মের অধ্যাস, অর্থাৎ ভ্রম। আবার, রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মকে দেখিয়া মায়ার মনে হইতেছে যে ব্রহ্মই স্থাবরজঙ্গমময় বিশ্ব ; ইহা মায়ার অধ্যাস। এইরূপে ব্রহ্মের এবং মায়ার পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের ভ্রম

হইতেছে যে জগৎ আছে, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে মনে হয় যে সর্প রহিয়াছে ; কিন্তু বাস্তবিক স্থাবরজঙ্গমময় বিশ্বের সত্তাই নাই। ইহাই ইতরেতরাধ্যাসবাদ। ইহা জগতের অস্তিত্ববোধকে ভ্রম বলিয়া নির্ণয় করিয়াছে বলিয়া ইহা জগতের অনস্তিত্ব-বিষয়ক মতবাদ। এই মতবাদটী যে সম্পূর্ণ অসার এবং অসত্য, তাহা বালকেরও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। ইহার অসারত্ব প্রমাণের জন্য কয়েকটী কারণ উল্লিখিত হইতেছেঃ (১) বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তম" ; মায়াবাদ অনুসারেও ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। ব্রহ্মের মধ্যে অজ্ঞানতা নাই। অধ্যাস অজ্ঞানতার ফল। অতএব, ব্রহ্মের অধ্যাস হইতে পারে না। সুতরাং, ইতরেতরাধ্যাসবাদ অসার এবং অসত্য। (২) বেদান্ত অনুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন, দ্বিতীয় কোন বস্তু ছিল না। ব্রহ্মের অতিরিক্ত মায়া নামক দ্বিতীয় বস্তু না থাকায়, ব্রহ্মের এবং মায়ার ইতরেতরাধ্যাস হইতে পারে না। সুতরাং, ইতরেতরাধ্যাসবাদ অসার এবং অসত্য। (৩) মায়াবাদ অনুসারে ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিঃশক্তি। এইরূপ ব্রহ্মের দ্বারা দর্শনকার্য্য হইতে পারে না, কারণ দর্শনকার্য্য সবিশেষ ও সাকার শক্তিমানের দ্বারাই হইতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে ব্রহ্মের যখন কোন শক্তিই নাই, তখন মায়াশক্তিও নাই। সুতরাং, ইতরেতর-অধ্যাসবাদের মায়া ব্রহ্মের মায়াশক্তি হইতে পারে না। শাস্ত্র যে উপাদানমায়াকে প্রকৃতি বলেন, ইতরেতর-অধ্যাসবাদের মায়া যদি সেই মায়া হয়, তবে মায়া নামক বিশ্বের মূল জড় উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় এবং মায়া হইতে উৎপন্ন বিশ্বেরও অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। তাহা হইলে ইতরেতর-অধ্যাসবাদ ব্যর্থ হইয়া যায়। আর যদি তর্কের খাতিরে এই উপাদানমায়াকেই ইতরেতর-অধ্যাসবাদের মায়া বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও এই মতবাদ ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ এই মায়া জড় ও অচেতন বস্তু, অচেতন বস্তুর চিন্তাশক্তি নাই এবং ভ্রমও হইতে পারে না। যদি তর্কের খাতিরে এই জড় উপাদানমায়াকে চেতন বস্তু বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও এই মতবাদ ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ, বেদান্তমতেই ব্রহ্ম জড় চক্ষুকর্ণাদির অগোচর, মায়াবাদ অনুসারেও ব্রহ্ম নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ এবং চক্ষুকর্ণাদির অগোচর, জড় উপাদানমায়াকে জড় চক্ষুকর্ণাদিবিশিষ্ট চেতন বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাহার দ্বারা ব্রহ্ম দৃষ্ট হইতে পারেন না এবং দৃষ্ট না হওয়ায় অধ্যাসও হইতে পারে না। সুতরাং ইতরেতর-

অধ্যাসবাদ অসার ও অসত্য। (৪) এই মতবাদের মায়া যদি অবিদ্যা ও অজ্ঞান হয়, তাহা হইলেও ইহা ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে যখন এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন, তখন অবিদ্যা ও অজ্ঞান ছিল না; বিশ্বোৎপত্তির সহিত অবিদ্যার এবং অজ্ঞানেরও উৎপত্তি হইয়াছে। মায়াকে অজ্ঞান ও অবিদ্যা বলিয়া ধরিয়া লইলে বিশ্বোৎপত্তিও স্বীকার করিতে হয়। বিশ্বের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিশ্বের অস্তিত্বও স্বীকৃত হয় এবং তাহা হইলে অস্তিত্ববান বিশ্বের অস্তিত্ববোধ ভ্রম হইতে পারে না। আবার, অবিদ্যা ও অজ্ঞানকে জড়ত্ববর্জ্জিত গুণমাত্ররূপে (Abstract quality রূপে) গ্রহণ করিলেও, সৃষ্টির পূর্ব্বে এরূপ কোন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং, মায়ার অর্থ অবিদ্যা এবং অজ্ঞান বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইতরেতর-অধ্যাসবাদ অসার ও অসত্য। (৫) রজ্জুতে সর্পভ্রমের ব্যাপারে অন্ততঃ চারিটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়: রজ্জুর দ্রষ্টার অস্তিত্ব, রজ্জুর অস্তিত্ব, সর্পের অস্তিত্ব, রজ্জুর দ্রষ্টার দ্বারা রজ্জুদর্শনের পূর্ব্বে সর্পদর্শনলব্ধ সর্পজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। মায়াকে অবলোকন করিয়া মায়াকে স্থাবরজঙ্গমময় বিশ্ব বলিয়া ব্রহ্মের অধ্যাস হইতে হইলেও চারিটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়: ব্রহ্মের মায়ার দ্রষ্টারূপে অস্তিত্ব, ব্রহ্মের দ্বারা দৃষ্ট মায়ার অস্তিত্ব, স্থাবরজঙ্গমময় বিশ্বের অস্তিত্ব, ব্রহ্মের মায়াকে দর্শন করিবার পূর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমময় বিশ্বকে দর্শন করিয়া সেই দর্শনলব্ধ বিশ্বজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন, অন্য তিনটী বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং, ইতরেতর-অধ্যাসবাদ অসার এবং অসত্য। অপরপক্ষে, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য মায়াবাদী কর্ত্তৃক যে ইতরেতর-অধ্যাসবাদ কল্পিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই বিশ্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এই মতবাদ অনুসারেই ব্রহ্মের বিশ্বদর্শনের দ্বারা বিশ্ব-জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। (৬) জগতকে যদি মিথ্যা, অস্তিত্বহীন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে মানব জগতকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া যুগে যুগে জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং যে জ্ঞান জ্যোতিষবিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান, বীজগণিতবিজ্ঞান, জ্যামিতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, দেহতত্ত্ববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেই সমস্ত জড়বিজ্ঞানই মিথ্যা বস্তুতে পরিণত হইত এবং মানবের চিন্তা গবেষণা বিচার জ্ঞান সমস্তই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হইয়া যাইত। কিন্তু মানবজাতি এমন অর্ব্বাচীন নহে যে

জগতকে এবং জগত-বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানসমূহকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিবে। জগৎ সত্য বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানসমূহ লব্ধ হইয়াছে এবং জগৎ-বষয়ক উক্ত বিজ্ঞানসমূহও সত্য। আবার, জগৎ মিথ্যা হইলে, যিনি বলেন জগৎ মিথ্যা তিনিও মিথ্যা এবং তাঁহার "জগৎ মিথ্যা" এই বাক্যও মিথ্যা। ইতরেতর-অধ্যাসবাদ অসার ও অসত্য তাহা প্রমাণিত হইল। বিশ্ব এবং জগৎ সত্য, এবং বিশ্বোৎপত্তি বিষয়ক শাস্ত্রোক্ত পরিণামবাদও সত্য। পরিণামবাদ জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানের মতে সকল বস্তুই তাহাদের কারণের কার্য্যাবস্থা, অর্থাৎ পরিণাম। জড়বৈজ্ঞানিক কার্য্যপরম্পরা হইতে কারণপরম্পরার অনুসন্ধান করিতে করিতে ইহাও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, শক্তি বিশ্বের মূল কারণ এবং এই বিশ্ব শক্তির পরিণাম। কিন্তু সেই শক্তি জড় বস্তু নহে বলিয়া জড়বৈজ্ঞানিক সেই শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন না। মায়াবাদ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়াছে কিন্তু জগতকে মিথ্যা বলিয়াছে। মায়াবাদ যদি শাস্ত্র নিরূপিত পরিণামবাদ গ্রহণ করিত তাহা হইলে জগতকে মিথ্যা বলিতে পারিত না, কারণ, ব্রহ্ম সত্য; সেই সত্যের পরিণাম বিশ্বও অবশ্যই সত্য, মিথ্যা হইতে পারে না। জগতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ মায়াবাদকে শাস্ত্রনিরূপিত পরিণামবাদ ত্যাগ করিয়া ইতরেতরাধ্যাসবাদ কল্পনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু মিথ্যা কল্পনা কখনও যুক্তির বিচারে দাঁড়াইতে পারে না এবং সত্য বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে না। আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় মহামনস্বী ব্যক্তি যে ইহা জানিতেন না তাহা নহে। তিনি মায়াবাদকে কোনরূপ একটী যুক্তির দ্বারা সমন্বিত না করিলে তাহা গৃহীত হইত না। এইজন্য তিনি ইতরেতরাধ্যাসবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তদানীন্তন শাস্ত্রানভিজ্ঞ জনসাধারণকে উক্তরূপ যুক্তির দ্বারা নিরস্ত করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল, কিন্তু কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই উক্ত যুক্তি গ্রহণ করেন নাই, তাহা শ্রীশঙ্করের পরবর্ত্তী রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক মায়াবাদখণ্ডন হইতে বুঝা যায়। বিরুদ্ধ যুক্তির চাপে পড়িয়া আধুনিক মায়াবাদীগণের মধ্যে অনেকেই জগতের ব্যবহারিক সত্ত্বা আছে বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

১১।১।৫ সাংখ্যদর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব

কেহ কেহ বলেন যে সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা

এই মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সাংখ্যসূত্রের উপর নির্ভর করেন তাহা এই: "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" সাংখ্যাসূত্র ১।৯২। এই সূত্রটীর অর্থ এরূপ নহে যে, ঈশ্বর নাই। সাংখ্যদর্শন চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত প্রমাণের সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিয়াছেন যে ঈশ্বর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। ইহাই "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্রের অর্থ। শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রও বলিয়াছেন যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সুতরাং, এবিষয়ে সাংখ্যদর্শনের মত এবং শ্রুতির ও স্মৃতির মত এক এবং অভিন্ন। ১।৯৬ সূত্রে সাংখ্যদর্শন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানহেতু প্রকৃতির মহত্তত্ত্ব নামক পরিণাম হয়। সুতরাং সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর শাস্ত্র নহে। যাঁহারা সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর শাস্ত্র বলেন, তাঁহারা বলেন যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি বিশ্বের মূল কারণ। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মত তাহা নহে। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন: "মূলে মূলাভা-বাদমূলং মূলম্।" সাংখ্যসূত্র ১।৬৭।—"যাঁহা সকলের মূল কারণ তাহার কোন মূল কারণ থাকিতে পারে না।" যাঁহারা সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর বলেন, তাঁহারা বলেন যে, সাংখ্যদর্শন এই সূত্রের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে প্রকৃতি বিশ্বের মূল কারণ, প্রকৃতির কোন কারণ নাই। কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র বলিয়াছেন: "সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য।" সাংখ্যসূত্র ১।৬৬।—"জগতের সৃষ্টবস্তুমাত্রেই যেভাবে অবস্থিত আছে, তাহা হইতে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, পুরুষ আছেন। সাংখদর্শনে পুরুষ সম্বন্ধে আরও অনেক সূত্র আছে, যেগুলির সহিত ১।৬৭ সূত্রের সমন্বয়মতে এই অর্থই পাওয়া যায় যে, পুরুষই, অর্থাৎ ঈশ্বরই পরম কারণ এবং প্রকৃতি ঈশ্বরের পরিণাম। অতঃপর সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন: "পারম্পর্য্যেহপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্।" সাংখ্যসূত্র ১।৬৮। এই সূত্রের অর্থ এই: "জগতের সকল স্থূল বস্তুর কারণ সূক্ষ্ম বস্তু; সূক্ষ্মের কারণ সূক্ষ্মতর, এবং সূক্ষ্মতরের কারণ সূক্ষ্মতম বস্তু। এইরূপে কারণানুসন্ধান করিতে করিতে আমরা যে মূল পরম কারণে উপনীত হই, তাহার কোন কারণ নাই। এই পরমকারণকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা অন্য যে কোন নাম দেওয়া হউক্, তাহাতে দোষ নাই।" সাংখ্যসূত্রসমূহের সমন্বয়-মতে এই তত্ত্বই পাওয়া যায় যে ঈশ্বর পরমকারণ এবং প্রকৃতি ঈশ্বরের পরিণাম এবং প্রকৃতি বিশ্বের মূল জড় উপাদান। বেদান্ততত্ত্বও ইহাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকৃতিঃ বিশ্বের সমষ্টি কারণদেহ

১১।২।১ মায়াশক্তির পরিণাম ঃ ত্রিগুণ

গোলোকবিহারী কৃষ্ণ আনন্দলীলার বিস্তারের নিমিত্ত বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কিরূপে আপনাকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বে পরিণত করিয়াছেন এখন তাহাই বিবৃত করা হইতেছে। সত্যসঙ্কল্প কৃষ্ণ যখন বিশ্বসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি অমোঘ সঙ্কল্প বলে সঙ্কর্ষণরূপে স্বীয় অনন্ত মায়াশক্তির একাংশকে আপনা হইতে সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আনিয়া সত্ত্বগুণে পরিণত করিলেন। সত্ত্বগুণে পরিণত হইয়া মায়াশক্তি তন্মধ্যে কামনাশক্তি রূপে বিদ্যমান রহিল। কামনাশক্তি মায়াশক্তির বিকার। সত্ত্বগুণে অবস্থিত কামনাশক্তিকে কৃষ্ণ রজোগুণে পরিণত করিলেন। রজোগুণের মধ্যে কামনাশক্তি বিকৃত হইয়া অবিদ্যাশক্তি রূপে বিদ্যমান রহিল। অবিদ্যাশক্তি কামনাশক্তির বিকার। রজোগুণে অবস্থিত অবিদ্যাশক্তিকে কৃষ্ণ তমোগুণে পরিণত করিলেন। তমোগুণের মধ্যে অবিদ্যাশক্তিও বিকৃত হইয়া মোহিনীশক্তি রূপে বিদ্যমান রহিল। মোহিনীশক্তি অবিদ্যাশক্তির বিকার। এইরূপে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটী গুণের উৎপত্তি হইল। গুণত্রয় সর্ব্বপ্রথমোৎপন্ন জড় বস্তু, কিন্তু ইহারা সূক্ষ্মতম জড় বস্তু, এইজন্য জড় চক্ষুর গোচর নহে। গুণত্রয় চিদ্বস্তু নহে, জড়বস্তু। তাহাদের মধ্যে অবস্থিত মায়াশক্তির কামনাশক্তি, অবিদ্যাশক্তি, এবং মোহিনীশক্তি নামক ত্রিবিধ কার্য্যকারী রূপও চিচ্ছক্তি নহে। জড় ত্রিগুণের এই শক্তিত্রয়ও জড়শক্তি ; ইহারাও সূক্ষ্মতম জড়বস্তু বলিয়া চক্ষুগোচর হয় না।

১১।২।২ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটী গুণের সমবায় প্রকৃতি। এই গুণ শব্দের অর্থ জড়ত্ববর্জ্জিত গুণমাত্র (Abstract quality) নহে। রজ্জু যেমন বস্তুকে বন্ধন করিয়া রাখে, তদ্রূপ সত্ত্ব রজঃ তমঃ জীবাত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে ; এইজন্য এই তিনটীকে গুণ বলা হয়। গুণ শব্দ রজ্জু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ গীতা ১৪।৫

—"সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই গুণত্রয় হইতে প্রকৃতির সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা অবিনাশী জীবাত্মাকে দেহে বন্ধন করিয়া রাখে।"

১১।২।৩ প্রকৃতি উপাদানমায়া

প্রকৃতি মায়াশক্তির পরিণাম, সর্ব্বপ্রথমোৎপন্ন জড়বস্তু, এবং যাহা কিছু জড়বস্তু আছে, তৎসমুদয়ের মূল জড় উপাদান। মায়াশক্তি বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, এইজন্য মায়াশক্তি বিশ্বের নিমিত্তমায়া। প্রকৃতি বিশ্বের উপাদানকারণ, এইজন্য প্রকৃতি বিশ্বের উপাদানমায়া। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" শ্বেতাশ্বতর ৪।১০।—"মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।" ইহার অর্থ এই যে, মায়াশক্তি প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে এবং প্রকৃতিও মায়া। প্রকৃতি বিশ্বের প্রধান অর্থাৎ মূল জড় উপাদান বলিয়া ইহার অন্য নাম প্রধান। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি মায়াধীশ কৃষ্ণের মায়াশক্তিতে প্রলীন হইয়া থাকে, ইহার বাহ্য প্রকাশ থাকে না, এইজন্য প্রকৃতির অন্য নাম ক্ষর। "ক্ষরং প্রধানম্।" শ্বেতাশ্বতর ১।১০। প্রকৃতি সূক্ষ্মতম জড়বস্তু এবং চক্ষুর অগোচর বলিয়া ইহার অন্য নাম অব্যক্ত। "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।" কঠ ১।৩।১১।—"মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্ত (=প্রকৃতি) শ্রেষ্ঠ, এবং অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ (=কৃষ্ণ) শ্রেষ্ঠ।" "অব্যক্তা-দ্ব্যক্তয় সর্ব্বাঃ।" গীতা ৮।১৮।—"অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত হইয়াছে", অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে চরাচরাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি অপরব্রহ্ম বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মও বলা হয়। ইহা মহত্তত্ত্ব প্রসব করে বলিয়া ইহার অন্য নাম মহদ্‌ব্রহ্ম। বিশ্বোৎপত্তির জন্য প্রকৃতিতে কৃষ্ণ চিদানন্দ-বীজ আধান করেন বলিয়া ইহার অন্য নাম মহদ্‌যোনি (গীতা ১৪।৩-৪)।

১১।২।৪ প্রকৃতি কারণবারি

অব্যক্ত প্রকৃতি ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ অথবা ব্যোমের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট আকারের বস্তু নহে এবং উক্ত পঞ্চভূতের মধ্যে কোনও একটী নহে। ইহা অগঠিত এবং অনির্দ্দিষ্ট বস্তু। ইহা জল নহে, বাষ্পও নহে, কিন্তু এই উভয়বিধ বস্তুর ভাববিশিষ্ট তরল বস্তু। বিশ্বের উপাদানকারণ এই তরল বস্তুটীকে শাস্ত্রে

কারণবারি নাম দেওয়া হইয়াছে। এখানে বারি বলিতে ঠিক জল বুঝায় না ; অগঠিত এবং অনির্দ্দিষ্ট তরল বস্তুটীকে "বারি" ব্যতীত অন্য শব্দের দ্বারা বুঝান যায় না বলিয়া ইহাকে কারণবারি বলা হইয়াছে। এই "বারি" বিশ্বের উপাদান-কারণ বলিয়া ইহার নাম কারণবারি। "আপ এব ইদমগ্র আসুঃ।" বৃহদারণ্যক ৫।৫।১—"নামরূপাকারে ব্যক্ত এই বিশ্ব অগ্রে জলই ছিল।" ঋগ্বেদ ইহাকে অপ্রকেত সলিল বলিয়াছেন (অপ্রকেত =যাহাকে বিশেষরূপে জানা যায় না)। প্রথোমোৎপন্ন কারণবারির পরিমাণ সুবিশাল। ইহা পরব্যোমের বাহিরে অকূল সমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত ; এইজন্য শাস্ত্র ইহাকে কারণার্ণব, কারণসমুদ্র, এবং করণাব্ধি নামও দিয়াছেন। জড়বিজ্ঞানেও এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, চরাচরাত্মক বিশ্ব প্রথমে অব্যক্ত, অগঠিত, এবং অনির্দ্দিষ্ট তরলবস্তুরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা একরূপ বস্তু (Homogeneous matter) এবং বিবিধ রূপবিশিষ্ট জড়বস্তু-সমূহ (Heterogeneous matter) তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জড়বিজ্ঞান এই বস্তুটীকে Protyle নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের Protyle শাস্ত্রোক্ত কারণবারি নহে ; উহা অতঃপর বর্ণিত ক্ষীরোদধির ক্ষীর নামক বস্তু। বিশ্বের বিবিধ বস্তু প্রথমে অব্যক্ত, অগঠিত, অনির্দ্দিষ্ট তরল বস্তুরূপে ছিল, জড়বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের প্রকৃতিতত্ত্বের অনুরূপ। প্রকৃতি সূক্ষ্মতম জড়বস্তু, এইজন্য ইহা জড়বিজ্ঞানের বিষয় নহে, অণুবীক্ষণের দ্বারাও প্রকৃতিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

১১।২।৫ প্রকৃতির সত্ত্বগুণ : কামনাশক্তি

ত্রিগুণের ধর্ম্ম, শক্তি, এবং কার্য্যই প্রকৃতির ধর্ম্ম, শক্তি, এবং কার্য্য, কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণের সমবায়। প্রকৃতিকে ত্রিগুণের পরিচয়ের দ্বারা বুঝা যাইবে। প্রথমোৎপন্ন সত্ত্ব ত্রিগুণের মধ্যে শুদ্ধতম। শুদ্ধতায় ইহা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের সতের নিকটতম বস্তু। কিন্তু সত্ত্বগুণ সৎ নহে। সৎ মূল বস্তু, ইহার কোন কারণ নাই, এবং ইহা কাহারও পরিণাম নহে। শক্তির পরিণাম শক্তির কার্য্যাবস্থা। কার্য্যাবস্থা অসৎ, অর্থাৎ অশুদ্ধ। এইজন্য সত্ত্বগুণ অসৎ। সত্ত্ব ত্রিগুণের মধ্যে শুদ্ধতম হইলেও অসৎ বস্তু বলিয়া ইহাও সৎ হইতে ভিন্ন এবং অশুদ্ধ সত্ত্বা বা বস্তু।.. সৎ শুদ্ধসত্ত্বা এবং চিদ্বস্তু ; তিনটী গুণই অশুদ্ধ সত্ত্বা এবং অচিদ্বস্তু। সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্ম্মী এবং পালনধর্ম্মী। ইহার কামনাশক্তি ইহার প্রকাশধর্ম্ম

হইতে প্রকাশের এবং পালনধর্ম্ম হইতে পালনের কামনা উৎপন্ন করে। প্রকাশের অর্থ, বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানলাভ। পালনের অর্থ, উক্তরূপে লব্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যে পালনকর্ম্ম সম্পাদন। সত্ত্বগুণ জড়বস্তু, ইহার নিজস্ব চেতনা নাই; ইহা চেতনা পাইলে জড়বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করিয়া তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে। জড়বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন; জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে কর্ম্ম করাইবার জন্য মনের প্রয়োজন; মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়-গণের কর্ম্মে সহায়তা করিবার জন্য হস্ত পদ বাক্ পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। এইজন্য সত্ত্বগুণ হইতে মনের এবং দশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। ইহাদের দ্বারা সত্ত্বগুণ বস্তুকে প্রকাশ করে এবং পালনও করে। এইরূপে, কামনাশক্তি সত্ত্বগুণের প্রকাশধর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রকাশিকাশক্তিরূপে এবং পালনধর্ম্মের মধ্য দিয়া পালনকারী শক্তি রূপে ক্রিয়াশীল হয়। এই দুইটী সত্ত্বগুণের প্রধান শক্তি। কাম্য বস্তুর প্রতি আসক্তি হয়, উহার লাভে সুখ হয় এবং সেই সুখের প্রতিও আসক্তি হয়। সত্ত্বগুণের কাম্যবস্তু জ্ঞান, এবং জ্ঞানলাভে উহার সুখ। এইজন্য, সত্ত্বগুণে জ্ঞানাশক্তি এবং জ্ঞানলাভজাত সুখের প্রতি আসক্তি আছে। সত্ত্বগুণ এই দুইটী আসক্তির দ্বারা জীবাত্মাকে দেহে বন্ধন করিয়া রাখে। গীতা বলেন:

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ গীতা ১৪।৬

—"ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ব নির্ম্মলতা হেতু প্রকাশক এবং অনাময়। সুখাসক্তি এবং জ্ঞানাশক্তির দ্বারা ইহা জীবাত্মাকে দেহে বন্ধন করে।" সত্ত্বগুণের প্রকাশ-ধর্ম্ম, জ্ঞানাসক্তি, এবং সুখাসক্তি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকের মর্ম্ম। ইহাতে সত্ত্বগুণকে নির্ম্মল এবং অনাময় বলা হইয়াছে। ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ব শুদ্ধতম এবং ইহাতে কামনাশক্তি কামক্রোধাদি রিপু উৎপন্ন করে না বলিয়া ইহা নির্ম্মল। রিপুগণ আময় অর্থাৎ অনর্থ সৃষ্টি করে; সত্ত্বগুণে রিপু না থাকায় ইহাতে আময় নাই। কামনাশক্তি সত্ত্বগুণে যে জ্ঞানের এবং পালনের কামনা উৎপন্ন করে, তাহা রজোগুণের কামরিপু নহে। বিষয়ভোগের কামনা এই কামরিপু। ক্রোধএবং লোভ নামক রিপুদ্বয় কামরিপুরই অবস্থান্তর।

প্রকাশধর্ম্মী সত্ত্বগুণে মোহ মদ মাৎসর্য্য নামক রিপুত্রয়ও নাই। এইজন্য সত্ত্বগুণকে গীতা নির্ম্মল এবং অনাময় বলিয়াছেন।

১১।২।৬ প্রকৃতির রজোগুণ : অবিদ্যাশক্তি

রজোগুণও অসৎ এবং সত্ত্বগুণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। রজঃ সম্ভোগধর্ম্মী এবং সৃজনধর্ম্মী। অবিদ্যাশক্তি ইহার সম্ভোগধর্ম্ম হইতে কাম ক্রোধ এবং লোভ নামক রিপুত্রয় উৎপন্ন করে। এই তিনটী রিপু জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া অজ্ঞান উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাদের জন্মদাত্রী শক্তির নাম অবিদ্যাশক্তি। কাম মূল রিপু; ইহা প্রতিহত হইলে ক্রোধে, এবং ইহাই কাম্য বস্তুর প্রতি লোভে পরিণত হয়। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভব।" গীতা ৩।৩৭। কামরিপু রজোগুণকে বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত করে; বিষয়ভোগের জন্য ভোগ্য বিষয়ের প্রয়োজন। কাম রজোগুণকে ভোগ্য বিষয়ের সৃজনকর্ম্মে, এবং সৃষ্ট বিষয়ের রক্ষণকর্ম্মে ব্যাপৃত করে। এইরূপে, অবিদ্যাশক্তি রজোগুণের সম্ভোগধর্ম্মের মধ্য দিয়া সম্ভোগশক্তি, এবং সৃজনধর্ম্মের মধ্য দিয়া সৃষ্টিশক্তি এবং রক্ষণশক্তি রূপে ক্রিয়াশীল হয়। এই তিনটী রজোগুণের প্রধান শক্তি। ভোগ্যবিষয়ের প্রতি রজোগুণের আসক্তি হয়। বিষয় ভোগ করিলে রজোগুণে সুখের উদয় হয়, এবং এইরূপ সুখের প্রতি রজোগুণের আসক্তি হয়। ভোগ্য বিষয় সৃষ্টি, রক্ষা, এবং ভোগ করিবার কর্ম্মেও রজোগুণের আসক্তি হয়। রজোগুণ এই সকল আসক্তির দ্বারা জীবাত্মাকে দেহে বন্ধন করিয়া রাখে।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ গীতা ১৪।৭

—"রজোগুণ রাগাত্মক (=সম্ভোগধর্ম্মী)। ইহা হইতে তৃষ্ণা (=কাম) উৎপন্ন হয়। ইহা জীবাত্মাকে কর্ম্মের (=ভোগ্যবিষয় সৃষ্টির, রক্ষার, এবং ভোগের কর্ম্মের) আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে।"

১১।২।৭ প্রকৃতির তমোগুণ : মোহিনীশক্তি

তমঃ নিকৃষ্টতম গুণ। ইহা মোহনধর্ম্মী এবং প্রলয়ধর্ম্মী। মোহিনীশক্তি ইহার মোহনধর্ম্ম হইতে মোহ এবং প্রলয়ধর্ম্ম হইতে মদ এবং মাৎসর্য্য নামক রিপু উৎপন্ন করে। মোহরিপু জ্ঞানবিমুখ, প্রমাদপরায়ণ, এবং নিদ্রালু করে।

মদ দাম্ভিক এবং গর্ব্বপরায়ণ করে। মাৎসর্য্য হিংসা এবং কুটিলতা উৎপন্ন করিয়া সংহারকার্য্যে লিপ্ত করে। ইহার মোহনধর্ম্মের মধ্য দিয়া মোহিনীশক্তি এবং প্রলয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রলয়শক্তি কার্য্যকারী হয়। এই দুইটী ইহার প্রধান শক্তি। প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, এবং সংহারকর্ম্মের প্রতি ইহার আসক্তি হয়, এবং এই সকল কর্ম্মের ফলে যে সুখ প্রাপ্ত হয়, সেই সুখের প্রতিও ইহার আসক্তি হয়। এইরূপ কর্ম্মাসক্তি এবং সুখাসক্তির দ্বারা ইহা জীবাত্মাকে দেহে বন্ধন করিয়া রাখে।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ গীতা ১৪।৮

—"তমোগুণ অজ্ঞানজাত, অর্থাৎ অবিদ্যাশক্তি হইতে উৎপন্ন। ইহা জীবাত্মাকে মোহগ্রস্থ করে। প্রমাদ আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা ইহা জীবাত্মাকে দেহে বন্ধন করে।

১১।২।৮ প্রকৃতিতে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা

ত্রিগুণের মধ্যে কোন একটী অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না। ইহারা সর্ব্বদা একত্র অবস্থিত থাকে। এইজন্য প্রকৃতি নিত্যই ত্রিগুণময়ী। কিন্তু প্রকৃতির ত্রিগুণের মধ্যে কোন একটী প্রবল এবং পরিচালক হইয়া অন্য দুইটীকে অধীন এবং আজ্ঞাকারী করে না। প্রকৃতির তিনটী গুণই সাম্যাবস্থায় থাকে। এইজন্য, সাম্যাবস্থাপন্ন ত্রিগুণই প্রকৃতি। "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" সাংখ্যসূত্র ১।৬১—"প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা।" অর্থাৎ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এবং ইহার ত্রিগুণ সাম্যাবস্থাপন্ন। প্রকৃতির সাম্যাবস্থাপন্ন ত্রিগুণ পরস্পরের সহযোগিতা করে, কিন্তু কেহ কাহাকেও অভিভূত করে না। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি নামক যে বিকার উৎপন্ন হয়, সেই বিকারের মধ্যে ত্রিগুণ কখনও সাম্যাবস্থায় থাকে না। মায়াময় বিশ্বের দ্বন্দ্বলীলার জন্য প্রকৃতির বিকার উৎপন্ন হয়। বিকারের মধ্যে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা থাকিলে বিশ্বে দ্বন্দ্ব থাকিত না, দ্বন্দ্ব না থাকিলে দ্বন্দ্বলীলা হয় না; এইজন্য বিকারের মধ্যে সাম্যাবস্থা নাই। রজোগুণের ধর্ম্ম এবং শক্তি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। দ্বন্দ্ব-লীলার জন্য প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বুদ্ধি নামক বিকারে রজঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং পরিচালক গুণ; সত্ত্ব এবং তমঃ ইহার অধীন ও অনুবর্ত্তী; সত্ত্ব স্বীয়

প্রকাশিকাশক্তি এবং পালনশক্তিকে এবং তমঃ স্বীয় মোহিনীশক্তি এবং প্রলয়-শক্তিকে রজোগুণের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। পরিণয়প্রাপ্তির জন্য যোগ-সাধনার ফলে সত্ত্বগুণ প্রবল ও পরিচালক হয়; তখন রজঃ এবং তমঃ নিজ নিজ শক্তিসমূহকে সত্ত্বগুণের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। তমোগুণ প্রবল ও পরিচালক হইলে সত্ত্ব এবং রজঃ তাহার অধীন ও আজ্ঞাকারী হয়। ত্রিগুণের এইরূপ অসাম্য এবং আসাম্যাবস্থার এইরূপ সহযোগিতা প্রকৃতির বিকার বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধির বিকারসমূহের মধ্যে আছে, কিন্তু প্রকৃতিতে নাই। সাম্যা-বস্থাপন্না এবং বিক্ষোভহীনা প্রকৃতি বিশ্বের সমষ্টি কারণদেহ; ইহার অংশ ব্যষ্টি জীবদেহে ব্যষ্টি কারণদেহরূপে বিদ্যমান থাকে। বিশ্বের সমষ্টি কারণদেহের উৎপত্তি বিশ্বসৃষ্টির প্রথম পর্য্যায়।

১১।২।৯ প্রকৃতি জড় ও অচেতন

প্রকৃতি জড় বস্তু; তাহার নিজস্ব চেতনা নাই। শ্রুতি এবং স্মৃতি সকল শাস্ত্রই প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। "ঈক্ষতের্ন, অশব্দম্।" ব্রহ্মসূত্র ১।১।৫—"শ্রুতি এবং স্মৃতি সকল শাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঈশ্বর বহু হইবার ইচ্ছায় স্বীয় অনন্ত জ্ঞানশক্তির পরিচালনা করিয়া সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিয়া, সৃষ্টির পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা শ্রুতি এবং স্মৃতি নিরূপণ করিয়াছেন যে, অনন্ত জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর বিশ্বের মূল কারণ এবং পরম করণ, প্রকৃতি বিশ্বের মূল এবং পরম কারণ নহে। সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রকৃতি অচেতন; এইজন্য, প্রকৃতির পক্ষে উক্তরূপ চিন্তা এবং পরিকল্পনা সম্ভব নহে। প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন জড় এবং অচেতন বস্তু, এবং ইহা বিশ্বের মূল জড় উপাদন।" কৃষ্ণ স্বীয় চিদানন্দের অংশ প্রকৃতিতে আধান করেন; ইহার ফলে প্রকৃতি সচেতন এবং সপ্রাণ হয়, এবং ইহার শক্তিসমূহ সক্রিয় হয়। অনুপ্রবেশতত্ত্বের আলোচনায় এই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে।

১১।২।১০ প্রকৃতি কৃষ্ণের অধীন

সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণ সকল শক্তির অধীশ্বর। তিনি তাঁহার আনন্দাংশের ইচ্ছানুসারে সকল শক্তিকে কার্য্যকারী করেন। মায়াশক্তি তাঁহার ক্রিয়াশক্তির

রূপ ; তিনি মায়াশক্তিরও অধীশ্বর। দ্বন্দ্বলীলার জন্য তিনি মায়াশক্তিকে প্রকৃতিতে পরিণত করিয়াছেন। মায়াধীশ কৃষ্ণ প্রকৃতিরও অধীশ্বর। প্রকৃতি তাঁহার অধীন। "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" শ্বেতাশ্বতর। ৪।১০—"পরমেশ্বর মায়ী, অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর।" "তদধীনত্বাদর্থবৎ।" ব্রহ্মসূত্র। ১।৪।৩ —"প্রকৃতি পরমেশ্বরের অধীন, ইহা শাস্ত্র নিরূপিততত্ত্ব।" "প্রকৃতিনিবন্ধনাচ্চেন্ন তস্যাপি পারতন্ত্র্যম্।" সাংখ্যসূত্র। ১।১৮—"প্রকৃতি পরমপুরুষের বন্ধনের কারণ হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি তাঁহার অধীন।" শক্তি কর্তৃক শক্তিমানের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মসাধনাই শক্তির দ্বারা শক্তিমানের সেবা। প্রকৃতি কৃষ্ণের দ্বন্দ্বলীলার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র এই বিশ্বকে প্রসব করিয়া, জীবদেহে জীবাত্মাকে আবদ্ধ করিয়া দ্বন্দ্বে লিপ্ত করিয়া রাখে। ক্রিয়াশক্তির পরিণাম এবং ক্রিয়াশক্তির বিবিধরূপে কার্য্যকারী ক্রিয়াশক্তিসমূহযুক্তা প্রকৃতির ইহাই কৃষ্ণসেবা এবং এইজন্যই প্রকৃতি মায়াময় জগতে কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বের হেতু। "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি হেতুরুচ্যতে।" গীতা ১৩।২০

১১।২।১১ প্রকৃতি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন নহে : বহিরঙ্গা মায়া

রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরই মূর্ত্ত রূপ, এইজন্য রাধা এবং কৃষ্ণ অভিন্ন। মহামায়া কৃষ্ণের মায়াশক্তিরই মূর্ত্ত রূপ, এইজন্য মহামায়া ও কৃষ্ণ অভিন্ন। প্রকৃতি মায়াশক্তির মূর্ত্ত রূপ নহে, মায়াশক্তির পরিণাম। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি দুগ্ধের সহিত অভিন্ন নহে, তদ্রূপ মায়াশক্তির পরিণাম প্রকৃতি মায়াশক্তির সহিত অভিন্ন নহে। শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, এইজন্য কৃষ্ণ এবং তাঁহার মায়াশক্তি অভিন্ন। মায়াশক্তি এবং প্রকৃতি অভিন্ন নহে, এইজন্য কৃষ্ণ এবং প্রকৃতি অভিন্ন নহে। দুগ্ধ এবং দধি যেমন মূলতঃ একই বস্তু, তদ্রূপ কৃষ্ণ এবং প্রকৃতি মূলতঃ একই বস্তু। দধি আর দুগ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু প্রকৃতি মহাপ্রলয়ে মায়াশক্তিতে প্রলীন হইয়া মায়াশক্তি হইয়াই থাকে। কৃষ্ণের মধ্যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি নাই এবং কখনও থাকে না। মায়াশক্তির কার্য্য কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহের মধ্যে নাই, তাঁহার কোন ভগবান এবং ভগবতী স্বরূপের মধ্যেও নাই। কৃষ্ণের এবং তাঁহাদের বাহিরে মায়াশক্তি কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এইজন্য মায়াশক্তি কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি এবং প্রকৃতি বহিরঙ্গা মায়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুরুষ

১১।৩।১ কৃষ্ণের পুরুষরূপ

এক্ষণে আমরা শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্র হইতে পুরুষতত্ত্বটী বিবৃত করিতেছি। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাহপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্। বৃহদারণ্যক ১।৪।৩

—"পরমেশ্বর একাকী থাকিয়া আনন্দ পাইলেন না, এইজন্য এখনও কেহ একাকী থাকিয়া আনন্দ পায় না। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। তিনি এই পরিমাণ হইলেন যেমন পরস্পর-আলিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষে হয়। তিনি এই আপনাকেই দুইভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাহা হইতে পতি ও পত্নী উৎপন্ন হইল।" এই শ্রুতিবাক্যের "স বৈ নৈব রেমে" হইতে "যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ" অংশের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। তৎকালে বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর আনন্দলীলার নিমিত্ত যুগলমূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ হইলেন। অতঃপর শ্রুতি বলিয়াছেন, "তিনি এই আপাকেই দুইভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাহা হইতে পতি ও পত্নী উৎপন্ন হইল।" ইহার অর্থ এই যে, পরমেশ্বর কৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি হইবার পর আপনাকে দ্বিধা করিয়া পুরুষ এবং প্রকৃতি হইলেন এবং "তাহা হইতে পতি ও পত্নী উৎপন্ন হইল", অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতি হইতে পুরুষ প্রাণীগণ এবং স্ত্রী প্রাণীগণ উৎপন্ন হইল। জীবসৃষ্টির ক্রম সম্বন্ধে আলোচনাকালে জীবগণের উৎপত্তির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। এক্ষণে আমরা পাইলাম যে, বেদান্ত অনুসারে কৃষ্ণ পুরুষ ও প্রকৃতি হইয়াছেন। প্রশ্নোপনিষৎ ও ঘোষণা করিয়াছেন যে পরমেশ্বর প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় পুরুষ-প্রকৃতি হইয়াছেন; এই উপনিষৎ পুরুষকে প্রাণ এবং প্রকৃতিকে রয়ি নাম দিয়াছেন।

প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িং চ প্রাণং চেতি। এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। প্রশ্ন ১।৪

—"যিনি সকল প্রজার পতি, সেই পরমেশ্বর প্রজা স্থষ্টি করিবার ইচ্ছায় স্বীয় জ্ঞানশক্তির পরিচালনা করিয়া যুগল উৎপাদন করিয়াছিলেন। রয়ি (=প্রকৃতি) এবং প্রাণ (=পুরুষ) সেই যুগল। তিনি বলিলেন, 'এই যুগল আমার নিমিত্ত, অর্থাৎ আমার লীলার নিমিত্ত, বহু প্রকারের প্রজা উৎপাদন করিবে।" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি পুরুষকে অজ এবং প্রকৃতিকে অজা নামে অভিহিত করিয়া পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে॥ শ্বেতাশ্বতর ৪।৫

—"লোহিতবর্ণ=রজঃ গুণ, কারণ 'রজো রাগাত্মকং'—গীতা। শুক্লবর্ণ =সত্ত্বগুণ, কারণ 'সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ'—গীতা। কৃষ্ণবর্ণ=তমঃ গুণ, কারণ 'তমস্ত্বজ্ঞানজং'—গীতা। লোহিতশুক্লকৃষ্ণা অজা=সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতি। অজ=পুরুষ। অর্থ:—আপনার সরূপ বহু প্রজা, অর্থাৎ আপনারই মত ত্রিগুণময় বহু প্রজা প্রসব করে এমন একটী লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণা অজার সহিত, অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত একটী অজ, অর্থাৎ পুরুষ, যুক্ত হইবার জন্য অনুপ্রবেশ করেন।" "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" শ্বেতাশ্বরতর ১।৯।—"স্বয়ং পরমেশ্বর জ্ঞ (=সর্ব্বজ্ঞ) এবং ঈশ (=স্থষ্টি করিতে সক্ষম) অজ (=পুরুষ) এবং অজ্ঞ (=অচেতন) এবং অনীশ (=আপন শক্তিতে স্থষ্টি করিতে অক্ষম) অজা (=প্রকৃতি) হইয়াছেন।" আমরা পাইলাম যে, বিশ্বস্থষ্টির জন্য কৃষ্ণ পুরুষ এবং প্রকৃতি হইয়াছেন, ইহা বেদান্ত-নিরূপিত তত্ত্ব। স্মৃতিশাস্ত্রও এই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।

১১।৩।২ পুরুষের প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৪।৫ স্থত্র হইতে আমরা পাইয়াছি যে পুরুষ প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতেও আমরা অনু-প্রবেশতত্ত্বটী প্রাপ্ত হই। "সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমস্থজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ স্থষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ।"

তৈত্তিরীয় ২।৬।—"পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন, 'আমি বহু হইব, আমি প্রজারূপে উৎপন্ন হইব।' তিনি জ্ঞানশক্তির পরিচালনা করিলেন। জ্ঞানশক্তির পরিচালনা করিয়া তিনি এই যাহা কিছু আছে তাহা সৃষ্টি করিলেন, এবং সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন।" পরমেশ্বরের সৃষ্টি করার অর্থ পরিণত হওয়া, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রুতি বলিলেন, যাহা কিছু আছে তাহাতেই পরমেশ্বর অনুপ্রবেশ করিলেন। ইহা হইতে আমরা পাইলাম যে তিনি প্রকৃতিতেও অনুপ্রবেশ করিলেন। গীতা এই অনুপ্রবেশের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দদাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয় সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা। গীতা ১৪।৩-৪

কৃষ্ণ বলিতেছেন, "মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার যোনি (গর্ভাধানের স্থান); আমি প্রকৃতিতে গর্ভ দান করি। মনুষ্যাদি সকল যোনিতে যে সকল দেহ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্ম (প্রকৃতি) তৎসমুদয়ের মহদ্‌যোনি (উৎপত্তির কারণ) এবং আমি তৎসমুদয়ের বীজপ্রদ পিতা।" এখানে কৃষ্ণ বলিলেন যে প্রকৃতিরূপ যোনিতে তিনি বীজ নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন। ইহার অর্থ এই যে, কৃষ্ণ প্রকৃতিতে স্বীয় চিদানন্দের অংশকে অধিষ্ঠিত করেন। বেদান্তের অনুপ্রবেশের গীতা যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, বেদান্তের ভাষ্য ভাগবতও তাহাই দিয়াছেন।

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ ভাগবত ৩।৫।২৬

—"চিচ্ছক্তিযুক্ত কৃষ্ণ কালের প্রবৃত্তির সহিত ত্রিগুণময়ী মায়াতে (প্রকৃতিতে) আত্মভূত পুরুষরূপে বীর্য্য আধান করিয়াছিলেন।" কৃষ্ণ আত্মভূত পুরুষরূপে বীর্য্য আধান করিলেন, ইহার অর্থ এই যে, কৃষ্ণ স্বীয় চিদানন্দের অংশকে পুরুষরূপে প্রকাশ করিলেন এবং সেই পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। ভাগবত বলিলেন যে তখন হইতেই কালেরও প্রবৃত্তি অর্থাৎ আরম্ভ হইল। ইহা প্রথম অনুপ্রবেশ এবং ইহাই প্রকৃতিতে কৃষ্ণের বীর্য্যাধান। কৃষ্ণের এই পুরুষমূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম মায়ায় অধিষ্ঠিত হইলেন বলিয়া শাস্ত্র এই পুরুষমূর্ত্তিকে

আত্মাবতার বলেন এবং তাঁহাকে কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু নামে অভিহিত করেন। গীতার ১৩।৯ শ্লোকে অনাদি পুরুষ-প্রকৃতির উল্লেখ আছে, এই কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু সেই পুরুষ এবং মহদ্‌যোনি সেই প্রকৃতি।

১১।৩।৩ পুরুষ-প্রকৃতি পুরাণের লিঙ্গ-যোনি

কৃষ্ণ পুরুষরূপে প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতিকে বিশ্বপ্রসবকারিণী করেন বলিয়া পুরাণে পুরুষ লিঙ্গ এবং প্রকৃতি যোনি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পুরুষ-প্রকৃতিকে কৃষ্ণের লিঙ্গযোনি মূর্ত্তিরূপে পূজার বিধিব্যবস্থাও পুরাণে বিহিত হইয়াছে। শিবপুরাণ লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে লিঙ্গযোনিতত্ত্ব বিস্তৃত-রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতায়ও এই তত্ত্বটী বিবৃত হইয়াছে। "লিঙ্গ-যোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরীঃ প্রজাঃ।" ব্রহ্মসংহিতা ১৩।—"বিশ্বের সকল প্রজা লিঙ্গযোনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রজাগণ মাহেশ্বরী, অর্থাৎ মহান্ ঈশ্বর কৃষ্ণই লিঙ্গযোনি রূপে প্রজা উৎপন্ন করিয়াছেন বলিয়া প্রজাগণ মাহেশ্বরী =মহান্ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন।" লিঙ্গযোনিমূর্ত্তি শিবলিঙ্গ, শিবমূর্ত্তি, মহেশ্বরমূর্ত্তি প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয়েন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্বের সমষ্টি লিঙ্গদেহ

১১।৪।১ প্রকৃতির বিক্ষোভ

জড়, অচেতন, এবং প্রাণহীন প্রকৃতির মধ্যে কৃষ্ণের চিদানন্দের অনুপ্রবেশের ফলে প্রকৃতি সচেতন এবং সপ্রাণ হইল। প্রকৃতি সচেতন এবং সপ্রাণ হইবামাত্র প্রকৃতিতে যে কামনার উদয় হইল, তাহা পুরুষকে সেবার দ্বারা সুখ দান করিবার কামনা। পরমপুরুষ কৃষ্ণ "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" এই ইচ্ছা করিয়াছেন। মায়াময় লীলায় তিনি আপনাকে বহু রূপে প্রকাশ করিবেন। তিনি স্বীয় চিদানন্দকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বহু জীবাত্মা রূপে প্রকাশ করিবেন। জীবজগতে দ্বন্দ্বপরিণয়ের লীলা তাঁহার ইচ্ছা। জীবাত্মাকে দ্বন্দ্বের

মধ্যে না রাখিলে দ্বন্দ্বপরিণয়ের লীলা হয় না। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতি কৃষ্ণের ইচ্ছা পূর্ণ করে এবং এতদ্দ্বারা প্রকৃতির কৃষ্ণসেবা করা হয়। মায়াময় বিশ্বলীলায় জীবাত্মাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে রাখিবার জন্য কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকৃতিকে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র এবং দ্বন্দ্ব উৎপন্ন করিতে হইবে। বিশ্ব, বিশ্বের অন্তর্গত এই জগৎ, এবং জগতের অন্তর্গত সর্ব্ববিধ দেহ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র। কৃষ্ণের দ্বন্দ্বলীলার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহার সেবা করিবার কামনার উদয়ে প্রকৃতির সকল শক্তিগুলি কার্য্যকারী হইল। ইহাই প্রকৃতির বিক্ষোভ। প্রকৃতির বিক্ষোভের এরূপ অর্থ নহে যে, তাহার ত্রিগুণের মধ্যে কোন গুণ প্রধান হইয়া অন্য কোন গুণকে অভিভূত করিয়া আজ্ঞাকারী করে। বিক্ষুব্ধা প্রকৃতিরও ত্রিগুণ সাম্যাবস্থাপন্নই থাকে, কিন্তু তাহার ত্রিগুণের শক্তিসমূহ ক্রিয়াশীল হয়।

১১।৪।২ প্রকৃতির বিকার ঃ মহত্তত্ত্ব ঃ মননবৃত্তি ঃ সঙ্কল্প, বিকল্প

বিক্ষোভের ফলে প্রকৃতির শক্তিসমূহ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব নামক একটী বিকার উৎপন্ন করিল। মহত্তত্ত্বই বুদ্ধিতত্ত্ব বা বুদ্ধি।

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাহসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ভাগবত ৩।২৬।১৮

—"দৈবাৎ=কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার চিদানন্দের অধিষ্ঠানের ফলে। ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী=বিক্ষুব্ধ হওয়া যাহার ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাব। কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার চিদানন্দের অংশ পুরুষরূপে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে প্রকৃতির বিক্ষোভ হয়, এইজন্য ভাগবত প্রকৃতিকে "দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণী" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এই দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণী প্রকৃতি কৃষ্ণের আপনা হইতে উদ্ভূত যোনি অর্থাৎ চিদানন্দ-আধানের স্থান (স্বস্যাং যোনৌ)। এই প্রকৃতিতে কৃষ্ণ বীর্য্য অর্থাৎ চিদানন্দ আধান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে প্রকৃতি হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়াছিল।" মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি বস্তুপ্রকাশক বলিয়া ইহাকে হিরণ্ময় বলা হইয়াছে। ত্রিগুণময়ী জড় প্রকৃতির বিকার মহত্তত্ত্বও ত্রিগুণময় জড় বস্তু; ইহারও নিজস্ব চেতনা এবং প্রাণ নাই। কৃষ্ণের চিদানন্দের অধিষ্ঠানহেতু মহত্তত্ত্ব সচেতন এবং সপ্রাণ হয় এবং তখন ইহার শক্তিসমূহ সক্রিয় হয়। ত্রিগুণের শক্তি, ধর্ম্ম এবং কার্য্যই বুদ্ধির শক্তি, ধর্ম্ম এবং কার্য্য। বুদ্ধির ত্রিগুণ কখনও সাম্যাবস্থায় থাকে না। রজোগুণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, এইজন্য দ্বন্দ্বলীলায়

বুদ্ধিতে রজঃ প্রবল এবং পরিচালক গুণ। বুদ্ধি আপনাকে "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" বলিয়া মনে করে। ইহা বুদ্ধির অহংভাব; ইহা মননবৃত্তিযুক্ত; মননবৃত্তি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক। "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" সাংখ্যস্থত্র ১।৭১। —"মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির প্রথম কার্য্য অর্থাৎ বিকার। ইহা মননবৃত্তিযুক্ত।" সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মননবৃত্তির সঙ্কল্পের অর্থ, বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা ভোগের যোগ্য হইলে তাহাকে প্রাপ্ত হইবার এবং ভোগ করিবার অধ্যবসায়। মননবৃত্তির বিকল্পের অর্থ, বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিবার পর তাহা ভোগের যোগ্য না হইলে তাহা হইতে ভিন্ন থাকিবার, অর্থাৎ তাহাকে ত্যাগ করিবার অধ্যবসায়। বুদ্ধির সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মননবৃত্তি ভোগ্য বিষয় নির্দ্ধারণ করে এবং তাহা পাইবার জন্য অধ্যবসায় করে।

১১।৪।৩ অহঙ্কার: তৈজস, বৈকৃত, ভূতাদি

বুদ্ধিতে যে মননবৃত্তিযুক্ত অহংভাব উৎপন্ন হইল, তাহা বুদ্ধির বিকার। এই বিকারটীর নাম অহঙ্কার। বুদ্ধি প্রকৃতির বিকার; অহঙ্কার বুদ্ধির বিকার; সুতরাং, অহঙ্কার বিকারের বিকার। অহঙ্কারও ত্রিগুণময়, এবং জড় বস্তু। কৃষ্ণের চিদানন্দের অধিষ্ঠানহেতু ইহা সচেতন এবং সপ্রাণ হয় এবং ইহার ত্রিগুণের শক্তিসমূহ কার্য্যকারী হয়। রজোগুণ অহঙ্কারের মধ্যে প্রবল এবং পরিচালক গুণ। রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত অহঙ্কারকে তৈজস বলা হয়। তৈজস অহঙ্কারের রজোগুণের দ্বারা তাহার সত্ত্বগুণ বিকৃত হয়; তখন ইহার নাম বৈকৃত। বৈকৃত অহঙ্কারের প্রকাশধর্ম্মী সত্ত্বাংশ হইতে মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। তৈজস অহঙ্কারের রজোগুণের দ্বারা তাহার তমোগুণ বিকৃত হয়; তখন ইহার নাম ভূতাদি। ভূতাদির মোহনধর্ম্মী তমোগুণাংশ হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হইল। মন এবং দশ ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধির করণ (agent) বলা হয়। ইহাদের দ্বারা বুদ্ধি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, বিষয়সংগ্রহ, বিষয়-উৎপাদন এবং বিষয় ভোগ করে। পঞ্চ তন্মাত্র সেই বিষয়। একাদশ করণ এবং পঞ্চ তন্মাত্র অহঙ্কারের বিকার।

১১।৪।৪ একাদশ করণ

মনের কার্য্যকে মননকার্য্য বলা হয়। মনের কার্য্য সঙ্কল্প এবং বিকল্প।

সঙ্কল্পবিকল্প কি, তাহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মনও ত্রিগুণময়, জড়, অচেতন, এবং অহংভাবাপন্ন বস্তু। কৃষ্ণের চিদানন্দের অধিষ্ঠানহেতু চেতনা প্রাপ্ত হইলে মন স্বীয় সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক কর্ম্ম করে। মন ইন্দ্রিয়াধিপতি। প্রভু যেমন ভৃত্যকে আদেশ দিয়া এবং ভৃত্যের নিকট উপস্থিত থাকিয়া তদ্দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করায়, মনও তদ্রূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে কর্ম্ম করিতে নির্দ্দেশ দেয় এবং কার্য্যকারী ইন্দ্রিয়ে উপস্থিত থাকে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্, এই পাঁচটীর নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়, কারণ এই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বুদ্ধি বস্তুবিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। ইহারা বুদ্ধির জ্ঞানলাভের করণ বলিয়া ইহাদিগকে বুদ্ধীন্দ্রিয়ও বলা হয়। বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই দশটী ইন্দ্রিয় ত্রিগুণময়, জড়, এবং অচেতন বস্তু। কৃষ্ণের চিদানন্দের অধিষ্ঠানের ফলে ইহারা সচেতন, সপ্রাণ এবং সক্রিয় হয়। লিঙ্গদেহের এই একাদশ করণ স্থূল জড় বস্তু নহে, সূক্ষ্ম জড়বস্তু।

১১।৪।৫ পঞ্চ তন্মাত্র

বুদ্ধির ভোগকামনা পূর্ণ করিবার জন্য ভোগায়তন দেহের এবং ভোগ্য বিষয়ের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হইল। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পাঁচটী তন্মাত্র। তৎ=তাহার; মাত্রা=সূক্ষ্ম রূপ। শব্দতন্মাত্র=শব্দের সূক্ষ্ম রূপ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দ। স্পর্শতন্মাত্র=স্পর্শের সূক্ষ্ম রূপ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্পর্শ। রূপতন্মাত্র=রূপের সূক্ষ্ম রূপ, অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপ। রসতন্মাত্র=রসের সূক্ষ্ম রূপ, অর্থাৎ সূক্ষ্মরস। গন্ধতন্মাত্র=গন্ধের সূক্ষ্ম রূপ, অর্থাৎ সূক্ষ্মগন্ধ। লিঙ্গদেহই সূক্ষ্মদেহ। সূক্ষ্মদেহ স্থূলবস্তু গ্রহণ করে না, সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণ করে।

১১।৪।৬ সমষ্টিলিঙ্গদেহ : গর্ভোদক : হিরণ্যগর্ভ : গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু

পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ তত্ত্বের (বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র) সমবায়ে বিশ্বের সমষ্টি লিঙ্গদেহ গঠিত হইল। জড়বস্তুর চতুর্ব্বিধ রূপ; স্থূল রূপ, সূক্ষ্ম রূপ, সূক্ষ্মতর রূপ, সূক্ষ্মতম রূপ। যাহা কিছু মানবের জড় চক্ষুকর্ণাদির গ্রাহ্য, তৎসমুদয় স্থূল জড় রূপ। পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ তত্ত্ব জড় চক্ষুকর্ণাদির গ্রাহ্য নহে; উহারা জড়বস্তুর সূক্ষ্মরূপ। চিদানন্দের

অনুপ্রবেশের পরে বিক্ষোভিতা প্রকৃতি সূক্ষ্মতর জড়বস্তু। উক্তরূপে বিক্ষোভিতা হইবার পূর্ব্বের বিক্ষোভহীনা প্রকৃতি সূক্ষ্মতম জড়বস্তু। অষ্টাদশতত্ত্বের দ্বারা গঠিত সমষ্টিলিঙ্গদেহ মানবের জড় চক্ষুর গোচর নহে বলিয়া উহাকে সূক্ষ্মদেহও বলা হয়। যেমন, জগতের সকল জীবদেহই ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম, এই পঞ্চ স্থূল ভূতের সমবায়ে গঠিত, এবং এই সকল পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহের সকল ভোগ্য বস্তুও পাঞ্চভৌতিক স্থূল বস্তু, তদ্রূপ, অষ্টাদশতত্ত্বের সমবায়ে যে সমষ্টিলিঙ্গদেহ গঠিত হইল, তাহার আকার বা দেহ গঠিত হইল পঞ্চতন্মাত্রের দ্বারা, এবং তাহার ভোগ্য বস্তুও পঞ্চতন্মাত্রিক সূক্ষ্ম বস্তু। সমষ্টিলিঙ্গদেহের মধ্যে প্রথম পুরুষ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এই অনুপ্রবেশের অর্থ এই যে, কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু স্বীয় চিদানন্দের অংশ সমষ্টিলিঙ্গদেহের মধ্যে আধান করিলেন। সমষ্টিলিঙ্গদেহে অধিষ্ঠিত এই চিদানন্দ কৃষ্ণের দ্বিতীয় পুরুষ রূপ। চিদানন্দের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া সমষ্টি-লিঙ্গদেহ সচেতন এবং প্রাণবন্ত হয় এবং তাহার নিজস্ব শক্তিসমূহ সক্রিয় হয়, অর্থাৎ লিঙ্গদেহের উপাদান যে অষ্টাদশ তত্ত্ব তাহারা সকলেই চেতনা এবং প্রাণ প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের নিজ নিজ শক্তিসমূহের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। যদ্দ্বারা যে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা সেই বস্তুর লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বা প্রতীক। অষ্টাদশতত্ত্বের সমবায়ে গঠিত দেহের দ্বারা সকল দেহের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়; এইজন্য ইহাকে লিঙ্গদেহ বলা হয়। প্রথমোৎপন্ন এই লিঙ্গদেহ বিশ্বের সমষ্টি লিঙ্গদেহ। সমষ্টি লিঙ্গদেহ স্থূল বিশ্বের সূক্ষ্ম রূপ। সমষ্টি লিঙ্গদেহকে শাস্ত্রে গর্ভোদক নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। সমষ্টি লিঙ্গদেহ হইতে স্থূল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া উহাকে স্থূল বিশ্বের গর্ভ বলা হইয়াছে। গর্ভ+উদক=গর্ভোদক। উদক=জল=কারণবারি=সাম্যা-বস্থাপন্না প্রকৃতি=কারণদেহ। মায়াশক্তির একাংশ সমষ্টি কারণদেহে বিদ্যমান আছে এবং সমষ্টি কারণদেহের একাংশ সমষ্টি লিঙ্গদেহে বিদ্যমান আছে। লিঙ্গদেহ=গর্ভ; ইহার মধ্যে উদক=কারণদেহ বিদ্যমান আছে বলিয়া উহাকে গর্ভোদক বলা হয়। সমষ্টিলিঙ্গদেহরূপ গর্ভে কৃষ্ণ দ্বিতীয় পুরুষরূপে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তাহা বেদান্তেও ঘোষিত হইয়াছে। "স উ গর্ভে অন্তঃ।" শ্বেতাশ্বতর ২।১৬।—"পরমেশ্বর গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।" দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট আছেন বলিয়া শাস্ত্রে তাঁহাকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু

বলা হইয়াছে। অণ্ড যেমন শাবকের কারণ, সমষ্টিলিঙ্গদেহ তদ্রূপ স্থূল বিশ্বের কারণ; এইজন্য ইহাকে অণ্ড নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার অন্য নাম হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্য=রেতঃ=বীর্য্য=চিদানন্দ। কৃষ্ণের চিদানন্দরূপ বীর্য্য সমষ্টি লিঙ্গদেহে অধিষ্ঠিত আছে বলিয়া ইহাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। ইহার হিরণ্যগর্ভ নাম বেদান্তেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) যো…হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। শ্বেতাশ্বতর ৩।৪। (২) হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। শ্বেতাশ্বতর ৪।১২।—"(১) যে পরমেশ্বর স্থূল বিশ্বের উৎপত্তির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন। (২) যে পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন।" কেহ কেহ হিরণ্যগর্ভের মধ্যে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণের দ্বিতীয় পুরুষরূপকে অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকেও হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হিরণ্যগর্ভ নহেন, সমষ্টিলিঙ্গদেহই হিরণ্যগর্ভ। তাহার কারণ এই :—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু কৃষ্ণের পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা নহেন; কৃষ্ণই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু; কৃষ্ণ পরমেশ্বর; বেদান্ত এবং অন্য সকল শাস্ত্রই একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে পরমেশ্বর অনাদি এবং উৎত্তিহীন; বেদান্ত বলিয়াছেন যে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হইয়াছিল, কৃষ্ণ হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; যখন হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি আছে, তখন উহা কারণের পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা, এবং উহা অনাদি ও উৎপত্তিহীন পরমেশ্বর কৃষ্ণ অথবা তাঁহার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপ হইতে পারে না। সুতরাং, সমষ্টিলিঙ্গদেহই বেদান্তের হিরণ্যগর্ভ।

বিশ্বের সমষ্টিলিঙ্গদেহের উৎপত্তি বিশ্বসৃষ্টির দ্বিতীয় পর্য্যায়। লিঙ্গদেহের যে সূক্ষ্ম অষ্টাদশ উপাদান উল্লিখিত হইল, উহারাও জড়বিজ্ঞানের বিষয় নহে, কারণ শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যেও উহা দৃষ্ট হইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিশ্বের সমষ্টি স্থূলদেহ ঃ বিরাট ঃ বিশ্বরূপ

১১।৫।১ ব্রহ্মার উৎপত্তি

বিশ্বের সমষ্টি লিঙ্গদেহ হইতে বিশ্বের সমষ্টি স্থূলদেহের উৎপত্তি হইয়াছে। স্থূল বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্যটী করাইবার জন্য কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সমষ্টি লিঙ্গদেহের উৎপত্তির পরে এবং স্থূল বিশ্বের উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মার উৎপত্তি। সমষ্টিলিঙ্গদেহের মধ্যে বুদ্ধিতত্ত্বই সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব। ব্রহ্মা বুদ্ধির রজোগুণের সৃষ্টিশক্তির মূর্ত্ত রূপ। দ্বিতীয় পুরুষরূপী কৃষ্ণ, অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিলেন। বুদ্ধি অচিদ্বস্তু এবং তাহার শক্তিও অচিদ্বস্তু। অচিদ্বস্তুর মূর্ত্তি ব্রহ্মার শরীরও অচিদ্বস্তু, কিন্তু সূক্ষ্ম জড় বস্তু বলিয়া তাহা মানবেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। ব্রহ্মার দেহ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ নহে। ব্রহ্মাও জীব, কিন্তু স্থূল বিশ্ব সৃষ্টি করিবার শক্তিসম্পন্ন উন্নততম জীব। ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন জীব বলিয়া সকল দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। এইজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয়। ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবার পরে কৃষ্ণ তাঁহাকে বেদ শিক্ষা এবং যোগসাধনায় দীক্ষা দিয়াছিলেন। বেদশিক্ষার এবং তপস্যার পর ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বেদোক্ত নামসমূহ, সেই নামসমূহের দ্বারা নির্ণীত বস্তুরূপসমূহ, এবং সেই সকল বস্তুরূপ কিরূপে সৃষ্টি করিতে হইবে, শিক্ষার এবং তপস্যার ফলে তাহা জ্ঞাত হইয়া তদনুসারে ব্রহ্মা স্থূল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার তত্ত্ব বেদান্তেও নিরূপিত হইয়াছে। "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।" মুণ্ডক ১।১।১। —"সকল দেবগণেরও পূর্ব্বে বিশ্বের স্রষ্টা এবং শুভানুধ্যায়ী ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।" "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং…শরণমহং প্রপদ্যে।" শ্বেতাশ্বতর ৬।১৮।—"যে পরমেশ্বর বিশ্বোৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি তাঁহার শরণ লইতেছি। "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে

জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।" শ্বেত ৫।২।—"ব্রহ্মা কৃষ্ণের শিষ্য; কৃষ্ণ তাঁহাকে বেদ এবং যোগসাধনা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন।" ব্রহ্মাই প্রথম ঋষি, এইজন্য বেদান্ত ব্রহ্মাকে ঋষি বলিলেন। ব্রহ্মার গাত্রবর্ণ স্বর্ণের বর্ণের ন্যায়, সেইজন্য বেদান্ত তাঁহাকে কপিল অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণের শরীরবিশিষ্ট, ঋষি বলিলেন। এই বেদান্তসূত্রের অর্থ:—"পরমেশ্বর স্থূলবিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে স্বর্ণবর্ণের শরীরবিশিষ্ট ঋষি ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে বেদ এবং যোগসাধনা শিক্ষা দিয়া জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন।" বেদান্ত হইতে আমরা পাইলাম যে, কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং স্থূল বিশ্বের সৃষ্টির নিমিত্ত যেরূপ জ্ঞান এবং শক্তির প্রয়োজন তিনিই তাঁহাকে তাহা দিয়াছিলেন। ভাগবতও বলেন: "যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।" ভাঃ ২।৯।৩০।—"স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়া স্রষ্টা হইবার যোগ্য করিয়াছিলেন।" ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রজাপতিও বলা হয়। হিরণ্যগর্ভের, অর্থাৎ সমষ্টি লিঙ্গদেহের সৃষ্টিশক্তির মূর্ত্ত রূপ বলিয়া ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভও বলা হয়, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বস্তুতঃ সমষ্টি লিঙ্গদেহই হিরণ্যগর্ভ। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছিল। এই জন্ম-বিবরণের তত্ত্বার্থ এই:—পুরুষের সৃষ্টিশক্তির অধিষ্ঠান মূলাধারে; নাভিপদ্মের বিকাশের অর্থ, নাভি হইতে মূলাধারস্থ সৃষ্টিশক্তির বিকাশ; গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর দ্বারা অধিষ্ঠিত সমষ্টিলিঙ্গদেহের সৃষ্টিশক্তির মূর্ত্ত রূপ ব্রহ্মা; ইহাই ব্রহ্মার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপত্তির অর্থ। পুরাণের এই জন্মবিবরণ অনুসারে ব্রহ্মার অন্য নাম পদ্মযোনি।

১১।৫।২ পঞ্চ স্থূল মহাভূতের উৎপত্তি: পঞ্চীকরণ

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পাঁচটী তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে অগ্নি, রস হইতে জল এবং গন্ধ হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইল। উৎপত্তির পরেই ইহারা বর্ত্তমান স্থূল আকারের ক্ষিতি (মৃত্তিকা) অপ্ (জল) তেজঃ (অগ্নি) মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ) ছিল না; তখনও ইহারা পরস্পরের সহিত

অমিশ্রিত এবং লঘু ছিল, এবং ইহাদের দ্বারা কোন স্থূল জড় রূপ গঠন করিবার উপযোগী ইহারা ছিল না। উক্ত অমিশ্রিত এবং লঘু পঞ্চভূতকে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত করিয়া পঞ্চ স্থূল মহাভূতে পরিণত করা হইয়াছিল। উক্তরূপ মিশ্রণ-প্রক্রিয়ার শাস্ত্রীয় নাম পঞ্চীকরণ। ইহা একটী রাসায়নিক প্রক্রিয়া। উহা এইরূপ :—এক-একটী অমিশ্রিত লঘু মহাভূতের অর্দ্ধাংশের সহিত অন্য চারিটী অমিশ্রিত এবং লঘু মহাভূতের প্রত্যেকের এক-অষ্টমাংশ মিশ্রিত করিয়া সেই অর্দ্ধাংশবিশিষ্ট অমিশ্রিত এবং লঘু মহাভূতটীকে স্থূল মহাভূতে পরিণত করা হইয়াছে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-মৃত্তিকা, এই পঞ্চ লঘু মহাভূত এইরূপ পঞ্চীকরণের ফলে আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-মৃত্তিকা, এই পঞ্চ স্থূল মহাভূতে পরিণত হইয়াছিল। উক্ত পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়াটীর মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আকাশ সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন স্থূল ভূত, এবং অন্য চারিটী স্থূল ভূতের মধ্যে তাহাদের উপাদানরূপে আকাশ রহিয়াছে; বায়ু দ্বিতীয় উৎপন্ন স্থূল ভূত, এবং অগ্নি জল মৃত্তিকার মধ্যে তাহাদের উপাদান রূপে বায়ু বিদ্যমান রহিয়াছে; অগ্নি তৃতীয় উৎপন্ন স্থূল ভূত, এবং জল ও মৃত্তিকার মধ্যে তাহাদের উপাদানরূপে অগ্নি বিদ্যমান রহিয়াছে; জল চতুর্থ উৎপন্ন স্থূল ভূত, এবং পঞ্চম উৎপন্ন স্থূল ভূত মৃত্তিকার মধ্যে তাহার উপাদানরূপে জল বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্য বেদান্ত বলেন : "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" তৈত্তিরীয় ২।১।৩।—"সেই আত্মা, অর্থাৎ পরমেশ্বর, হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী অর্থাৎ মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে।" এখানে বেদান্ত পঞ্চ স্থূল মহাভূতের উৎপত্তির বিষয় বলিতেছেন বলিয়া সৃষ্টির প্রথম পর্য্যায় সমষ্টি কারণদেহের এবং দ্বিতীয় পর্য্যায় সমষ্টি-লিঙ্গদেহের উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ না করিয়া কেবল পঞ্চ স্থূল মহাভূতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে "পরমেশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" বলিয়া বেদান্ত এরূপ নিরূপণ করেন নাই যে আকাশের উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী পর্য্যায় ছিল না, এবং প্রথমেই পরমেশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বেদান্ত হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে প্রকৃতির বা সমষ্টিকারণদেহের এবং হিরণ্যগর্ভের বা সমষ্টি-

লিঙ্গদেহের উৎপত্তির এবং ব্রহ্মার উৎপত্তির বিবরণও বেদান্ত দিয়াছেন। অতএব, এক্ষণে উদ্ধৃত বেদান্তবাক্য কেবল পঞ্চ স্থূল ভূতের উৎপত্তির কথা বলিতে চাহেন বলিয়া এবং সমস্তই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বলিলেন যে ঈশ্বর হইতে আকাশ উদ্ভূত হইয়াছে।

১১।৫।৩ বিশ্বের উৎপত্তি : ক্ষীরোদধি : ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু

আমাদের জগৎ একটী সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত। এই সৌরমণ্ডল (Solar System) আকাশের মধ্যে অবস্থিত। সূর্য্য ইহার কেন্দ্র ; সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া কয়েকটী গ্রহ, কতকগুলি উপগ্রহ, এবং কতকগুলি গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাই আমাদের সৌরমণ্ডল। এইরূপ অসংখ্য সৌরমণ্ডল আকাশের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিই একই আকারের নহে। আমাদের সৌরমণ্ডলের অপেক্ষা বৃহত্তর অসংখ্য সৌরমণ্ডল আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশ এবং আকাশে অবস্থিত অসংখ্য সৌরমণ্ডল সমষ্টিভাবে বিশ্ব (Universe, Cosmos) নামে অভিহিত হয়। এই বিশ্বের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল এক্ষণে তাহাই বিবৃত করা হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে পঞ্চ স্থূল মহাভূতের উৎপত্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অনন্ত-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর লীলার নিমিত্ত সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইলে যে স্থানের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাতে পরব্যোম গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধাম সহ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরব্যোমের বাহিরে অবস্থিত কারণাব্ধির অতিরিক্ত শূন্য স্থান পাঞ্চভৌতিক স্থূল আকাশের দ্বারা পূর্ণ হইল। ইহাই বিশ্বাকাশ ; ইহাকে স্বল্পাকাশ এবং ভূতাকাশও বলা হয়। এই আকাশের মধ্যে পঞ্চ স্থূল মহাভূতকে মিশ্রিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডসমূহের দেহগঠনের উপযোগী পাঞ্চভৌতিক উপাদান প্রস্তুত করা হইল। এই পাঞ্চভৌতিক পদার্থ সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই দেহের উপাদান। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই জগতকে কেবল মৃত্তিকা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা নহে। জগতের দেহে পঞ্চ স্থূল ভূতই আছে। ব্রহ্মাণ্ডসমূহের দেহগঠনের উপযোগী যে পাঞ্চভৌতিক জড় বস্তুটী প্রস্তুত হইল, তাহা তখন শুষ্ক এবং কঠিন পদার্থ ছিল না এবং তরল পদার্থও নহে ; তাহা শুভ্রবর্ণ ক্ষীরবৎ গাঢ় পদার্থ। এইজন্য পুরাণে এই বস্তুটীকে ক্ষীর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমরাও এক্ষণে উহাকে ক্ষীর নামেই উল্লেখ করিব। এই

ক্ষীর ত্রিগুণময় স্থূল জড় বস্তু এবং সকল স্থূল জড়দেহের অব্যবহিত কারণ। কারণবারি বা প্রকৃতি হইতে লিঙ্গদেহের উৎপত্তি এবং লিঙ্গদেহের পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষীরের উৎপত্তি, এইজন্য কারণবারি স্থূল জড়দের অব্যবহিত কারণ (Immediate Cause) নহে, দূরবর্ত্তী কারণ (Remote Cause)। জড়বৈজ্ঞানিক স্থূল জড় দেহের কারণস্বরূপ যে বস্তুটীর Protyle নাম দিয়াছেন তাহা এই ক্ষীর বলিয়াই মনে হয়। এই ক্ষীরোদধি বহুপ্রকারের পরমাণুর বিপুল সমাবেশ। এই ক্ষীর ত্রিগুণময়, জড়, অচেতন বস্তু। কৃষ্ণের চিদানন্দের অনুপ্রবেশের ফলে ইহা সচেতন, সপ্রাণ, এবং সক্রিয় হয়। প্রকৃতির সকল শক্তি ক্ষীরের মধ্যেও আছে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের দেহগঠনের জন্য কি বিপুল পরিমাণ ক্ষীরের প্রয়োজন তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। এই বিপুল পরিমাণ ক্ষীর অতি দীর্ঘ আকারের সমুদ্রের ন্যায় আকাশের মধ্যে স্থাপিত হইল, এবং এই মূল ক্ষীরোদধি হইতে বহু শাখা আকাশের মধ্যে নানাস্থানে বিদ্যমান হইল। মনে হয়, এইগুলিই জড়বিজ্ঞানে উল্লিখিত gallaxy বা ছায়াপথ। ইহাকে পুরাণে ক্ষীরোদধি অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্র বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের গর্ভো-দকশায়ী বিষ্ণু নামক দ্বিতীয় পুরুষরূপ ক্ষীরোদধির মধ্যে তৃতীয় পুরুষ রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তৃতীয় পুরুষরূপে এই অনুপ্রবেশও দ্বিতীয় পুরুষের চিদানন্দের অংশের অনুপ্রবেশ। ক্ষীরোদধির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কৃষ্ণের এই তৃতীয় পুরুষাবতারকে পুরাণে ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ক্ষীরোদধির মধ্যে কৃষ্ণের চিদানন্দের অনু-প্রবেশের ফলে ইহার সর্ব্বাংশে চেতনা এবং আনন্দ সঞ্চারিত হইল, ইহা প্রাণময় হইল, এবং অচেতন অবস্থায় ইহার যে সকল শক্তি নিষ্ক্রিয় ছিল, সৎসমুদয় সক্রিয় হইল। চেতনা এবং আনন্দের সঞ্চার এবং শক্তিসমূহের সক্রিয়তা লাভের ফলে ক্ষীরোদধির প্রত্যেকটী পরমাণু (atom) প্রাণময়, চেতন, আনন্দময়, এবং সক্রিয় হইল। এইরূপ পরমাণুময় ক্ষীরের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অসংখ্য সৌরমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন। ইহাই ব্রহ্মার বিশ্বসৃষ্টি। ক্ষীর এবং ক্ষীরের দ্বারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিশ্ব কৃষ্ণের পরিণাম, ব্রহ্মার পরিণাম নহে। কুম্ভকার মৃত্তিকার দ্বারা যে ঘট নির্ম্মাণ করে, তাহা মৃত্তিকার পরিণাম, কুম্ভকারের পরিণাম নহে। ব্রহ্মাও কুম্ভকারের ন্যায়, ক্ষীরের দ্বারা যে বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন তাহা কৃষ্ণের পরিণাম। ব্রহ্মার বিশ্বসৃষ্টি কুম্ভকারের

হস্তের দ্বারা ঘটনির্ম্মাণের ন্যায় নহে ; তিনি স্বীয় তপঃশক্তির এবং সৃষ্টিশক্তির প্রয়োগের দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। বিশ্বের উৎপত্তি হইবামাত্র গ্রহ-উপগ্রহগণ বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই ; তখনই তাহারা কঠিন, শুষ্ক, এবং প্রাণীর বাসের উপযোগী ছিল না। সূর্য্যের চারিদিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে গ্রহ-উপগ্রহগণ গোলাকার হইয়াছিল এবং তাহাদের উপরিভাগ শুষ্ক, কঠিন, এবং প্রাণীর বাসের উপযোগী হইয়াছিল। এইরূপ হইতে কতদিন লাগিয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। মানবীয় সময়ের হিসাবে তাহা দীর্ঘকাল হইলেও, ব্রহ্মার সময়ের হিসাবে তাহা এক মিনিটের অধিক হইবার কথা নহে, (ব্রহ্মার এক মিনিট = মানবীয় ৬০০০০০০ বৎসর)।

১১।৫।৪ বিশ্বের আকৃতি

বিশ্বের আকৃতি একটী বিকশিত পদ্মের ন্যায়। ক্ষীরোদসাগর হইতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল উৎপন্ন হইবার পরে ক্ষীরোদসাগর শেষ হইয়া যায় নাই। কৃষ্ণের অনন্ত মায়াশক্তি বিশ্বের অব্যয় বীজ। প্রকৃতি হইতে সমষ্টিলিঙ্গদেহ উৎপন্ন হইবার পর প্রকৃতি নিঃশেষ হইয়া যায় নাই ; সমষ্টিলিঙ্গদেহ হইতে ক্ষীরোদসাগর উৎপন্ন হইবার পর সমষ্টিলিঙ্গদেহও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। অনন্ত মায়াশক্তির প্রবাহ উহাদিগকে পরিপূর্ণ অবস্থায় রাখিয়াছে। এইজন্য, বিশ্বোৎপত্তির পরেও ক্ষীরোদসাগর বিদ্যমান রহিল। প্রস্ফুটিত পদ্মের সর্ব্বোচ্চ-ভাগে উহার কর্ণিকা থাকে, এবং পাপড়িগুলি বৃন্তটীর সহিত সংলগ্ন হইয়া উহারই চারিদিকে অবস্থান করে। অতি দীর্ঘ ক্ষীরোদসাগর বৃন্তের ন্যায় ; উহার সর্ব্বোচ্চভাগে কর্ণিকার ন্যায় ব্রহ্মলোক অবস্থিত, ইহা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার লোক। বৃন্তবৎ ক্ষীরোদসাগরের চারিদিকে পদ্মদলের ন্যায় স্তবকে স্তবকে অসংখ্য সৌরমণ্ডল অবস্থিত আছে। ত্রিগুণময় ক্ষীরোদধির এবং ত্রিগুণময় ব্রহ্মাণ্ডসমূহের রজোগুণের রক্ষণশক্তি মাধ্যাকর্ষণশক্তি রূপে সৌরমণ্ডলসমূহকে স্ব স্ব স্থানে রক্ষা করিতেছে। এই মাধ্যাকর্ষণশক্তি কৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির একটী কার্য্যকারী রূপ। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে স্বয়ং পরমেশ্বরের দ্বারা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড স্ব স্ব কক্ষপথ সহ যথাস্থানে বিধৃত হইয়া আছে।

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায়। ছান্দোগ্য ৮।৪।১

এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায়। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২

—"অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগণকে স্ব স্ব স্থানে রাখিবার জন্য পরমেশ্বরই তাহাদের বিধারক সেতু; অর্থাৎ, পরমেশ্বর বন্ধনসূত্ররূপে লোকসকলকে স্ব স্ব স্থানে রক্ষা করিতেছেন।" গীতায়ও কৃষ্ণ বলিয়াছেন: "গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।" গীতা ১৫।১৩।—"আমি স্বীয় শক্তিকে ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত করিয়া সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিয়া রাখি।"

১১।৫।৫ সূর্য্য

প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র সূর্য্য, এবং প্রত্যেক সৌরমণ্ডলে একমাত্র মূল জ্যোতিষ্ক সূর্য্য। প্রত্যেক সৌরমণ্ডলে অন্য যে সকল দীপ্তিমান্ গ্রহ উপগ্রহ বা গ্রহাণুপুঞ্জ দৃষ্ট হয়, তাহারা সূর্য্যের জ্যোতিতে দীপ্তিমান। সূর্য্যও জড়পিণ্ড; তাহারও নিজস্ব জ্যোতি নাই। চিৎ সম্বন্ধে আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণের চিদংশের জ্ঞানশক্তি হইতে জ্যোতি এবং উত্তাপ উৎপন্ন হয়। ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষরূপী কৃষ্ণ সূর্য্যে স্বীয় চিদানন্দ অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। সূর্য্য হইতে যে প্রাণপোষক জ্যোতি এবং উত্তাপ বিকীর্ণ হয়, তাহা সূর্য্যে অধিষ্ঠিত চিদানন্দের চিদংশের জ্ঞানশক্তির পরিণাম, এবং যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশিত হয় তাহা আনন্দাংশের হ্লাদিনীশক্তির পরিণাম। সূর্য্যকে শাস্ত্রে আদিত্য নামেও অভিহিত করা হইয়াছে এবং আদিত্যের উপাসনাও শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। আদিত্য-উপাসনার অর্থ কেবল জড়পিণ্ড আদিত্যের উপাসনা নহে, আদিত্যে অধিষ্ঠিত চিদানন্দরূপী আদিত্য পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা।

"স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসাবাদিত্যে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি।" —বৃহদারণ্যক। ২।১।২—গার্গ বলিলেন, "আদিত্যে যে পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।"

স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেহভ্যাশো হ যদেনং
সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নিম্রেড়েরন্। ছান্দোগ্য। ৩।১৯।৫

—"যিনি আদিত্যকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করেন, পাপনাশক ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়া তাঁহাকে আনন্দ দান করে।" পুরাণে আদিত্যকে কশ্যপ এবং অদিতির সন্তান বলা হইয়াছে। পুরাণের এই উক্তি বেদান্ততত্ত্বের প্রতি-ধ্বনি। তৈত্তিরীয় আরণ্যক কশ্যপের অর্থ দিয়াছেন, "যঃ সর্ব্বং পশ্যতি"—যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা তিনি কশ্যপ। ঈশ্বর সর্ব্বদ্রষ্টা, এইজন্য ঈশ্বর কশ্যপ। কঠশ্রুতি

অদিতিকে দেবতাময়ী বলিয়াছেন (কঠ ২।১।৭)। দেবতার অর্থ, ঈশ্বরের লীলাময়ী শক্তি। পুরাণ আদিত্যকে কশ্যপ এবং অদিতির সন্তান বলিয়া জানাইয়াছেন যে, আদিত্যপুরুষ সর্ব্বদ্রষ্টা কৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলাময়ী শক্তির প্রকাশরূপ। প্রণাম-মন্ত্রে আছে ঃ

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥

প্রাতঃকালের সদ্যোদিত সূর্য্যকে প্রণাম করা হইতেছে—"জবাকুসুমের মত লোহিতবর্ণ, কশ্যপ হইতে উৎপন্ন, মহাজ্যোতির্ম্ময়, অন্ধকারনাশক, এবং সর্ব্ব-পাপনাশক সূর্য্যকে প্রণাম করি।" কাশ্যপেয় বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত আদিত্য পুরুষকেই প্রণাম করা হইয়াছে, কারণ দিবাকরকে কেবল অন্ধকারনাশক বলা হয় নাই, সর্ব্বপাপ-নাশকও বলা হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় জড়পিণ্ডের দ্বারা অন্ধকার নাশ করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু পাপ নাশ করা সম্ভব নহে। আদিত্যপুরুষরূপী কৃষ্ণই পাপ নাশ করিতে পারেন।

১১।৫।৬ বিরাট ঃ বিশ্বরূপ ঃ বিশ্বপ্রাণ ঃ বিশ্বাত্মা

স্থূল বিশ্বের উৎপত্তির পরে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বাসোপযোগী হইলে সকল স্থাবরের এবং জঙ্গমের স্থূল দেহসমূহের উৎপত্তি হয়। সমুদয় স্থূল স্থাবরজঙ্গমদেহ সহ সমগ্র স্থূল বিশ্বটাই বিশ্বের সমষ্টি স্থূলদেহ। ইহাকে বিরাট বলা হয়। বিরাট্ কৃষ্ণের বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপের মধ্যে কৃষ্ণের চিদানন্দ প্রত্যেক দেহে পরমাত্মারূপে এবং জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছেন, এইজন্য কৃষ্ণ বিশ্বাত্মা। আত্মার অধিষ্ঠানে দেহ সপ্রাণ হয়, এইজন্য বিশ্বাত্মা কৃষ্ণই বিশ্বপ্রাণ। বিশ্বপ্রাণ সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেকটী পরমাণুকে প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন জড় বৈজ্ঞানিক বলেন যে তাঁহারা কাঁচপাত্রের (glass tube) মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাণসৃষ্টির এই দাবী সত্য হইতে পারে না। প্রাণ সৃষ্টি করিবার শক্তি মানবের নাই। জড়বৈজ্ঞানিক কাঁচপাত্রে যে বস্তুর দ্বারা প্রাণসৃষ্টি করেন বলিয়া মনে করেন, সেই সকল বস্তু ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন এবং তাহাতে প্রাণ আছেই। সেই প্রাণের ক্রিয়াকেই জড়বৈজ্ঞানিক স্বীয় প্রাণসৃষ্টি বলিয়া দাবী করিয়াছেন; বস্তুতঃ তিনি প্রাণ সৃষ্টি করেন নাই এবং করিতে পারিবেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্যষ্টি জীব সৃষ্টি

১১।৬।১ ব্যষ্টি জীব সমগ্র বিশ্বের অধিবাসী

বিশ্বোৎপত্তির বিবরণ হইতে আমরা পাইয়াছি যে, এই বিশ্বে অসংখ্য সৌর-মণ্ডল আছে, এবং আমাদের সৌর মণ্ডলের ন্যায় প্রত্যেক সৌরমণ্ডলেই সূর্য্যকে আবর্ত্তনকারী গ্রহ, উপগ্রহ, এবং গ্রহাণুপুঞ্জ আছে। সমগ্র বিশ্বের অগণ্য গ্রহ-উপগ্রহসমূহের মধ্যে কেবল যে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটীতেই জীব আছে, তাহা নহে ; প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের গ্রহে এবং উপগ্রহে জীব আছে। জড়বৈজ্ঞানিকও স্বীকার করেন যে কেবল এই পৃথিবীতেই নহে, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহেও জীব বাস করে। অনন্ত বিশ্বের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে কত প্রকারের এবং কত সংখ্যক জীব বাস করে তাহা মানবের গণনার এবং ধারণারও অতীত। ব্যষ্টি শব্দের অর্থ প্রত্যগ্, এক-একটী (Individual)। আদিম সৃষ্টিকালে সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১১।৬।২ ঐশী পরিকল্পনা অনুসারে জীবসৃষ্টি

সৃষ্টিলীলা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর কৃষ্ণ স্বীয় অনন্ত জ্ঞানশক্তির পরিচালনার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির সম্পূর্ণ পরিকল্পনা স্থির করিয়া তদনুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্বের অসংখ্য সৌরমণ্ডলসমূহ অথবা অসংখ্য ব্যষ্টি জীব, ইহাদের মধ্যে কোন একটীরও উৎপত্তি সহসা (By chance or accident) হয় নাই, অথবা অন্ধ শক্তির খেয়ালের খেলা (the freak of a blind force) নহে। ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানশক্তির ক্ষুদ্রাংশমাত্র প্রাপ্ত মানব যখন কোন রাজ্য স্থাপন করে, তৎপূর্ব্বেই রাজ্যের আয়তন, প্রজাবৃন্দ প্রভৃতিকে জ্ঞাত হয়, শাসনতন্ত্র এবং শাসনতান্ত্রিক নিয়ম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় প্রস্তুত করিয়া লয়, রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালন করিবার যোগ্য শক্তি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে

দিয়া শাসন যন্ত্র গঠন করিয়া লয়, এবং প্রজাবর্গকে শিক্ষিত ও সভ্য করিবার জন্য শিক্ষাতন্ত্রও প্রস্তুত করিয়া লয়। অনন্তজ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরও যে বিশ্বের সৃজন শাসন এবং পালনের জন্য তদ্রূপ করিয়াছেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত। বিশ্বসৃষ্টি এবং প্রজাসৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই পরমেশ্বর উক্ত সমুদয় বিষয়েরই পরিকল্পনা স্থির করিয়া লইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমরা পাইয়াছি যে, প্রকৃতিতে, সমষ্টিলিঙ্গদেহে, ক্ষীরোদকে, এবং সূর্য্যে তিনি বিষ্ণুরূপে এবং আদিত্যপুরুষরূপে বিদ্যমান হইয়া তৎসমুদয়ের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা ইহাও পাইয়াছি যে, ব্যষ্টিসৃষ্টি করিবার জন্য তিনি ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা প্রথমোৎপন্ন দেবতা ও ঋষি। এক্ষণে যে ব্যষ্টি জীবসমূহের সৃষ্টি হইবে, তৎসমুদয় সৃষ্টি করিবার অগ্রে, ঐশী পরিকল্পনা অনুসারে ব্রহ্মা তাহাদের শাসন ও পালন করিবার যোগ্য এবং বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট জীবসমূহের সৃষ্টি প্রথমে করিলেন এবং তৎপরে অন্যান্য প্রজাগণের সৃষ্টি করিলেন। রাজা যদি রাজশক্তিতে শক্তিমান উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারীগণকে প্রথমেই রাজ্যের যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া প্রজাপালনের কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা হইলে যেমন রাজ্যশাসনের এবং প্রজাপালনের কার্য্য হইতে পারে না এবং সেই রাজ্য বিশৃঙ্খল হয়, তদ্রূপ, ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনায় যদি প্রথমে বিশ্ববাসী প্রজাগণকে শাসন ও পালন করিবার শক্তিবিশিষ্ট যোগ্য জীবের সৃষ্টি না হইত, তবে বিশ্বও বিশৃঙ্খল হইত। কিন্তু ঈশ্বরের সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি হওয়ায় বিশ্ব কখনও বিশৃঙ্খল ছিল না, হয় নাই, বা হইতে পারে নাই।

১১।৬।৩ জীবসৃষ্টির ক্রম

কৃষ্ণের সৃষ্টিপরিকল্পনানুযায়ী যেক্রম অনুসারে ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বেদান্তে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

আপ এব ইদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সতং ব্রহ্ম
ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দ্দেবান্। বৃহদারণ্যক ৫।৫।১

—"এই বিশ্ব উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জলরূপে অর্থাৎ কারণবারিরূপে ছিল। সেই কারণবারি সত্যকে অর্থাৎ সমষ্টিলিঙ্গদেহকে বা হিরণ্যগর্ভকে সৃজন করিল। সেই সত্য ব্রহ্ম অর্থাৎ অপরব্রহ্ম। সমষ্টিলিঙ্গদেহ প্রজাপতিকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে সৃজন করিল। ব্রহ্মা দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন।" আমরা

পাইলাম, ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে যে জীবগণকে সৃষ্টি করিলেন তাঁহারা দেবতা। প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের শাসন এবং পালনের জন্য বিশেষ কার্য্য করিবার শক্তি-বিশিষ্ট দেবতাগণের সৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে হওয়া প্রয়োজন ছিল, সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে দেবতাগণের সৃষ্টি হইল। জীবগণের উৎপত্তির ক্রম সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।৩ এবং ১।৪।৪ সূত্রদ্বয়ে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা এই : ১।৪।৩ সূত্র পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে ; এই সূত্রে ঘোষিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ পুরুষ ও প্রকৃতি হইলেন, এবং পুরুষ-প্রকৃতি হইতে পতিপত্নী অর্থাৎ পুরুষ জীবগণ এবং স্ত্রী জীবগণ উৎপন্ন হইল। পুরুষপ্রকৃতি হইতে প্রথমেই জীবগণ উৎপন্ন হয় নাই, পূর্ব্ববর্ণিত সৃষ্টি-পর্য্যায় অনুসারে হইয়াছিল। ব্যষ্টি জীবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।৪ সূত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, আদি মানব মনু এবং আদি মানবী শত-রূপা। ব্রহ্মা তপঃ প্রভাবে মনুকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ; মনু ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং আদি মানব। মানবীর উৎপত্তির পূর্ব্বে মনুর দেহ বিদলের ন্যায় ছিল, তাহা ১।৪।৩ সূত্রে পাওয়া যায়। কলায়, ছোলা প্রভৃতি যে সকল ডালের খোসার মধ্যে দ্বিধাকৃত শস্যটী সম্মিলিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বিদল বলা হয়। ব্রহ্মা মনুকে সৃষ্টি করিয়া মনুর বিদলবৎ দেহের অর্দ্ধাংশকে ভিন্ন করিয়া মানবী করিলেন। এই আদি মানবীর নাম শতরূপা। শতরূপা মনুর অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া তাঁহাকে মনুর অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হইয়াছে, এবং আজিও স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হয়। ১।৪।৪ সূত্রের ঘোষণার সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের ঘোষণার সমন্বয় মতে ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে মনু শতরূপার গর্ভ হইতে প্রথমে মানব ও মানবীর উৎপত্তি করিয়াছিলেন। তৎপরে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ইচ্ছায় এবং শক্তিতে মনু বৃষ রূপ এবং শতরূপা গাভীরূপ ধারণ করিয়া বৃষ এবং গাভী উৎপন্ন করিয়া-ছিলেন। এইরূপে তাঁহারা বেদোল্লিখিত নামরূপ অনুযায়ী সর্ব্বপ্রকারের প্রাণীর পুরুষ এবং স্ত্রী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তত্তজ্জাতীয় প্রাণীগণের পুরুষ ও স্ত্রী উৎপন্ন করিয়াছিলেন। "এবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্ব্বমসৃজত।" বৃহদারণ্যক ১।৪।৪।—"ঠিক এইরূপেই, পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যতকিছু স্ত্রীপুরুষযুগল জগতে আছে, তিনি তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন।" জীবসৃষ্টির ক্রম সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে আমরা পাইলাম যে, ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে দেবতা, তৎপরে মানব, এবং তৎপরে অন্যান্য সকল জীবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকের সৃষ্টিক্রম মুণ্ডক শ্রুতিতেও ঘোষিত হইয়াছে, মুঃ ২।১।৬-৭ :—

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পাবতে যত্র সূর্য্যঃ॥
তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপ্রাণৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্য বিধিশ্চ॥

ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত এই বিশ্বের বস্তুসমূহ পর পর যে ক্রম অনুসারে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ক্রম অনুসারে তাহাদের নাম এই সূত্রদ্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমেই ঋক্ সামাদি বেদের উৎপত্তি ; দীক্ষা, যজ্ঞ, ক্রতু, যজ্ঞদক্ষিণা, সম্বৎসর অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাল, যজমান প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিধিবিধান এবং মন্ত্রাদি বেদের মধ্যেই আছে। তৎপরে লোকসমূহ, অর্থাৎ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডযুক্ত এই বিশ্ব, এবং প্রতি সৌরমণ্ডলের চন্দ্র এবং সূর্য্য। তৎপরে অনেক প্রকারের দেবতা এবং সাধ্যগণ। তৎপরে মনুষ্যগণ। তৎপরে পশুগণ। তৎপরে বিহঙ্গগণ। প্রাণ ও অপান বায়ু সকল জীবদেহের মধ্যেই আছে। তৎপরে গোধূমযবাদি উদ্ভিজ্জগণ উৎপন্ন হইল। অতঃপর তপস্যা, শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধিসকল প্রবর্ত্তিত হইল। সৃষ্টিকালেই উৎপন্ন এই সকল জীবগণকে বেদান্ত তিনটী মূল শ্রেণীতে (genus) বিভক্ত করিয়াছেন। জরায়ুজ—দেবতা, সাধ্য, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি। অণ্ডজ—পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি। উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষ, লতা, ওষধি প্রভৃতি। "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি।" ছান্দোগ্য। ৬।৩।১ ।—"সেই সকল সৃষ্টিকালেই উৎপন্ন প্রাণীগণের তিনটীমাত্র বীজ অর্থাৎ কারণ আছে—অণ্ডজ, জরায়ুজ, এবং উদ্ভিজ্জ।" বীজ শব্দ ব্যবহার করিয়া বেদান্ত নিরূপণ করিলেন যে প্রথমোৎপন্ন অণ্ডজগণ পরবর্ত্তী সকল অণ্ডজগণের বীজ ; প্রথমোৎপন্ন জরায়ুজগণ পরবর্ত্তী জরায়ুজগণের বীজ ; এবং প্রথমোৎপন্ন উদ্ভিজ্জগণ পরবর্ত্তী উদ্ভিজ্জগণের বীজ ; অর্থাৎ, এখন জগতে যত প্রকারের জীব আছে, সৃষ্টিকালে ততপ্রকারের জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহারা সকলেই তাহাদের বংশধর, এবং ইহাদের মধ্যে কোন জীবদেহ অন্য কোন প্রকারের জীবদেহের ক্রমোন্নত পরিণতি নহে। ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনা অনুসারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকার জীবের স্ত্রী-পুরুষ দেহ সৃষ্টি, এবং তৎপরে স্বজাতীয় স্ত্রী পুরুষের দেহ সহযোগে তত্তজ্জাতীয় জীবগণের বংশ বৃদ্ধি, ইহাই ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় বিশ্বনিয়ম (Cosmic Law)। আমরা বেদান্ত হইতে ইহাও পাইয়াছি

যে মানবসৃষ্টির পরেই মানবগণের মধ্যে দীক্ষা, শ্রদ্ধা, সত্য, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিও প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মা স্বয়ং কৃষ্ণের নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করিয়া আদি ঋষি হইয়াছিলেন। তিনিই দেবতাগণকে এবং প্রথমোৎপন্ন মানবগণের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিগণকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সেই মানবগণও ঋষিত্বলাভ করিয়া মানবজাতির মধ্যে বেদ-বেদান্ত এবং যোগসাধনার প্রচার করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা না হইলে মানবগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিত না, সভ্য এবং উন্নত হইতে পারিত না, এবং দ্বন্দ্বাতীত ও মায়াতীত হইয়া মুক্তি, পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভও করিতে পারিত না।

১১।৬।৪ জীবদেহে অনুপ্রবেশ

ব্রহ্মা বেদে উল্লিখিত নামরূপ অনুসারে পূর্ব্ববর্ণিত সৃষ্টিপদ্ধতিতে জীবদেহসমূহ সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তিনি জীবাত্মা সৃষ্টি করেন নাই। জীবাত্মা সৃষ্ট বস্তু নহে। উক্ত পদ্ধতিতে যে সকল দেহের সৃষ্টি হইল, তৃতীয় পুরুষরূপী কৃষ্ণ সেই সকল দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন। অনুপ্রবেশতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, জীবদেহে অনুপ্রবেশতত্ত্বও তদ্রূপ, অর্থাৎ, প্রত্যেক জীবদেহে কৃষ্ণ চিদানন্দের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া জীবাত্মা রূপে অধিষ্ঠিত করিলেন। বেদান্তের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে উক্তি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতাও বলিয়াছেন ঃ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" গীতা ১৫।৭। বেদান্ত বলিয়াছেন, স্থাবরজঙ্গম যাহা কিছু আছে, ঈশ্বর তৎসমুদয় সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন (তৈত্তিরীয় ২।৬)। গীতায়ও কৃষ্ণ বলিলেন, তাঁহারই অংশ জীবলোকে সর্ব্বজীবের মধ্যে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছে। বেদান্তের জীবদেহে অনুপ্রবেশতত্ত্ব এবং গীতার জীবদেহে চিদানন্দের অংশের জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠানতত্ত্ব একই। এই উভয় তত্ত্বেরই অর্থ এই যে, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জীবদেহ সৃষ্টির পর কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ জীবদেহে অনুপ্রবিষ্ট এবং অধিষ্ঠিত হইল। সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে, প্রতি জীবদেহে কৃষ্ণের চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তি প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছেন এবং প্রতি জীবদেহের হৃদয়াকাশে কৃষ্ণ বামনরূপেও অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাও কৃষ্ণের অনুপ্রবেশ। জীবাত্মার অনুপ্রবেশের ফলে জীবদেহ সচেতন, সপ্রাণ এবং সক্রিয় হইল। অনুপ্রবেশের পর ব্যষ্টি জীবসৃষ্টির কার্য্য

সম্পূর্ণ হইল। ব্রহ্মা লিঙ্গদেহ সৃষ্টি করেন নাই, কেবল স্থূলদেহই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার সৃষ্ট স্থূলদেহসমূহে, তৃতীয়পুরুষরূপী কৃষ্ণের ইচ্ছায় এবং বিধানে সমষ্টিলিঙ্গদেহের অংশ ব্যষ্টিলিঙ্গদেহ রূপে এবং সমষ্টিকারণদেহের অংশ ব্যষ্টিকারণদেহ রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে ব্যষ্টিজীবদেহের সৃষ্টিসম্পন্ন হইলে পরে তাহাতে জীবাত্মার, পরমাত্মার, এবং বামনের অনুপ্রবেশ হইয়াছিল।

১১।৬।৫ সৃষ্টির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

সৃষ্টির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টিলীলার বিধান অনুসারে প্রথম সৃষ্ট জীবগণের স্বজাতীয় স্ত্রীপুরুষের সংযোগে তজ্জাতীয় জীবদেহের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম সৃষ্টির পর হইতে এইরূপে যে সকল জীবদেহ উৎপন্ন হইতেছে তৎসমুদয়ের মধ্যে কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্তরূপ অনুপ্রবেশ হইতেছে। জীবাত্মার ক্রমোন্নতির এবং ক্রমাবনতিরও নিয়ম আছে। এই নিয়ম অনুসারেও নূতন উৎপন্ন দেহসমূহের মধ্যে জীবাত্মাসমূহ অনুপ্রবিষ্ট ও অধিষ্ঠিত হইতেছে, এবং তদতিরিক্ত দেহসমূহে কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। প্রথম সৃষ্টির সময় যে অল্পসংখ্যক জরায়ুজ, অণ্ডজ, এবং উদ্ভিজ্জ জীবগণ ছিল, ক্রমশঃ তৎসমুদয়েরই সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদের মধ্যে উক্তরূপেই জীবাত্মা অনুপ্রবিষ্ট এবং অধিষ্ঠিত হইতেছে। সৃষ্টির প্রয়োজন অনুসারে এখনও ক্ষীরোদধি হইতে নূতন নূতন গ্রহ-উপগ্রহ ব্রহ্মার ইচ্ছায় এবং শক্তিতে জন্মলাভ করিতেছে। এইরূপে, প্রথম সৃষ্টির পর হইতে সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। যে সকল নূতন স্থূলদেহের উৎপত্তি হইতেছে, তাহাতে সমষ্টিলিঙ্গদেহের অংশ ব্যষ্টিলিঙ্গদেহ রূপে এবং সমষ্টিকারণদেহের অংশ ব্যষ্টিকারণদেহ রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলে পর তাহাতে জীবাত্মার, পরমাত্মার, এবং বামনের অনুপ্রবেশ হইতেছে। প্রথম সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে যে সকল জাতির জীবদেহ পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে এবং এখন লুপ্ত হইতেছে, পরবর্ত্তী কল্পে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইবে।

১১।৬।৬ জীবগণের দেহানুযায়ী বাসভূমি : স্বর্গ : দেবগণ

যে সকল জীবের দেহ স্থূল পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত, পৃথিবী তাহাদের বাসভূমি। পৃথিবীর সকল জরায়ুজ, অণ্ডজ, এবং উদ্ভিজ্জের দেহ স্থূল পঞ্চভূতের

দ্বারা গঠিত। দেবতাগণের বাসভূমি স্বর্গ। প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের চন্দ্রই স্বর্গলোক, এই তত্ত্ব বেদান্ত হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদান্ত অনুসারে, যে সকল মানব ইষ্টপূর্ত্তাদি বেদবিহিত যজ্ঞ সম্পাদন করে তাহারা মৃত্যুর পর দেবযানপথে গমন করিয়া স্বর্গলাভ করে এবং পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ শেষ হইলে পুনরায় মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে। গীতার ৯।২১ শ্লোকেও এই তত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতির পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ডে এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতির ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে দেবযানগামী জীবগণ চন্দ্রলোকে দেবতাগণের নিকট গিয়া স্বর্গভোগ করেন এবং ভোগশেষে তথা হইতে মর্ত্তে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। এতদ্দ্বারা বেদান্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের চন্দ্রলোকই সেই সৌরমণ্ডলের স্বর্গ এবং সেই সৌরমণ্ডলের দেবতাগণের বাসভূমি। চন্দ্রলোকে দেবতাগণ বাস করেন এবং যে সকল মানব কর্ম্মফলে স্বর্গ লাভ করে তাহারাও তথায় গিয়া বাস করে, তথাপি চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না, বেদান্ত তাহাও বলিয়াছেন। অতি অল্পসংখ্যক মানব স্বর্গলাভ করে; যাহারা স্বর্গলাভ করে, তাহারাও চিরকালের জন্য স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না, কর্ম্মফলভোগ শেষ হইলেই আবার মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে। এইজন্য স্বর্গ কখনও পূর্ণ হয় না, অর্থাৎ স্বর্গের অধিবাসীসংখ্যা (Population) অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। স্বর্গবাসী দেব-দেবীগণের দেহ স্থূল পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত নহে, তাহাদের সূক্ষ্মাংশের দ্বারা গঠিত; এইজন্য স্থূল বস্তুর সূক্ষ্মাংশ দেবতাদের ভোগ্য, এবং এইজন্য দেবগণ নিজ নিজ সৌরমণ্ডলের মধ্যে যে কোন গ্রহে বা উপগ্রহে ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারেন। স্থূলভূতের সূক্ষ্মাংশের দ্বারা গঠিত বলিয়াই দেবতাগণ স্বেচ্ছায় মানবকে দর্শন না দিলে মানব স্থূলচক্ষে অথবা দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যেও তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। কৃষ্ণ প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত গ্রহ-উপগ্রহসকলের অধিবাসীগণের রক্ষণপালন প্রভৃতি কর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার দেবতাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন এবং সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার যোগ্য বিশেষ শক্তিও তাঁহাদিগকে দিয়াছেন। প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের স্বর্গ এবং পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহসকলের মধ্যে কোনটী গন্ধর্ব্বলোক, কোনটী কিন্নরলোক, কোনটী পিতৃলোক, কোনটী প্রেতলোক, ইত্যাদি। জীবগণের নিমিত্ত দেহানুযায়ী এই যে নির্দ্দিষ্ট বাসভূমির ব্যবস্থা তাহা কেবল আমাদের এই সৌরমণ্ডলের

জন্যই নহে, তাহা সমগ্র বিশ্বের সকল সৌরমণ্ডলের জন্য। সমগ্র বিশ্বের জন্য কৃষ্ণ একই বেদ এবং একরূপ (uniform) নিয়ম এবং ব্যবস্থা করিয়াছেন। কৃষ্ণ মঙ্গলেচ্ছাতেই সাধারণ দেহাভিমানী মানবকে অন্যান্য সৌরমণ্ডলসমূহের এবং পৃথিবী ব্যতীত তাহার নিজের সৌরমণ্ডলেরও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহসমূহের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী করেন নাই ; সেইজন্য বেদশাস্ত্রে মর্ত্তাতীত লোক-সমূহের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখের দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ববিষয়েমাত্র জ্ঞান দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকগণ দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা চন্দ্রলোকে কোন অধিবাসী দেখিতে না পাওয়ায় মনে করেন যে চন্দ্রলোক অধিবাসীশূন্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে চন্দ্রলোকের অধিবাসীগণ সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট ; তাঁহারা দূরবীক্ষণের দ্বারাও দৃষ্ট হয়েন না। এইজন্য জড়বৈজ্ঞানিক বলেন যে চন্দ্র অধিবাসীহীন। বস্তুতঃ তাহা নহে ; চন্দ্রই স্বর্গলোক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মানবজাতির উন্নতির ও অবনতির আবর্ত্তন

১১।৭।১ চতুর্যুগ : সভ্যতা

সর্গারম্ভে এবং কল্পারম্ভেও, বিশ্বসৃষ্টির অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের নাম সত্য-যুগ ; তৎপরবর্ত্তী যুগের নাম ত্রেতাযুগ ; ত্রেতাযুগের পরবর্ত্তী যুগের নাম দ্বাপর যুগ ; দ্বাপরের পরবর্ত্তী যুগের নাম কলিযুগ। কলিযুগের পর আবার সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি পূর্ব্ববৎ পর পর আবর্ত্তন করে। সত্যযুগের মানব উন্নততম। পরবর্ত্তী যুগত্রয়ে মানবের ক্রমাবনতি হয়। কলিযুগের মানব অন্য তিনটী যুগের মানবের সহিত তুলনায় অধিকতম অবনত। কেবল পদার্থ বিজ্ঞান (Material Science) এবং জাগতিক সমৃদ্ধি (material prosperity) লাভ করিলেই মানব উন্নত হয় না। উন্নত মানব বলিতে সভ্য মানব বুঝায়। বাহ্যাভ্যন্তর শুচিসম্পন্ন মানবই সভ্য মানব। জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রেম বাহ্যাভ্যন্তরের শুচিতা সম্পাদন করে। এইজন্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং প্রেম

সভ্যতার প্রাণবস্তু। জ্ঞান বলিতে কেবল জড়বস্তুবিষয়ক জ্ঞান বুঝায় না। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭-১১ শ্লোকপঞ্চকে যে জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাই জ্ঞান। কৃষ্ণের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি এই জ্ঞানের অন্তর্গত। এইজন্য গীতার জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগের সহিত সমন্বিত। এইরূপ জ্ঞানলাভে মানব অধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং সর্ব্বজীবে তাহার সমভাব আসে।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ গীতা ১৩।২৮

এই শ্লোকের মর্ম্ম ঃ—"গীতায় উপদিষ্ট জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগের সাধনা করিয়া যে মানব জ্ঞানী হইয়াছে, সেই জ্ঞানী মানব সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরকে সমভাবে অবস্থিত বলিয়া জানেন; তিনি জানেন যে ঈশ্বর আপনাকে সকল জীবরূপে পরিণত করিয়াছেন; এবং তিনি স্বীয় চিদানন্দের অংশকে জীবাত্মারূপে সকল জীবদেহে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন; এইজন্য সকল জীবই মূলতঃ এক বস্তু; এরূপ অবস্থায়, এক জীব অন্য জীবকে হিংসা করিলে আপনাকে আপনিই হিংসা করা হয়। এইরূপ সমদর্শী মানব পরম গতি লাভ করে। এইরূপ সমভাবাপন্ন মানবের প্রেমের বিকাশ হয় এবং তিনি যে কেবল ভগবানকেই ভালবাসেন তাহা নহে, ভগবানের স্থষ্ট সকল জীবকে আত্মসম ভালবাসেন। এইরূপ জ্ঞানী বিজ্ঞানী এবং প্রেমী মানবই সভ্য এবং উন্নত মানব। এইরূপ জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রেম যে মানবের যত অধিক আছে সে তত অধিক সভ্য মানব। যেখানে এইরূপ জ্ঞান এবং প্রেম নাই, সেখানে জ্ঞান কেবল বিষয়জ্ঞান এবং কর্ম্ম বিষয়-কর্ম্ম। যাহার প্রভূত বিষয়জ্ঞান, বিষয়কর্ম্ম, এবং অর্থসম্পদ আছে কিন্তু জ্ঞান ও প্রেম নাই, সেই ব্যক্তিও অসভ্য এবং অনুন্নত মানব। বিষয়জ্ঞান, বিষয়কর্ম্ম এবং অর্থসম্পদ না থাকিলেও যাঁহার জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রেম আছে তিনি সভ্য এবং উন্নত মানব। কেবল বিষয়জ্ঞান এবং জাগতিক সমৃদ্ধি মানবের লক্ষ্য হইলে তাহার মধ্যে কুটিলতা, স্বার্থপরতা এবং আত্মসুখাভিলাষীতা আসিবেই। এইরূপ মানবগণের কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মানবের সহিত মানবের সম্বন্ধকে এবং মানবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকেও কঠিন, কুটিল এবং জটিল করিয়াছে, এবং করিতে থাকিবে।

সভ্যতা ধর্ম্মকে বাদ দিয়া লাভ করা যাইতে পারে না, কারণ, যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রেম সভ্যতার প্রাণবস্তু, তাহা ধর্ম্মকে জীবনের লক্ষ্য জানিয়া ধর্ম্ম-সাধনার দ্বারা লভ্য। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, সকল যুগেই ইহাই সভ্যতা, কিন্তু সত্য যুগ এই সভ্যতার যুগ। যুগপরিবর্ত্তনের সহিত মানবের ক্রমাবনতির ফলে মানব ক্রমশঃ এই সভ্যতা হইতে বিচ্যুত হইতে থাকে। চতুর্থ যুগে অর্থাৎ কলিযুগে, এই সভ্যতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মানব বিষয়জ্ঞান এবং জাগতিক সমৃদ্ধি-মূলক তথাকথিত সভ্যতাকেই যথার্থ সভ্যতা বলিয়া মনে করে। এইজন্য কলিযুগের মানব অন্য তিনটী যুগের মানবের সহিত তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত মানব। কিন্তু কলিযুগেও যে সভ্য মানব একেবারেই নাই, তাহা নহে। কলিযুগে এইরূপ মানবের সংখ্যা অত্যল্প। এই কারণে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, এবং কলিযুগে মাত্র একপাদ। ভদ্রতা সভ্যতার ফল এবং সভ্যতা ধর্ম্মে অন্তর্নিহিত বলিয়া শাস্ত্র ধর্ম্ম শব্দের দ্বারা ভদ্রতা এবং সভ্যতাও সূচিত করিয়াছেন। অত্যন্ত অবনতির পর আবার উন্নতি হয়। কলিযুগের অন্তে আবার সত্যযুগ আসে। কিন্তু দ্বন্দ্ব-পরিণয়লীলার ক্ষেত্র এই জগৎ কখনও গোলোক বা বৈকুণ্ঠধাম হইবে না। সত্যযুগের পর পুনরায় পর পর ত্রেতা, দ্বাপর, কলি আসে, অর্থাৎ ক্রমাবনতি হয়। আমরা পাইলাম যে, যাহা চতুর্যুগের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন, তাহা বস্তুতঃ উন্নতির এবং অবনতির পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন। এইরূপ আবর্ত্তন কৃষ্ণের বিশ্ব-লীলার বিধান। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সর্গারম্ভের এবং কল্পারম্ভেরও অব্যবহিত পরবর্ত্তী মানবগণের এবং অন্যান্য প্রাণীগণেরও দেহ যেরূপ বৃহৎ এবং শক্তিশালী থাকে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তদ্রূপ বৃহৎ এবং শাক্তিশালী থাকে না, দেহের আয়তন এবং শক্তি ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে।

১১।৭।২ ভারতবর্ষ আদিমানবের বাসভূমি

সর্গারম্ভে এবং কল্পারম্ভেও সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইবার পর আমাদের সৌর-মণ্ডলে এই পৃথিবীতে ব্রহ্মা ভারতবর্ষকে প্রথমসৃষ্ট মানবগণের আদি বাসভূমি করিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষ নাম ছিল না; তখন ইহার নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। আদি মানবের বাসভূমি জম্বুদ্বীপের ভৌগলিক অবস্থান এবং সীমা বর্ত্তমান ভারতের ন্যায় ছিল না। বর্ত্তমান আফগানিস্থান, মেসোপটেমিয়া,

সুসা, উর, লাগাস, কিস, নেনিভা, ব্যবিলন, এই সমস্তই জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান ভারতের পূর্ব্বদক্ষিণের বহু অংশই তখন সমুদ্রগর্ভে ছিল, কালক্রমে ঐ সকল স্থান সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া জম্বুদ্বীপের সহিত যুক্ত হইয়া ইহার আয়তন বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল; ভারতের উত্তরপশ্চিমাংশে যেখানে সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, গঙ্গা এবং যমুনা, এই সাতটী নদী হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানে প্রথম সৃষ্টির পরের আদি মানবগণের বাসভূমি ছিল। ঐ সাতটী প্রধান নদীর নামানুসারে ঐ অঞ্চলের সপ্তসিন্ধু অঞ্চল নাম হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা আদি-মানবগণের মাতৃভাষা ছিল। তাঁহারা বেদ শিক্ষা করিয়া বৈদিক ধৰ্ম্মজীবন এবং সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সপ্তসিন্ধু অঞ্চল যখন তাঁহাদের বাসের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল এবং জীবনযাত্রার উপযোগী দ্রব্য-সমূহ সকলের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হইল, তখন তথা হইতে আদিমানবগণ পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ উত্তরাপথ অঞ্চলে এবং পশ্চিমদিকে ক্রমশঃ ব্যবিলন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ঐ সকল স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতের সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের আদি মানবজাতিই আর্য্যজাতি। সপ্তসিন্ধু হইতে আর্য্যজাতির অভিযান কেবল জম্বুদ্বীপের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না; তাঁহারা ক্রমশঃ জম্বুদ্বীপের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যান্য স্থানেও গমন করিয়া সেই সকল স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের আর্য্যজাতির শাখা-প্রশাখা সমূহ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারই ফলে এক্ষণে সমগ্র পৃথিবী মানবের বাসভূমি হইয়াছে। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের মূল গোত্র (Parent stock) হইতে বিচ্ছিন্ন দূরদেশবাসী শাখাপ্রশাখাগণ কালক্রমে মূলগোত্রের সভ্যতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের মূল মাতৃভাষা সংস্কৃত বিকৃত হইয়া নানারূপ ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। তাহাদেরই পরস্পরের মধ্যে জীবনসংগ্রামে পরাজিত প্রশাখাগণ লোকালয় ত্যাগ করিয়া অরণ্যে এবং পৰ্ব্বতগুহায় গিয়া বাস করিয়াছিল এবং তথায় শিক্ষা ও সংস্কার বর্জ্জিত অবস্থায় বাস করিতে করিতে তাহারা কালক্রমে অসভ্য বন্য মানবে পরিণত হইয়াছিল। আদিম সৃষ্টির পর হইতে প্রতি নূতন সর্গে এবং প্রতি নূতন কল্পেও এই ইতিহাসই পুনরাবৰ্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মার আয়ুঃশেষে প্রাকৃতিক প্রলয়ের পর যে নূতন সৃষ্টি হয় তাহাকে সর্গ বলা

হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রিতে নৈমিত্তিক প্রলয়ের পর দিবসারম্ভে যে নূতন সৃষ্টি হয় তাহাকে কল্প বলা হয়।

১১।৭।৩ আদি মানবজাতি উন্নততম ঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি যে প্রতি নূতন সর্গের এবং প্রতি নূতন কল্পেরও সর্ব্বপ্রথম যুগ হইতেছে সত্যযুগ এবং সেই সত্যযুগের মানবগণ উন্নততম মানব। তাঁহারাই আদি মানবজাতি, সুতরাং আদি মানবজাতিই উন্নততম। আদি মানবজাতি কিরূপে উন্নততম হইয়াছিলেন তাহা বিবৃত করা হইতেছে। সর্গারম্ভের পর অথবা কল্পারম্ভের পর সর্ব্বপ্রথম সত্যযুগের আদিমানবগণ সংখ্যায় অধিক ছিলেন না। প্রথম সপ্ত মহর্ষি ব্রহ্মার শিষ্য। তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট বেদ শিক্ষা করিয়া এবং দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা মহর্ষি হইয়াছিলেন। অল্পসংখ্যক আদি মানবগণকে তাঁহারা বেদ শিক্ষা দিয়া এবং দীক্ষা দান করিয়া উন্নততম মানব করিয়াছিলেন। বেদে কেবলই যে অধ্যাত্মবিজ্ঞানই আছে তাহা নহে। বর্ণমালা, শব্দতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ছন্দ, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থবিজ্ঞান, জীবনযাত্রাবিধি প্রভৃতি সমস্তই বেদে আছে। বেদে পর্ণকুটীর এবং অট্টালিকা, কর্কশ বস্ত্র এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র, স্বর্ণাদি ধাতুর অলঙ্কার, লৌহ এবং অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার, রন্ধন এবং পক্ব আহার, বিবিধ প্রকারের আমিষ এবং নিরামিষ আহার্য্য, স্থলযান, জলযান, এবং বায়ুযানেরও উল্লেখ আছে। আদি মানবজাতি অধ্যাত্মবিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞান বেদ হইতে শিক্ষা করিয়া পদার্থবিজ্ঞানেও পারদর্শী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পদার্থবিজ্ঞানসাধনা অধ্যাত্মবিজ্ঞান সাধনার অনুবর্ত্তী এবং পরিপোষক ছিল, অধ্যাত্মবিজ্ঞানসাধনার সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জিত এবং তাহার প্রতিকূল ছিল না। আদি মানবগণ এইরূপে যে সভ্য সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, সেই সমাজের মানবগণ মানবজাতির ইতিহাসে উন্নততম মানব। আদি মানবজাতির লোকসংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া তাঁহারা সকলেই জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে পাইতেন, এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত সংগ্রাম ছিল না এবং তাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞানসাধনার জন্য যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ পাইতেন। এই সমাজের প্রত্যেকটী মানবই যে সমান উন্নত ছিলেন, তাহা নহে। মানবের দেহ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়। মায়াময় দ্বন্দ্বলীলায় দ্বন্দ্ব-

সৃষ্টির জন্য, সৃষ্টির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য, এবং সৃষ্টিলীলার বৈচিত্রবিধানের জন্য কৃষ্ণের সৃষ্টিবিধান এই যে, কোন মানব সত্ত্বপ্রধান, কোন মানব রজোপ্রধান কোন মানব রজস্তমোপ্রধান, এবং কোন মানব তমোপ্রধান হয়। ইহার ফলে মানব ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি এবং যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। মানবের এইরূপ গুণ এবং কর্ম্মের বিভেদানুসারে আদি মানবসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র, এই চারিটী জাতিতে ঈশ্বরের বিধানানুসারে বিভক্ত হইয়াছিল। সত্ত্বপ্রধান মানবগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ। রজোপ্রধান মানবগণ ছিলেন ক্ষত্রিয়। রজস্তমোপ্রধান মানবগণ ছিলেন বৈশ্য। তমোপ্রধান মানবগণ ছিলেন শূদ্র। বিজ্ঞানসাধনা এবং অপরকে জ্ঞানদান ছিল ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ম্ম। ব্রাহ্মণের মন্ত্রীত্বে রাজ্যের শাসন পালন এবং রক্ষা ছিল ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ম্ম। ব্যবসাবাণিজ্য এবং কৃষিকর্ম্ম ছিল বৈশ্যের প্রধান কর্ম্ম। অন্য তিনটী জাতির সেবা ছিল শূদ্রের প্রধান কর্ম্ম, কারণ এইরূপ সেবা ব্যতীত, উচ্চস্তরের কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা তাহাদের ছিল না। এখানে প্রধান কর্ম্ম বলিতে জাতিগত প্রধান কর্ম্ম বুঝান হইয়াছে। সকলেরই ব্যক্তিগত জীবনের প্রধান কর্ম্ম ছিল, অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের ভজনা। উক্ত চারি জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথবা শূদ্রও যদি অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারিতেন, তিনিও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতেন, কারণ তিনি সত্ত্বপ্রধান না হইলে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারিতেন না, এবং যোগসাধনার দ্বারা রজঃ-তমঃ-প্রধান ব্যক্তিও সত্ত্বপ্রধান হইতে পারেন। আদি মানবসমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্রগণ সকলেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের দ্বারা পরিচালিত হইতেন, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, শাস্ত্রের আদর্শ এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এবং ভক্তির সহিত ঈশ্বরের ভজনা করিতেন। এইজন্য আদিম সৃষ্টির পরের সর্ব্বপ্রথম সত্যযুগের আদি মানবজাতি উন্নততম ছিলেন। বিশ্বের স্থিতিকালে যে যুগপরিবর্ত্তন হয় তাহাও এক-একটী প্রলয়াত্মক বিপ্লবের পরে হয়। এইজন্য, কলিযুগের পরে যখন সত্যযুগ আসে, মহা লোকক্ষয় হইয়া কলিযুগের অবসান হয় বলিয়া, অল্পসংখ্যক লোক লইয়া সত্যযুগ আরম্ভ হয় এবং আদিম সত্যযুগের মানবগণের মত তাহারাও উন্নততম হইবার সুযোগ পায় এবং উন্নততম হয়।

১১।৭।৪ ক্রমাবনতির কারণ

দ্বন্দ্বলীলার ক্ষেত্র এই জগতে অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে মানবের শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হইতে থাকে এবং মানবের জীবনযাত্রা শাস্ত্রের আদর্শ এবং শাস্ত্রবিধি হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইতে থাকে। ইহার ফলে মানব ভগবানকে ভুলিয়া এবং যথেচ্ছাচারী হইয়া ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। কলিযুগের অধিকাংশ মানব শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত নহে, এবং শাস্ত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ও শাস্ত্রবিধান ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এইজন্য কলিযুগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবনতি হয়। কলিযুগের অধিকাংশ মানবে রজঃ এবং তমঃ গুণ অত্যধিক বৃদ্ধি এবং প্রাবল্য প্রাপ্ত হয়। রজঃ এবং তমঃ গুণ মানবকে অতিশয় ইন্দ্রিয়পরবশ, বিষয়লোভী, এবং বিষয়কর্ম্মে আসক্ত করে এবং মানবচিত্তকে বহির্ম্মুখী করে। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের আদি মানবজাতির যে সকল ব্যক্তি ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরদেশে চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র জাতীয় রজঃ এবং তমঃ গুণপ্রধান মানব। মূল গোত্রের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া তাহারা বৈদিক সভ্যতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে ধর্ম্মহীনও হইয়া গিয়াছিল। যাহারা জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া অরণ্যে ও পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই তমোপ্রধান শূদ্রজাতীয় মানব। শিক্ষা, দীক্ষা, এবং সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং সভ্য জীবন যাপন করিবার উপযুক্ত অবস্থা ও পরিবেশ অরণ্যে ও পর্ব্বতে প্রাপ্ত না হওয়ায় এই সকল তমোপ্রধান শূদ্রজাতীয় মানবগণ কালক্রমে বস্ত্রহীন, গৃহহীন, অপক্কমাংসভোজী অসভ্য বন্য মানবে পরিণত হইয়াছিল। জগতের বহু স্থানেই এখনও এই সকল মানবের বংশধরগণ অরণ্যে ও পর্ব্বতে বসবাস করিতেছে। মানবজাতির ক্রমাবনতির ইহাই কারণ। ধর্ম্মস্থাপন করিবার জন্য এবং স্থাপিত ধর্ম্মের রক্ষার এবং পুনস্থাপনের জন্য কৃষ্ণ যদি বারে বারে জগতে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে অবিদ্যাশক্তির অবাধ ক্রিয়া মানবজাতিকে দ্বিপদ শ্বাপদ জাতিতে পরিণত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ডারুইনের মতবাদ

১১।৮।১ জীবদেহোৎপত্তি বিষয়ে ডারুইনের মতবাদ অসার এবং অসত্য

যে শাস্ত্রনিরূপিত সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত করা হইল, তাহার সহিত ডারুইন (Darwin) সাহেবের জীবদেহের ক্রমোন্নতিবাদের (Theory of Evolution) সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য, ডারুইন সাহেবের জীবদেহোৎপত্তি বিষয়ক মতবাদটী যথার্থ তত্ত্ব কিনা তাহা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডারুইনের মতবাদ কেবলমাত্র জীবদেহের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ। সংক্ষেপে ডারুইনের ক্রমোন্নতিবাদটী এইরূপ :— এই জগতে এখন মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে সকল জীবদেহ আছে, আদিতে এই সকল জীবদেহ ছিল না। সর্ব্বপ্রথমে শৈবালজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র জলজন্তুর দেহ ছিল; সেই দেহে অস্থি ছিল না। সেই দেহের ক্রমোন্নতি হইয়া তাহা ক্ষুদ্র-অস্থি-যুক্ত ক্ষুদ্র সরীসৃপ দেহে পরিণত হয়। সেই সরীসৃপ-দেহের ক্রমোন্নতি হইয়া তাহা পক্ষীদেহে পরিণত হয়। পক্ষীদেহের ক্রমোন্নতি হইয়া তাহা স্থূল-অস্থি-যুক্ত স্তন্যপায়ী পশুদেহে পরিণত হয়। পশুদেহের ক্রমোন্নতি হইয়া তাহা বানরদেহে পরিণত হয়। বানরদেহের ক্রমোন্নতি হইয়া তাহা মানবদেহে পরিণত হয়। এইরূপে, জগতে যত প্রকারের জীবজন্তুর দেহ আছে, মানবদেহের উৎপত্তি তৎসমুদয়ের পরে হইয়াছে। ডারুইনের এই মতবাদ অসার এবং অসত্য, তাহা যুক্তি এবং প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে।

১। জড়বৈজ্ঞানিকগণও ইহা স্বীকার করেন যে, বিশ্বের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টির এবং স্থিতির ব্যাপার বিশ্বনিয়মের (Cosmic Laws) ক্রিয়ার দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই বিশ্বনিয়মসমূহ কেবল আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতের জন্যই নহে, এবং কোন এক সময়ের জন্য নহে। এই সকল নিয়ম সৃষ্টির সময় হইতেই কার্য্য করিতেছে এবং যতদিন বিশ্ব থাকিবে ততদিন কার্য্য করিবে। বিশাল বিশ্বের অসংখ্য

ব্রহ্মাণ্ডসমূহের মধ্যে কেবল যে আমাদের এই পৃথিবীতেই জীব আছে, তাহা নহে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহে অসংখ্য প্রকারের জীব আছে। সকল ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবেরই সৃষ্টি এবং স্থিতি বিশ্বনিয়মের ক্রিয়ার দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সকল ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রকার জীবের পরিচয় না জানিয়া এবং তাহাদের সৃষ্টি এবং স্থিতি বিষয়ক বিশ্বনিয়ম জ্ঞাত না হইয়া, কেবলমাত্র এই পৃথিবীর মাত্র কয়েকপ্রকার জীবদেহ দেখিয়া, এইরূপ একদেশী দৃষ্টির এবং চিন্তার দ্বারা বিশ্ববাসী জীবসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না। জীবদেহের উৎপত্তি বিষয়ে ডারুইনের মতবাদ একদেশী দৃষ্টির এবং চিন্তার কার্য্য; ইহার দ্বারা বিশ্ববাসী জীবসমূহের সৃষ্টির তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না এবং এইরূপ একদেশী মতবাদ যথার্থ তত্ত্ব হইতে পারে না।

২। জড়বৈজ্ঞানিকও স্বীকার করেন যে প্রাণীমাত্রেরই দেহের মধ্যে চেতনা আছে। এই চেতানাকে আত্মা (Soul), চেতন সত্ত্বা (Conscious Principle), অথবা চৈতন্য (Consciousness), যে নামই জড়বৈজ্ঞানিক দিন্ না কেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রাণীমাত্রেরই দেহ এই চেতনার সত্ত্বাতেই সচেতন, সপ্রাণ, এবং সক্রিয় হয়। চেতনার সত্ত্বা না জানিয়া অথবা না মানিয়া এবং দেহের উপর দেহস্থিত চেতনার প্রভাব কতখানি এবং ক্রিয়া কিরূপ, তাহা না জানিয়া এবং তৎসম্বন্ধে বিচার না করিয়া, কেবলমাত্র দেহের আকার-প্রকার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং কেবলমাত্র তৎসম্বন্ধেই বিচার করিয়া ডারুইন জীবদেহের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন। যে চেতনার দ্বারা দেহ সপ্রাণ, সচেতন, এবং সক্রিয় হয়, সেই চেতনাকে বাদ দিয়া কেবল জড়দেহের পর্য্যবেক্ষণ জীবসম্বন্ধীয় আংশিক পর্য্যবেক্ষণ মাত্র, এবং সেই চেতনাকে বাদ দিয়া কেবল জড়দেহের সম্বন্ধে বিচার জীবসম্বন্ধীয় আংশিক বিচার মাত্র। এইরূপ আংশিক পর্য্যবেক্ষণ এবং আংশিক বিচার ও গবেষণার দ্বারা জীবদেহের উৎপত্তিবিষয়ক তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। এই কারণেও ডারুইনের মতবাদ অসার এবং অসত্য।

৩। ডারুইন স্বীয় মতবাদ-গঠনের জন্য অসংখ্য প্রকার জীবের মধ্যে মাত্র কয়েকপ্রকার জঙ্গম জীবের দেহ সম্বন্ধেই পর্য্যবেক্ষণ এবং চিন্তা করিয়াছেন, সকল প্রকার জীবদেহের সম্বন্ধে করেন নাই। তৃণ গুল্ম বৃক্ষ লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জগণও প্রাণী; ইহারা স্থাবর হইলেও ইহারাও জীব। ডারুইন

উদ্ভিজ্জ নামক জীবসমূহের দেহোৎপত্তির সম্বন্ধে কোন পর্য্যবেক্ষণ এবং চিন্তা করেন নাই। বহু প্রকারের জঙ্গম জীবকে বাদ দিয়া এবং উদ্ভিজ্জজাতীয় জীবসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া জীবদেহের উৎপত্তির বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ এবং গবেষণা, এবং এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ এবং গবেষণার দ্বারা জীবোৎপত্তির তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। এই কারণেও ডারুইনের মতবাদ অসার এবং অসত্য।

৪। জড়বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারাও ইহা স্বীকৃত যে, সৃষ্টির এবং স্থিতির সকল কার্য্যপদ্ধতি বিশ্বনিয়মসমূহের দ্বারা অনুশাসিত, এবং এই সকল বিশ্বনিয়ম চিরকাল কার্য্যকারী আছে এবং থাকিবে। যদি বিশ্বনিয়মসমূহ চিরন্তন (eternal) না হইয়া অস্থায়ী এবং সাময়িক (temporary) হইত, তবে জড়বিজ্ঞান অস্থায়ী এবং সাময়িক বিজ্ঞানের শাস্ত্র হইত। এইরূপ বিজ্ঞান মূল্যহীন, এবং নির্ভরের অযোগ্য হইত। কিন্তু তাহা নহে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহগণের পরিভ্রমনের নিয়ম, দিবস-রাত্রির এবং গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুসমূহের পর্যায়ক্রমে আগমনের নিয়ম, ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি পঞ্চ ভূতের শক্তিসমূহের ক্রিয়ার নিয়ম প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের বিশ্ব নিয়ম চিরকালই কার্য্যকারী আছে। যদি এক প্রকার জীবদেহের অন্য প্রকার জীবদেহে পরিণত হওয়ার ফলে সেই জীবদেহের উৎপত্তি হওয়ার বিশ্বনিয়ম থাকিত, তাহা হইলে আজিও সেই নিয়মের কার্য্য হইতে দেখা যাইত, এবং আমরা দেখিতে পাইতাম যে বানরদেহ মানবদেহে পরিণত হইতেছে। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এখনও পর্য্যন্ত কেহ কখনও বানরদেহকে মানবদেহে পরিণত হইতে দেখে নাই। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, একপ্রকারের জীবদেহের অন্য-প্রকার জীবদেহে পরিণত হওয়ার কোন বিশ্বনিয়ম নাই। এই কারণেও ডারু-ইনের মতবাদ অসার এবং অসত্য।

৫। যখন হইতে প্রাণীজগতের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন হইতেই বিবিধ প্রকারের জলজন্তু, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, বানর, মানব এবং বৃক্ষলতাদিরও অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং উক্ত সর্ব্ববিধ প্রাণীরই স্ত্রীপুরুষের দেহসহ-যোগে ঠিক তজ্জাতীয় প্রাণীদেহের উৎপত্তিরও প্রমাণ পাওয়া যায়। নরনারীর সহযোগে নরনারীর দেহ, বানরবানরীর সহযোগে বানরবানরীদেহ, এমনকি অতি ক্ষুদ্রাকার কীটেরও স্ত্রীপুরুষের সহযোগে তজ্জাতীয় কীটদেহ উৎপন্ন হয়,

ইহাই প্রাণীজগতের ইতিহাস হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। উদ্ভিজ্জগণেরও পুংপরাগ এবং স্ত্রীপরাগের সহযোগে তত্তজ্জাতীয় ফল ও বীজের উৎপত্তি হয়। এই প্রমাণের বলে এই সিদ্ধান্তই হয় যে, সর্ব্বপ্রকারের প্রাণীদেহ তত্তৎ জাতীয় প্রাণীর স্ত্রীপুরুষের দেহ সহযোগেই উৎপন্ন হয়, ইহাই বিশ্বনিয়ম, কিন্তু একপ্রকারের প্রাণীদেহের অন্যপ্রকারের প্রাণীদেহে পরিণত হওয়া বিশ্বনিয়ম নহে। এইরূপ পরস্পরবিরোধী দুইটী বিশ্ব নিয়ম প্রাণীদেহের উৎপত্তির কার্য্যসাধনের নিমিত্ত থাকিতে পারে না, এবং ডারুইন-কথিত নিয়মের কার্য্য কখনও কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় নাই। এই কারণেও ডারুইনের মতবাদ অসার এবং অসত্য, এবং আমাদের শাস্ত্র বিশ্বসৃষ্টিকালেই সর্ব্বপ্রকারের জীবের স্ত্রীপুরুষের উৎপত্তির যে তত্ত্ব দিয়াছেন তাহাই অভ্রান্ত সত্য।

৬। যদি তুমি ডারুইনের মতবাদের সমর্থনে এইরূপ বল :—"জগতের জীবদেহসমূহের উৎপত্তির ব্যাপারে কোন বিশ্বনিয়ম নাই, উহা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র (a mere accident)",—তাহা হইলে তোমার এই যুক্তির খণ্ডনার্থে আমরা বলিব :—বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিব্যাপারের সমস্তই সুশৃঙ্খল, সুনিয়মিত, এবং সুনিয়ন্ত্রিত, কোন ব্যাপারই আকস্মিক নহে। প্রত্যেক প্রকারের জীবদেহে নিজ নিজ সুনির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তনীয় বৈশিষ্ট আছে। প্রত্যেক প্রকারের জীবদেহের গঠনে পরিকল্পনা, সুশৃঙ্খলা, সুনিয়ম, এবং সুসামঞ্জস্য আছে। এইরূপ দেহসমূহের উৎপত্তি একটা আকস্মিক ঘটনা হইতে পারে না, কারণ যেখানেই পরিকল্পনা, সুশৃঙ্খলা, এবং সুনিয়ম আছে, সেখানেই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, এবং ক্রিয়াশক্তির কার্য্য অবশ্যই আছে, এবং যেখানেই এই ত্রিবিধ শক্তির কার্য্য আছে, সেখানেই উক্ত ত্রিবিধ শক্তিবিশিষ্ট স্রষ্টাও অবশ্যই আছেন। আমরা জগতে দেখিতে পাই যে, উক্ত ত্রিবিধ শক্তি-বিশিষ্ট স্রষ্টার উদ্ভাবনা এবং ক্রিয়া ব্যতীত কোন যন্ত্রই সৃষ্ট হয় নাই। রেল, বায়ুযান, জলযান, মোটরযান প্রভৃতির এঞ্জিন, কারখানা সমূহের এঞ্জিন, প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া একটা ক্ষুদ্র হাতুড়ি পর্য্যন্ত মনুষ্যের দ্বারা উদ্ভাবিত এবং নির্ম্মিত হয়। এই সমস্ত যন্ত্র অপেক্ষা প্রাণীদেহমাত্রেই অধিক-তর জটিল যন্ত্র (intricate machine)। দেহযন্ত্রের কোন উদ্ভাবনকর্ত্তা এবং স্রষ্টা নাই, এইরূপ বলিলে তাহা বিপরীত ন্যায় (Perverse logic) হয়। সুতরাং, জগতের জীবদেহসমূহের উৎপত্তি আকস্মিক ঘটনা নহে ; ইহা অবশ্যই

স্থষ্টিপরিকল্পনা অনুসারে স্রষ্টার কার্য্য। অতএব, ডারুইনের মতবাদ অসার এবং অসত্য।

৭। যদি তুমি ডারুইনের মতবাদের সমর্থনে এইরূপ বল: "জগৎস্থষ্টির অব্যবহিত পরেই একপ্রকার প্রাণীদেহের অন্য প্রকার প্রাণীদেহে পরিণত হওয়ার একটী বিশ্বনিয়ম কিছুকালের জন্য কার্য্যকারী ছিল, এবং সেই নিয়মানুসারে ক্ষুদ্র জলজন্তুর দেহ ক্রমোন্নতির দ্বারা ক্রমে ক্রমে সরীস্থপ, পক্ষী, পশু, বানর, এবং মানবদেহে পরিণত হইয়াছিল; পরিণতির ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর হইতে ক্রমোন্নতির নিয়মের অবসান হইয়া স্ত্রীপুরুষসহযোগে দেহোৎপত্তি হইতেছে", তাহা হইলে তোমার এই উক্তির খণ্ডনার্থে আমরা বলিব: তোমার এই উক্তিতে যুক্তি নাই। তোমার উক্তি অনুসারে, যে ক্ষুদ্র জলজন্তুর দেহ ক্রমোন্নতির নিয়মের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জীবদেহে পরিণত হইয়াছিল, সেই জলজন্তুটী ক্রমোন্নতির ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও অবশ্যই ছিল। তোমার মতে বিশ্বনিয়ম যদি কিছুকালের জন্যও কার্য্যকারী ছিল, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে একজন নিয়ামক সেই নিয়মটীর স্থষ্টি করিয়াছিলেন, কারণ নিয়ম কখনও আপনাকে আপনি স্থষ্টি করিতে পারে না। স্বল্পকালস্থায়ী নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও নিয়ামকের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তুমি ডারুইনের মতবাদের সমর্থনে এই যে যুক্তি দিয়াছ, তদ্দ্বারাই স্বীকৃত হইতেছে যে সর্ব্বপ্রথম জলজন্তুটীর এবং ক্রমোন্নতির নিয়মেরও একজন স্রষ্টা ছিলেন। তোমার উক্তি হইতেই জীব জগতের একজন ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আবার, প্রথম স্থষ্ট জলজন্তু জানিত না যে, তাহার দেহটী ক্রমোন্নতির ফলে যে সরীস্থপদেহে পরিণত হইবে সেই সরীস্থপদেহ কিরূপ; সরীস্থপ জানিত না যে তাহার দেহটী ক্রমোন্নতির ফলে যে পক্ষীদেহে পরিণত হইবে, সেই পক্ষীদেহ কিরূপ; এইরূপে বানর পর্য্যন্ত সকলের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযুজ্য। অতএব, তর্কের খাতিরে তোমার এই মতকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যিনি প্রথম জলজন্তুর স্রষ্টা, তিনিই প্রথম জলজন্তুর স্থষ্টি করিবার পরে সরীস্থপ, পক্ষী, পশু, বানর, এবং মানবের দেহের পরিকল্পনা স্থির করিয়া প্রথম স্থষ্ট জলজন্তুর দেহকে ক্রমোন্নতির দ্বারা তত্তৎ দেহে পরিণত হইবার নিয়ম স্থষ্টি করিয়াছিলেন। আবার, প্রথমস্থষ্ট জলজন্তুর দেহ যদি পুরুষদেহ হইত, তাহা হইলে সেই

পুরুষদেহ তোমার কথিত নিয়মানুসারে পুরুষ সরীসৃপদেহেই পরিণত হইত, স্ত্রী সরীসৃপদেহে পরিণত হইত না। পরবর্ত্তী পক্ষী, পশু, বানর এবং মানব দেহ সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযুজ্য। যদি কেবল পুরুষদেহই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ক্রমোন্নতির ফলে মানবদেহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবার পর স্ত্রীদেহ এবং পুরুষদেহের সহযোগে দেহোৎপত্তির নিয়ম এবং কার্য্য সম্ভব হইত না। স্ত্রীপুরুষের দেহের সহযোগে দেহোৎপত্তির নিয়ম এবং কার্য্য যে রহিয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব তোমাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রথমস্থষ্ট জলজন্তুগুলির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ দেহই ছিল, এবং তাহাদের স্ত্রীদেহগুলি পরবর্ত্তী প্রাণীর স্ত্রীদেহে এবং পুরুষ-দেহগুলি পরবর্ত্তী প্রাণীর পুরুষদেহে পরিণত হইয়াছিল, এবং এইরূপেই মানবজাতিরও পুরুষ-স্ত্রী উভয়বিধ দেহই উৎপন্ন হইয়াছিল। তোমার উক্তি অনুসারে, এইরূপে সর্ব্ববিধ প্রাণীর স্ত্রীপুরুষ দেহগুলির উৎপত্তির পর ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে দেহোৎপত্তির কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতে স্ত্রীপুরুষের দেহসহযোগে দেহোৎপত্তি হইয়া আসিতেছে। এখন দেখ, ডারুইনের মতবাদের সমর্থনে তুমি যে উক্তি করিয়াছ, তাহার বিশ্লেষণের ফলে তুমি এই অবস্থায় আসিয়াছ ঃ—ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন একজন স্রষ্টা প্রথমে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়বিধ লিঙ্গযুক্ত একজাতীয় ক্ষুদ্র জলজন্তুর স্থষ্টি করিয়াছিলেন ; তাহাদের মধ্যে যখন স্ত্রী ও পুরুষ ছিল, তখন তাহাদের সহযোগে তাহাদের ন্যায় দেহের উৎপত্তি অবশ্যই হইতেছিল ; অতঃপর স্রষ্টা সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, বানর, এবং মানব দেহসমূহের পরিকল্পনা স্থির করিয়া নিয়ম করিলেন যে প্রথমস্থষ্ট পুরুষ জলজন্তুর দেহ পুরুষ সরীপ-দেহে এবং স্ত্রীজলজন্তুর দেহ স্ত্রী সরীসৃপদেহে পরিণত হইবে, এবং এইরূপে ক্রমোন্নতির দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী মানবদেহের উৎপত্তি হইবে ; এই নিয়মের কার্য্যকারীতায় মানব পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ প্রাণীর স্ত্রীপুরুষ দেহ উৎপন্ন হইল ; ইহার পর ক্রমোন্নতির নিয়মের অবসান হইল এবং স্ত্রীপুরুষসহযোগে দেহোৎ-পত্তির নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। ইহা বালকস্থলভ যুক্তি, তথাপি ইহার দ্বারা শাস্ত্রনিরূপিত স্থষ্টিতত্ত্বের মূল নীতি তুমি স্বীকার করিয়াছ। শাস্ত্রীয় স্থষ্টিতত্ত্বের মূল নীতি এই যে, পরমেশ্বর স্থষ্টির পরিকল্পনা স্থির করিয়া বেদে নাম ও রূপ বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, ব্রহ্মা সেই পরিকল্পনা অনুসারে

সর্ব্বপ্রকার জীবের স্ত্রীপুরুষ স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে স্ত্রীপুরুষের সহযোগে জীবদেহ উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রানুসারে, ব্রহ্মার দ্বারা বিশ্বস্থষ্টিকালেই সর্ব্বপ্রকার জীবের স্ত্রীপুরুষের দেহের উৎপত্তি এবং তখন হইতেই স্ত্রীপুরুষ দেহসহযোগে দেহোৎপত্তি বিশ্বনিয়ম। তোমার উক্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে যে, স্থষ্টিকালেই স্ত্রীপুরুষের সহযোগে দেহোৎপত্তির নিয়ম ছিল, কিন্তু কেবল একজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ জলজন্তুর স্থষ্টি প্রথমে হইয়াছিল, এবং ক্রমোন্নতির দ্বারা তাহাদের দেহ যখন সরীস্থপদেহে পরিণত হইল, তখন সরীস্থপগণেরও স্ত্রীপুরুষ সহযোগে দেহোৎপত্তি হইতে লাগিল, এবং ইহাদের পরবর্ত্তীগণেরও তদ্রূপ। স্থতরাং, তোমার উক্তি অনুসারেও, যুগপৎ ক্রমোন্নতির নিয়মে এবং স্ত্রীপুরুষসহযোগের নিয়মে দেহোৎপত্তি হইতেছিল। ইহা বালকস্থলভ যুক্তি। তোমার মতে স্থষ্টির পর জগতে মানব ছিল না, সর্ব্ববিধ প্রাণীর উৎপত্তির পর সর্ব্বশেষে জগতে মানব উৎপন্ন হইয়াছে। তোমার এই মতের পোষকতায় কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; ইহা তোমার কাল্পনিক অনুমান মাত্র; তোমার এই অনুমান সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। পক্ষান্তরে, যখন হইতে জগতের প্রাণীসমূহের অস্তিত্বের ইতিহাস পাওয়া যায়, তখন হইতেই জগতে মানবাদি সকল প্রাণীই আছে, ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং প্রাচীনতম ইতিহাস। বেদে প্রমাণ পাওয়া যায় যে জগতে প্রথম হইতেই মানব এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ প্রাণী ছিল। জগতে মানব ছিল না কিন্তু মানবেতর প্রাণী ছিল, ইহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। ডারুইন মৃত জীবদেহের কঙ্কালের সাদৃশ্য দেখিয়া এই মতবাদ গঠন করিয়াছেন, কিন্তু সকল জীবদেহের একই উপাদান বলিয়া সকল জীবের মধ্যে দেহগত সাদৃশ্য কিয়ৎ-পরিমাণে থাকিবেই; এইরূপ সাদৃশ্য ক্রমোন্নতির দ্বারা দেহোৎপত্তির এবং বানরদেহের মানবদেহে পরিণতির প্রমাণ নহে এবং হইতে পারে না। এইজন্য, ডারুইনের Missing Link চিরকাল Missing থাকিয়াই যাইবে। পুরুষস্ত্রীসংযোগে দেহোৎপত্তিই দেহোৎপত্তির বৈজ্ঞানিক প্রণালী। জগৎস্রষ্টা এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সর্ব্বপ্রকারের প্রাণীর দেহোৎপত্তির নিমিত্ত স্থষ্টির প্রারম্ভেই সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর স্ত্রীপুরুষদেহ স্থষ্টি করিয়াছিলেন।

আমরা দেখিলাম যে, ডারুইনের দ্বারা প্রবর্ত্তিত স্থষ্টিতত্ত্ব অসার এবং

অসত্য। উহা ডারুইনের কল্পনামাত্র। অনেক জড়বৈজ্ঞানিকও স্বীকার করিতেছেন যে ডারুইনের মতবাদ যথার্থ সৃষ্টিতত্ত্ব নহে। আমরা শাস্ত্রোল্লিখিত যে সৃষ্টি তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছি তাহাই যথার্থ সৃষ্টিতত্ত্ব। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানব বানরের বংশধর নহে।

১১।৮।২ শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে ডারুইনের মতের অনুবর্ত্তী করিবার বিফল চেষ্টা

ডারুইনের মতবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে কোন কোন ভারতীয় লেখক বলিয়াছেন যে ডারুইনের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্ব একই এবং ডারুইনের সৃষ্টিতত্ত্ব শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ। তাঁহাদের এই চেষ্টা বস্তুতঃ শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে ডারুইনের মতের অনুবর্ত্তী করিবার চেষ্টা। তাঁহারা বলেন, শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্ব ডারুইনের ক্রমোন্নতিবাদের সমর্থন করে। তাঁহাদের এই উক্তির পোষকতায় তাঁহারা যে দুইটী যুক্তির প্রয়োগ করেন, তাহার প্রথমটী এই :—শাস্ত্রে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, এবং নৃসিংহ অবতারের উল্লেখ আছে। এই অবতারগণের দেহ মনুষ্যদেহ নহে। যখন মৎস্য অবতার হইয়াছিলেন, তখন জগতে কেবল মৎস্যই ছিল। তৎপরে জগতে যখন কূর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল তখন কূর্ম্মাবতার, যখন বরাহের উৎপত্তি হইয়াছিল তখন বরাহাবতার, যখন জগতে নৃসিংহদেহবিশিষ্ট প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন নৃসিংহাবতার হইয়াছিলেন। ক্রমোন্নতির নিয়মে মৎস্যদেহ নৃসিংহদেহে পরিণত হইয়াছিল। নৃসিংহদেহ যখন উক্ত নিয়মে নরদেহে পরিণত হইয়াছিল তখন নরাবতার হইয়াছিলেন। সুতরাং, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ডারুইনকথিত ক্রমোন্নতি নামক মূলনীতি শাস্ত্রেও নিরূপিত হইয়াছে। এই যুক্তিটী অসার, তাহার কারণ :—এই যুক্তিতে কেবল মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ এবং নৃসিংহ অবতারচতুষ্টয়ের নামই শাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এতৎসম্পর্কে শাস্ত্রের অন্য বিবরণসমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র হইতে আংশিক বিবরণ লইয়া মতবাদ গঠন করিলে তাহা কখনই শাস্ত্রীয় তত্ত্ব হইতে পারে না। শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে উক্ত অবতারচতুষ্টয়ের আবির্ভাবকালে জগতে মনুষ্যাদি সর্ব্বপ্রকারের প্রাণীই ছিল এবং মনুষ্যের কল্যাণের নিমিত্ত বেদ এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব, প্রথম যুক্তিটী অসার। তাঁহাদের

দ্বিতীয় যুক্তিটী এই ঃ—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন যে জীব ৮২ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পরে মনুষ্যজন্মলাভ করে।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশলক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

এই শ্লোকের অর্থ ঃ—"২০ লক্ষ জন্ম বৃক্ষলতাদি স্থাবরদেহে, ৯ লক্ষ জন্ম মৎস্যাদি জলজন্তুদেহে, ৯ লক্ষ জন্ম কূর্ম্মদেহে, ১০ লক্ষ জন্ম পক্ষীদেহে, ৩০ লক্ষ জন্ম পশুদেহে এবং ৪ লক্ষ জন্ম বানরদেহে জন্মলাভ করিবার পর জীবাত্মা মনুষ্যদেহে জন্মলাভ করিয়া মোক্ষলাভের জন্য সাধনা করিতে পারে।" প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বৃক্ষাদি স্থাবরদেহ জলজন্তুর দেহে পরিণত হইয়া সেই জলজন্তুর দেহ ক্রমশঃ মানবদেহে পরিণত হইয়াছে, ইহা ডারুইনের মতবাদ নহে; তাঁহার মতে জলজন্তু প্রথম সৃষ্ট এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ মানবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্লোক স্থাবরদেহের ক্রমোন্নতির দ্বারা মানবদেহে পরিণতির তত্ত্ব প্রকাশ করে নাই; পরন্তু, এই শ্লোক উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, এবং জরায়ুজ ৮২ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রাণীগণের সমকালীন অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে। ইহা জীবদেহের ক্রমোন্নতিতত্ত্ব ঘোষণা করে নাই, জীবাত্মার ক্রমোন্নতিতত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছে। এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে যে, যে সকল জীবাত্মা স্থাবর বৃক্ষলতাদি দেহে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহারা ২০ লক্ষ জন্ম স্থাবর উদ্ভিজ্জদেহে থাকিবার পরে প্রথম যে জঙ্গমদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা অণ্ডজদেহ। মৎস্যাদি জলজন্তু, কূর্ম্ম, এবং পক্ষী, এই সমস্তগুলিই অণ্ডজ জঙ্গমদেহ। বহুলক্ষ জন্ম এই সকল অণ্ডজ জঙ্গমদেহে থাকিবার পরে সেই সকল দেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মাসমূহ জরায়ুজ জঙ্গমদেহ প্রাপ্ত হয়; ইহারও ক্রম এই ঃ—প্রথমে পশুদেহ, তৎপরে বানরদেহ, এবং অবশেষে মানবদেহ, অর্থাৎ নিম্নতম জরায়ুজ জঙ্গমদেহ হইতে ক্রমশঃ উচ্চতম জরায়ুজ জঙ্গম মানবের দেহ প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোক জানাইয়াছেন যে জীবাত্মা মানবদেহ প্রাপ্ত হইবার পরে মোক্ষলাভের জন্য সাধনা করিতে পারে। এই শ্লোক অনুসারে, জীবাত্মার এইরূপ ক্রমোন্নত প্রাণীদেহে জন্মলাভই জীবাত্মার ক্রমোন্নতি। জীবাত্মার এইরূপ ক্রমোন্নতির তত্ত্ব শ্রুতি এবং স্মৃতি সকল শাস্ত্রেই ঘোষিত

হইয়াছে। আবার, মানবদেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মা দুষ্কর্ম্মের ফলে নিম্নযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এই তত্ত্বও শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৮ স্থত্রে এবং গীতার ১৬।১৯-২০ শ্লোকদ্বয়ে এই তত্ত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে। স্থতরাং মানবদেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মার ক্রমাবনতিও হয়, ইহাও শাস্ত্র নিরূপিত তত্ত্ব। আমরা দেখিলাম যে, দ্বিতীয় যুক্তিটীও অসার। স্থাবরদেহে অবস্থিত একটী জীবাত্মার ৮২ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর মানবদেহ প্রাপ্ত হইতে যে সময় লাগে, তাহার হিসাব অনুসারেও ঐ যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হয়। ৮২ লক্ষ জীবদেহের মধ্যে অনেকগুলিই অতি দীর্ঘজীবী। অনেক প্রকারের মৎস্য আছে, যাহাদের পরমায়ু শতাধিক বৎসর। কুম্ভীর, হাঙ্গর, তিমি প্রভৃতি জলজন্তুর পরমায়ু ৩০০ হইতে ৫০০ বৎসর। কূর্ম্ম, শকুনি, কাক, বক প্রভৃতি প্রণীগণ দীর্ঘায়ুর জন্য বিখ্যাত। ইহাদের পরমায়ু ৫০০ বৎসর, এইরূপ কথিত হয়। স্থাররগণের মধ্যে অনেক প্রকারের বৃক্ষ ৫০০ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে। বিশ্বস্থষ্টির কালে যে স্থাবর দেহগুলির স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাসমূহের উক্তরূপ পরমায়ুযুক্ত ৮২ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানবদেহ প্রাপ্ত হইতে প্রায় তিনটী মন্বন্তর অতিবাহিত হইয়াছিল। যদি বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে জীবদেহের ক্রমোন্নতিতত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে বলা হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে যে জগৎস্থষ্টি হইবার পর হইতে প্রথম তিনটী মনুর দ্বারা শাসিত প্রথম তিনটী মন্বন্তরে জগতে মানব ছিল না। কিন্তু শাস্ত্র অতি স্থস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে জগৎস্থষ্টির পর প্রথম মন্বন্তর হইতেই জগতে মানবাদি সর্ব্বপ্রকারের জীব ছিল।

মন্বন্তরং মনুর্দ্দেবা মনুপুত্রাঃ স্থরেশ্বরাঃ।
ঋষয়োহংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে ॥ ভাগবত।১২।৭।১৫

—"মন্বন্তরের শাসনকর্ত্তা মনু, মানবগণ, দেবতা-সাধ্য-প্রজাপতি প্রভৃতি, স্থরগণ (=ঐশীশক্তির দ্বারা আবিষ্ট ব্যক্তিগণ), ঋষিগণ এবং হরির অংশাবতারগণ, এই ষড়্‌বর্গ যাহাতে স্ব স্ব অধিকারে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহাকে মন্বন্তর বলা হয়।" অতএব বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকদ্বয়ে দেহের ক্রমোন্নতিবাদ স্থাপিত হয় নাই, জীবাত্মার ক্রমোন্নতিতত্ত্ব স্থাপিত হইয়াছে। স্থষ্টির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রথম স্থষ্ট জীবগণের স্ত্রীপুরুষসহযোগে যে সকল নূতন জীবদেহের উৎপত্তি হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দেহে নিম্ন-

যোনি হইতে জীবাত্মার ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে ক্রমোন্নতিলব্ধ জীবাত্মা অনুপ্রবিষ্ট হয়, এবং তদতিরিক্ত দেহগুলিতে কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়। জীবাত্মার উন্নততর জীবদেহে জন্মলাভই উন্নততর জন্মলাভ। আমরা দেখিলাম যে, শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে ডারুইনের মতের অনুবর্ত্তী করিবার যে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বিফল চেষ্টা।

১১।৮।৩ আধুনিক ঐতিহাসিকের আদিমানবসম্বন্ধীয় ডারুইনের মতের অনুবর্ত্তী অনুমান অসত্য

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকে মানবজাতির ইতিহাসকে দুইটী যুগে বিভাগ করিয়াছেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং ঐতিহাসিক যুগ। যখন হইতে মানবজাতির ইতিহাস পাওয়া যায়, তখন হইতে তাঁহাদের ঐতিহাসিক যুগ। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মানবজাতির ইতিহাস পাওয়া যায় না বলিয়া উহাকে তাঁহারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলিয়াছেন। যদিও তাঁহাদের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবজাতির কোন ইতিহাস নাই, তথাপি তাঁহারা যে প্রমাণের উপর আদিমানবের সভ্যতার সম্বন্ধে তথ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত মানবনির্ম্মিত কয়েক প্রকারের বস্তু। সিন্ধুনদের উপত্যকায় মাহেঞ্জদাড়ো নামক স্থানে এবং পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা নামক স্থানে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ভূগর্ভ খনন করিয়া ভারতের সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীগণের দ্বারা নির্ম্মিত নগরীর ভগ্নাবশেষ এবং বহু প্রকারের দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণাপথ অঞ্চলদ্বয়ে ভূগর্ভ হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত বল্লম (Spear) তীর (arrow) এবং অন্য কয়েক প্রকারের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অমসৃণ এবং কতকগুলি মসৃণ। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, অমসৃণ প্রস্তরাস্ত্রসমূহ যাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা ভারতের আদিম অধিবাসী, তাহারা লৌহস্বর্ণাদি ধাতুর ব্যবহার জানিত না, বস্ত্রবয়ন এবং গৃহনির্ম্মাণ করিতে জানিত না, উলঙ্গ থাকিত, বনে বা পর্ব্বতগুহায় বাস করিত, এবং অপক্ক মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে এই অসভ্য মানবগণ আদি মানবজাতি, এবং অমসৃণ প্রস্তরাস্ত্রব্যবহারকারী এইরূপ অসভ্য মানবজাতির যুগকে তাঁহারা "প্রাচীন

প্রস্তরযুগ" (Palaeolithic Age) নাম দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন প্রস্তরযুগের অসভ্য মানব ক্রমে প্রস্তরনির্ম্মিত মসৃণ অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু লৌহাদি ধাতুর ব্যবহার জানিত না; ইহারা কৃষিকার্য্য এবং পশুপালন করিত। তাঁহারা এই যুগের নাম দিয়াছেন "নব্য প্রস্তরযুগ" (Neolithic Age)। তাঁহারা বলেন যে অতঃপর প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্গত নব্য প্রস্তরযুগের অসভ্য মানবগণ ক্রমশঃ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং লৌহাদি ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা করিয়া সভ্য মানবে পরিণত হইয়াছিল। আদি মানবজাতির সভ্যতার সম্বন্ধে ইহাই ডারুইনের মত। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকে ডারুইনের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগকে প্রাচীন প্রস্তরযুগ এবং নব্য প্রস্তরযুগে বিভাগ করিয়া আদি মানবজাতির সম্বন্ধে উক্তরূপ অনুমান করিয়াছেন। তাঁহাদের এই অনুমানের সহিত শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিরোধ হইতেছে; এইজন্য এই অনুমানটী যথার্থ তত্ত্ব কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা বিশেষ প্রয়োজন। শাস্ত্র অনুসারে জগৎসৃষ্টির পরেই সত্যযুগ এবং সত্যযুগের মানব উন্নততম মানব, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ঐ সকল অমসৃণ এবং মসৃণ প্রস্তরাস্ত্র এখন হইতে কত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিকগণ সঠিক বলেন নাই এবং বলিতে পারেনও না। আদি মানব ঐ সকল অস্ত্র ব্যবহার করিত এবং তাহারা অসভ্য ছিল ইহা তাঁহাদের নিছক অনুমান মাত্র। কিন্তু মাহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার তাঁহাদের এই অনুমানকে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। মাহেঞ্জোদাড়োর ভূগর্ভ হইতে যে প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সাধারণ স্নানাগার, উপাসনামন্দির প্রভৃতি আছে, তাম্র এবং স্বর্ণ-নির্ম্মিত অলঙ্কার এবং অন্য নানাবিধ বস্তু আছে, লিপিযুক্ত শীলমোহর আছে, কারুকার্য্যখচিত নানারূপ দ্রব্য আছে, যোগাসনে উপবিষ্ট প্রস্তরনির্ম্মিত যোগীমূর্ত্তি এবং উপবীতধারী ব্যক্তির চিত্রও আছে। উপবীতধারণ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে তৎকালীন মানব বৈদিক ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেন, এবং যোগাসনে উপবেশন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে তৎকালীন মানব বৈদান্তিক অধ্যাত্মযোগসাধনা করিতেন। মাহেঞ্জোদাড়োর এই আবিষ্কার প্রাচীন মানবের বাক্য, কার্য্য এবং চিন্তাধারার আবিষ্কার এবং এতদ্দ্বারাই প্রাচীন

ইতিহাস পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তির (ancient relics) পর্য্যবেক্ষণ এবং গবেষণা করিয়া বলেন যে মাহেঞ্জোদাড়োর ভূগর্ভস্থ নগর এখন হইতে ন্যূনকল্পে পঞ্চদশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, এই নগরের অধিবাসীগণ বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিত, ইহাদের সভ্যতা অতীব উচ্চস্তরের ছিল এবং তাহা বৈদিক সভ্যতা। এই সভ্যতা পঞ্চদশ সহস্র বৎসরের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল; মাহেঞ্জোদাড়োর নগর সেই বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত বৈদিক সভ্যতার একটী পরবর্ত্তী বাস্তব রূপ। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের বয়স মাত্র চারি হাজার বৎসর বলিয়া যে অনুমান করিয়াছিলেন, মাহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার তাঁহাদের সেই অনুমানকে সম্পূর্ণ মিথ্যায় পরিণত করিয়াছে, কারণ বেদ মাহেঞ্জোদাড়োর ভূগর্ভস্থ নগরেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। মাহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত প্রাচীন বস্তুগুলির সহিত মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের অন্তর্গত ব্যাবিলন, নেনিভা, কিস্, লাগাস্, সুসা, উর, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থানের ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন বস্তুসমূহের তুলনামূলক পরীক্ষা এবং গবেষণার দ্বারা পণ্ডিতগণ ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের প্রাচীন মানবই আদি সভ্য আর্য্যজাতি, মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে ইহারই শাখা-প্রশাখা গিয়া বাস করিয়াছিল, এবং ঐ সকল স্থানের সভ্যতা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতার বিস্তার। মাহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত যে সকল অমসৃণ এবং মসৃণ প্রস্তরাস্ত্র দেখিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়াছিলেন যে ঐ সকল অস্ত্রের ব্যবহারকারীগণ আদি মানব ছিল, তাঁহারা বলেন নাই এবং বলিতেও পারেন না যে ঐ সকল প্রস্তরাস্ত্র পঞ্চদশ সহস্র বৎর পূর্ব্বে, অর্থাৎ মাহেঞ্জোদাড়োর প্রাচীন সভ্যযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধিকন্তু, প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহার করিলেই যে মানবকে আদি মানব এবং অসভ্য, উলঙ্গ, এবং বনবাসী মানব হইতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, কারণ মাহেঞ্জোদেড়োর ভগ্নাবশেষের মধ্যে স্বর্ণাদি ধাতুনির্ম্মিত বিবিধ প্রকারের বস্তুর সহিত প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রও পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে সেই প্রাচীন নগরের স্বর্ণাদি ধাতুর ব্যবহারজ্ঞ সুসভ্য মানবগণও প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহার করিতেন। আধুনিক কালের মানবগণও প্রস্তরনির্ম্মিত বহুবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবহার করেন। ইহা হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে প্রস্তরাস্ত্র

ব্যবহার করিলেই মানব আদি ও অসভ্য মানব হইয়া যায় না। বেদে লৌহের উল্লেখ আছে; সুতরাং মাহেঞ্জোদাড়োর সুসভ্য যুগে লৌহের ব্যবহারও নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য দীর্ঘকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিলে ক্ষয় পাইয়া (Corrode করিয়া) মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যায় বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন স্থানের ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত দ্রব্য সমূহের মধ্যে লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। আমরা দেখিলাম যে, মাহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার ডারুইনের মতের অনুবর্ত্তী পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণের অনুমানকে অসত্যে পরিণত করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে আদি মানবজাতি সম্বন্ধে যে তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছি, মাহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার সেই তত্ত্বকেই প্রমাণিত করিয়াছে। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন কালের মানবগণের বাক্য, কার্য্য এবং চিন্তাধারার ইতিহাস আবিষ্কার করিতে পারিলে তাঁহাদের ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে, নতুবা নহে। ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন মানবগণের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল (Fossil) তাঁহাদের দেহের আয়তনের পরিচয়মাত্র দিতে পারিবে, কিন্তু তাঁহাদের ইতিহাস দিতে পারিবে না। Fossil-এর ভিত্তিতে ইতিহাস গড়িলে ইতিহাসও fossilised হইয়া গিয়া সত্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রলয়

১১।৯।১ বাহ্যপ্রকাশহীন স্থিতি

প্রলয়ের অর্থ অস্তিত্বহীনতা নহে; প্রলয়ের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে লীনতা। আদিম সৃষ্টির পর হইতে বিশ্বের ধ্বংস অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা নাই; সৃষ্টির অনন্ত প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে এবং চলিতে থাকিবে। বিশ্ব যতদিন স্বীয় কারণের কার্য্যরূপে অবস্থিত থাকে ততদিন তাহার বাহ্য প্রকাশ থাকে; যতদিন বাহ্য প্রকাশ থাকে, ততদিন বিশ্বের স্থিতিকাল বলা হয়। এই স্থিতিকালের অর্থ বাহ্যপ্রকাশ স্থিতিকাল। বিশ্ব যখন স্বীয় কারণে লীন হয়, তখন বিশ্বের বাহ্যপ্রকাশ স্থিতি থাকে না, কিন্তু বাহ্যপ্রকাশহীন স্থিতি থাকে। বিশ্বের

এইরূপ কারণে লীন বাহ্যপ্রকাশহীন স্থিতি তাহার প্রলয়। স্থিতিকালের স্থিতি এবং প্রলয়কালের স্থিতি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও, প্রলয়কালেও বিশ্বের স্থিতি থাকে, এইজন্য প্রলয় সৃষ্টিলীলার অন্তর্গত ঘটনা। সৃষ্টিতত্ত্ব সমগ্ররূপে জানিতে হইলে প্রলয়তত্ত্বটীও জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য আমরা প্রলয়ের তত্ত্বটী বিবৃত করিতেছি।

১১।৯।২ দেহের এবং জীবাত্মার বাহ্য প্রকাশ

নামরূপাকারে অভিব্যক্ত অবস্থায় প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া স্থিতিই বাহ্যপ্রকাশ স্থিতি। ত্রিগুণময় দেহমাত্রের এইরূপ বাহ্য প্রকাশ আছে। দেহসমূহের যেরূপ বাহ্য প্রকাশ আছে, জীবাত্মাসমূহের তদ্রূপ বাহ্য প্রকাশ নাই, কিন্তু তাহাদেরও অন্য প্রকারের বাহ্য প্রকাশ আছে। জীবাত্মার জ্ঞানশক্তির ক্রিয়ায় দেহের দর্শন-শ্রবণাদি কার্য্য, এবং হ্লাদিনীশক্তির ক্রিয়ায় দেহের স্নেহ-প্রণয়-শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতির প্রকাশক কার্য্য জীবাত্মার বাহ্য প্রকাশ। জীবাত্মার এইরূপ বাহ্য প্রকাশের দ্বারা দেহে জীবাত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধ হয়। আমরা পাইলাম যে, দেহের বাহ্য প্রকাশ এবং জীবাত্মার বাহ্য প্রকাশ একই রূপ নহে, কিন্তু জীবাত্মারও বাহ্য প্রকাশ আছে।

১১।৯।৩ দেহের এবং জীবাত্মার বাহ্যপ্রকাশহীন অবস্থা

আমরা বলিয়াছি যে, বিশ্বের বাহ্যপ্রকাশহীন স্থিতিই বিশ্বের প্রলয়। ত্রিগুণময় জড়দেহ এবং জড়দেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মা, এই উভয়েরই প্রলয়ে বাহ্যপ্রকাশহীন স্থিতি হয়। ইহাদের বাহ্য প্রকাশ ভিন্ন প্রকারের; ইহাদের বাহ্যপ্রকাশহীনতাপ্রাপ্তিও ভিন্ন প্রকারের। ত্রিগুণময় দেহ স্বীয় কারণ মায়াশক্তিতে লীন হইয়া বাহ্যপ্রকাশহীন হয়। জীবাত্মা পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা নহে; ইহা চিদানন্দের আংশিক প্রকাশ এবং প্রলয়ে চিদানন্দে লীনতা প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যপ্রকাশহীন হয়। দেহ এবং জীবাত্মা কিরূপে লীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহা নিম্নে প্রলয়ের প্রকারভেদ বর্ণনার প্রসঙ্গে বিবৃত হইবে।

১১।৯।৪ নৈমিত্তিক প্রলয়ঃ দীর্ঘতর সুষুপ্তি

প্রলয় চতুর্ব্বিধ, (১) নৈমিত্তিক (২) প্রাকৃতিক (৩) আত্যন্তিক এবং (৪)

নিত্য প্রলয়। প্রথমে আমরা নৈমিত্তিক প্রলয়ের বিষয় বিবৃত করিতেছি। ব্রহ্মার দিবসের এবং রাত্রির পরিমাণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্রহ্মার একটী দিবসের অন্তে যে প্রলয় হয় তাহাই নৈমিত্তিক প্রলয়। এই প্রলয়ে কারণাব্ধি (প্রকৃতি) এবং কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ, গর্ভোদক (সমষ্টি লিঙ্গদেহ) এবং গর্ভোদকশায়ী পুরুষ, ক্ষীরোদধি এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ, ক্ষীরোদধির শীর্ষে অবস্থিত ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্মা বিদ্যমান থাকেন। বিশ্বের সকল সৌরমণ্ডল এবং সকল সৌরমণ্ডলের অধিবাসী সমুদয় স্থাবর ও জঙ্গমের স্থূলদেহসমূহ তাহাদের অব্যবহিত কারণ ক্ষীরোদধিতে লীন হইয়া যায়, এবং তাহাদের লিঙ্গদেহসমূহ সমষ্টিলিঙ্গদেহে লীন হয়। সূর্য্যে অধিষ্ঠিত আদিত্যপুরুষ, বিশ্বে ব্যাপ্ত প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা, এবং সকল জীবাত্মা ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষরূপী কৃষ্ণের চিদানন্দে লীন হইয়া যায়। ব্রহ্মার দিবসান্তে এই প্রলয় হয় এবং তাঁহার রাত্রিকাল ব্যাপিয়া এই প্রলয় থাকে। রাত্রির অবসানে পূর্ব্বদিবসের বিশ্বের পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ২।৩।৪ সংখ্যক শ্লোকত্রয়ে, গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৭।১৮।১৯ সংখ্যক শ্লোকত্রয়ে, এবং ব্রহ্মসূত্রের ১।৩।৩০ সূত্রে বিশ্বের এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রলয় এবং পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের তত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে। প্রলয়ের এবং সুষুপ্তাবস্থার সৃষ্টির উদ্দেশ্য একই। সুষুপ্তিতে জীবাত্মা বামনরূপী কৃষ্ণে প্রলীন হইয়া যায় না, সবিকল্প স্থিতিতে আনন্দ সম্ভোগ করে; প্রলয়ে জীবাত্মা তৃতীয় পুরুষরূপী কৃষ্ণে প্রলীন হইয়া যায়; তাহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না; এইজন্য প্রলয়ে জীবাত্মা আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু সুষুপ্তিতে জীবাত্মা যেমন মায়াময় দ্বন্দ্বলীলার সকল দুঃখ হইতে অব্যাহতিও পায়, প্রলয়ে প্রলীন জীবাত্মা তদ্রূপ মায়াময় সংসারের সকল দুঃখ হইতে দীর্ঘকালের জন্য অব্যাহতি পায়। সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা যেমন সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত অবস্থায় থাকে, প্রলয়কালেও তদ্রূপ। সুষুপ্তির পরে জাগ্রত অবস্থায় জীবাত্মা যেমন পূর্ব্বসংস্কার প্রাপ্ত হয়, প্রলয়ান্তে পুনরাবর্ত্তনের পরেও জীবাত্মাসমূহ তদ্রূপ প্রলয়পূর্ব্বের সংস্কার প্রাপ্ত হয়। সুষুপ্তির সহিত প্রলয়ের এই সকল সাদৃশ্য থাকায় আমরা নৈমিত্তিক প্রলয়কে দীর্ঘতর সুষুপ্তি এবং প্রাকৃতিক প্রলয়কে দীর্ঘতম সুষুপ্তি বলিয়াছি। জীবাত্মাসমূহকে দীর্ঘকালের জন্য সংসার দুঃখ হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য কৃষ্ণ প্রলয় নামক দীর্ঘকালব্যাপী সুষুপ্তির ব্যবস্থা

করিয়াছেন। জীবের সংসারপ্রবাহ চলিতেছেই; প্রলয়ের ব্যবস্থা মধ্যে মধ্যে অব্যাহতিদানের ব্যবস্থা।

১১।৭।৫ প্রাকৃতিক প্রলয়ঃ দীর্ঘতম সুষুপ্তি

ব্রহ্মার অহোরাত্রের পরিমাণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐরূপ ৩০ অহোরাত্রে মাস এবং ১২ মাসে বৎসর ধরিয়া ১০০ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে যে প্রলয় হয়, তাহার নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় স্থাবরজঙ্গম সহ সমগ্র বিশ্ব, সমস্তই কৃষ্ণে প্রলীন হইয়া যায়। যাহা কিছু তাঁহার মায়াশক্তির পরিণাম, অর্থাৎ প্রকৃতি (কারণাব্ধি), গর্ভোদক (সমষ্টিলিঙ্গদেহ), ক্ষীরোদধি, স্থাবরজঙ্গমসহ বিশ্ব, সমস্তই তাঁহার মায়াশক্তিতে প্রলীন হইয়া যায়, এবং কারণাব্ধিশায়ী প্রথম পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ, ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ, আদিত্যপুরুষ, পরমাত্মা, জীবাত্মা প্রভৃতি যাহা কিছু কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ, তৎসমুদয় তাঁহার চিদানন্দে প্রলীন হইয়া যায়। এই প্রলয়ে ব্রহ্মাও স্বীয় কারণে প্রলীন হইয়া যান। তখন বিশ্বাকাশ এবং বিশ্ব সবই কৃষ্ণে প্রলীন হইয়া যাওয়ায় যে স্থানে বিশ্ব এবং বিশ্বাকাশ অবস্থিত ছিল তাহা শূন্য হইয়া যায়। কৃষ্ণ বিশ্বের পরমকারণ এবং আশ্রয় বলিয়া প্রকৃতির প্রলয়ের পর তিনি বিদ্যমান থাকেন।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যতে সোহস্ম্যহম্॥ ভাগবত ২।৯।৩২

কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম। তখন প্রকৃতি আমাতে বিলীন ছিল বলিয়া কোন সূক্ষ্ম অথবা স্থূল পদার্থ ছিল না। সৃষ্টির পর যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহাও আমি। প্রলয়ের পর আমিই অবশিষ্ট থাকিব।" প্রাকৃতিক প্রলয়ে একটী সর্গের অবসান হইলে কতকাল বিশ্ব কৃষ্ণে প্রলীন থাকিবার পর আবার নূতন সর্গারম্ভ হয়, তাহা শাস্ত্রে প্রকাশিত নাই, কারণ প্রকৃতির উৎপত্তি হইতে কালের আরম্ভ হয় এবং প্রকৃতির প্রলয়ে কালও থাকে না। আমরা যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছি, নূতন সর্গারম্ভে আবার ঠিক সেই ধারা (Process) অনুসারে বিশ্বের উৎপত্তি হয়। আদিম সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর এইরূপ কত সর্গ আসিয়াছে এবং গিয়াছে তাহা বলিবার সাধ্য কাহারও নাই। অনাদি কাল হইতে এই সৃষ্টি প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে বলিয়া

গীতা (১৩।১৯) প্রকৃতি এবং পুরুষকে অনাদি বলিয়াছেন। প্রকৃত্যাদি যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিশ্বের সকল ক্ষেত্রের (দেহের) উপাদান, প্রলয়কালে কৃষ্ণে প্রলীনতার অবস্থায় তাহাদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না, কেবল মায়াশক্তিমাত্ররূপে অবস্থান করে। এইজন্য, প্রাকৃতিক প্রলয়ে বিশ্ব তাঁহাতে প্রলীন হইলেও তাঁহার মধ্যে ত্রিগুণ থাকে না, এবং ত্রিগুণ না থাকায় ত্রিগুণময় বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয়গণ এবং তাহাদের বাসনা সংস্কারও তাঁহার মধ্যে থাকে না। প্রাকৃতিক প্রলয়ে কৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বের এইরূপ পরিস্থিতি শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে।

ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ত্বং তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী।
ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়দেবতা বা ন সন্নিবেশঃ খলু লোককল্পঃ॥
ন স্বপ্নজাগ্রন্ন চ তৎ সুষুপ্তং ন খং ন জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ।
সংসুপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং তন্মূলভূতং পদমামনন্তি॥
লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা।
শক্তয়ঃ সম্প্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ॥ ভাগবত। ১২।৪।২০-২২

—"কৃষ্ণ পরাতত্ত্ব এবং পরব্রহ্ম; তাঁহার মধ্যে বাক্য, মন, সত্ত্বরজস্তমোগুণ, মহত্তত্ত্বাদি, প্রাণবায়ু, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বর্গ, দেবতাগণ, অথবা ব্রহ্মাণ্ডগণের অবস্থিতি হয় না। তাঁহার মধ্যে স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি, আকাশ, জল, মৃত্তিকা, অগ্নি, সূর্য্য থাকে না। সুষুপ্তি এবং শূন্য যেমন তর্কের দ্বারা প্রতিপাদ্য নহে, তাঁহার মধ্যে বিশ্বের এইরূপ অবস্থিতিও তদ্রূপ তর্কের দ্বারা প্রতিপাদ্য নহে। বেদসমূহ তাঁহাকে মূলভূত স্থান বলিয়া নিরূপণ করেন। যখন কালের প্রভাবে অবশভাবে প্রকৃতি-পুরুষাদি শক্তিসমূহ তাঁহার মধ্যে এইরূপে সম্যক্ প্রলীন হয়, তখন তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় বলা হয়।" প্রাকৃতিক প্রলয়ের অবসানে পুনরাগত নূতন সর্গে পূর্ব্ববর্ত্তী সর্গের জীবগণ সুষুপ্তিভঙ্গের পর জাগরণের ন্যায়, নিজ নিজ সংস্কার এবং কর্ম্মফল সহ ক্রমে ক্রমে পুনরাবর্ত্তিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রলয় প্রাকৃত বিশ্বেরই হয়, অপ্রাকৃত পরব্যোম এবং তত্রত্য অপ্রাকৃত গোলকবৈকুণ্ঠধামসমূহের প্রলয় নাই।

১১।৯।৬ আত্যন্তিক প্রলয়

আত্যন্তিক প্রলয়টী সমগ্র বিশ্বের অথবা বিশ্বের অন্তর্গত কোন একটী সূর্য্য-মণ্ডলের কিম্বা কোন একটী ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় নহে। ইহা ব্যক্তিগত প্রলয়।

জীব অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা মায়ামুক্ত হইলে সাযুজ্য সারূপ্যাদি মুক্তি লাভ করে। যে জীব মুক্তি লাভ করে, তাহার স্থূলদেহ তৎকারণে লীন হইয়া যায়, সূক্ষ্মদেহ তৎকারণে প্রলীন হয়, এবং সাযুজ্য মুক্তি লাভ হইলে তাহার জীবাত্মা কৃষ্ণের চিদানন্দে বিলীন হইয়া যায়; সারূপ্যাদি মুক্তি লাভ হইলে তাহার জীবাত্মা দাস্য-সখ্যাদি ভাবানুসারে বৈকুণ্ঠের অথবা গোলোকের নিত্যলীলা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ মুক্ত আত্মাকে আর কখনও প্রাকৃত বিশ্বের কোন ব্রহ্মাণ্ডেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বেদান্ত, ব্রহ্মসূত্র, গীতা, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে ঐরূপ মুক্ত আত্মাকে আর কখনও সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে।" ছান্দোগ্য। ৪।১৫।৫—"মুক্ত আত্মা দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে তাঁহাকে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না (দৃঢ়তার জন্য দুইবার উক্তি।" "মুক্ত প্রতিজ্ঞানাৎ।" ব্রহ্মসূত্র। ৪।৪।২ "অনাবৃত্তি শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ।" ব্রহ্মসূত্র। ৪।৪।২২—"বেদান্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে, অধ্যাত্মযোগসাধনার ফলে জীবাত্মা মুক্ত হয় এবং মুক্ত আত্মার কখনই সংসারে পুনর্জন্ম হয় না, পুনর্জন্ম হয় না (দৃঢ়তার জন্য দুইবার)।"

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ গীতা। ৮।১৬

কৃষ্ণ বলিতেছেন, "হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মার লোক হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর-জঙ্গমসহ সকল ব্রহ্মাণ্ডগণের পুনরাবর্ত্তন হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না"। জীবাত্মার এইরূপ পুনরাবর্ত্তনহীন মুক্তিলাভকে শাস্ত্রে আত্যন্তিক প্রলয় বলা হইয়াছে। নৈমিত্তিক প্রলয়ের পরে নূতন কল্পে এবং প্রাকৃতিক প্রলয়ের পরে নূতন সর্গেও জীবাত্মাকে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়; এই দ্বিবিধ প্রলয়েও জীবের সংসারগতির অবসান হয় না; এইজন্য এই দ্বিবিধ প্রলয় আত্যন্তিক প্রলয় নহে। মুক্তিতে জীবাত্মার সংসারগতির চিরন্তন অবসান ঘটে বলিয়া মুক্তি আত্যন্তিক প্রলয়।

যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্।
ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবম্ ॥ ভাগবত ১২।৪।৩৪

—"যখন জীব স্বীয় স্বরূপজ্ঞান এবং পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া মায়াময় অহঙ্কাররূপ বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে

প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে স্থিতিলাভ করে, তখন তাহার সেই মুক্তিকে আত্যন্তিক প্রলয় বলা হয়।"

১১।৯।৭ নিত্য প্রলয়

সর্ব্ববিধ স্থাবরজঙ্গমের দেহের নিত্যই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে সকল জীবের দেহের বহু প্রকারের পরিবর্ত্তন হয়। শৈশব, বাল্য, পৌগণ্ড, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্দ্ধক্য এই সকল বয়সের প্রভেদানুসারে সকল দেহের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা ক্রমশঃ এমন ধীরে ধীরে হয় যে দেহের নিত্য পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ অলক্ষ্যণীয় নিত্যপরিবর্ত্তনের ফলে শৈশবদেহ ক্রমশঃ বাল্যদেহে, বাল্যদেহ ক্রমশঃ পৌগণ্ড দেহে, পৌগণ্ডদেহ ক্রমশঃ কৌমারদেহে, কৌমারদেহ ক্রমশঃ কৈশোরদেহে, কৈশোরদেহ ক্রমশঃ যৌবনদেহে, যৌবনদেহ ক্রমশঃ প্রৌঢ়দেহে, এবং প্রৌঢ়দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধদেহে পরিণত হইলে পর বৃদ্ধদেহের জরা এবং মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; মৃত্যুর পর সেই দেহ আবার অন্য রূপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে, পূর্ব্বদিনের দেহে যে অবস্থা ছিল, পরদিনে ঠিক সেই অবস্থাই থাকে না; পূর্ব্বদিনের অবস্থার প্রলয় ঘটিয়া পরদিনের নূতন অবস্থার উৎপত্তি হয়। দেহের অবস্থার এইরূপ নিত্য পরিবর্ত্তনকে শাস্ত্রে নিত্য প্রলয় বলা হইয়াছে।

কালস্রোতোজবেনাশু হ্রিয়মাণস্য নিত্যদা।
পরিণামিনামবস্থাস্তা জন্মপ্রলয়হেতবঃ॥
অনাদ্যন্তবতানেন কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা।
অবস্থা নৈব দৃশ্যন্তে বিয়তি জ্যোতিষামিব॥ ভাগবত ১২।৪।৩৬-৩৭

—"কালের বেগে হ্রিয়মাণ (=যাহাদের আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে), এবং পরিবর্ত্তনশীল দেহসমূহের সেই সকল অবস্থা (=জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং মৃত্যুর পর রূপান্তরগ্রহণ) নিত্য প্রলয় এবং উৎপত্তির হেতু। আকাশে জ্যোতিষ্কগণের সঞ্চরণ যেমন চক্ষে দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ, ঈশ্বরের শক্তিভূত অনাদি এবং অনন্ত কালের দ্বারা সাধিত এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা দৃষ্ট হয় না।" ইহাই নিত্য প্রলয়। কালের বেগে হ্রিয়মাণ দেহ বলিতে কেবল জীবসমূহের দেহকেই সূচিত করা হয় হয় নাই, ব্রহ্মাণ্ডদেহ সমূহকেও সূচিত করা হইয়াছে। অসীম বিশ্বের মধ্যে কোন-না-কোন ব্রহ্মাণ্ডের অথবা সৌরমণ্ডলের

মৃত্যু হইতেছে। এইরূপ খণ্ডপ্রলয়ও নিত্যপ্রলয়। যে ব্রহ্মাণ্ডের বা সৌরমণ্ডলের প্রলয় হইতেছে, তাহার স্থানে নূতন ব্রহ্মাণ্ড বা সৌরমণ্ডল জন্মলাভ করিতেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চারি যুগের যে পুনরাবর্ত্তন হইতে থাকে, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগটীর প্রলয়ের পর পরবর্ত্তী যুগটীর পুনরাবর্ত্তন, যথা: কলিযুগের প্রলয়ান্তে সত্যযুগের পুনরাগমন। এইরূপ যুগপ্রলয়ও নিত্যপ্রলয়ের অন্তর্গত। এইরূপ যুগপ্রলয় মহালোকক্ষয়কারী বিপ্লব এবং যুদ্ধের দ্বারা সংঘটিত হয়।

১১।৭।৮ নিত্যপ্রলয়ের তত্ত্ব ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ নহে

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ একটী মতবাদের নাম। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বলেন, জগতের সকল বস্তুরই স্থিতিকাল এক ক্ষণ মাত্র, এবং ক্ষণমাত্র স্থিতির পরেই সকল বস্তু ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। তাঁহার এই মতবাদের পোষকতায় ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী প্রদীপশিখার এবং নদীপ্রবাহের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। প্রদীপের শিখার দিকে চাহিয়া থাকিলে মনে হয় এক এবং অপরিবর্ত্তনশীল শিখাই সর্ব্বক্ষণ দেখা যাইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; প্রতিক্ষণের শিখা ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে এবং পরক্ষণেই নূতন শিখার উৎপত্তি হইতেছে। নদীপ্রবাহের দিকে চাহিয়া থাকিলে মনে হয় এক এবং অপরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ সর্ব্বক্ষণ দেখা যাইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; প্রতিক্ষণের প্রবাহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং পরক্ষণেই নূতন প্রবাহ তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছে। তদ্রূপ, দেহমাত্র-কেই দেখিলে মনে হয় যেন একই দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; প্রতিক্ষণের দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং পরক্ষণের নূতন দেহের উৎপত্তি হইতেছে। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী আরও বলেন যে, দেহের ন্যায় আত্মাও ক্ষণস্থায়ী বস্তু। দেহের মধ্যে প্রতিক্ষণেই নদীপ্রবাহের ন্যায় "আমি, আমি" এইরূপ জ্ঞানপ্রবাহ চলিতেছে; এই জ্ঞানপ্রবাহই আত্মা; এতদ্ভিন্ন আত্মা নামক নিত্যস্থিতিশীল অন্য কোন বস্তু নাই। দেহকে যেমন নদীপ্রবাহের ন্যায় অথবা প্রদীপশিখার ন্যায় একই এবং অপরিবর্ত্তনশীল স্থায়ী বস্তু বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ দেহাভ্যন্তরস্থ "আমি আমি" রূপ জ্ঞানপ্রবাহ প্রতিক্ষণে ধ্বংসশীল হইলেও এক এবং অপরিবর্ত্তনশীল স্থায়ী আত্মা বলিয়া মনে হয়। দেহের প্রবাহ "আমি আমি" রূপ জ্ঞানপ্রবাহকে স্বীয় ভাবে প্রভাবিত করে

বলিয়া এই জ্ঞানপ্রবাহ দেহাদি বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। ইহাই ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদকে অসার এবং অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। দেহ এবং আত্মা, এই উভয় বস্তু সম্বন্ধেই ক্ষণিকবিজ্ঞান-বাদীর মত অসার এবং অসত্য। একটী দেহ একক্ষণ থাকিয়া ধ্বংস হইয়া যাইতেছে এবং পরক্ষণেই অন্য একটী নূতন দেহ তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছে, এই মত তত্ত্বতঃ সত্য নহে এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অনুসারেও সত্য নহে। সাংখ্যদর্শন ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের আত্মা সম্বন্ধে মতকেও যে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। "ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ।" সাংখ্যসূত্র ১।৩৫।—"ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংসশীল "আমি আমি" জ্ঞানপ্রবাহ যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে মানবাদি কোন জীবেরই প্রত্যভিজ্ঞা থাকিত না। পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান এবং স্মৃতিকে প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়। মানবাদি জীবগণের প্রত্যভিজ্ঞা আছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংসশীল "আমি আমি" জ্ঞানপ্রবাহ যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে মানবের দেহাভ্যন্তরস্থ যে "আমি আমি" জ্ঞানপ্রবাহ দুই-চারি বৎসর, অথবা দুই-চারি দিন, অথবা দুই-চারি মিনিট পূর্ব্বেও যে কোন বস্তুকে দেখিয়াছিল এবং জানিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা স্মৃতিই মানবের থাকিত না, কারণ যে "আমি আমি" জ্ঞানপ্রবাহ সেই বস্তুকে দেখিয়াছিল এবং জানিয়াছিল তাহা এখন আর নাই, এবং এখন যে নূতন "আমি আমি" জ্ঞানপ্রবাহ আসিয়াছে তাহা সেই বস্তুকে দেখে নাই এবং জানে নাই। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংসশীল "আমি আমি" জ্ঞানপ্রবাহ নাহ; আত্মা নিত্যস্থিতিশীল চেতন বস্তু। "শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ।" সাংখ্যসূত্র ১।৩৬।—"ক্ষণিকবিজ্ঞান-বাদ শ্রুতিশাস্ত্র এবং ন্যায়শাস্ত্র কর্ত্তৃক নিরূপিত তত্ত্বের বিরোধী; এইজন্যও এই মতবাদ তত্ত্ব নহে।" "দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ।" সাংখ্যসূত্র ১।৩৭।—"দীপশিখার এবং নদীপ্রবাহের দৃষ্টান্তের দ্বারা দেহের এবং আত্মার ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হয় না, কারণ আত্মার এবং দেহেরও ধ্বংস নাই।" আমরা দেখিলাম যে, ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয় না এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা অপ্রমাণিত হয়। শাস্ত্রনিরূপিত নিত্যপ্রলয়ের তত্ত্ব ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ নহে। আমরা পাইয়াছি যে, নিত্যপ্রলয়ের তত্ত্ব আত্মা সম্বন্ধে নহে, কেবল দেহের সম্বন্ধে নিরূপিত হইয়াছে এবং এই তত্ত্ব অনুসারে দেহের প্রতিক্ষণে ধ্বংস হয় না,

একই দেহ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু নিত্যই তাহার অলক্ষ্যণীয় পরিবর্ত্তন হইতে থাকে।

কৃষ্ণ "সর্ব্বকারণকারণম", এই তত্ত্বের আলোচনায় আমরা পাইলাম যে, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল এবং পরমকারণ কৃষ্ণ। আমরা এই আলোচনার মধ্যে মানবের সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞাত হইলাম, এক্ষণে আমরা মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দ্বাদশ অধ্যায়

মানবাত্মা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবাত্মা পরিণয়ের পাত্র

১২।১।১ মানব দ্বন্দ্ব ও পরিণয়ের ক্ষেত্র ও পাত্র

মানব বিশ্বলীলার অন্তর্গত; এইজন্য, মানবকে বিশ্ব হইতে পৃথকভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলে মানবতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না। যে উদ্দেশ্যে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যে মানবসৃষ্টিও হইয়াছে। সোহহম্ কৃষ্ণ বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন, স্বীয় অহম্-এর সহিত আনন্দলীলা করিবার জন্য। মানবাত্মা কৃষ্ণের সহিত পরিণয় প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত কৃষ্ণের আনন্দলীলা হয়। এই পরিণয় মায়াময় বিশ্বলীলার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া, দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়া লাভ করিতে হইবে, ইহাই বিশ্বলীলার ঐশী উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দ্বন্দ্বসৃষ্টির প্রয়োজন। প্রকৃতির বিকারমাত্রেই দ্বন্দ্বময়। আমরা পাইয়াছি যে, প্রকৃতির মধ্যে মায়াশক্তি যে সকল কার্য্যকারী রূপে অবস্থিত আছে, সেইগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট। প্রকৃতির বিকার লিঙ্গদেহের মধ্যে এবং লিঙ্গদেহের বিকার স্থূলদেহের মধ্যেও অবিদ্যাশক্তির এবং প্রকাশিকাশক্তির, সৃষ্টিশক্তির এবং প্রলয়-শক্তির কার্য্যসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ। প্রকৃতির বিকার সমষ্টিলিঙ্গদেহ; সমষ্টি-লিঙ্গদেহের বিকার বিশ্ব; বিশ্বের অংশ জগৎ, এবং জগতের অংশ মানবদেহ।

বিশ্বে, জগতে, এবং মানবদেহেও ঐ সকল পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহ আছে। কামনাশক্তি বিশ্বে, জগতে এবং মানবদেহেও আছে, কিন্তু মানবদেহে অবস্থিত জীবাত্মায় প্রেমময়ী হ্লাদিনীশক্তি আছে; কামনাশক্তি এবং হ্লাদিনীশক্তি পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট। জীবাত্মায় জ্ঞানশক্তি আছে; ইহা বিশ্বে, জগতে, এবং দেহে বিদ্যমান অবিদ্যাশক্তি হইতে বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট। দেহের শক্তিসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট, এবং জীবাত্মার শক্তিসমূহ হইতেও বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট; কিন্তু জীবাত্মার জ্ঞানশক্তি এবং হ্লাদিনীশক্তির মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই, পরন্তু এই দুইটী আত্মিক শক্তি পরস্পর সহযোগী। প্রকৃতি, বিশ্ব, জগৎ, এবং দেহ অপরা প্রকৃতি, কিন্তু মানবাত্মা, অর্থাৎ মানবদেহে অবস্থিত জীবাত্মা পরা-প্রকৃতি। পরাপ্রকৃতি জীবাত্মা পরিণয় চাহে; অপরাপ্রকৃতি বিশ্ব, জগৎ, এবং দেহ বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট শক্তিসমূহের দ্বারা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং জীবাত্মাকে সেই দ্বন্দ্বের মোহে আবদ্ধ করিয়া পরিণয়প্রাপ্তির অন্তরায় হয়। অপরাপ্রকৃতি বিশ্ব জগৎ এবং দেহ দ্বন্দ্বলীলার ক্ষেত্র এবং পরাপ্রকৃতি জীবাত্মা পরিণয়লীলার পাত্র। সুতরাং, মানব দ্বন্দ্বপরিণয়লীলার ক্ষেত্র এবং পাত্র। এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্ট ক্ষেত্র এবং পাত্রকে বুঝিতে পারিলে মানবতত্ত্বটী জানা যাইবে। আমরা প্রথমে পরিণয়লীলার পাত্র জীবাত্মার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরে দ্বন্দ্বলীলার ক্ষেত্র দেহ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১২।১।২ জীবাত্মার অধিষ্ঠান হৃদয়ে

মানবদেহের নাম মানব, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মানবদেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মা দেহী, অর্থাৎ দেহের অধীশ্বর। দেহী এবং দেহ, এই দুইয়ের সমহারে মানবজীবন। দেহকে ক্ষেত্র এবং দেহীকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও বলা হয়। দেহীর দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে সেই দেহটী মৃত মানব; দেহ হইতে উৎক্রান্ত জীবাত্মাকে মানবের জীবাত্মা বা মানবাত্মা বলা যাইতে পারে কিন্তু মানব বলা যায় না। দেহের কেন্দ্র হৃদয়; হৃদয়ের মধ্যে জীবাত্মার অধিষ্ঠান; এই তত্ত্ব পূর্ব্বেই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। জীবাত্মার চিৎ ও আনন্দ নিত্য একত্র অবস্থিত। চিৎ আনন্দের কোশ; চিৎ-কোশের মধ্যে আনন্দ অবস্থিত। এইরূপে দেহের মধ্যে জীবাত্মা অবস্থান করে। পূর্ব্বেই প্রসঙ্গক্রমে জীবাত্মা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব বিবৃত করা হইয়াছে। এখানে পূর্ব্ববর্ণিত কোন তত্ত্বের

উল্লেখের কোন প্রয়োজন হইলে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা না করিয়া সংক্ষিপ্ত-ভাবে উল্লিখিত হইবে।

১২।১।৩ "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" মতবাদ অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বা অভেদবাদ অসার ও অসত্য

মায়াবাদ অনুসারে "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" অর্থাৎ মানবাদি প্রাণীমাত্রেরই জীবাত্মা পূর্ণ অখণ্ড পরব্রহ্ম। পূর্ব্বেই আমরা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের নিরূপিত তত্ত্ব পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ ব্রহ্ম এবং অংশী, জীবাত্মা অণুপরিমাণ এবং তাঁহার অংশ; কৃষ্ণ উপাস্য এবং জীবাত্মা তাঁহার উপাসক; কৃষ্ণ ধ্যেয়, জীবাত্মা ধ্যাতা; কৃষ্ণ প্রাপ্তব্য, জীবাত্মা প্রাপক; কৃষ্ণ নিয়ন্তা, জীবাত্মা নিয়ন্ত্রিত; কৃষ্ণ জ্ঞেয়, জীবাত্মা জ্ঞাতা। মায়াবাদীর মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং অসার এবং অসত্য। এক এবং অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্মই যদি সকল প্রাণীর দেহে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিতেন তাহা হইলে মানবাদি সর্ব্বপ্রকার জীবের প্রত্যেকের প্রতি মুহূর্ত্তের সুখদুঃখানুভূতি একই হইত; কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে জগতের সকল মানবের এবং অন্য প্রাণীগণের সুখদুঃখানুভূতি একই নহে। জীবাত্মা পূর্ণ ব্রহ্ম হইলে কোন মানবের বা মানবেতর প্রাণীর জীবাত্মা অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং দেহা-ভিমানী হইত না, কারণ ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্", তাঁহার অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং দেহাভিমানী হওয়া অসম্ভব। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে পূর্ণ ব্রহ্মও অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং দেহাভিমানী হয়েন, তাহা হইলেও, একজন মানব জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করে অথবা অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা যে অবস্থা লাভ করে, সকল জীবাত্মা এক এবং অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম হইলে বিশ্ববাসী প্রত্যেকজীবই সেই জ্ঞান এবং সেই অবস্থা লাভ করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা করে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে পূর্ণ ব্রহ্মকেও অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে হয়, তাহা হইলেও, একটী মানব অধ্যাত্মযোগসাধনা করিয়া যদি মোক্ষ লাভ করে তবে তৎক্ষণাৎ বিশ্ববাসী সকল জীবই মোক্ষ লাভ করিত এবং সমগ্র বিশ্বের আত্যন্তিক প্রলয় হইয়া যাইত; কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে কোন কোন মানব সাধনার দ্বারা মোক্ষ লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মোক্ষলাভের ফলে অন্য কোন জীব মোক্ষ লাভ করে না। ব্রহ্ম বহু হইবার ইচ্ছায় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক মানবাত্মাই যদি পূর্ণ ব্রহ্ম হইত প্রত্যেক

মানবেরই বিশ্বসৃষ্টি করিবার শক্তি থাকিত। কিন্তু শাস্ত্র প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুসারে কোন মানবই বিশ্বসৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং মানবাত্মা পূর্ণ এবং অখণ্ড ব্রহ্ম নহে। মায়াবাদী জীবকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে যে ব্রহ্ম নিঃশক্তি, তিনি বিশ্বসৃষ্টি করেন নাই, জগতের সৃষ্টিই হয় নাই, এবং জগৎ মিথ্যা। জগৎকে সত্য বলিলে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন স্বীকার না করিয়া উপায় নাই; তাহা হইলে ব্রহ্ম নিঃশক্তি হইতে পারেন না; ব্রহ্ম যদি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং জীব যদি ব্রহ্ম হয়, তবে জীবও জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। আমরা দেখিলাম, জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করায় মায়াবাদীকে "ব্রহ্ম নিঃশক্তি" এবং "জগৎ মিথ্যা" বলিতে হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণিত করিয়াছি যে এই দুইটী মতই অসার এবং অসত্য। এখন আমরা পাইলাম যে, মায়াবাদীর "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" মতবাদ সম্পূর্ণ অসার এবং অসত্য। সকল প্রাণীর দেহে একই জীবাত্মা অধিষ্ঠিত নহে, প্রত্যেক জীবদেহে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবাত্মা অধিষ্ঠিত; সুতরাং জীবাত্মা বহু। এইজন্য, প্রত্যেক জীবদেহে অবস্থিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবাত্মাকে শ্রুতি প্রত্যগাত্মা (individual soul) নাম দিয়াছেন। "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" মতটীকেই অদ্বৈতবাদ বা অভেদবাদ বলা হয়। ইহা যথার্থ তত্ত্ব নহে।

১২।১।৪ কৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ

শ্রুতি এবং স্মৃতি, সকল শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ভেদাভেদবাদ এবং শ্রীবল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ কি তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ভেদাভেদবাদকেই তত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার ভেদ এবং অভেদ মানববুদ্ধির চিন্তাতীত বলিয়া এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ অচিন্ত্য।

১২।১।৫ জীবাত্মা কৃষ্ণের চিদানন্দের অতি ক্ষুদ্র অংশ

জীবাত্মা কৃষ্ণের চিদানন্দের অতি ক্ষুদ্র অংশ। এই বিষয়ে পূর্ব্বেই শাস্ত্রের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "বালাগ্রশতভাগস্য" সূত্রে (শ্বেত ৫।৯)

জীবাত্মার অণুপরিমাণতা নিরূপিত হইয়াছে। জীবাত্মা চিৎ এবং আনন্দ, তাহা জীবকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেও বুঝা যায়। মানবের চেতনা আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যখন চেতনা আছে, চেতনার কারণও আছে, অর্থাৎ মানবদেহে এমন কোন বস্তু আছে, যদ্দ্বারা মানবদেহ চেতন হইয়াছে। এইরূপ চেতনা মৃতদেহে থাকে না; ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দৈহিক চেতনার যে কারণ দেহে আছে তাহা দেহের অংশ নহে, তাহা দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং দেহাতিরিক্ত বস্তু। কৃষ্ণের চিতের যে অংশ দেহে আছে তাহাই সেই বস্তু। আবার, মানবের আনন্দদিৎসা, আনন্দলিপ্সা, এবং আনন্দসম্ভোগও আছে। ইহাদের কারণও অবশ্যই আছে। ইহারা মৃতদেহে থাকে না; এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহাদের যে কারণ দেহে আছে, তাহা দেহের অংশ নহে, তাহা দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং দেহাতিরিক্ত বস্তু। কৃষ্ণের আনন্দের যে অংশ দেহে আছে তাহাই সেই বস্তু। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ এবং বিচারের দ্বারাও বুঝা যায় যে মানবদেহে দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং দেহাতিরিক্ত চিদানন্দ আছে। ইহা কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ এবং ইহাই মানবদেহের জীবাত্মা। এই জীবাত্মারই কৃষ্ণের সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীবাত্মা কৃষ্ণের পরাপ্রকৃতির অংশ বলিয়া জীবাত্মাও কৃষ্ণের পরাপ্রকৃতি।

১২।১।৬ জীবাত্মার স্ত্রীপুরুষাদি লিঙ্গভেদ নাই ঃ জীবাত্মা পরাপ্রকৃতি ও পরমভাব

জীবাত্মাকে পরাপ্রকৃতি বলিতে ইহা বুঝায় না যে সে স্ত্রীলিঙ্গ। প্রকৃতি শব্দের অর্থ, প্র=প্রকৃষ্ট, কৃতি=কার্য্য অর্থাৎ সেবাকার্য্য যাহার। যাহা প্রকৃষ্টরূপে কৃষ্ণের সেবা করে তাহা প্রকৃতি। দ্বন্দ্বপরিণয়ের লীলায় যে প্রকৃতি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া পরিণয়ে বাধা দান করে তাহা অপরা প্রকৃতি, এবং যাহা পরিণয় লাভ করিয়া কৃষ্ণকে আনন্দ দান করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তাহা পরা প্রকৃতি। দ্বন্দ্বসৃষ্টির জন্য অপরাপ্রকৃতিতে লিঙ্গভেদ (স্ত্রী এবং পুরুষ) আছে। অপরা প্রকৃতির অতীত পরা প্রকৃতিতে দ্বন্দ্ব নাই, লিঙ্গভেদও নাই। জীবাত্মা পরা প্রকৃতি এবং পরমভাব বলিয়া তাহার স্ত্রীপুরুষাদি লিঙ্গভেদ নাই (শ্বেত ৫।১০)। দেহ অপরাপ্রকৃতি বলিয়া দেহে স্ত্রীপুরুষাদি লিঙ্গভেদ আছে। জীবাত্মা যে দেহে অবস্থান করে, দেহাভিমানবশতঃ আপনাকে সেই দেহের

লিঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে; এই কারণে পুরুষদেহে অবস্থিত জীবাত্মা আপনাকে পুরুষ, স্ত্রীদেহে অবস্থিত জীবাত্মা আপনাকে স্ত্রী, এবং নপুংসকদেহে অবস্থিত জীবাত্মা আপনাকে নপুংসক বলিয়া অভিমান করে। ইহা তাহার অধ্যাস। স্ত্রীপুরুষাদি লিঙ্গভেদও দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বলীলার ক্ষেত্রে দেহে অবস্থিত জীবাত্মা দেহাভিমানবশতঃ আপনাকে দেহের লিঙ্গানুসারে স্ত্রী বা পুরুষ ভাবিয়া দ্বন্দ্বমোহে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবাত্মার স্বরূপ এবং দেহাভিমান

১২।২।১ জীবাত্মার চিৎ

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের চিতের সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমারা চিতের শক্তি গুণ ধর্ম্মাদির পরিচয় দিয়াছি। জীবাত্মার চিৎ কৃষ্ণের চিতেরই অংশ; এইজন্য জীবাত্মার চিতেও সেই সকল শক্তি গুণ এবং ধর্ম্ম আছে। কৃষ্ণের চিৎ অনন্ত বলিয়া তাঁহার চিতের শক্তি গুণ ধর্ম্মও অনন্ত, কিন্তু জীবাত্মার চিৎ তাঁহার চিতের অতি ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া জীবাত্মার চিতের শক্তি গুণ এবং ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র। দেহে অবস্থিত জীবাত্মার চিতের চৈতন্য দেহের সর্ব্বাংশকে চেতন করে। মানবের দেহে চিৎ জ্ঞাতা। জ্ঞানশক্তির দ্বারা চিৎ জ্ঞান লাভ করে। চিতের জ্ঞানশক্তি বুদ্ধিতে সঞ্চারিত হইয়া বুদ্ধিকে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা করে এবং মন ও ইন্দ্রিয়বর্গে সঞ্চারিত হইয়া ইহাদিগকে বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানলাভের নিমিত্ত বুদ্ধির করণরূপে কার্য্যকারী করে। জীবাত্মার চিতের জ্ঞানশক্তি যখন চক্ষুতে কার্য্য করে তখন তাহার নাম দৃষ্টিশক্তি, যখন কর্ণে কার্য্য করে তখন তাহার নাম শ্রবণশক্তি, যখন নাসিকায় কার্য্য করে তখন তাহার নাম ঘ্রাণশক্তি, যখন ত্বকে কার্য্য করে তখন তাহার নাম স্পর্শশক্তি, এবং যখন জিহ্বায় কার্য্য করে তখন তাহার নাম আস্বাদনশক্তি। এইজন্য শাস্ত্রে জীবাত্মাকে চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ প্রভৃতি বলা হইয়াছে। জীবাত্মার জ্ঞানশক্তি যখন মনে কার্য্য করে তখন তাহাকে মননশক্তি বলা হয়,

এবং যখন বুদ্ধিতে কার্য্য করে তখন তাহাকে বিচারশক্তি বলা হয়। এইজন্য শাস্ত্রে জীবাত্মাকে মনের মন এবং বুদ্ধির বিচারশক্তি বলা হইয়াছে (কেন ১।২ এবং প্রশ্ন ৪।৯)। স্মৃতিশক্তিও জ্ঞানশক্তির একটী কার্য্যকারী রূপ, এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন যে আত্মা হইতেই স্মৃতিশক্তির উৎপত্তি। চিতের স্মৃতিশক্তি বুদ্ধিতে এবং মনে সঞ্চারিত হয় বলিয়া বুদ্ধি এবং মন পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করিতে পারে। "আত্মতঃ স্মর। আত্মতঃ বিজ্ঞানম্। আত্মতঃ মনঃ।" ছান্দোগ্য ৬।২৬।১। —"আত্মা হইতে স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি, এবং মননশক্তি উৎপন্ন হয়।" চিতের জ্ঞানশক্তি প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। চিৎ যখন বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে স্বীয় চেতনাকে এবং জ্ঞানশক্তিকে আপনাতে উপসংহৃত করিয়া লয়, তখন সেই ধ্যানযোগের সমাধি অবস্থায় আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং ঈশ্বরকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারে। চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তিযুক্ত চিৎ-ই জীবাত্মার জ্ঞাননেত্রস্বরূপ। জ্ঞান-নেত্রের দ্বারা অপ্রাকৃত চিদ্বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। এইজন্য শাস্ত্র বলেন যে আত্মার দ্বারাই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এবিষয়ে "গোবিন্দ" নামের ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, তজ্জন্য এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। জীবাত্মার চিৎ যে জ্ঞান লাভ করে, চিৎ-ই সেই জ্ঞানের আধার। সমস্ত লব্ধ জ্ঞান চিতেই সঞ্চিত থাকে এবং চিৎ স্মৃতি-শক্তির দ্বারা প্রয়োজনানুসারে পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানকে স্মরণ করে। জীবাত্মার চিতের জ্ঞানশক্তির আর একটী কার্য্যকারী রূপের নাম প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তিকে প্রাণও বলা হয়। প্রাণশক্তি আত্মা হইতে উদ্ভূত হয়, ইহা শাস্ত্রনিরূপিত তত্ত্ব। "আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে।" প্রশ্ন ৩।৩। "আত্মতঃ প্রাণঃ।" ছান্দোগ্য ৭।২৬।১। প্রাণশক্তি সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত থাকিয়া এবং প্রাণ অপান উদান সমান এবং ব্যান নামক পঞ্চ প্রাণবায়ুকে পরিচালিত করিয়া সমস্ত দেহটীকে প্রাণময় করিয়া রাখে। হৃৎপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, পাকস্থালী প্রভৃতি সমস্ত দৈহিক যন্ত্রগুলি প্রাণশক্তির দ্বারা পরিচালিত এবং ক্রিয়াশীল হয়। প্রাণ সর্ব্বশরীরের সকল স্থানে একই সময়ে কার্য্য করে। প্রাণকে শাস্ত্রে বৈশ্বানর এবং অগ্নি নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। প্রাণাগ্নিই জঠরাগ্নি রূপে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে (গীতা ১৫।১৪)। হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণশক্তির বলেই নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারে; বুদ্ধি-মন-জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহও

প্রাণশক্তির দ্বারা প্রাণময় হয় বলিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারে। জীবিত প্রাণীর দেহে যে উত্তাপ আছে দেহে প্রাণাগ্নির (=প্রাণশক্তির) বিদ্যমানতার ফলে সেই উত্তাপ সৃষ্ট হয়। প্রাণশক্তি চিরবিনিদ্র। বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়াদিসহ সমগ্র দেহ যখন নিদ্রিত থাকে, প্রাণশক্তি তখনও জাগ্রত থাকে এবং দেহের পঞ্চ প্রাণবায়ুর পরিচালনা করিয়া দেহকে প্রাণময় এবং প্রাণক্রিয়াময় করিয়া রাখে। প্রাণশক্তি নিদ্রিত হইলে তাহার নিদ্রিতাবস্থায় দেহ প্রাণক্রিয়াহীন হইত এবং হৃৎপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতি দেহযন্ত্রের ক্রিয়া থাকিত না। প্রাণশক্তি চিরজাগ্রত বলিয়া নিদ্রাকালেও প্রাণবায়ুর ক্রিয়া থাকে এবং হৃৎপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতির কার্য্য চলিতে থাকে। "প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি।" প্রশ্ন ৪।৩—"দেহপুরে প্রাণশক্তির দ্বারা পরিচালিত পঞ্চ প্রাণবায়ুরূপ অগ্নিগণ জাগ্রত থাকে। প্রাণ চিরজাগ্রত।" জীবাত্মার চিৎ দেহের সর্ব্বাংশের চেতনারও কারণ। জীবাত্মা চিদ্বস্তু; তাহার চিদংশও চিদ্বস্তু; চিতের পূর্ব্বোক্ত শক্তিসমূহ চিচ্ছক্তি।

১২।২।২ জীবাত্মার আনন্দ

চিৎ-কোশের মধ্যে আনন্দ অবস্থিত। এইরূপে নিত্য একত্রস্থিত চিদানন্দই জীবাত্মা। নিত্য একত্রস্থিতির জন্য আনন্দ নিত্যচেতন বস্তু। জীবাত্মার আনন্দ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের আনন্দের অংশ বলিয়া জীবাত্মার আনন্দাংশেও হ্লাদিনী শক্তি আছে, এবং হ্লাদিনীর আনন্দদিৎসা ও আনন্দ-লিপ্সা আছে। হ্লাদিনীর এই স্বভাবই প্রেম; সুতরাং জীবাত্মার আনন্দাংশে প্রেম আছে, এবং প্রেম থাকায় প্রেমের পঞ্চবিধ ভাব, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর ভাবসমূহও আছে। চিতের অজ্ঞানাচ্ছন্নতা এবং দেহাভিমানকে জীবাত্মারই অজ্ঞানাচ্ছন্নতা এবং দেহাভিমান বলা হয়, কিন্তু আনন্দ কখনও বিষয়ভোগজাত সুখকে আনন্দ বলিয়া গ্রহণ করে না। আনন্দ কৃষ্ণের সহিত আনন্দের আদানপ্রদানের দ্বারা তাহার আনন্দদিৎসা এবং আনন্দলিপ্সাকে সার্থক করিতে চাহে, কিন্তু চিতের অজ্ঞানাচ্ছন্নতার জন্য তাহা করিতে পারে না বলিয়া তাপ ও ক্লেশ ভোগ করে। চিতের অজ্ঞানাচ্ছন্নতার নিমিত্ত, জাগতিক সকল কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইলেও কোন্ বস্তুর অভাবে সে অতৃপ্তি এবং তাপ বোধ করে, মানব বুদ্ধির দ্বারা তাহা বুঝিতে পারে না। এই অবস্থায়ও

আনন্দ স্বীয় প্রেমের পঞ্চবিধভাবের আনন্দদিৎসা কথঞ্চিৎ সার্থক করে, জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে ; এবং এইরূপ সার্থকতার দ্বারা আনন্দলিপ্সাও কথঞ্চিৎ সার্থক করে। সাধু এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সহিত জ্ঞানালোচনা, এবং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া জীবাত্মার আনন্দাংশের শান্তভাবের আনন্দদিৎসার এবং আনন্দলিপ্সার সার্থকতা হয়। উক্তরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণসকল জীবাত্মার আনন্দাংশের শান্তভাবের প্রেমের প্রকাশ। গুরুজনগণ, মান্যব্যক্তিগণ, এবং প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির দ্বারা এবং তাঁহাদের সেবা করিয়া জীবাত্মার আনন্দাংশের দাস্যভাবের আনন্দদিৎসা এবং আনন্দলিপ্সা সার্থক হয়। উক্তরূপ গুণসকল অর্থাৎ শ্রদ্ধাভক্তি ও সেবাপরায়ণতা জীবাত্মার আনন্দাংশের দাস্যভাবের প্রেমের প্রকাশ। মানব এবং মানবেতর প্রাণীগণের প্রতি প্রীতি, অহিংসা, দুঃস্থের প্রতি দয়া, রোগীর সেবা, ভ্রাতাভগ্নীর এবং বন্ধুগণের সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা আনন্দের সখ্যভাবের আনন্দদিৎসার এবং আনন্দলিপ্সার সার্থকতা হয়। উক্তরূপ প্রীতি, দয়া, অহিংসা, সেবাপরায়ণতা, বন্ধুবাৎসল্য প্রভৃতি গুণসকল জীবাত্মার আনন্দাংশের সখ্যভাবের প্রেমের প্রকাশ। পিতামাতা এবং সন্তানগণের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহভালবাসার এবং সেবাযত্নের ও লালনপালনাদির দ্বারা আনন্দের বাৎসল্যভাবের আনন্দ-দিৎসার এবং আনন্দলিপ্সার সার্থকতা হয়। উক্তরূপ সন্তানের প্রতি স্নেহ, পিতামাতার প্রতি ভক্তি-ভালবাসা, সন্তানপালনের প্রবৃত্তি, পিতামাতার সেবা-পরায়ণতা প্রভৃতি গুণসমূহ জীবাত্মার আনন্দাংশের বাৎসল্যভাবের প্রেমের প্রকাশ। নর-নারীর মধ্যে পারস্পরিক প্রণয় এবং আলিঙ্গনাদি ক্রিয়ার দ্বারা আনন্দের মধুরভাবের আনন্দদিৎসার এবং আনন্দলিপ্সার সার্থকতা হয়। স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় জীবাত্মার আনন্দাংশের মধুরভাবের প্রেমের প্রকাশ। যতদিন চিৎ দেহাভিমানী থাকে এবং কৃষ্ণের সহিত পরিণয় লাভ না হয়, ততদিন জীবাত্মার আনন্দাংশ জাগতিক সম্পর্ক হইতে স্বীয় আনন্দদিৎসা এবং আনন্দ-লিপ্সা সার্থক করে কিন্তু জাগতিক সম্পর্ক মায়াময় এবং দ্বন্দ্বময় বলিয়া জাগতিক সম্পর্কে স্বার্থ এবং তিক্ততা আসিয়া পড়ে ; জাগতিক সম্পর্ক চিরস্থায়ীও নহে ; এবং জাগতিক সম্পর্ক হইতে প্রাপ্ত আনন্দ ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র। এইজন্য জীবাত্মার আনন্দাংশ এইরূপ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণিক আনন্দের আদানপ্রদানের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, এবং কৃষ্ণের সহিত ভূমানন্দের আদানপ্রদানের অভাবে অতৃপ্তি

ও তাপ ভোগ করে। চিৎ দেহাভিমানমুক্ত হইলে দ্বন্দ্বাতীত এবং মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণের সহিত পরিণয়প্রাপ্ত জীবাত্মার আনন্দদিৎসা এবং আনন্দলিপ্সা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে।

১২।২।৩ জীবাত্মার স্বরূপগত অবস্থা

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের চিৎ এবং আনন্দ "বিজ্ঞানমানন্দম্"। বিজ্ঞানের মধ্যে অজ্ঞান থাকিতে পারে না, আনন্দের মধ্যে আনন্দহীনতা থাকিতে পারে না। জীবাত্মা কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ; তাহারও চিতের মধ্যে অজ্ঞানতা নাই এবং আনন্দের মধ্যে আনন্দহীনতা নাই। কৃষ্ণের চিদানন্দের মধ্যে মায়া নাই এবং দ্বন্দ্ব নাই; সুতরাং জীবাত্মার মধ্যেও মায়া নাই এবং দ্বন্দ্ব নাই। কৃষ্ণের চিদানন্দ নিত্যশুদ্ধ; সুতরাং জীবাত্মার মধ্যেও অশুদ্ধতা নাই। কৃষ্ণের চিদানন্দের মধ্যে কোন বন্ধন নাই; সুতরাং জীবাত্মার মধ্যেও কোন বন্ধন নাই। জীবাত্মা স্বরূপতঃ মায়াহীন, দ্বন্দ্বহীন, এবং মুক্ত "বিজ্ঞানমানন্দম্"।

১২।২।৪ জীবাত্মার দেহাভিমান

জীবাত্মা যে দেহে অবস্থান করে তাহা ত্রিগুণময়ী মায়া। মায়ার অবিদ্যা-শক্তি বুদ্ধিতে কাম ক্রোধ লোভ উৎপন্ন করে; এই রিপুসমূহ জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করে।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ গীতা। ৩।৪০

—"রজোগুণোদ্ভূত কাম বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাদের দ্বারা জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে বিমোহিত করে।" জীবাত্মার চিৎ জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট জ্ঞাতা; অজ্ঞানাচ্ছন্নতাটা চিতের। চিতের অজ্ঞানাচ্ছন্নতা জীবাত্মারই অজ্ঞানচ্ছন্নতা, কারণ চিৎ কোশের মধ্যে আনন্দ থাকে। জীবাত্মার অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিৎ আপনাকে বুদ্ধির সহিত অভিন্ন ভাবে; বুদ্ধি লিঙ্গদেহের প্রধান উপাদান; বুদ্ধির সহিত চিতের অভিন্নতাবোধ লিঙ্গদেহের সহিতই অভিন্নতাবোধ। এইরূপ অভিন্নতাবোধই জীবাত্মার চিতের দেহা-ভিমান। দেহের প্রধানাংশ বুদ্ধির অহংভাবই দৈহিক আমিত্ব বা কাঁচা আমি; বুদ্ধি বৈষয়িক কর্ম্মের কর্ত্তা এবং বিষয়ের ভোক্তা। জীবাত্মার চিৎ আপনাকে

বুদ্ধির সহিত অভিন্ন বোধ করে বলিয়া এই অহংভাব, কর্তৃত্ব, এবং ভোক্তৃত্বকে নিজেরই ভাবে। বস্তুতঃ জীবাত্মা কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মানানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ গীতা ১৩।২৯

—"প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্ম করে; জীবাত্মা কর্ত্তা নহে। যে ব্যক্তি জীবাত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানে, সে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছে।" জীবাত্মা যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দেহাভিমানী এবং কর্তৃত্বভাবযুক্ত না হইত, তাহা হইলে সে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইত না। এরূপ হইলে দ্বন্দ্বলীলা চলিত না। কৃষ্ণের ইচ্ছা, জীবাত্মাকে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া গিয়া এবং দ্বন্দ্বাতীত হইয়া পরিণয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। কার্য্যকারণ কর্তৃত্বের হেতু প্রকৃতি কৃষ্ণের এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য স্বীয় অবিদ্যাশক্তির দ্বারা জীবাত্মাকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দেহাভিমানী, এবং কর্তৃত্বভাবাপন্ন করিয়া দ্বন্দ্বে লিপ্ত রাখে।

১২।২।৫ জীবাত্মার বন্ধন এবং মুক্তি

অবিদ্যা জীবাত্মাকে অজ্ঞানে আবৃত করিয়া রাখে; ইহাই তাহার অজ্ঞানাচ্ছন্নতা। জীবাত্মার এই অজ্ঞানাবরণই তাহার বন্ধন। এই বন্ধন ত্রিগুণের বন্ধন। ত্রিগুণের সমবায়ই মায়া। সুতরাং এই বন্ধন মায়ার বন্ধন। জীবাত্মা ত্রিগুণের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারিলে গুণাতীত হয়। গুণাতীত অবস্থাই মায়াতীত অবস্থা, কারণ ত্রিগুণের সমবায়ই মায়া। কৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার শরণ লইয়া ভক্তিযোগে তাঁহার ভজনা করিলে তিনি জীবাত্মাকে মায়ামুক্ত করেন।

(১) মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীতা ৭।১৪
(২) মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ গীতা ১৪।২৬

..."(১) যাহারা আমার শরণ লয় তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করে। (২) যে ব্যক্তি অবিচলিত ভক্তিযোগে আমার আরাধনা করে সে ত্রিগুণের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হয়, অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞানে স্থিত এবং মুক্ত হয়।" ত্রিগুণের প্রভাবকে অতিক্রম করিলে অবিদ্যাকেও অতিক্রম করা হয়, কারণ অবিদ্যাশক্তি ত্রিগুণের মধ্য দিয়াই কার্য্য করে। যেমন স্বর্ণকে মৃত্তিকার

প্রলেপে আবৃত করিলেও স্বর্ণ স্বর্ণই থাকে মৃত্তিকা হইয়া যায় না, তদ্রূপ, মায়ার দ্বারা অজ্ঞানাবৃত হইলেও জীবাত্মার স্বরূপ নষ্ট হয় না। মৃত্তিকার প্রলেপ ধৌত করিলেই যেমন স্বর্ণ স্বরূপে প্রকাশ এবং স্থিতি লাভ করে, তদ্রূপ, অধ্যাত্মযোগ-সাধনার দ্বারা অজ্ঞানাবরণ বিদূরিত হইলেই জীবাত্মা স্বরূপে প্রকাশ লাভ করে এবং স্থিত হয়। যাহা স্বরূপতঃ বদ্ধ, তাহার কখনই মুক্তি হইতে পারে না। জীবাত্মা স্বরূপতঃ মুক্ত বলিয়াই তাহার অজ্ঞানাবরণ দূরীভূত হইলে সে স্বরূপ-গত অবস্থায় "বিজ্ঞানমানন্দম্" রূপে স্থিতি এবং প্রকাশ লাভ করে। এইরূপ স্থিতি এবং প্রকাশপ্রাপ্ত জীবাত্মাকে আর কখনও মায়াময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ইহাকেই জীবাত্মার মুক্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ, এবং ব্রহ্মভূত অবস্থা নামে অভিহিত করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুনর্জন্ম

১২।৩।১ জীবাত্মার দেহান্তর গ্রহণ—ইহাই পুনর্জন্ম

স্থূলদেহের জন্মমৃত্যু আছে; জীবাত্মার জন্মমৃত্যু নাই। স্থূলদেহকে বধ করা যায়; জীবাত্মাকে বধ করা যায় না। সকল শাস্ত্রই একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে জীবাত্মা অজ, নিত্য, অবিনশ্বর। বাস্তবিক, জগতের কোন বস্তুরই ধ্বংস নাই; স্থূলদেহটী নষ্ট হয়, কিন্তু সেই দেহের উপাদানগুলির ধ্বংস হয় না। যখন জড়বস্তুরও ধ্বংস নাই, তখন চিদ্বস্তু জীবাত্মারও ধ্বংস থাকিতে পারে না। শাস্ত্রের ঘোষণা অনুসারেও জীবাত্মা অবিনশ্বর। এইজন্য স্থূলদেহের মৃত্যুর পরেও জীবাত্মা থাকেই। দেহনাশের পরেও যখন জীবাত্মা থাকে তখন তাহার থাকিবার জন্য একটী স্থূল আধারের অবশ্য প্রয়োজন, কারণ চিদানন্দ আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না, এবং বিশ্ববিধান অনুসারে বিশ্বে চিদানন্দের আধার স্থূলদেহ। এইজন্য অবিনাশী জীবাত্মা একটী স্থূলদেহের মৃত্যুর পরে অন্য একটী স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। ইহাই জীবাত্মার দেহান্তর গ্রহণ। বেদান্ত এই তত্ত্বকে তৃণজলৌকার তৃণান্তর গ্রহণের

উপমার দ্বারা, এবং গীতা জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নববস্ত্রগ্রহণের উপমার দ্বারা বুঝাইয়াছেন। বেদান্তের দৃষ্টান্তে পরিস্ফুট হইয়াছে যে একটী স্থূলদেহের মৃত্যুর পরে জীবাত্মা অন্য একটী স্থূলদেহ গ্রহণ না করিয়া থাকিতেই পারে না; গীতার দৃষ্টান্তে পরিস্ফুট হইয়াছে যে বস্ত্র জীর্ণ হইলে নববস্ত্র-পরিধান যেমন আবশ্যকীয় ব্যাপার, তদ্রূপ, একটী স্থূলদেহ জীর্ণ হইলে নূতন স্থূলদেহ গ্রহণ জীবাত্মার পক্ষে আবশ্যকীয় ব্যাপার; গীতা ও বেদান্ত উভয়েরই ঘোষিত মূলতত্ত্ব একই যে একটী দেহের মৃত্যুর পর জীবাত্মা অন্যদেহ গ্রহণ করে। জীবাত্মার এইরূপ পুনঃ পুনঃ দেহান্তরগ্রহণকেই জীবাত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ বলা হয়। বস্তুতঃ জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে না; যাহার মৃত্যু নাই তাহার জন্মও থাকিতে পারে না। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে জীবাত্মা প্রবিষ্ট হয় এবং অবস্থিত থাকে বলিয়া ভ্রূণের জন্মকেই জীবাত্মার পুনর্জন্ম বলা হয়।

১২।৩।২ বাসনাপূরণ এবং কর্ম্মফলভোগের জন্য অজ্ঞানাবৃত জীবাত্মার অন্য স্থূলদেহগ্রহণ

জীবাত্মার দেহাভিমান সম্বন্ধে আলোচনায় গীতার ৩।৪০ শ্লোক হইতে আমরা পাইয়াছি যে অবিদ্যাশক্তির দ্বারা পরিচালিত রজোগুণ হইতে উদ্ভূত কামনা বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গে অধিষ্ঠিত আছে, এবং এই কামনা বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়-বর্গের দ্বারা জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবাত্মাকে বিমোহিত করিয়া অর্থাৎ দেহাভিমানী করিয়া রাখে। ইহা হইতে আমরা পাইলাম যে, অবিদ্যাশক্তি যদ্দ্বারা জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞান আবৃত করে তাহা লিঙ্গদেহের বুদ্ধি-মন ইন্দ্রিয়বর্গ, অর্থাৎ লিঙ্গদেহ। জীবাত্মা যখন দেহে অবস্থিত থাকে, তখন লিঙ্গদেহ তাহার আবরণ হইয়া থাকে। এই আবরণই অজ্ঞানাবরণ। জীবাত্মা আপনাকে লিঙ্গদেহ ভাবিয়া দেহাভিমানী হয় এবং তাহার "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এই সংস্কার হয়। যাহার "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" সংস্কার আছে সে কামনা পূরণের জন্য কর্ম্ম করে এবং কৃত কর্ম্মের ফলও ভোগ করে। এই তত্ত্বটীর প্রমাণ প্রত্যেক মানবের জীবনেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। একটী স্থূলদেহের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবৃত জীবাত্মার সকল বাসনা যদি পূর্ণ না হয় এবং সকল কৃত কর্ম্মের ফলভোগ না হয়, তাহা হইলে, যেহেতু স্থূলদেহের মৃত্যুর পরেও অজ্ঞানাবৃত জীবাত্মা থাকে, সেইহেতু স্থূলদেহের মৃত্যু হইলেও তাহার অপূর্ণ

বাসনাসমূহ থাকিয়া যায় এবং কৃত কর্ম্মের অভুক্ত ফলের ভোগও থাকিয়া যায়। জীবাত্মা এই অপূর্ণ বাসনাসমূহকে পূর্ণ করিবার জন্য এবং অভুক্ত কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য একটী স্থূলদেহের মৃত্যুর পরে অন্য একটী স্থূলদেহ গ্রহণ করে; স্থূলদেহই ভোগায়তন, স্থূলদেহ গ্রহণ ব্যতীত ভোগ হইতে পারে না।

১২।৩।৩৩ জীবাত্মার কারণদেহ এবং লিঙ্গদেহ সহ দেহান্তরগ্রহণ

অজ্ঞানাবৃত জীবাত্মা অন্য স্থূলদেহ গ্রহণ করে। লিঙ্গদেহই আজ্ঞানাবরণ। এইজন্য, জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ একটী স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া অন্য স্থূলদেহ গ্রহণ করে। লিঙ্গদেহের মধ্যে কারণদেহ থাকে বলিয়া জীবাত্মা যখন লিঙ্গদেহের সহিত স্থূলদেহ হইতে উৎক্রামণ করে, তৎসহিত কারণদেহও থাকে। এইজন্য, স্থূলদেহেরই মৃত্যু হয়, লিঙ্গদেহের এবং কারণদেহের মৃত্যু হয় না। গীতার ১৫। ৭-৮ শ্লোকদ্বয়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমারই অংশ জীবলোকে অবিনাশী জীবাত্মা হইয়া অবস্থিত আছে। বায়ু যেমন পুষ্প বা অন্য গন্ধদ্রব্য হইতে গন্ধকে আপনার সহিত আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ দেহের ঈশ্বর অর্থাৎ দেহী জীবাত্মা যখন এক দেহ হইতে উৎক্রামণ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করে, তখন কারণ-দেহের সহিত একত্র অবস্থিত মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।" মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গ লিঙ্গদেহের অবিভাজ্য অংশ; ইহাদের নামোল্লেখ করিয়া গীতা লিঙ্গদেহকেই বুঝাইয়াছেন। লিঙ্গদেহের সহিত জীবাত্মার স্থূলদেহ হইতে উৎক্রামণ এবং অন্য স্থূলদেহ গ্রহণের তত্ত্ব বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।১ হইতে ৪।৪।৬ সূত্রগুলিতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

১২।৩।৩৪ জীবাত্মার উৎক্রামণ এবং দেহান্তরগ্রহণ পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত: ত্রিবিধ গতি

পরমাত্মারূপী কৃষ্ণ জীবাত্মার দেহ হইতে উৎক্রামণ এবং দেহান্তরগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করেন (৬০পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩৫ দ্রষ্টব্য)। পরমাত্মা প্রত্যেক দেহে থাকিয়া প্রত্যেকের প্রত্যেকটী বাক্য কার্য্য এবং চিন্তা জ্ঞাত আছেন। স্থূলদেহের মৃত্যুকালেই তিনিই লিঙ্গদেহ সহ জীবাত্মাকে দেহ হইতে উৎক্রামণ করাইয়া অতিবাহিক দেহে অধিষ্ঠিত করেন এবং যথাকালে তাহার বাসনা এবং কর্ম্ম-ফলের অনুরূপ অন্য স্থূলদেহ গ্রহণ করান। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৩।৩৬ সূত্রে

বলিয়াছেন ঃ—"যখন এই দেহ জরার দ্বারা অথবা ব্যধিদ্বারা জীর্ণ হয় তখন, আম্র ডুমুর অথবা পিপ্পল বৃক্ষ হইতে পত্র যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তদ্রূপ লিঙ্গদেহ সহ জীবাত্মাও সেই দেহ হইতে উৎক্রামণ করিয়া, পূর্ব্বে যেমন এই দেহে আসিয়াছিল সেই প্রকারে অন্য যথাযোগ্য দেহে গমন করে।" আমরা পাইলাম যে, পরমাত্মার নিয়ন্ত্রণে লিঙ্গদেহ সহ জীবাত্মা এক স্থূলদেহ হইতে উৎক্রামণ করিয়া অন্য যথাযোগ্য স্থূলদেহ গ্রহণ করে। উৎক্রামণকালে জীবাত্মার যে সকল সঞ্চিত বাসনা এবং কর্ম্মফল থাকে সেই সমস্ত ভোগ করিবার যোগ্য দেহই যথায়োগ্য দেহ। পরমাত্মাই অজ্ঞানাবৃত জীবাত্মাকে যথাযোগ্য দেহে প্রবিষ্ট করান। পাপ-পুণ্য অনুসারে কর্ম্মফল বিভিন্ন হয়। পাপকর্ম্মের ফল-ভোগের যোগ্য দেহ এবং পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগের যোগ্য দেহ একই রকম হয় না।

যথাকারী যথাচারী ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো
ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫

—"যে যেমন কার্য্য করে এবং আচরণ করে, সে সেইরূপ হয়। যে কল্যাণময় কার্য্য করে সে কল্যাণযুক্ত হয়, যে পাপ কার্য্য করে সে পাপযুক্ত হয়, যে পুণ্যকার্য্য করে সে পুণ্যযুক্ত হয়।" এইরূপে, পাপ ও পুণ্য, বাসনা ও কর্ম্মফল অনুসারে যথাযোগ্য দেহ নিরূপিত হয়। বাসনাপূরণ এবং কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত যথাযোগ্য দেহে যথাযোগ্য স্থানে গমনকে জীবাত্মার গতি বলা হয়। বেদান্ত ত্রিবিধ গতির বিষয় বলিয়াছেন। (১) দেবযান গতি ; ইহারই অন্য নাম ব্রহ্মযান গতি। উত্তরায়ণমার্গে এই গতি হয় বলিয়া ইহাকে উত্তরায়ণ-মার্গের গতি, এবং সংক্ষেপে উত্তরায়ণ মার্গও বলা হয়। (২) পিতৃযান গতি ; দক্ষিণায়নমার্গে এই গতি হয় বলিয়া ইহাকে দক্ষিণায়নমার্গের গতি এবং দক্ষিণায়ন মার্গও বলা হয়। (৩) "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" গতি। জায়স্ব=জন্মাও। ম্রিয়স্ব=মর। "জন্মাও এবং মর" গতি পূর্ব্বোক্ত দুইটী গতি হইতে ভিন্ন।

১২।৩।৫ যোগভ্রষ্ট যোগীর দেহান্তরগ্রহণ

যাঁহারা অধ্যাত্মযোগসাধনা করেন তাঁহারা যোগী। সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগীগণের জীবাত্মা মুক্তি লাভ করিয়া পরিণয়লীলায় প্রবেশ করে। যে জীবাত্মা মুক্তি লাভ করিয়াছে তাহাকে মুক্ত আত্মা বলা হয়। দেবযান গতিটী মুক্ত আত্মার

গতি। ইহার দ্বারা মুক্ত আত্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পরিণয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহার কখনই পুনর্জন্ম হয় না। এখন আমরা দ্বন্দ্বলীলার মানবের লিঙ্গদেহ সহ দেহান্তরগ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। এইজন্য, মুক্তাত্মার দেবযান গতির বিষয়ে আলোচনা এখানে না করিয়া অধ্যাত্মযোগসাধনার আলোচনার প্রসঙ্গে করিব। কিন্তু সকল যোগীই এক জীবনেই সিদ্ধি এবং মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। যে সকল যোগীর কোন না কোন জাগতিক বিষয়ে বাসনা মৃত্যুকালে থাকিয়া যায়, তাঁহাদিগকে যোগভ্রষ্ট বলা হয়। মৃত্যুকালে এইরূপ যোগভ্রষ্ট যোগীর জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ উৎক্রামণ করে এবং অন্য স্থূল-দেহে প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহাকে পুনর্জন্ম বলা হয় তাহাই ঘটে। যোগভ্রষ্ট-গণের মধ্যে যাঁহাদের বিষয়সুখভোগের কামনা থাকে, তাঁহারা প্রথমে স্বর্গে গিয়া দীর্ঘকাল তথায় সুখভোগ করিয়া সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং যাঁহাদের যোগৈশ্বর্য্যলাভের অথবা জ্ঞানলাভের কামনা থাকে তাঁহারা যোগনিষ্ঠ ব্যক্তির সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির জীবাত্মা পুনর্জন্ম লাভ করিয়া যাহাতে নবজন্মেও যোগসাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন তজ্জন্য কৃষ্ণ ঐরূপ জন্মের ব্যবস্থা করেন। গীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৪১ হইতে ৪৪ শ্লোকগুলিতে যোগভ্রষ্ট যোগীগণের এইরূপ জন্মতত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে।

১২।৩।৬ পিতৃযান গতি

যাহারা অধ্যাত্মযোগসাধনা করে না, কেবল ইহলোকের এবং পরলোকের ভোগকামনাতেই কর্ম্ম করে, ইহলোকে ভোগকামনায় অর্থ সম্পদ যশ মান প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য সারা জীবন কর্ম্ম করে, আবার বেদবিহিত যাগযজ্ঞ দেবার্চ্চনা প্রভৃতি কর্ম্ম করে এবং মানবাদি জীবগণের কল্যাণের নিমিত্ত ইষ্ট-পূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাদের জন্য পিতৃযান গতি বিহিত হইয়াছে। এইরূপ মানবের জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ স্থূলদেহ হইতে উৎক্রামণ করিয়া আতিবাহিক দেহ অবলম্বন করিয়া প্রথমে পিতৃলোকে গমন করে এবং তথা হইতে বাসনা ও কর্ম্মফল অনুসারে চন্দ্রলোকে অর্থাৎ স্বর্গে, অথবা গন্ধর্ব্বলোকে, অথবা প্রজাপতিলোকে গমন করে এবং তথায় বাস করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৪ সূত্রে চন্দ্রলোকে বা স্বর্গে গমনের উল্লেখ আছে এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।৪ সূত্রে দেবলোকে বা স্বর্গে, এবং গন্ধর্ব্ব-

লোকে এবং প্রজাপতিলোকেও গমনের উল্লেখ আছে। এই দুই শ্রুতির ঘোষণা অনুসারে পিতৃযানগতিপ্রাপ্ত জীবাত্মা বাসনা ও কর্ম্মফল অনুসারে দেবলোকে, গন্ধর্ব্বলোকে, অথবা প্রজাপতিলোকে পিতৃলোক হইতে গমন করে এবং তথায় পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগান্তে পুনরায় জগতে জন্মগ্রহণ করে। "তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বাহথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।" ছান্দোগ্য ৫।১০।৫। —"যতদিন না তাহাদের পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ শেষ হয়, ততদিন স্বর্গে বাস করিবার পরে যে পথে তাহারা স্বর্গে গমন করিয়াছিল সেই পথেই পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে।" অর্থাৎ, তাহারা স্বর্গ হইতে পুনরায় পিতৃলোকে এবং পিতৃলোক হইতে পুনরায় জগতে ফিরিয়া আসে।

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ মুণ্ডক ১।২।১০

—"যে মূঢ় ব্যক্তিগণ ইষ্টাপূর্ত্তকেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম মনে করে, তাহারা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মযোগসাধনার বিষয় অবগত হয় না। তাহারা সুখময় স্বর্গপৃষ্ঠে পুণ্যফল ভোগ করিয়া মনুষ্যলোকে অথবা হীনতর লোকে জন্ম গ্রহণ করে।" (মুণ্ডকোপনিষদের এই তত্ত্ব গীতার ৯।২০-২১ শ্লোকদ্বয়েও ঘোষিত হইয়াছে।) তাহারা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম ব্যতীত অন্য যে সমুদয় শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই সকল কর্ম্মের উপযুক্ত ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত জগতে পুনরাবর্ত্তন করিয়া যথাযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হয়।

তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশে হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্
ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাহথ য ইহ
কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্ শ্বযোনিং
বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা। ছান্দোগ্য ৫।১০।৭

—"স্বর্গলাভকারীগণের মধ্যে যাহারা স্বর্গলাভের পূর্ব্বে শুভ কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহারা স্বর্গভোগের পরে শীঘ্র ব্রাহ্মণযোনিতে, অথবা ক্ষত্রিয়যোনিতে, অথবা বৈশ্যযোনিতে পুনর্জন্ম লাভ করে, এবং যাহারা অশুভ কর্ম্ম করিয়াছিল তাহারা স্বর্গভোগান্তে শীঘ্র কুক্কুরযোনিতে, অথবা শূকরযোনিতে, অথবা চণ্ডালযোনিতে পুনর্জন্ম লাভ করে।" স্বর্গভোগের পরেও তৎপূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মের সঞ্চিত ফলে চণ্ডাল, কুক্কুর, অথবা শূকর যোনিতেও পুনর্জন্ম হয় এবং তৎপূর্ব্বকৃত শুভকর্ম্মের ফলে সদ্‌বংশে, উচ্চবংশে, ধনীর বংশে পুনর্জন্ম হয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে এই তত্ত্বও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, মানব যদি অধ্যাত্মযোগসাধনা না করে, এবং যাগযজ্ঞও না করে, কিন্তু যদি পাপকর্ম্ম না করে, তাহা হইলেও, মৃত্যুর পর স্বর্গভোগ না হইলেও, মানবদেহেই পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়, এবং যদি মানবের ও মানবেতর প্রণীগণের কল্যাণে হিতকর কার্য্য করে, তাহা হইলে স্বর্গভোগ না হইলেও মানবজন্মই প্রাপ্ত হয় এবং সদ্‌বংশে, উচ্চবংশে, ধনীর বংশে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে।

১২।৩।৭ "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" গতি

যাহারা অধ্যাত্মযোগসাধনা করে না, যাগযজ্ঞাদি এবং দেবতার্চ্চনা করে না, ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করে না, অথবা মানবের বা অন্য প্রাণীর জন্য কোন হিতকর কর্ম্ম করে না, কেবল জাগতিক সম্পদ, বিষয়ভোগ এবং ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি চাহে এবং তজ্জন্য পরহিংসা, পরদ্বেষ, অথবা পরস্বাপহরণ করে, তাহাদের জন্য "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" নামক তৃতীয় গতি বিহিত হইয়াছে। মৃত্যুর পর এইরূপ ব্যক্তির জীবাত্মা লিঙ্গদেহসহ হীনযোনিতে জন্মলাভ করে।

অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণচন তানীমাণি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি
ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানম্। ছান্দোগ্য ৫।১০।৮

—"যাহারা দেবযান বা পিতৃযান এই উভয়গতির মধ্যে কোনটীতে গমন করে না, সেই সকল মানব 'জন্মাও এবং মর' গতি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর গতি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ভূত হয়। এইরূপ জন্ম তৃতীয় স্থান।" ক্ষুদ্র ভূত বলিতে কেবল ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্ট প্রণীই বুঝায় না; ইহার অর্থ নীচ এবং অধম প্রাণী। এইরূপ প্রাণী অতি নিম্নস্তরের মানব হইতে পারে অথবা পশু পক্ষী সরীসৃপ পতঙ্গ দংশ মশক প্রভৃতিও হইতে পারে। এই তত্ত্ব গীতার ১৬।১৯ শ্লোকেও ঘোষিত হইয়াছে। "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" গতির জীবাত্মা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দেহসমূহের মধ্যে কোন একটীতে অবস্থান করিয়া সেইটীর মৃত্যুর পরে ঐরূপ অন্য একটীতে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে, হীনযোনিতে তাহার জন্ম-মৃত্যু, মৃত্যুর পরেই আবার জন্ম-মৃত্যু, এই প্রকারের "জন্মাও এবং মর" গতি লাভ হয়। ইহা জীবাত্মার ক্রমাবনতি। ক্রমাবনতির গতি প্রাপ্ত মানবের জীবাত্মার আবার ক্রমোন্নতি হইবেই, কিন্তু কতকাল এই গতিতে থাকিয়া পুনরায় ক্রমোন্নতির গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা স্রষ্টা পরমেশ্বরই জানেন;

এই তত্ত্ব স্রষ্টার বিধান অনুসারে মানবের নিকট চিরগুপ্ত। কেন চিরগুপ্ত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। একজন মানবের পিতা পুত্র বা অন্য কোন প্রিয়জন মৃত্যুর পরে একটী শূকর, ব্যাঘ্র, বা মশক দেহে জন্মলাভ করিল। সেই মানব যদি জানিতে পারিত যে সেই শূকর, ব্যাঘ্র, বা মশকটী তাহার সেই প্রিয়জন, তাহা হইলে তাহার কিরূপ মানসিক অবস্থা হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্য মানবদেহে জন্মগ্রহণ করিলেও যদি তাহা জানিতে পারা যাইত, তাহা হইলেও নানারূপ জটিল অবস্থার উদ্ভব হইত। এই অবস্থা নিবারণের জন্য স্রষ্টার বিধান অনুসারে উক্ত তত্ত্বটী মানবের নিকট চিরগুপ্ত। কিন্তু পরমেশ্বর সৃষ্টিকালেই বেদ প্রকাশ করিয়া মানবকে জানাইয়া দিয়াছেন যে মানব যদি তাঁহার বিধান অনুসারে না চলে, তাহা হইলে তাহাকে "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" গতি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমাবনতির পথে নামিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং, মানব স্বয়ংই তাহার ক্রমাবনতির জন্য দায়ী।

১২।৩।৮ আতিবাহিক দেহ

এই স্থূল জগতে, লিঙ্গদেহ সহ জীবাত্মা স্থূল আধারে ব্যতীত থাকিতে পারে না। পাঞ্চভৌতিক দেহই এই স্থূল আধার। জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ স্থূল দেহ হইতে আতিবাহিক দেহ অবলম্বন করিয়া উৎক্রামণ করে, এবং পিতৃযান ও জায়স্ব-ম্রিয়স্ব গতিদ্বয়ের মধ্যে যে গতিটী যে জীবাত্মার প্রাপ্য, তাহা প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সেই গতি অনুসারে জীবাত্মাকে যেরূপ দেহান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, সেই দেহে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ আতিবাহিক দেহে অবস্থান করে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকেও জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের জীবাত্মাও লিঙ্গদেহ সহ আতিবাহিক দেহ অবলম্বনে নূতন দেহে গমন করে। পিতৃযানগতিপ্রাপ্ত যে জীবাত্মা স্বর্গে গমন করে, সে প্রথমে পিতৃলোকে যায় এবং তথা হইতে স্বর্গে বা গন্ধর্ব্বাদি লোকে গিয়া অবস্থান করে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্থূলদেহ হইতে উৎক্রামণ হইতে স্বর্গে গমন পর্য্যন্ত সময় জীবাত্মা আতিবাহিক দেহে অধিষ্ঠিত থাকে; লিঙ্গদেহ সহ থাকে তাহা বারে বারে বলিবার প্রয়োজন হইবে না। স্বর্গে গিয়া আতিবাহিক দেহ কান্তি লাভ করে; তখন আর তাহাকে আতিবাহিক দেহ বলা হয় না; তখন তাহা দিব্য দেহ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৪।৪।৪ সূত্রে বলিয়াছেন যে, স্বর্গে বা গন্ধর্ব্বাদি লোকে গিয়া জীবাত্মা নবতর এবং কল্যাণতর রূপ প্রাপ্ত হয়। "নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে।" বৃহদারণ্যক ৪।৪।৪। স্বর্গাদি লোকে গিয়া দিব্যদেহলাভই নবতর এবং কল্যাণতর রূপ প্রাপ্তি। দেবযানপথে যাঁহারা গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধামে যান, তাঁহারাও নবতর এবং কল্যাণতর রূপ প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু সেই রূপ স্বর্গাদি লোকের রূপের ন্যায় নহে; দেবযানগতির বিবরণপ্রসঙ্গে সেই রূপের বিবরণও প্রদত্ত হইবে। যে জীবাত্মাকে জায়স্ব-ম্রিয়স্ব গতি অনুসারে হীনদেহে জন্মলাভ করিতে হইবে, তাহাও স্থূলদেহ হইতে উৎক্রামণ সময় হইতে নূতন স্থূলদেহে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত আতিবাহিক দেহেই অবস্থান করে। যে স্থূলদেহ হইতে জীবাত্মা উৎক্রামণ করে সেই দেহের স্থূলভূতের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা গঠিত এবং সেই দেহেরই আকৃতিবিশিষ্ট দেহকে আতিবাহিক দেহ বলা হয়। ঈশ্বরের বিধান অনুসারে, স্থূলদেহের মৃত্যুকালে, সেই স্থূলদেহ হইতেই আতিবাহিক দেহটী উদ্গত হয়, এবং জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ সেই আতিবাহিক দেহটীতে অবস্থিত হইয়া মুমূর্ষু স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে এবং তখনই মুমূর্ষু স্থূলদেহটীর মৃত্যু হয়। আতিবাহিক দেহ পঞ্চতান্মাত্রিক দেহ নহে; ইহা স্থূলভূতের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা গঠিত, এইজন্য ইহাও পাঞ্চভৌতিক দেহ। স্বর্গগামী জীবাত্মা আতিবাহিক দেহে পিতৃলোকে গমন করে এবং স্বর্গে যতদিন থাকে, দিব্যকান্তিলব্ধ আতিবাহিক দেহেই থাকে। জায়স্ব-ম্রিয়স্ব গতি প্রাপ্ত জীবাত্মা হীন প্রাণীদেহে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আতিবাহিক দেহেই এই পৃথিবীতে অথবা প্রেতলোকে অবস্থান করে। স্বর্গগামী জীবাত্মা যতদিন আতিবাহিক দেহে পিতৃলোকে অবস্থান করে ততদিন তাহাকে প্রেত বা প্রেতাত্মা বলা হয়; জায়স্ব-ম্রিয়স্ব গতিপ্রাপ্ত জীবাত্মা অন্য হীনদেহে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অথবা প্রেতলোকে যতদিন আতিবাহিক দেহে অবস্থান করে, ততদিন তাহাকেও প্রেত বা প্রেতাত্মা বলা হয়। স্বর্গগামী পিতৃলোকবাসী প্রেতাত্মা হীনযোনিগামী পৃথিবীবাসী প্রেতাত্মা অপেক্ষা উচ্চতর। আতিবাহিক শব্দটীর অর্থ, যাহা এক অবস্থাকে অতিক্রম করাইয়া অন্য অবস্থায় বহন করিয়া লইয়া যায়। এই দেহ জীবত্মাকে এক অবস্থাকে অতিক্রম করাইয়া অন্য অবস্থায় বহন করিয়া লইয়া যায় বলিয়া ইহার নাম আতিবাহিক দেহ। প্রেত শব্দের অর্থ, প্র=প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে,

ইত=স্থূলদেহ হইতে উৎক্রান্ত। স্থূলদেহে আবদ্ধ জীবাত্মা শূন্যমার্গে অথবা স্থূলবস্তুর ব্যবধান ভেদ করিয়া গমনাগমন করিতে পারে না, কিন্তু আতিবাহিক দেহের সূক্ষ্মত্বহেতু এই দেহে অবস্থিত জীবাত্মা অর্থাৎ প্রেতাত্মা শূন্যমার্গে অথবা স্থূলবস্তুর ব্যবধান ভেদ করিয়া গমনাগমন করিতে পারে। যে স্থূলদেহটীর মৃত্যুর পর জীবাত্মা প্রেতত্ব লাভ করে, কেবল সেই দেহটীর জীবনকালের স্মৃতি প্রেতের থাকে কারণ মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবিতাবস্থাতেও জীবাত্মার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকে না। অতিবাহিক দেহ সাধারণতঃ চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু চেষ্টা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রাটক সাধন নামক একপ্রকার দৃষ্টিসাধন আছে। যাঁহারা ত্রাটক সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা অতিবাহিক দেহ দেখিতে পান। অধ্যাত্মযোগসাধনায় অগ্রসর হইলেও উহা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ ক্রমাগত ছয় মাস রাত্রিকালে একেবারেই আলোক ব্যবহার না করিয়া অন্ধকারে দেখিতে অভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষু অতিবাহিক দেহ দেখিতে পাইবার শক্তি লাভ করে। কুকুরাদি নিশাচর প্রাণীগণ প্রেত দেখিতে পায়। প্রেতাত্মা ইচ্ছা করিলে স্বীয় অতিবাহিক দেহকে যে কোন মানবের দৃষ্টিগোচর করিতে পারে এবং বাক্যালাপও করিতে পারে।

১২।৩।৯ জীবাত্মার নূতন স্থূলদেহে প্রবেশ

সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণে আমরা পাইয়াছি যে ব্রহ্মা কারণদেহ এবং লিঙ্গদেহ সৃষ্টি করেন নাই, ব্যষ্টিজীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং সমষ্টি কারণদেহের অংশ ব্যষ্টি কারণদেহ রূপে এবং সমষ্টিলিঙ্গদেহের অংশ ব্যষ্টি লিঙ্গদেহ রূপে ব্রহ্মার সৃষ্ট স্থূলদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে যে জীবদেহ উৎপন্ন হয়, তাহাও পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ; পিতামাতা কারণদেহ এবং লিঙ্গদেহ সৃষ্টি করেন না এবং করিতে পারেন না। পিতার শুক্রকীট (Spermatoaza) এবং মাতার শোণিতের (Ovum) মিলনে মাতৃগর্ভে স্থূলদেহের ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। শুক্রকীটে পিতার এবং শোণিতে মাতার প্রাণশক্তি থাকে। এই সম্মিলিত প্রাণশক্তির ক্রিয়ায় ভ্রূণ যখন মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখনও মাতার প্রাণশক্তি ভ্রূণে সঞ্চারিত হইতে থাকে এবং ভ্রূণ মাতৃদেহ হইতে গর্ভপুষ্পের দ্বারা (through the placenta) স্বীয় বৃদ্ধির এবং পুষ্টির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হয়। ভ্রূণ যখন সর্ব্বাবয়ব-

বিশিষ্ট হয়, তখন পরমাত্মা-কৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণাধীনে জীবাত্মা কারণদেহ এবং লিঙ্গ-দেহ সহ ভ্রূণের মধ্যে প্রবেশ করে, তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভ্রূণের মধ্যে কারণদেহ, লিঙ্গদেহ এবং জীবাত্মা থাকে না। গর্ভাভ্যন্তরস্থ ভ্রূণদেহে প্রবিষ্ট হইয়া জীবাত্মা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় এবং কারণদেহ সহ লিঙ্গদেহের সূক্ষ্ম অবয়বসমূহ স্থূল ভ্রূণদেহ-কোশে অধিষ্ঠিত হয়। যে অতিবাহিকদেহে জীবাত্মা ভ্রূণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেই অতিবাহিক দেহের সূক্ষ্ম উপাদান ভ্রূণের স্থূল পাঞ্চভৌতিক উপাদানে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে নির্দ্দিষ্টকাল গর্ভবাসের পরে ভ্রূণ যথাকালে ভূমিষ্ঠ হয়। ভ্রূণের জন্মলাভে কারণদেহ এবং লিঙ্গদেহ সহ জীবাত্মার পুনর্জন্ম লাভ হয়। এইরূপে জীবাত্মা নূতন স্থূলদেহ এবং ভোগায়তন প্রাপ্ত হয়। আমরা পাইলাম যে, জীবাত্মা যে নূতন স্থূলদেহে প্রবেশ করে, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কারণদেহ এবং লিঙ্গদেহ সহ প্রবেশ করে এবং অব্যবহিত পূর্ব্ব জন্মের স্থূলদেহের সূক্ষ্মাংশদ্বারা গঠিত অতিবাহিকদেহের সহিতও প্রবেশ করে। এইজন্য, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসমূহের সকল সঞ্চিত বাসনা এবং কর্ম্মফল সহ জীবাত্মার নূতন স্থূলদেহে প্রবেশ হয়, এইজন্যই জীবাত্মার পূর্ব্বসংস্কারসমূহ নূতন জন্মেও থাকে। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের স্থূলদেহের সূক্ষ্মাংশদ্বারা গঠিত অতিবাহিক দেহটী নূতন স্থূলদেহে বিলীন হইয়া যাওয়ায়, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের স্থূল-দেহেরও সূক্ষ্মাংশ নূতন স্থূলদেহে থাকে; এইজন্য নূতন স্থূলদেহে পূর্ব্বজন্মের স্থূলদেহের সংস্কারও কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। গর্ভবাসকালে জীবাত্মার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকে এবং জন্মের পরেও শিশু যতদিন কথা কহিতে না শিখে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকে; কথা কহিতে শিখিলে সেই স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাও ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধান। গর্ভবাস হইতে শিশুর বাক্যস্ফূর্ত্তিকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকায় জীবাত্মার পূর্ব্বজন্মের অকর্ম্মের এবং বিকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা হয়; কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তির পরেও মানবের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকিলে পূর্ব্বজন্মের আত্মীয়বন্ধুগণের, ঘরবাড়ী বিষয়সম্পত্তির এবং অন্য প্রিয়বস্তুর প্রতি তাহার আসক্তি এবং আকর্ষণ হইত এবং ইহার ফলে মানবজীবনে বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হইত। জীবাত্মার অস্তিত্বে এবং জন্মান্তরগ্রহণে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে কৃষ্ণ কচিৎ কাহাকেও জাতিস্মর করেন, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে। মানবদেহের জীবাত্মা কুকর্ম্ম-ফলে মানবেতর প্রাণীদেহ প্রাপ্ত হইলে গর্ভবাসকালে এবং জন্মের পরেও আমরণ

তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকে, কিন্তু ভাষার অভাবে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। এইরূপ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ স্মৃতি থাকিলেও মানবেতর প্রাণীদেহের গুণ এবং স্বভাবের বশে জীবাত্মা সেই প্রাণীর ন্যায় আচরণ এবং অবস্থান করে। অধোগতিপ্রাপ্ত জীবাত্মার এইরূপ স্মৃতি থাকাও ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধান। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি তাহাকে অধোগতির বিষয় স্মরণ করাইয়া অনুতাপে দগ্ধ করে এবং ইহার ফলে তাহার পুনরায় মানবদেহপ্রাপ্তির উপায় হয়।

১২।৩।১০ কর্ম্মফল জগতে অসাম্যের কারণ ঃ কর্ম্মফল মানবের সৃষ্ট

জীবজগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মানব বা মানবেতর প্রাণীগণের কেহ সুখে আছে, কেহ দুঃখভোগ করিতেছে। মানবগণের মধ্যে জাতি, কর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি নানাবিষয়েও অসাম্য দেখা যায়। যাঁহারা কর্ম্মফলের তত্ত্বটি না জানিয়া অথবা না মানিয়া অসাম্যের কারণনির্ণয়ের চেষ্টা করেন, তাঁহারা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কর্ম্মফলের জন্য সুখ বা দুঃখ, উচ্চজন্ম বা নীচজন্ম, প্রভৃতি নানাবিধ অসাম্য উপস্থিত হয়। কর্ম্মফলের তত্ত্ব ব্যতীত এইরূপ অসাম্যের কারণ নির্ণয় করা যায় না। এমন দেখা যায় যে, কোন মানব পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে, সুযোগসুবিধাসত্ত্বেও, বিদ্যা বা ধন উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে না, কেহ বা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়াও করিতে পারিতেছে। কেহ অন্যায় না করিয়াও দুঃখ ভোগ করিতেছে, কেহ অন্যায় করিয়াও সুখে আছে ; কেহ পাপকর্ম্ম করিয়াও জীবিত আছে, কেহ পুণ্যকর্ম্ম করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের তত্ত্ব ব্যতীত এই সকল সমস্যার সমাধান হয় না। কর্ম্মের ফলই জগতে অসাম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ঈশ্বর মানব সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু কর্ম্মফল সৃষ্টি করেন নাই। আদিম সৃষ্টির সময় প্রথমসৃষ্ট মানবগণ কর্ম্মফলসহ সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু ত্রিগুণ এবং অবিদ্যার প্রভাবে মানব বাসনাবশে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল সৃষ্টি করিয়াছে।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ গীতা ৫।১৪

—"ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলভোগ সৃষ্টি করেন নাই।

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে।" আদিম সৃষ্টির পর এইরূপে উৎপন্ন কর্ম্মফলের নিমিত্ত ক্রমশঃ উচ্চজন্ম নীচজন্ম, সুখ দুঃখ, প্রভৃতি নানাবিধ অসাম্য মানবজগতে আসিয়াছে। যেহেতু মানব অবিদ্যার বশীভূত, সেইহেতু জগতে অসাম্যের কারণ কর্ম্মফল থাকিবেই এবং সেই কারণের কার্য্য অসাম্যও থাকিবে; এই অসাম্য দূর করিবার নিমিত্ত যে সকল দেশে Communism প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল দেশের মানবগণের মধ্যেও উচ্চজন্ম, নীচজন্ম, সুখ, দুঃখ, বিদ্যা ও বুদ্ধির অল্পবিস্তরতা, সামাজিক অবস্থাভেদ, কর্ম্মভেদ প্রভৃতি নানাবিধ অসাম্য আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মানবদেহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কারণদেহ

১৩।১।১ ক্ষেত্র

গীতা দেহকে ক্ষেত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে" গীতা ১৩।১—"হে অর্জ্জুন, এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়।" বিশ্ববাসী সমুদয় স্থাবরজঙ্গমসহ সমগ্র বিশ্বটী সমষ্টি জড়দেহ। ইহার মধ্যে সমষ্টি কারণদেহের এবং সমষ্টি লিঙ্গদেহের অংশ আছে। ইহা দ্বন্দ্বপরিণয়ের লীলার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র। এই সমষ্টিদ্বন্দ্বক্ষেত্রের প্রত্যেক অংশও এক একটী দ্বন্দ্বক্ষেত্র। ইহারা ব্যষ্টি দ্বন্দ্বক্ষেত্র। বিশ্বের অন্তর্গত এই জগৎ এবং অন্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহের প্রত্যেকটী এক একটি দ্বন্দ্বক্ষেত্র। ইহারা ব্যষ্টি দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্র। এই জগতের এবং অন্য সকল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক স্থাবরের এবং প্রত্যেক জঙ্গমের দেহ এক একটী দ্বন্দ্বক্ষেত্র। ইহারাও ব্যষ্টি দ্বন্দ্বক্ষেত্র। অসংখ্য ব্যষ্টি ক্ষেত্রের মধ্যে মানবদেহ এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। গীতা ক্ষেত্রের উপাদান সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন :—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ গীতা ১৩।৫-৬

—"পঞ্চ স্থূল মহাভূত (ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম), অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) অব্যক্ত (প্রকৃতি), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (হস্ত পদ বাক্ পায়ু উপস্থ), মন, পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ), এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ সঙ্ঘাত চেতনা ধৃতি এই সপ্ত বিকারের সহিত ক্ষেত্রতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিলাম।" সপ্ত বিকার ক্ষেত্রের উপাদান নহে, ক্ষেত্রের বিকার। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সকল ক্ষেত্রের অর্থাৎ জীবদেহের উপাদান। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং সপ্ত বিকার জড় বস্তু। আমাদের আলোচ্য বিষয় মানবদেহ। আমরা পাইয়াছি যে প্রত্যেক ব্যষ্টি স্থূলদেহে ব্যষ্টি কারণদেহ এবং ব্যষ্টি লিঙ্গদেহ বিদ্যমান আছে। সুতরাং, প্রত্যেক মানবদেহ কারণদেহ লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহের সমবায় এবং সমাহার। আমরা এই ত্রিবিধ দেহের বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করিব। ত্রিবিধ দেহের পরিচয়ের দ্বারা সমগ্র মানবদেহটীকে বুঝা যাইবে।

১৩।১।২ কারণদেহ

আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় পাইয়াছি যে অব্যক্ত অর্থাৎ সাম্যাবস্থাপন্না এবং বিক্ষোভহীনা প্রকৃতি কারণদেহ। বিক্ষোভহীনা প্রকৃতিরই অংশ ব্যষ্টি কারণদেহ। প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হইয়া দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতি স্বয়ং দ্বন্দ্বহীন; প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই; কারণ প্রকৃতির ত্রিগুণ সাম্যাবস্থাপন্ন এবং পুরুষ কর্ত্তৃক বিক্ষোভিতা না হইলে প্রকৃতি বিক্ষোভহীনা। এইজন্য প্রত্যেক মানবদেহের অন্তর্গত ব্যষ্টি লিঙ্গদেহ এবং ব্যষ্টি স্থূলদেহ দ্বন্দ্বময় দ্বন্দ্বক্ষেত্র, কিন্তু ব্যষ্টি কারণদেহ সাম্যাবস্থাপন্ন এবং বিক্ষোভহীন। এই কারণে কারণদেহে কামক্রোধাদি রিপু নাই এবং দ্বন্দ্বও নাই। ইহা মানবদেহের সূক্ষ্মতম অংশ। মস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চস্থানে অবস্থিত সহস্রারের অব্যবহিত নিম্নে কারণ-দেহের অধিষ্ঠান। অধ্যাত্মযোগসাধনার ফলে যোগীর জীবাত্মা যখন দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্বাতীত হয়, তখন সে দ্বন্দ্বহীন কারণদেহে উপনীত হইতে

পারে। তখন লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহ জীবাত্মার যোগসাধনার সহায়ক হইয়া থাকে। কিন্তু কারণদেহও ত্রিগুণময়ী মায়া বলিয়া, কারণদেহে অবস্থানকালেও জীবাত্মা ত্রিগুণের এবং মায়ার মধ্যেই থাকে এবং সেই অবস্থার যোগীর মৃত্যু হইলে তাঁহাকে মায়াময় বিশ্বে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু তাহা সদ্বংশে অতি উচ্চ এবং দুর্ল্লভ জন্ম। যোগীর জীবাত্মা যখন কারণদেহকেও অতিক্রম করিয়া সহস্রারে উপনীত হয়েন, তখন তিনি ত্রিগুণাতীত এবং মায়াতীত হয়েন এবং সমাধি লাভ করেন। এই অবস্থা লাভ করিয়া যোগী যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহার অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলা হয়। এইরূপ যোগী কারণদেহে অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে নিয়তর দেহদ্বয়ের ব্যাপার দেখেন মাত্র, কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হয়েন না। জীবন্মুক্ত যোগীর জীবাত্মা সহস্রারে গিয়া সমাধিতে দেহত্যাগ করেন এবং আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন না। মানবাত্মা স্থূলদেহকে এবং লিঙ্গদেহকে অতিক্রম করিতে না পারিলে কারণদেহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লিঙ্গদেহ

১৩৷২৷১ লিঙ্গদেহের উপাদান

সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় আমরা সমষ্টি লিঙ্গদেহের পরিচয় পাইয়াছি। তাহার একাংশই ব্যষ্টি লিঙ্গদেহ। লিঙ্গদেহ সূক্ষ্মবস্তু বলিয়া ইহার অন্য নাম সূক্ষ্ম দেহ। লিঙ্গদেহের অষ্টাদশ উপাদান:—(১) মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি (২) অহঙ্কার (৩) মন (৪-৮) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (৯-১৩) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (১৪-১৮) পঞ্চ তন্মাত্র। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই অষ্টাদশ তত্ত্বও ত্রিগুণময় এবং জড় বস্তু; প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তিসমূহ ইহাদের মধ্যে যে সকল কার্য্যকারী রূপে বিদ্যমান আছে, তাহা সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধি লিঙ্গদেহের প্রধান অংশ বলিয়া বুদ্ধিতে উক্ত শক্তিসমূহের অধিষ্ঠান, এবং বুদ্ধি হইতে তাহার বিকার অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারের বিকার অন্য তত্ত্বগুলিতে সঞ্চারিত হয়। এইজন্য সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

১৩।২।২ বুদ্ধির বৈচিত্র এবং সাধারণ ধর্ম্ম

বুদ্ধির সত্ত্বরজস্তমোগুণ কখনও সাম্যাবস্থাপন্ন এবং বিক্ষোভহীন হয় না। ত্রিগুণ এইরূপ অবস্থায় একমাত্র কারণদেহেই থাকে, কিন্তু লিঙ্গদেহে থাকে না ; এইজন্য বুদ্ধিতে সাম্যাবস্থা নাই এবং বুদ্ধি সর্ব্বদা বিক্ষুব্ধ এবং দ্বন্দ্বময়। সকল মানবের লিঙ্গদেহে বুদ্ধির পরিমাণ সমান নহে এবং সকল বুদ্ধির ত্রিগুণও সমপরিমাণ নহে। কাহারও বুদ্ধির সত্ত্ব, কাহারও রজঃ, এবং কাহারও তমঃ অধিক এবং প্রবল। সত্ত্বপ্রবল বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক বুদ্ধি, রজঃ-প্রবল বুদ্ধিকে রাজসিক বুদ্ধি, এবং তমঃ-প্রবল বুদ্ধিকে তামসিক বুদ্ধি বলা হয়। সাত্ত্বিক বুদ্ধিরও সত্ত্বগুণ সকল ক্ষেত্রে সমপরিমাণ এবং সমান প্রবল নহে ; রাজসিক এবং তামসিক বুদ্ধিরও তদ্রূপ। কাহারও বুদ্ধির সত্ত্বরজঃ প্রবল, কাহারও রজস্তমঃ প্রবল ; এইরূপ যুগ্মগুণের প্রাবল্যও সকল ক্ষেত্রে সমান নহে। ইহাই বুদ্ধির বৈচিত্র। যেমন জগতের কোন দুইটী মানব দেখিতে ঠিক একরূপ নহে, এমনকি যমজ ভ্রাতাগণকেও বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে কোন-না-কোন অংশে ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ, জগতের কোন দুইটী মানবের বুদ্ধি ঠিক একপ্রকার নহে। যদি সকল মানব দেখিতে ঠিক একরূপ হইত, তাহা হইলে মানবগণের মধ্যে রূপগত কোন পার্থক্যই থাকিত না এবং একজন মানবকে দেখিলে জগতের সকল মানবের রূপ জ্ঞাত হওয়া যাইত। যদি সকল মানবের বুদ্ধি ঠিক একপ্রকার হইত, তাহা হইলে মানবগণের মধ্যে কোন বুদ্ধিগত পার্থক্যই থাকিত না এবং একজন মানবকে জানিতে ও বুঝিতে পারিলে সকল মানবকে জানা ও বুঝা যাইত। কিন্তু কৃষ্ণের বিশ্বলীলার বৈচিত্র এই যে, কোন দুইটী মানবের দেহের রূপও ঠিক একই প্রকার নহে এবং বুদ্ধিও ঠিক একপ্রকার নহে। বুদ্ধির এই বৈচিত্রের নিমিত্ত, কোন একজন মানবকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতে ও বুঝিতে হইলে তাহার নিজস্ব বাক্য, কার্য্য এবং চিন্তাধারার দ্বারা তাহাকে বুঝিতে হয়। সকল মানবের বুদ্ধির উপাদান একই বলিয়া সকল মানবের বাক্য কার্য্য এবং চিন্তার মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রত্যেক মানবের বুদ্ধি ভিন্ন প্রকারের বলিয়া, সেই সাধারণ সাদৃশ্যের দ্বারা কোন একজন মানবকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারা যায় না। বুদ্ধির বৈচিত্র মানবকে দুর্জ্ঞেয় করিয়াছে। বুদ্ধির সমুদয় প্রকারভেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং

তামসিক বুদ্ধির পরিচয় আমরা দিব। তাহা হইতে অন্যান্য প্রকারের বুদ্ধির পরিচয় অনুমান এবং বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে। সকল প্রকারের বুদ্ধির সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা, নিশ্চয়াত্মিকা এবং অধ্যবসায়ী। সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক বুদ্ধি নিজ নিজ কামনার অনুকূল বিষয় পাইতে চাহে ; ইহা বুদ্ধির ব্যবসায়াত্মিকতা। কোন্ বিষয় কামনার অনুকূল এবং কোন্ বিষয় প্রতিকূল, বুদ্ধি তাহা বিচার করিয়া নিশ্চয় করে ; ইহা বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকতা। বুদ্ধি যে সকল বিষয়কে স্বীয় কামনার অনুকূল বলিয়া নিশ্চয় করে, তাহা প্রাপ্ত হইবার এবং ভোগ করিবার জন্য প্রয়াস করে ; ইহা বুদ্ধির অধ্যবসায়। বুদ্ধি স্থূল বাহ্য বিষয়কে জনিতে এবং ভোগ করিতে চাহে ; বুদ্ধি যে বাহ্য বিষয়কে জানিতে অথবা ভোগ করিতে চাহে, তাহা যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণীয় বস্তু, সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই বস্তুর সংযোগসাধনের জন্য মনকে নিয়োজিত করে। ইহাই বুদ্ধির জ্ঞাতব্য বিষয়ে মনোযোগ। মনোযোগ ব্যতীত বুদ্ধি জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। মন ইন্দ্রিয়কে স্থূল বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করে এবং ইন্দ্রিয় হইতে সেই স্থূল বিষয়ের তান্মাত্রা গ্রহণ করিয়া তাহা বুদ্ধিকে অর্পণ করে। বুদ্ধি সেই তন্মাত্রা অবলম্বনে বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা এবং বিচার করিয়া জ্ঞান লাভ করে। বুদ্ধি যে বিষয় ভোগ করিতে চাহে তাহাতেও উক্ত প্রকারের মনোযোগ দেয়, মন ভোগ্য বিষয়ের সহিত যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ের সংযোগসাধন করে, ইন্দ্রিয় হইতে সেই বিষয়ের তন্মাত্রা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিকে অর্পন করে, এবং বুদ্ধি সেই তন্মাত্রা সম্ভোগ করে।

১৩।৩।২ সাত্ত্বিক বুদ্ধি

যে বুদ্ধির সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ এবং প্রবল হইয়া রজস্তমোগুণদ্বয়কে অভিভূত করিয়াছে, তাহা সাত্ত্বিক বুদ্ধি। ত্রিগুণের মধ্যে কোন একটী অন্য দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র থাকে না। গুণত্রয় নিত্য একত্র অবস্থিত এবং পরস্পরের সহায়ক। সাত্ত্বিক বুদ্ধির রজস্তমোগুণ সত্ত্বগুণের সহায়ক। সাত্ত্বিকবুদ্ধি মানবই সাত্ত্বিক মানব। কামনাশক্তি সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে কামাদি রিপু উৎপন্ন করে না, কিন্তু জ্ঞানলাভের কামনা উৎপন্ন করে। এইজন্য সাত্ত্বিক মানব তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয় এবং জ্ঞানলাভ করিবার জন্য কর্ম্ম করে। এই লক্ষণের দ্বারা বুঝা যায় যে মানবের বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইয়াছে। সাত্ত্বিক বুদ্ধির রজস্তমোগুণ

সত্ত্বগুণের দ্বারা অভিভূত থাকে বলিয়া সাত্ত্বিক বুদ্ধি জড়বস্তুবিষয়ক জ্ঞানলাভে আবদ্ধ থাকে না, শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া, শাস্ত্রতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, বিশ্বকে এবং মানবকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে বিচার ও গবেষণা করিয়া ঈশ্বরের এবং জীবাত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। বুদ্ধি জড় বস্তু, এইজন্য বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইলেও ঈশ্বরকে এবং জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; কিন্তু সাত্ত্বিক বুদ্ধি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া মুক্তি, পরিণয় ও বিজ্ঞান লাভের নিমিত্ত জীবাত্মার অধ্যাত্মযোগসাধনায় সহায়তা করে, বিরুদ্ধাচরণ করে না। জীবাত্মার সহযোগী এইরূপ সাত্ত্বিক বুদ্ধিকে গীতা আত্মবুদ্ধি নামে অভিহিত করিয়াছেন (গীতা ১৮।৩৭)। অভয়, চিত্তপ্রসাদ, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অকুটিলতা, দয়া, গর্ব্বহীনতা লোভহীনতা, ধীরতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তরশুচিতা, অদ্রোহ, অভিমানশূন্যতা, এইগুলি সাত্ত্বিক মানবের গুণ এবং অবস্থা। সমগ্রভাবে উহারাই গীতায় দৈবী সম্পদ নামে অভিহিত হইয়াছে। গীতা ঘোষণা করিয়াছেন: "দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায়।" গীতা ১৬।৫—"দৈবী সম্পদ মোক্ষলাভের কারণ হয়।" উক্তরূপ দৈবীসম্পদলাভে সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে যে প্রসন্নতার উদয় হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। সাত্ত্বিক মানব মুক্তি এবং পরিণয় লাভ করিতে না পারিলে তাঁহাকে সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু দৈবীসম্পদপ্রাপ্তির ফলে তিনি দীর্ঘকাল দেবলোকে বাস করিয়া সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন (গীতা ১৪।১৪)। রজস্তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব প্রবল না হইলে মানব অধ্যাত্মযোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহে না এবং হইলেও সাধনায় উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যোগসাধনায় প্রবৃত্তি এবং উন্নতি লাভ করিতে হইলে সত্ত্বগুণ যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং প্রবল হয়, সেই চেষ্টা করা প্রয়োজন। কি উপায়ে তাহা হইতে পারে, তাহা অধ্যাত্মযোগসাধনার বিষয়ে আলোচনাকালে বিবৃত হইবে।

১৩।২।৪ রাজসিক বুদ্ধি

যে বুদ্ধির রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং প্রবল হইয়া সত্ত্ব এবং তমঃ গুণদ্বয়কে অভিভূত করে, তাহাকে রাজসিক বুদ্ধি বলা হয়। রাজসিক বুদ্ধি মানবই

রাজসিক মানব। অবিদ্যাশক্তি রজোগুণে কাম লোভ এবং ক্রোধ উৎপন্ন করে। কামের বশে রাজসিক বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্যবিষয়সমূহ ভোগ করিতে চাহে এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্যবিষয়সমূহের উৎপাদন, সংগ্রহ এবং রক্ষণ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। ভোগ্যবিষয়ের উৎপাদন, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ কর্ম্মে এবং ভোগক্রিয়ার সফলতায় রজোগুণে সুখের উদয় হয়। ইহা রাজসিক সুখ। রাজসিক বুদ্ধির রজোগুণ সত্ত্ব এবং তমঃ গুণকে অধীন এবং আজ্ঞাকারী করিয়া স্বীয় কামনাপূরণের কর্ম্মে নিয়োজিত করে। রাজসিক বুদ্ধির রজোগুণের পরিচালনাধীনে সত্ত্বগুণ স্বীয় প্রকাশিকা শক্তিকে রজোগুণের কামনানুরূপ ভোগ্যবিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের কার্য্যে এবং ভোগ্যবিষয় উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবার উপায় উদ্ভাবনের কার্য্যে নিয়োজিত করে। জড়বস্তু বহুবিধ, এবং বহুবিধ জড়বস্তুর উৎপাদনকর্ম্মও বহুবিধ। রজোগুণের প্রেরণায় সত্ত্বগুণ স্বীয় প্রকাশিকা শক্তির দ্বারা জড়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে ; ইহারই ফলে রসায়নবিজ্ঞান (Chemistry) পদার্থবিজ্ঞান (Physics) গণিতবিজ্ঞান (Mathematics) ভূবিজ্ঞান (Geology) প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বস্তুবিজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে। সত্ত্বগুণের প্রকাশিকা শক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত এবং আবিষ্কৃত বিজ্ঞান এবং উপায় অনুসারে রজোগুণের সৃষ্টিশক্তি যন্ত্রপাতি এবং কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া বহুবিধ ভোগ্যবস্তু উৎপাদন এবং সংগ্রহ করিতে থাকে ; এই সকল বস্তু ভোগ করিয়া রজোগুণের ভোগকামনা চরিতার্থ হয়। সন্তানোৎপাদনও জড়োৎপাদনকর্ম্ম ; রজোগুণের সৃষ্টিশক্তি সন্তানের স্থূল জড়-দেহ উৎপন্ন করে। রাজসিক বুদ্ধির কাম লোভ এবং ক্রোধ রিপুর চরিতার্থ-তার জন্য তাহারই প্রেরণায় তাহার সত্ত্বগুণ মারণাস্ত্র, ধ্বংসাস্ত্র প্রভৃতির উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করে, এবং রজোগুণের সৃষ্টিশক্তি তৎসমুদয় নির্ম্মাণ করে। এইরূপেই বন্দুক কামান্ টর্‌পেডো, আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতির আবিষ্কার এবং সৃষ্টি হইয়াছে। স্বীয় ভোগের ক্ষেত্র প্রসার এবং ভোগের প্রতিবন্ধককারীগণকে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে বিনাশ করিবার জন্য রাজসিক বুদ্ধির এই সকল অস্ত্রের প্রয়োজন হয় বলিয়া তাহার প্রেরণায় তাহার সত্ত্বগুণ এই সকল অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করে। রাজসিক বুদ্ধির রজো-গুণের দ্বারা পরিচালিত তমঃ গুণ ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়া ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধককারী এবং প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে বিনাশ করে। রাজসিক বুদ্ধির

কাম লোভ এবং ক্রোধ চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার পরিচালনাধীনে তাহার সত্ত্ব এবং তমঃ গুণ উক্তরূপে তাহার সেবা করে। কাম, লোভ, ক্রোধ, বিষয়-কর্ম্মে আসক্তি, চঞ্চলতা, অশান্ত ভাব প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা রজোগুণের প্রাবল্য বুঝা যায়। অহঙ্কৃতভাবে কর্ম্মফললিপ্সায় বহুলায়াসসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদনে ব্রতী মানবগণ রাজসিক বুদ্ধিবিশিষ্ট। বাঞ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে তাহারা দুঃখ পায় এবং প্রাপ্তিতে সুখী হয়। কার্য্য কি এবং অকার্য্য কি, ধর্ম্ম কি এবং অধর্ম্ম কি, রাজসিক বুদ্ধি তাহা যথাবৎ জানিতে পারে না। গীতা রাজসিক বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবকে অসুরপ্রকৃতি মানব বলিয়াছেন, এবং এইরূপ মানবের গুণ এবং অবস্থাকে আসুরী সম্পদ নাম দিয়াছেন। অসুরপ্রকৃতি মানবগণ অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির এবং ধর্ম্মে প্রবৃত্তির বিষয় জানে না; তাহাদের বাহ্যাভ্যন্তর শুচিতা, সদাচার এবং সত্যপরায়ণতা নাই। তাহারা কামোপভোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে এবং এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য আশার পাশে বদ্ধ হইয়া অপরিমেয় বিষয়চিন্তায় লিপ্ত এবং অর্থোপার্জ্জনে ব্যাপৃত থাকে। কামোপভোগপরায়ণতার ফলে তাহারা নানাবিধ বিষয়চিন্তায় এবং বিষয়কর্ম্মে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া থাকে। তাহারা অহঙ্কার বল দর্প কাম এবং ক্রোধবশতঃ কুটিল এবং ক্রূরকর্ম্মা হয়। তাহাদের ভগবদ্ভক্তি থাকে না এবং তাহারা সাধুব্যক্তিগণের নিন্দা করে। গীতা দৈবী সম্পদকে মোক্ষের এবং আসুরিক সম্পদকে বন্ধনের কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। "দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।" গীতা ১৬।৫—"দৈবী সম্পদ মোক্ষের কারণ এবং আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণ।" আসুরীসম্পদবিশিষ্ট মানব মৃত্যুর পর আসুরী যোনিতেই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। গীতা বলিয়াছেন, কাম ক্রোধ লোভ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং এই তিনটীই নরকের দ্বার; সুতরাং রাজসিক বুদ্ধি নরকভোগের কারণ হয়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগলব্ধ সুখ প্রথমে অমৃততুল্য, কিন্তু পরিণামে বিষবৎ। এইরূপ সুখকে রাজসিক সুখ বলা হয় (গীতা ১৮।৩৮)। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, এবং বিভীষণের উপমার দ্বারা রাজসিক মানবের বুদ্ধির স্বরূপটী উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। রাবণ রজোগুণ, কুম্ভকর্ণ তমোগুণ, বিভীষণ সত্ত্বগুণ। তিনটী গুণই রাক্ষস, কারণ তিনটী গুণই জীবাত্মাকে বন্ধন করে, কিন্তু রজোগুণ-রাবণ ত্রিভুবনের সমগ্র সম্পদ ভোগ করিতে চাহে, স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা এবং প্রয়াস করে। তমোগুণ-কুম্ভকর্ণ ছয় মাস

নিদ্রিত থাকে, জাগিয়া বিপুল পরিমাণ মদ্যপান এবং অসংখ্য প্রাণী সংহার ও ভক্ষণ করে, রাবণের আদেশে রাবণের ভোগের প্রতিবন্ধককারীগণকে বিনাশ করে। সত্ত্বগুণ-বিভীষণও রাবণের আদেশে তাহার বিষয়প্রাপ্তির অনুকূল জ্ঞানোপদেশ তাহাকে দান করে; কিন্তু রাবণ যখন রামের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখন বিভীষণ স্বীয় স্বভাববশতঃ রাবণকে রামের সহিত সংগ্রাম না করিয়া মিত্রতা করিতে উপদেশ দেয়; এইরূপ উপদেশ দেওয়ার জন্য রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করে; তখন বিভীষণ রাবণকে এবং কুম্ভকর্ণকে ত্যাগ করিয়া রামের শরণ লয়; রাম রাবণকে এবং কুম্ভকর্ণকে সবংশে নিধন করিয়া বিভীষণকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন; তখন হইতে বিভীষণ নির্ব্বিঘ্নে রামের জ্ঞানে ধ্যানে এবং উপাসনায় জীবন যাপন করে। ইহাই রাজসিক বুদ্ধির স্বরূপবর্ণনা। রাজসিক বুদ্ধিতেও সত্ত্বগুণ থাকে; অবশেষে সত্ত্বগুণই উদ্ধার এবং মুক্তির পথের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সেই পথে চলিতে থাকে।

১৩৷২৷৫ তামসিক বুদ্ধি

বুদ্ধির তমোগুণ প্রবৃদ্ধ এবং প্রবল হইয়া যখন সত্ত্ব ও রজঃ গুণদ্বয়কে অভিভূত করে, তখন তাহাকে তামসিক বুদ্ধি বলা হয়। তামসিকবুদ্ধি মানবই তামসিক মানব। তামসিক বুদ্ধির তমোগুণের দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণের প্রকাশিকা শক্তি যথাযথভাবে কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া তামসিক মানবের দ্বারা জ্ঞানলাভের কার্য্য যথাযথভাবে হইতে পারে না, এবং রজোগুণের কর্ম্ম-শক্তি অলস এবং অবসন্ন হইয়া যায় বলিয়া তাহার দ্বারা উৎপাদনকর্ম্মও যথা-যথভাবে হইতে পারে না। তামসিক মানব স্বীয় কর্ম্মসামর্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়; সে যে সকল কর্ম্ম করে তাহা হিংসামূলক এবং বিনাশকারী, এবং তাহার সকল কর্ম্মই তাহার বন্ধনের কারণ হয়। তামসিক বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে, সকল বিষয়কেই বিপরীতভাবে বুঝিয়া থাকে, এবং নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ, এবং গর্ব্বকে স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া মনে করে। মনোনিবেশহীন, বিবেকহীন, অনম্র, শঠ, পরদ্রোহী, অলস, বিষাদী, এবং দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাকে তামসিক মানব বলিয়া জানিতে হইবে। যে সুখ প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত মোহ সৃষ্টি করে, নিদ্রা আলস্য এবং প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখ তামস সুখ, অর্থাৎ তামসিক মানবের সুখ। তামসিক মানবের মৃত্যুর পরে অধোগতি হয়। "তথা প্রলীন-

স্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।" গীতা ১৪।১৫—"তমোগুণের প্রবৃদ্ধি এবং প্রাবল্যের সময় মানবের মৃত্যু হইলে তাহার পশ্বাদি হীনযোনিতে জন্ম হয়।" আসুরী সম্পদ বিশিষ্ট রাজসিক মানব অসুর, কিন্তু এইরূপ মানবও মৃত্যুর পরে অসুর-কুলে অসুর রূপে জন্ম গ্রহণ করে। তামসিক মানব মানবদেহধারী পশু ; এইজন্য তাহার মৃত্যুর পর সে আর মানবদেহে জন্মগ্রহণ করিতে পায় না, পশুদেহে জন্মগ্রহণ করে।

১৩।২।৬ বুদ্ধিতে স্মৃতির উদয়

জীবাত্মার চেতনা বুদ্ধিতে সঞ্চারিত হইয়া বুদ্ধি চেতন হয়, এবং জীবাত্মা হইতে প্রাণশক্তি বুদ্ধিতে সঞ্চারিত হইয়া বুদ্ধি সপ্রাণ হয়। জীবাত্মার স্মৃতি-শক্তিও বুদ্ধিতে সঞ্চারিত হয়। এইজন্য, বুদ্ধিতে পূর্ব্বে জ্ঞাত বিষয়ের এবং পূর্ব্বে লব্ধ সুখের স্মৃতির উদয় হয়। বুদ্ধি প্রয়োজনমত এই স্মৃতির ব্যবহার করে। বুদ্ধির সত্ত্বগুণ যখন কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে চাহে, তখন সেই জ্ঞানলাভের জন্য যে সকল পূর্ব্বস্মৃতির প্রয়োজন হয়, তাহা বুদ্ধিতে উদয় হয়। বুদ্ধির রজোগুণ যে সকল বিষয় পূর্ব্বে ভোগ করিয়া সুখ পাইয়াছে, তাহাদের স্মৃতি বুদ্ধিতে উদয় হয়, সেই স্মৃতিমূলে সেই সকল বিষয় ভোগ করিতে চাহে, এবং তাহারা ভোগ্যবস্তু কিনা তাহা পুনরায় চিন্তা এবং পরীক্ষা না করিয়াই তাহাদিগকে ভোগ করে। মন কোন নূতন বিষয় বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করিলে বুদ্ধি পরীক্ষা এবং গবেষণার দ্বারা তাহা ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানিলে তাহাও ভোগ করে। বুদ্ধি যখন স্বীয় পূর্ব্ব স্মৃতিমূলে কোন বিষয় ভোগ করিতে চাহে, তখন তাহার নির্দ্দেশে মন যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়কে সেই বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার তন্মাত্রা লইয়া বুদ্ধিকে অর্পণ করে। বুদ্ধির নির্দ্দেশ ব্যতীতও মন ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার তন্মাত্রা বুদ্ধিকে অর্পণ করিয়া বুদ্ধিকে বিষয়ভোগ করায়। এই দুই প্রকারে বুদ্ধি বিষয় ভোগ করে। তামসিক বুদ্ধিতেও স্মৃতির উদয় হয় এবং সে সেই স্মৃতিকে স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করে। রাজসিক মানবের এবং তামসিক মানবের আত্ম-বিষয়ক এবং ঈশ্বর বিষয়ক স্মৃতির উদয় হয় না, রজঃ এবং তমোগুণের অনুরূপ স্মৃতিরই উদয় হয়। বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইলে আত্মবিষয়ক এবং ঈশ্বরবিষয়ক স্মৃতির উদয় হয়। "সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।" ছান্দোগ্য ৭।২৬।২—"সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ এবং

প্রবল হইলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় এবং তাহার আত্মবিষয়ক এবং ঈশ্বরবিষয়ক অচল স্মৃতি লাভ হয়।" রজস্তমোগুণের দ্বারা অভিভূত অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার গীতাবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রুতি-কথিত ধ্রুবা স্মৃতি লাভ করিয়া বলিয়াছেন: "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত" গীতা ১৮।৭৩—"হে কৃষ্ণ, তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইল এবং আমি স্মৃতি লাভ করিলাম।" ধ্রুবা স্মৃতি ব্যতীত নিষ্ঠার সহিত যোগসাধনা হয় না।

১৩।২।৭ বুদ্ধির অধিষ্ঠান মস্তিষ্কে

বুদ্ধি লিঙ্গদেহের মস্তক। স্থূলদেহের মস্তকের মধ্যে যে মস্তিষ্ক (Brain) আছে, সেই মস্তিষ্কের মধ্যে বুদ্ধির অধিষ্ঠান। মস্তিষ্কের যে অংশ আজ্ঞাচক্র ও ললাটের মধ্যে অবস্থিত, এবং যাহাকে মস্তিষ্কের Pre-frontal Lobe বলা হয়, সেই অংশে বুদ্ধি অধিষ্ঠিত থাকে। মস্তিষ্ক স্থূল বস্তু, কিন্তু বুদ্ধি সূক্ষ্ম বস্তু বলিয়া মস্তিষ্কের সহিত সম্মিলিত হইয়া অবস্থান করিতে পারে এবং করে। বুদ্ধির শক্তিসমূহ মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া কার্য্য করে; এই কারণে বুদ্ধি যখন প্রখর চিন্তা করে তখন মস্তিষ্ক উষ্ণ হয়, কখনও বা মস্তিষ্কে ঘূর্ণন হয়, এমনকি বেদনা-বোধও হইতে পারে। মস্তিষ্ক চিন্তা করে না; চিন্তা করে মস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত বুদ্ধি। মৃতদেহের মস্তিষ্ক চিন্তা করে না, কারণ মৃত্যুতে জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ শরীর হইতে উৎক্রামণ করে বলিয়া মৃতদেহের মস্তিষ্কের মধ্যে বুদ্ধি থাকে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে মস্তিষ্ক চিন্তা করে না। মৃতদেহের মস্তক ব্যবচ্ছেদ করিয়া তন্মধ্যে কেহ বুদ্ধিকে প্রত্যক্ষ কতে পারিবে না। জীবিত মানবের মস্তক ব্যবচ্ছেদ করিলেও বুদ্ধিকে প্রত্যক্ষ করা যাইবে না, কারণ বুদ্ধি চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম বস্তু। স্থূলদেহের সকল অঙ্গেরই ব্যাধি হয়; মস্তিষ্কেরও ব্যাধি হয়। মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা (Derangement of the brain) হইলে সেই মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বুদ্ধির চিন্তাশক্তি যথাযথভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে না; এইরূপ অবস্থা বিশৃঙ্খলার গুরুত্বভেদে উন্মাদ (Lunacy) মূঢ়তা (Idiocy) প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এইগুলি মস্তিষ্কের ব্যাধি, বুদ্ধির ব্যাধি নহে। অন্ধতা, বধিরতা, খঞ্জতা প্রভৃতি ব্যাধি যেমন স্থূলদেহের অঙ্গবিশেষের বৈকল্য, তদ্রূপ উন্মাদ, মূঢ়তা প্রভৃতি ব্যাধিও মস্তিষ্কের বৈকল্য। এইরূপ বৈকল্য জন্মাবধি হইতে পারে, অথবা আঘাতের বা অন্য কোন ব্যাধির ফলেও হইতে

পারে। সুরা বা অন্য মাদক দ্রব্য সেবন করিলে মস্তিষ্কের সাময়িক বৈকল্য হয়, এইজন্য তৎকালে সেই মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বুদ্ধির চিন্তাশক্তি যথাযথভাবে কার্য্য করিতে পারে না।

১৩৷২৷৮ বুদ্ধির ক্রমবিকাশ

বুদ্ধি মস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া কার্য্য করে বলিয়া মস্তিষ্কের ক্রমবর্দ্ধনের সহিত বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হয়। আমরা পাইয়াছি যে, জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ মাতৃগর্ভে শিশুদেহে প্রবিষ্ট হয়। জীবাত্মার এবং বুদ্ধির হ্রাসবৃদ্ধি নাই, কিন্তু শিশুদেহের হস্তপদাদির ন্যায় মস্তিষ্কও অপরিণত এবং ক্ষুদ্রাকার থাকে বলিয়া বুদ্ধির শক্তিসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত দেহের এবং মস্তিষ্কেরও বৃদ্ধি হয়, এবং মস্তিষ্কের ক্রমবর্দ্ধনের সহিত বুদ্ধিরও ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। পরিণতবয়স্ক মানবের মস্তিষ্ক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া তৎকালে সেই মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বুদ্ধির সকল শক্তির ক্রিয়া পূর্ণরূপে হয় এবং বুদ্ধিরও পূর্ণ বিকাশ হয়। বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্থ মানবের হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় মস্তিষ্কও শিথিল এবং ক্ষীণবল হয় বলিয়া তৎকালেও বুদ্ধির শক্তিসমূহের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। এইজন্য বৃদ্ধের "ভীমরতি" (Senility) হইয়া থাকে। সকল মানবই সমান বুদ্ধিমান হয় না। বিশ্বলীলার বৈচিত্রবিধানের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকল লিঙ্গদেহের বুদ্ধির পরিমাণ সমান থাকে না। জীবনযাত্রার অবস্থাভেদে এবং আহারাদিভেদে মস্তিষ্কের গঠন, পুষ্টি, এবং বৃদ্ধিও সকলের সমান হয় না। অনেক মানবের মস্তিষ্কে ব্যাধিও থাকে। এই সকল কারণেও সকল মানবই সমান বুদ্ধিমান হয় না। অহঙ্কার বুদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট, এইজন্য বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সহিত অহঙ্কারেরও ক্রমবিকাশ হয়। বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সহিত মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গেরও ক্রমবিকাশ হয়।

১৩৷২৷৯ ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ বুদ্ধির বিকার

গীতা ১৩৷৫-৬ শ্লোকদ্বয়ে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে দেহের উপাদান বলিয়া ঘোষণা করিয়া ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখকে দেহের বিকার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। দেহ জড়বস্তু; তাহার বিকারও জড়বস্তু। এইজন্য ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ

এই চারিটীও জড়বস্তু। ইহারা বুদ্ধির বিকার। বুদ্ধির বিকার বুদ্ধি হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে। এই বিকারচতুষ্টয় কামনাশক্তির ক্রিয়া। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কামনাশক্তি মায়াশক্তিরই একটী কার্য্যকারী রূপ; কামনাশক্তিই রজোগুণে অবিদ্যাশক্তি, এবং অবিদ্যাশক্তি তমোগুণে মোহিনীশক্তিরূপে কার্য্য করে। এই তিনটী শক্তিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহারা বুদ্ধিতে নানারূপ কামনা উৎপন্ন করে। এই কামনাসমূহও বুদ্ধির বিকার। কামনাই ইচ্ছা; সুতরাং ইচ্ছা বুদ্ধির বিকার। ইচ্ছার অনুকূল বিষয় প্রাপ্ত হইলে সেই বিষয়ের সহিত সংযোগ বুদ্ধিতে যে তৃপ্তিদায়ক বিকার উৎপন্ন করে, তাহাই সুখ। অনুকূল বিষয় প্রাপ্ত না হইলে অথবা প্রতিকূল বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইলে অনুকূল বিষয়ের অপ্রাপ্তি এবং প্রতিকূল বিষয়ের প্রাপ্তি বুদ্ধিতে যে বেদনাদায়ক বিকার উৎপন্ন করে, তাহাই দুঃখ। এইজন্য, সুখ এবং দুঃখ বুদ্ধির বিকার। এই সুখদুঃখ দৈহিক সুখদুঃখ। প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি বুদ্ধির যে বিরাগ, তাহাই দ্বেষ; ইহাও বুদ্ধির বিকার। সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক, এই ত্রিবিধ বুদ্ধির ইচ্ছা দ্বেষ সুখ এবং দুঃখ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। ইচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ বুদ্ধির বিকার; বুদ্ধি লিঙ্গদেহের অন্তর্গত; এইজন্য উক্ত বিকারচতুষ্টয় লিঙ্গদেহের অন্তর্গত। ইহারা লিঙ্গদেহের উপাদান নহে, সাময়িক বিকার।

১৩।২।১০ অহঙ্কার

প্রত্যেক মানবের লিঙ্গদেহের দ্বিতীয় উপাদান অহঙ্কার। আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমার স্ত্রীপুত্রাদি, আমার বিষয়সম্পদ, আমার যশমান, বুদ্ধির ইত্যাকার অহংভাবের নাম অহঙ্কার। অহঙ্কার বুদ্ধির সহিত সম্মিলিতভাবে অবস্থান করে। ইহাও জড়বস্তু। ইহা বুদ্ধি হইতে মনে সঞ্চারিত হয়। যাহার বুদ্ধি যেরূপ, তাহার অহঙ্কার তদ্রূপ হয়। সাত্ত্বিক বুদ্ধির সাত্ত্বিক, রাজসিক বুদ্ধির রাজসিক, এবং তামসিক বুদ্ধির তামসিক অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই দৈহিক আমিত্ব বা কাঁচা আমি। সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক, ত্রিবিধ অহাঙ্কারই দৈহিক আমিত্ব, কিন্তু সত্ত্বাদি গুণভেদে অহঙ্কারের অবস্থাভেদ আছে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার দৈবী, এবং সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বভাবের অনুরূপ। রাজসিক অহঙ্কার আসুরিক, এবং রাজসিক বুদ্ধির স্বভাবের অনুরূপ। তামসিক

অহঙ্কার পাশবিক, এবং তামসিক বুদ্ধির স্বভাবের অনুরূপ। অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং দেহাভিমানী জীবাত্মা আপনাকে বুদ্ধির সহিত অভিন্ন ভাবে বলিয়া বুদ্ধির অহঙ্কার তাহারই অহঙ্কার বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

১৩।২।১১ মন

মন বুদ্ধির অহংভাবাপন্ন করণ (agent)। মন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক। সঙ্কল্প এবং বিকল্প মনের কার্য্য। মনের সকল কার্য্যই বুদ্ধির নিমিত্ত। বুদ্ধি যখন যে বাহ্য স্থূল জড় বিষয়কে জানিতে অথবা ভোগ করিতে ইচ্ছা করে তখন মনকে নিয়োজিত করে ; বুদ্ধির প্রেরণায় মন সেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সাধন করে এবং ইন্দ্রিয় হইতে সেই বিষয়ের তন্মাত্রা গ্রহণ করিয়া তাহা বুদ্ধিকে অর্পণ করে। মন অতিশয় চঞ্চল, সঙ্কল্পবিকল্প ব্যতীত থাকে না। বুদ্ধির নির্দ্দেশ না থাকিলেও মন স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটাইয়া বিষয়তন্মাত্রা বুদ্ধিকে অর্পণ করে। বুদ্ধি যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করে, তখনও মন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়তন্মাত্রা সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধিকে অর্পণ করিবার চেষ্টা করে এবং সুযোগ পাইলেই তাহা করে ; যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়তন্মাত্রা সংগ্রহ করিবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে তাহার স্মৃতিতে উদিত পূর্ব্বলব্ধ বিষয়ানুভূতি বুদ্ধির নিকট সহসা উপস্থিত করে। ইহার ফলে বুদ্ধি চঞ্চল এবং চিন্তাভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। মনের চঞ্চলতার জন্য বুদ্ধি স্থির থাকিতে পারে না। বুদ্ধি চিন্তাকালে মনকে সংযত করিয়া আপনার সহিত যুক্ত করিয়া না রাখিলে, অর্থাৎ চিন্তনীয় বিষয়ে মনোযোগ না পাইলে মন এইরূপেই নিজ অভ্যাসমত কার্য্য করে। বুদ্ধি চিন্তাকালে মনকে সকল্প-বিকল্প করিতে না দিয়া আপনার সহিত যুক্ত করিয়া রাখিলে সেই অবস্থার নাম মনোযোগ। মনোযোগ ব্যতীত বুদ্ধি ধীরভাবে চিন্তা ও ধ্যান করিতে পারে না। বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইলে মনও সাত্ত্বিক হয় ; সাত্ত্বিক বুদ্ধি সাত্ত্বিক মনকে সহজেই সংযত করিয়া মনোযোগ লাভ করিতে পারে। বুদ্ধি রাজসিক অথবা তামসিক হইলে মনও রাজসিক এবং তামসিক হয়। রাজসিক এবং তামসিক বুদ্ধি স্বয়ংই সর্ব্বদা চঞ্চল বলিয়া রাজসিক এবং তামসিক মনও সর্ব্বদা চঞ্চল। মনও ত্রিগুণময় জড়বস্তু, কিন্তু সূক্ষ্ম বস্তু বলিয়া জড়চক্ষুর গোচর নহে। জীবাত্মার চেতনায় চেতনা পাইয়া এবং জীবাত্মা হইতে প্রাণ-

শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি পাইয়া মন সচেতন এবং সপ্রাণ হইয়া স্বীয় শক্তিসমূহকে কার্য্যকারী করিতে পারে। মন লিঙ্গদেহের হৃদয়; ইহা স্থূলদেহের হৃদয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া অবস্থান করে। এই কারণে, মনের বিষয়ানুভূতিজনিত হর্ষ শোক বিস্ময় বিরক্তি ভীতি প্রভৃতি ভাবের ক্রিয়ার ফলে হৃদয়ের দ্রুত বা মন্থর স্পন্দন প্রভৃতি নানাপ্রকারের বিকার হয়। স্থূলদেহের হৃদয়ও স্থূল পাঞ্চভৌতিক বস্তু; তাহার নিজস্ব অনুভবশক্তি নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে মৃত মনুষ্যের দেহে স্থিত হৃদয়ও অনুভবশক্তির কার্য্য করিতে পারিত। মৃত্যুকালে জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ উৎক্রামণ করে বলিয়া মৃতদেহে মন থাকে না; এইজন্য মৃতদেহের হৃদয়ে অনুভবশক্তি থাকে না। মৃত মানবের অথবা জীবিত মানবের হৃদয় ব্যবচ্ছেদ করিলেও মন দৃষ্টিগোচর হইবে না, কারণ মন জড়দৃষ্টির অগোচর।

১৩।২।১২ অন্তঃকরণ বা চিত্ত ঃ বাহ্যকরণ

বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং মন, এই তিনটীকে সমবেতভাবে অন্তঃকরণ বলা হয় এবং চিত্ত ও বলা হয়। করণ = যন্ত্র (agent)। ইহাদের দ্বারা জীবাত্মা কর্ত্তা এবং ভোক্তা সংস্কারকে চরিতার্থ করে, এইজন্য ইহারা জীবাত্মার করণ। ইহারা দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত এবং ইহাদের কার্য্যও দেহাভ্যন্তরে হয়, এইজন্য ইহারা অন্তঃকরণ। জীবাত্মা স্বীয় চেতনা বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মনে সঞ্চারিত করিয়া ইহাদিগকে চেতন করে এবং ইহাদের মধ্য দিয়া সকল ইন্দ্রিয়ে এবং সমগ্র দেহে চেতনা সঞ্চারিত করিয়া সকল ইন্দ্রিয়গণকে এবং সমগ্র দেহকে চেতন করে বলিয়া ইহাদিগকে সমবেতভাবে চিত্তও বলা হয়। দশ ইন্দ্রিয়কে সমবেতভাবে বাহ্যকরণ বলা হয়, কারণ ইহারা বাহ্যবিষয় গ্রহণ করিবার যন্ত্র এবং গ্রহণ করে। "অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যম্।" সাংখ্যকারিকা ৩৩।—"বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মন, এই তিনটীকে অন্তকঃরণ বলা হয় এবং দশ ইন্দ্রিয়কে ব্যহ্যকরণ বলা হয়।"

"সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্।" সাখ্যকারিকা। ৩৩ —"ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, ত্রিকালের বস্তু অন্তঃকরণের বিষয়, কিন্তু বর্ত্তমানকালে বিদ্যমান বস্তু বাহ্যকরণের বিষয়।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মন, এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণেই স্মৃতির উদয় হয়। এই কারণে

ত্রিকালের বস্তু অন্তঃকরণের বিষয়, অর্থাৎ, অন্তঃকরণ স্মৃতির দ্বারা এবং কল্পনার দ্বারা ত্রিকালের বস্তু সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে পারে। কিন্তু বাহ্যকরণগুলিতে স্মৃতির উদয় হয় না, এইজন্য কেবল বর্ত্তমানের বস্তুই উহাদের বিষয়, অর্থাৎ, বর্ত্তমানের যে সকল বস্তুর সহিত ইহারা সংযোগ লাভ করে, কেবল সেইগুলিই ইহারা জানিতে পারে। বাহ্যকরণের দ্বারা অন্তঃকরণ বর্ত্তমানের বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।

১৩।২।১৩ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়

স্থূলদেহের চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্ জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে; ইহারা স্থূল বস্তু। লিঙ্গদেহের চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্ জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইহারা সূক্ষ্ম বস্তু। জীবাত্মার দৃষ্টিশক্তি লিঙ্গদেহের চক্ষুতে, শ্রবণশক্তি লিঙ্গদেহের কর্ণে, ঘ্রাণশক্তি লিঙ্গদেহের নাসিকায়, আস্বাদনশক্তি লিঙ্গদেহের জিহ্বায়, এবং স্পর্শ-শক্তি লিঙ্গদেহের ত্বকে সঞ্চারিত হয়; ইহার ফলে লিঙ্গদেহের চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্ রূপদর্শন, শব্দশ্রবণ, গন্ধ-আঘ্রাণ, রসাস্বাদন, এবং স্পর্শানুভব করে। নাসিকার দ্বারা যে শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য হয়, তাহা জীবাত্মার প্রাণ-শক্তির দ্বারা সাধিত হয়; শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা যে গন্ধ-আঘ্রাণ কার্য্য হয়, তাহা জীবাত্মার ঘ্রাণশক্তির দ্বারা সাধিত হয়। লিঙ্গদেহের চক্ষু স্থূলদেহের স্থূলচক্ষুর সহিত, কর্ণ স্থূলদেহের স্থূলকর্ণের সহিত, নাসিকা স্থূলদেহের স্থূলনাসিকার সহিত, জিহ্বা স্থূলদেহের স্থূল জিহ্বার সহিত, এবং ত্বক্ স্থূলদেহের স্থূলত্বকের সহিত সম্মিলিতভাবে অবস্থান করে। এইজন্যই স্থূলদেহের স্থূল চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্ স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে পারে। মৃতদেহে জীবাত্মা এবং লিঙ্গদেহ না থাকায় মৃতদেহের উক্ত বস্তুগুলি নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে পারে না। স্থূলচক্ষুকর্ণাদি লিঙ্গদেহের চক্ষুকর্ণাদির দ্বারস্বরূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি স্থূল বিষয় গ্রহণ করেনা, তন্মাত্রা গ্রহণ করে। স্থূল চক্ষু স্থূলরূপের সহিত সংযোগ লাভ করে, অর্থাৎ স্থূল রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, লিঙ্গচক্ষু স্থূলচক্ষুরূপ দ্বার দিয়া সেই স্থূল রূপকে দর্শন করিয়া তাহার রূপতন্মাত্রা গ্রহণ করে। এইরূপে লিঙ্গ কর্ণ শব্দতন্মাত্রা, লিঙ্গনাসিকা গন্ধতন্মাত্রা, লিঙ্গজিহ্বা রসতন্মাত্রা, এবং লিঙ্গত্বক্ স্পর্শতন্মাত্রা গ্রহণ করে। বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা গৃহীত এবং মনের দ্বারা অর্পিত তন্মাত্রা গ্রহণ করিয়া তাহাকে পরীক্ষা এবং তৎসম্বন্ধে বিচার করিয়া

বস্তুর ধর্ম্ম গুণ শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করে। এইরূপে জ্ঞানলাভের পর যে সকল বস্তু ভোগ্যবস্তু বলিয়া নিরূপিত হয়, বুদ্ধি তৎসমুদয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করে এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধারায় তাহা ভোগ করে। বুদ্ধির বিষয়-বিজ্ঞান-লাভের কার্য্য এবং বিষয়-সম্ভোগের কার্য্য মন এবং ইন্দ্রিয়-বর্গের সহায়তায় সাধিত হয়। বুদ্ধির সহিত অভিন্নাভিমানী জীবাত্মা বুদ্ধির এই বিষয়ভোগকে স্বীয় বিষয়ভোগ বলিয়া ভাবে। বুদ্ধি মনের এবং ইন্দ্রিয়-বর্গের সহায়ে বস্তুবিষয়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করে, তাহা জীবাত্মার চিদংশে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

১৩।২।১৪ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়

পাণি (হস্ত) পাদ (চরণ) পায়ু (মলদ্বার) উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) এবং বাক্ (বাগ্‌যন্ত্র), এই পাঁচটী লিঙ্গদেহের কর্ম্মেন্দ্রিয়। স্থূলদেহের পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ-বাক্ স্থূল বস্তু এবং স্থূলদেহের অবয়ব ; ইহারা লিঙ্গদেহের কর্ম্মেন্দ্রিয় নহে। লিঙ্গদেহের পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ-বাক্ সূক্ষ্ম বস্তু। নিজ প্রয়োজনমত বস্তু উৎপাদন সংগ্রহ ভোগ ত্যাগ রক্ষা সংহার প্রভৃতি কর্ম্ম করিবার ক্রিয়া-শক্তি বুদ্ধির আছে ; জীবাত্মার চেতনা এবং প্রাণশক্তি পাইলেই বুদ্ধির এই ক্রিয়াশক্তি কার্য্যকরী হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বুদ্ধির ক্রিয়াশক্তি লিঙ্গদেহের সূক্ষ্ম হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহে সঞ্চারিত হয় ; ইহারা স্থূলদেহের স্থূল হস্তপদাদি অবয়বের মধ্যে তাহাদের সহিত সম্মিলিতভাবে অবস্থান করে ; ইহাদের শক্তিতে স্থূল হস্তপদাদি স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে। স্থূল হস্তপদাদি যে সকল কার্য্য করে, বস্তুতঃ তাহা লিঙ্গদেহের কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের কর্ম্ম। লিঙ্গ-হস্তের শক্তিতে স্থূল হস্তের দ্বারা বস্তু উৎপাদন, সংগ্রহ, ভোগ, ত্যাগ, রক্ষা, সংহার প্রভৃতি কার্য্যসমূহ সাধিত হয়। লিঙ্গপদের শক্তিতে স্থূল পদের দ্বারা গমনাগমন প্রভৃতি কার্য্য সাধিত হয়। লিঙ্গপায়ুর শক্তিতে স্থূল পায়ুর দ্বারা মলত্যাগ এবং অধোবায়ু ত্যগ সাধিত হয়। লিঙ্গউপস্থে মূত্র, শুক্র, শোণিত প্রভৃতি নির্গত করিবার শক্তি আছে ; লিঙ্গ-উপস্থ উক্ত শক্তির ক্রিয়াযন্ত্র। ইহা সূক্ষ্ম বস্তু বলিয়া, যে স্থূলদেহে লিঙ্গদেহ অধিষ্ঠিত থাকে তাহা পুরুষদেহ হইলে পুরুষ-উপস্থের সহিত সম্মিলিতভাবে থাকিয়া পুরুষ উপস্থের কার্য্য করে এবং তাহা স্ত্রীদেহ হইলে স্ত্রী-উপস্থের অর্থাৎ যোনির সহিত সম্মিলিতভাবে

থাকিয়া যোনির কার্য্য করে। লিঙ্গ-বাগ্‌যন্ত্রের শক্তিতে স্থূল বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা বাক্যোচ্চারিত হয়। মৃতদেহে জীবাত্মা এবং লিঙ্গদেহ থাকে না বলিয়া মৃতদেহে স্থূলহস্তপদাদি থাকিয়াও কর্ম্ম করিতে পারে না।

১৩।২।১৫ পঞ্চ তন্মাত্র : পঞ্চতান্মাত্রিক লিঙ্গদেহাবয়ব : চতুর্ব্বিধ বাক্য— পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী

পঞ্চ তন্মাত্র কি বস্তু তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। লিঙ্গদেহও শরীর এবং ইহারও আকৃতি এবং অবয়ব আছে। ইহার আকৃতি এবং অবয়বসমূহ পঞ্চতন্মাত্রার দ্বারা গঠিত। স্থূলদেহের উপাদান স্থূল পঞ্চভূত; লিঙ্গদেহের অবয়বসমূহের উপাদান পঞ্চ তন্মাত্র। স্থূলদেহ পাঞ্চভৌতিক; লিঙ্গদেহ পঞ্চতান্মাত্রিক। লিঙ্গদেহের পঞ্চতান্মাত্রিক মস্তক-অবয়বের মধ্যে বুদ্ধি অবস্থিত; এইজন্য বুদ্ধি লিঙ্গদেহের মস্তক। লিঙ্গদেহের পঞ্চতান্মাত্রিক হৃদয়ের মধ্যে মন অবস্থিত; এইজন্য মন লিঙ্গদেহের হৃদয়। লিঙ্গদেহের পঞ্চতান্মাত্রিক নয়নাবয়বে দৃষ্টিশক্তি, কর্ণাবয়বে শ্রবণশক্তি, নাসিকাবয়বে ঘ্রাণশক্তি, জিহ্বাবয়বে আস্বাদনশক্তি, ত্বগবয়বে স্পর্শশক্তি আছে। লিঙ্গদেহের পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চতান্মাত্রিক; ইহাদের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি অবস্থিত। এই পঞ্চতান্মাত্রিক লিঙ্গদেহের মস্তক, হৃদয়, চক্ষুকর্ণ, হস্তপদাদি সকল অবয়ব স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে তত্তৎ স্থূল পাঞ্চভৌতিক অবয়বের সহিত সম্মিলিতভাবে অবস্থান করে। লিঙ্গদেহ সূক্ষ্ম পঞ্চতান্মাত্রিক বলিয়া স্ত্রী বা পুরুষ মনুষ্য বা মনুষ্যেতর যে স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে অবস্থান করে, তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গদেহ স্থূলদেহের মধ্যে তাহার সহিত সম্মিলিতভাবে থাকিলেও স্থূলদেহের সকল কর্ম্ম পাঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ স্থূল পঞ্চভূতকে লইয়া, এবং লিঙ্গদেহের সকল কর্ম্ম পঞ্চতান্মাত্রিক, অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্রকে লইয়া। স্থূল পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম তন্মাত্রাই লিঙ্গদহ গ্রহণ করে এবং ভোগ করে। সকল ভোগ্য স্থূল বস্তুর তন্মাত্রাই লিঙ্গদেহের ভোগ্য বস্তু এবং এই তন্মাত্রার ভোগই লিঙ্গদেহের ভোগকর্ম্ম। লিঙ্গদেহের মস্তকবুদ্ধি যে চিন্তার কার্য্য করে, তাহা তন্মাত্রা অবলম্বনে করে। জীবাত্মার চিতের প্রাণশক্তির সাহায্যে বুদ্ধি লিঙ্গ-বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে; সেই বাক্য শব্দতান্মাত্রিক বাক্য। বুদ্ধি স্বীয় শব্দতান্মাত্রিক বাক্য লিঙ্গকর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে। মনও বুদ্ধির শব্দতান্মাত্রিক

বাক্য লিঙ্গকর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে, কারণ মন ইন্দ্রিয়াধিপতি এবং সকল ইন্দ্রিয়ে উপস্থিত থাকে। বুদ্ধির শব্দতান্মাত্রিক বাক্য স্থূলকর্ণে শ্রুত হয় না; এইজন্য একজন মানবের বুদ্ধির শব্দতান্মাত্রিক বাক্য অন্য মানব শুনিতে পায় না। কিন্তু যোগসিদ্ধ ব্যক্তি যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা অন্য মানবের বুদ্ধির শব্দতান্মাত্রিক বাক্য শুনিতে পারেন। এইরূপ যোগীগণ বাহ্যতঃ মৌন থাকিয়া লিঙ্গদেহের শব্দতান্মাত্রিক বাক্যের দ্বারা পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে পারেন। একজন মানব যখন অন্যের সহিত স্থূলবাক্যের দ্বারা আলাপ করিতে ইচ্ছা করে, অথবা অন্য উদ্দেশ্যে স্থূল বাক্য উচ্চারণ করিতে চাহে, তখন তাহার বুদ্ধির নির্দ্দেশে ইন্দ্রিয়াধিপতি মন বুদ্ধির শব্দতান্মাত্রিক বাক্যকে লিঙ্গবাগ্‌যন্ত্রের বাক্‌শক্তির দ্বারা স্থূল বাগ্‌যন্ত্রের পরিচালনা করিয়া স্থূলবাক্য রূপে উচ্চারণ করে। এইরূপ স্থূল-বাক্য স্থূলকর্ণের শ্রুতিগোচর হয়। চারি প্রকারের বাক্য আছে:—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী। পরা বাক্য যে শব্দের দ্বারা উচ্চারিত হয় তাহা পরা শব্দ। পরা শব্দ তুরীয়। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ যে শব্দের দ্বারা বাক্যোচ্চারণ করেন, তাহা পরা বা তুরীয় শব্দের দ্বারা উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহা পরা বা তুরীয় বাক্য। এই বাক্য মানবের জীবাত্মা অধ্যাত্মযোগসাধনার দ্বারা পরম ভাবের ভূমিতে আরূঢ় হইলে শুনিতে পারে, কিন্তু দেহাভিমানী জীবাত্মা, লিঙ্গদেহ, এবং স্থূলদেহ ইহা শুনিতে পারে না। ভগবান মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় তুরীয় সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহকে যেমন কৃপা করিয়া লোকচক্ষুর গোচার করেন, তদ্রূপ তাঁহার তুরীয় বাক্যকেও লোক-কর্ণের গোচর করেন। জীবাত্মা সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সহিত যে শব্দের দ্বারা বাক্যালাপ করে, তাহাও পরা শব্দের দ্বারা উচ্চারিত পরা বাক্য, কিন্তু সেইরূপ বাক্যের দ্বারা প্রত্যক্ষদর্শী (পশ্যন্তী) জীবাত্মা অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ করে বলিয়া সেই শব্দকে এবং তদ্দ্বারা উচ্চারিত বাক্যকে পশ্যন্তী বলা হয়। এইরূপ বাক্যও লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহ শুনিতে পারে না। লিঙ্গদেহের বুদ্ধি তান্মাত্রিক শব্দের দ্বারা যে শব্দতান্মাত্রিক শব্দ উচ্চারণ করে, সেই শব্দ এবং তদ্দ্বারা উচ্চারিত বাক্য মধ্যমা। ইহা জীবাত্মা এবং লিঙ্গদেহ শ্রবণ করিতে পারে। মধ্যমা যখন স্থূল বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল শব্দ এবং স্থূল বাক্যরূপে উচ্চারিত হয়, সেই স্থূল শব্দ এবং বাক্য বৈখরী, অর্থাৎ বিশেষরূপে খর বা স্পষ্ট। ইহা স্থূল কর্ণের দ্বারা শ্রুত হয়।

১৩৷২৷১৬ স্থূলদেহ লিঙ্গদেহের আধার

স্থূলদেহ লিঙ্গদেহের আধার। পাঞ্চভৌতিক আধার ব্যতীত লিঙ্গদেহ থাকিতে পারে না।

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথাচ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥ সংখ্যকারিকা। ৪১

—"কাগজ বা পট ব্যতীত যেমন চিত্র থাকিতে পারে না, বৃক্ষাদি ব্যতীত যেমন ছায়া থাকিতে পারে না, তদ্রূপ লিঙ্গদেহ বিশেষ ব্যতীত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ব্যতীত থাকিতে পারে না। মৃত্যুর পরেও জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ পাঞ্চভৌতিক আতিবাহিক দেহে অবস্থান করে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

লিঙ্গদেহের পরিচয় প্রদত্ত হইল। এক্ষণে স্থূলদেহের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জন্য স্থূলদেহের যে পরিচয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, সেই পরিচয় দেওয়া হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্থূলদেহ

১৩৷৩৷১ স্থূলদেহের উপাদান —পঞ্চ স্থূল ভূত

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম, এই পঞ্চ স্থূল ভূত স্থূলদেহের উপাদান। স্থূলদেহে অপ্ (জল) তেজঃ (অগ্নি) মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ) বিদ্যমান আছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারেঃ "ক্ষিতি (মৃত্তিকা) দেহে দেখা যায় না। মাংস অস্থি মজ্জা প্রভৃতি আছে বটে, কিন্তু ইহারা মাটী নহে, মাটী হইতে ভিন্ন প্রকারের বস্তু। তাহা হইলে, মৃত্তিকা দেহের উপাদান কিরূপে হইতে পারে?" ইহার উত্তর এই যে, মাংস অস্থি মজ্জা প্রভৃতি কঠিন (solid) উপাদানসমূহ দেখিতে মাটীর মত না হইলেও মৃত্তিকারই বিকার। মৃতদেহের কঠিনাংশ ক্ষিতিতে, অপ-অংশ জলে, তেজ-অংশ অগ্নিতে, মরুৎ-অংশ বায়ুতে, এবং ব্যোম-অংশ আকাশে মিলিত হয়। জীবিত দেহে যে উত্তাপ থাকে তাহা দেহের উপাদান এই পাঞ্চভৌতিক অগ্নির দ্বারা সৃষ্ট হয় না, তাহা জীবাত্মার চিদংশের দ্বারা

সৃষ্ট ; ইহার প্রমাণ এই যে, মৃতদেহ বিশ্লেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে এই পাঞ্চভৌতিক উপাদান অগ্নি থাকে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জীবিতদেহের উত্তাপ তাহাতে থাকে না।

১৩।৩।২ স্থূলদেহের নবদ্বার

স্থূলদেহ নয়টী দ্বারযুক্ত গৃহের মত। দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, উপস্থ, এবং পায়ু এই নয়টী স্থূলদেহরূপ গৃহের দ্বার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্থূলদেহের কর্ণ চক্ষু নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে, ইহারা লিঙ্গদেহের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার এবং ইহাদের দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ানুভূতি লাভ করে। স্থূলদেহের বাগ্‌যন্ত্র পাণি পাদ পায়ু এবং উপস্থ, এই পঞ্চ অবয়ব লিঙ্গদেহের তত্তৎ নামের কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের স্থূল কোশ।

১৩।৩।৩ পাঞ্চভৌতিক দেহের কর্ম্ম এবং ভোগ পাঞ্চভৌতিক

পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহের সকল ভোগ্যবিষয় পাঞ্চভৌতিক স্থূলবস্তু। স্থূলদেহ আহার করে স্থূল বস্তু, দর্শন করে স্থূল রূপ, শ্রবণ করে স্থূল (বৈখরী) শব্দ, আঘ্রাণ করে স্থূল গন্ধ, উচ্চারণ করে স্থূল শব্দ। স্থূলদেহ যাহা কিছু কর্ম্ম করে তৎসমুদয় পাঞ্চভৌতিক স্থূল বস্তুকে লইয়া। লিঙ্গদেহের শক্তিতে এবং প্রেরণায় এবং পরিচালনায় স্থূলদেহ কর্ম্ম করে এবং ভোগ করে ; এই সকল বৈষয়িক কর্ম্ম এবং বিষয়ভোগ বস্তুতঃ লিঙ্গদেহেরই, স্থূলদেহ তাহার যন্ত্রস্বরূপ। আহার্য্যাদি ভোগ্যবস্তুর স্থূল অংশ স্থূলদেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধি সাধন করে এবং সূক্ষ্মাংশ লিঙ্গদেহের তৃপ্তি ও সুখ উৎপন্ন করে। জীবাত্মার চিতের প্রাণশক্তি লিঙ্গদেহের মধ্য দিয়া স্থূলদেহের প্রত্যেক অংশে সঞ্চারিত হইয়া ইহাকে ভোগ এবং কর্ম্ম সাধনায় সমর্থ করে।

১৩।৩।৪ পঞ্চ প্রাণবায়ুঃ নাড়ী

জীবাত্মার চিদংশ হইতে প্রাণশক্তির উদ্ভব। প্রাণশক্তি হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ দ্বারা সমগ্র দেহে রুধির সঞ্চার করিয়া, দেহের মধ্যে অবস্থিত বায়ুতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবং বায়ুর পরিচালনার দ্বারা বায়ুর সহিত দেহের

প্রতি পরমাণুতে সঞ্চারিত হইয়া দেহকে প্রাণময় করে। দেহকে সপ্রাণ রাখিবার জন্য প্রাণশক্তির কর্ম্ম পঞ্চবিধ। দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বায়ুর পরিচালনা করিয়া প্রাণশক্তি এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করে। প্রাণশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত পঞ্চকর্ম্ম সম্পাদক বায়ুকে পঞ্চ প্রাণবায়ু বলা হয়। পঞ্চ প্রাণ-বায়ুর নাম ঃ— (১) প্রাণ (২) অপান (৩) সমান (৪) ব্যান (৫) উদান। প্রাণ-শক্তি এই পঞ্চ প্রাণবায়ুর দ্বারা কার্য্য করে, এইজন্য পঞ্চ প্রাণবায়ুর কার্য্য প্রাণশক্তিরই কার্য্য। পঞ্চ প্রাণবায়ুর কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। প্রাণশক্তি যে বায়ুকে শ্বাসযন্ত্র হইতে নির্গত করিয়া নাসিকা অথবা মুখ দিয়া বহির্গত করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। সাধারণভাবে ইহাকে প্রশ্বাস-বায়ু বলা হয়। প্রাণবায়ুর সহিত যুক্ত প্রাণশক্তি কণ্ঠ হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সমগ্র মুখমণ্ডলের সর্ব্বাংশে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কণ্ঠ তালু জিহ্বা ওষ্ঠ চক্ষু কর্ণ নাসিকা মস্তিষ্ক প্রভৃতি সমুদয় যন্ত্রগুলিকে সপ্রাণ এবং ক্রিয়াক্ষম করে। প্রাণ-শক্তি যে বায়ুকে নাসিকা অথবা মুখ দিয়া আকর্ষণ করিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করায়, তাহার নাম অপান বায়ু। ইহাকে সাধারণভাবে শ্বাসবায়ু বলা হয়। অপানবায়ু স্বাসযন্ত্র হইতে উদরে এবং উদর হইতে পায়ুতে এবং উপস্থে গতি প্রাপ্ত হয়। অপানবায়ুর সহিত যুক্ত প্রাণশক্তি পায়ুতে এবং উপস্থে বিদ্যমান থাকিয়া ইহাদিগকে সপ্রাণ এবং ক্রিয়াক্ষম করে। প্রাণবায়ুর নিরোধের দ্বারা কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সমগ্র মুখমণ্ডলের যন্ত্রসমূহের ক্রিয়ারোধ হয়, এবং অপান বায়ুর নিরোধের দ্বারা পায়ুর ও উপস্থের ক্রিয়ারোধ হয়। নাভিকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকস্থ দেহমধ্যভাগে অবস্থিত বায়ুর নাম সমানবায়ু। এই বায়ুতে অধিষ্ঠিত প্রাণশক্তি জঠরাগ্নিরূপে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক (digestion) এবং সমতা (assimilation) সম্পাদন করে। সুষুম্না নাড়ী ব্যতীত সমগ্র শরীরের অন্য সকল নাড়ীর মধ্যে যে বায়ু অবস্থিত তাহার নাম ব্যানবায়ু। হৃদয় হইতে ১০১ মূল নাড়ী নির্গত হইয়াছে। প্রত্যেক মূল নাড়ীর ১০০ করিয়া শাখানাড়ী আছে; সুতরাং শাখানাড়ীর সংখ্যা = ১০১ × ১০০ = ১০১০০। প্রত্যেক শাখানাড়ীর ৭২০০০ প্রশাখা নাড়ী আছে; সুতরাং প্রশাখানাড়ীর সংখ্যা = ১০১০০ × ৭২০০০ = ৭২৭২০০০০০০। মূলনাড়ী, শাখা-নাড়ী, এবং প্রশাখানাড়ী মিলিয়া সমগ্র দেহে মোট নাড়ীসংখ্যা = ১০১ + ১০১০০ + ৭২৭২০০০০০০ = ৭২৭২১০২০১। এই নাড়ীসমূহ সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া

বিদ্যমান। এই সমুদয় নাড়ীতে ব্যানবায়ু বিদ্যমান। প্রাণশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং পরিচালিত ব্যানবায়ুর ক্রিয়ায় দেহ সামর্থ্য এবং উদ্যম লাভ করে। শক্তিসাপেক্ষ কর্ম্ম ব্যানবায়ুর সাহায্যে সাধিত হয়। সুষুম্না নাড়ীও হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্যস্থান দিয়া মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্ন স্থান হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই নাড়ীর মধ্য দিয়া প্রাণশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত উদানবায়ু সঞ্চরণ করে। স্থূলদেহের মৃত্যুকালে জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ এই নাড়ী অবলম্বনে দেহ হইতে উৎক্রামণ করিয়া কর্ম্মানুযায়ী পুণ্যলোক অথবা পাপলোক প্রাপ্ত হয়। এই বায়ু অবলম্বনে জীবাত্মা সুষুপ্তি লাভ করে, এবং যোগীর জীবাত্মা মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতম স্থানে সহস্রারে উত্থিত হইয়া সমাধিস্থ হয়েন। এই বায়ু অবলম্বন করিয়া যোগীরও জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রামণ করেন। এইরূপে, প্রাণশক্তি পঞ্চ প্রাণবায়ুতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র দেহকে সপ্রাণ এবং ক্রিয়াক্ষম করে।

১৩।৩।৫ ষট্চক্র, কুণ্ডলিণী, ব্রহ্মরন্ধ্র, সহস্রার, সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা

স্থূলদেহে ছয়টী চক্র আছে। চক্রগুলি পদ্মাকার বলিয়া ইহাদিগকে পদ্মও বলা হয়। ষট্চক্রের অবস্থানভূমি এবং নাম:—(১) মেরুদণ্ডের শেষভাগে গুহ্যদেশে, মূলাধারচক্র। (২) লিঙ্গমূলে, স্বাধিষ্ঠান চক্র। (৩) নাভিস্থলে, মণিপুর চক্র। (৪) হৃদয়ে, অনাহত চক্র। (৫) কণ্ঠে, বিশুদ্ধ চক্র। (৬) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে, আজ্ঞাচক্র। চক্রগুলি মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সুষুম্নানাড়ীর মধ্যে অবস্থিত; সুষুম্নার যে যে স্থান গুহ্যদেশ, লিঙ্গমূল, নাভিস্থল, হৃদয়, কণ্ঠ, এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের সহিত সরলরেখায় অবস্থিত, সুষুম্নার সেই সেই স্থানে চক্রগুলি অবস্থিত। এইজন্য উক্ত স্থানগুলিকে ষট্চক্রের অবস্থানভূমি বলা হয়। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের শেষভাগ হইতে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত কারণদেহের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। কারণদেহের ঊর্দ্ধে একটী ক্ষুদ্র রন্ধ্র (Cavity) আছে; ইহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলা হয়। এই ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার নামক একটী সহস্রদল পদ্ম আছে। সহস্রার ত্রিগুণময় বস্তু নহে; ইহা শুদ্ধসত্ত্বাময়; সমগ্র মানবদেহে এই একটী মাত্রই শুদ্ধসত্ত্বাময় স্থান আছে। সহস্রার শুদ্ধসত্ত্বা অর্থাৎ সৎ বলিয়া ইহা মানবচক্ষুর গোচর হয় না। এই সৎ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সতের ক্ষুদ্র অংশ। পরিণয়প্রাপ্ত যোগীর সহিত সমাধিতে

মিলনের জন্য কৃষ্ণ স্বীয় সতের অংশকে সহস্রার রূপে ব্রহ্মরন্ধ্রে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সহস্রারেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান। উদানবায়ুতে অধিষ্ঠিত প্রাণশক্তি উদানবায়ু অবলম্বনে সুষুম্নার সর্ব্বনিম্নস্থানে অবস্থিত মূলাধারচক্রে সর্পের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় অবস্থান করে; ইহার সার্দ্ধ তিনটী কুণ্ডলী আছে এবং সর্পের শ্বাসপ্রশ্বাসে যেরূপ শব্দ (Hissing sound) হয়, তদ্রূপ শব্দ করে। এইরূপে উদানবায়ুতে অবস্থিত এই প্রাণশক্তির নাম কুণ্ডলিণী শক্তি; এইজন্য শাস্ত্র কুণ্ডলিণীশক্তিকে বায়বীশক্তি বলিয়াছেন। "সা দেবী বায়বী শক্তিঃ।" রুদ্রযামল।—"কুণ্ডলিনীশক্তি নাম্নী দেবী বায়বী শক্তি, অর্থাৎ উদানবায়ুতে অধিষ্ঠিত প্রাণশক্তি।" যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন না, এইরূপ মানবগণের কুণ্ডলিণীশক্তি আমরণ উক্তরূপে মূলাধারেই অবস্থান করে, তথা হইতে তাহার উর্দ্ধগতি হয় না। ইহাই কুণ্ডলিণীর সুপ্তাবস্থা, অর্থাৎ উর্দ্ধগতিহীন নিষ্ক্রিয় অবস্থা। যে সকল মানব সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, দীক্ষাদানকালে সদ্‌গুরু তাঁহাদের সুপ্ত কুণ্ডলিণীকে জাগ্রত করিয়া দেন, অর্থাৎ সক্রিয় করিয়া উর্দ্ধগতিশীল করিয়া দেন। সদ্‌গুরুর দ্বারা সঞ্চারিত শক্তির সহায়ে তাঁহার উপদিষ্ট প্রণালীতে যোগসাধনা করিলে কুণ্ডলিণী ক্রমশঃ স্বাধিষ্ঠান চক্রে উপনীত হয়; তৎপরে উক্ত চক্র ভেদ করিয়া মনিপুর চক্রে, তৎপরে মণিপুর চক্র ভেদ করিয়া অনাহত চক্রে, তৎপরে অনাহত চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে, এবং অবশেষে আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে উপনীত হয়। যখন কুণ্ডলিণী অনাহত চক্রে উপনীত হয়, তখন জীবাত্মা হৃদয়গুহা হইতে নির্গত হইয়া কুণ্ডলিণীর সহিত সম্মিলিত হয় এবং কুণ্ডলিণীর সহিত মিলিত হইয়া সহস্রারে উপনীত হয়। তখন যোগী সমাধি লাভ করেন। সদ্‌গুরুর আদেশ এবং উপদেশ অনুসারে না চলিলে এবং সাধনা না করিলে কুণ্ডলিণী পুনরায় নিম্নগা হইয়া মূলাধারে গিয়া পুনরায় সুপ্ত হইয়া পড়ে।

যেন মার্গেণ গন্তব্যং ব্রহ্মস্থানং নিরাময়ম্।
মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী ॥
সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ ॥ হঠযোগপ্রদীপিকা

—"জীবাত্মা যে সুষুম্নাপথে ব্রহ্মস্থানে অর্থাৎ সহস্রারে গমন করে, কুণ্ডলিনী সেই সুষুম্নার দ্বার মুখের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রিত আছেন। গুরুকৃপায়

কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইলে ষট্‌চক্র ভেদ হয় এবং মায়ার সকল বন্ধন ছিন্ন হয়।” কুণ্ডলিনী মূলাধার ত্যাগ করিয়া স্বাধিষ্ঠানে উপনীত হইলে বুদ্ধির পদদ্বয়কে কামনামূলক কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছা থাকে না, মণিপুরে উপনীত হইলে বুদ্ধির উপস্থকে কামনামূলক কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছা থাকে না, অনাহত চক্রে আসিলে বুদ্ধির হস্তদ্বয়কে কামনামূলক কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছা থাকে না। কুণ্ডলিনী অনাহত চক্রে উপনীত হইলে জীবাত্মা উদানবায়ুতে অধিষ্ঠিতা কুণ্ডলিনীকে স্বীয় আধারভূতা করিয়া এবং কুণ্ডলিনীকে অবলম্বন করিয়া আজ্ঞাচক্রে উপনীত হয়। কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মা অনাহত চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইলে বুদ্ধির চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এবং মনকে কামনামূলক কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছা থাকে না এবং আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া কারণদেহে উপনীত হইলে বুদ্ধির সকল বৈষয়িক কামনা তিরোহিত হয়। তখন যোগীর কোনরূপ কামনামূলক দৈহিক ব্যাপার থাকে না। ইহার পর কুণ্ডলিনী কারণদেহকেও অতিক্রম করিয়া সহস্রারে উপনীত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া সমাধি লাভ করে; এইরূপে জীবাত্মা কুণ্ডলিনীকে আধার করিয়া উদানবায়ু অবলম্বনে কারণদেহকেও অতিক্রম করিয়া সহস্রারে উপনীত হইয়া পরমাত্মার সহিত সংযোগ এবং সমাধি লাভ করে। এক-একটী চক্র এক-একটী অবরোধস্বরূপ (Hurdle)। সকল যোগীই এক জীবনেই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে উপনীত হইতে পারে না। সহস্রারকে শাস্ত্রে ব্রহ্মস্থান নামেও অভিহিত করা হইয়াছে, কারণ ইহা শুদ্ধসত্ত্বময়, ইহা প্রজ্ঞানব্রহ্ম পরমাত্মার অধিষ্ঠানক্ষেত্র, এবং জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের মিলনের স্থান। সহস্রারে উপনীত হইয়াই জীবাত্মা প্রথমে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করে। ইহার পর প্রেমের বিকাশ এবং পরিণয় লাভ হইলে জীবাত্মা সহস্রারেই সবিকল্প সমাধিতে কৃষ্ণের সহিত মিলন সম্ভোগ করে। কুণ্ডলিনী জীবাত্মারই চিদংশের প্রাণশক্তি, সহস্রারে গমনের জন্য ইহাই জীবাত্মার আধার রূপে কার্য্য করে, এবং জীবাত্মা যখন সমাধি লাভ করে তখন এই কুণ্ডলিনী জীবাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে। সমাধি হইতে ব্যুত্থান হইলে আবার কুণ্ডলিনীকে স্বতন্ত্র করিয়া এবং তাহাকেই আধার করিয়া জীবাত্মা অনাহত চক্রে নামিয়া আসে এবং তথা হইতে হৃদয়গুহায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে; কুণ্ডলিনী অনাহত চক্রে অবস্থান করে। জীবাত্মার সমাধি

এবং ব্যুত্থান এইরূপেই হইতে থাকে। কুণ্ডলিনী চিচ্ছক্তি, কারণ উহা জীবাত্মার চিদংশের শক্তি; উহা স্থূলদেহের অংশ নহে; কিন্তু ষট্‌চক্র, উদানবায়ু, এবং সুষুম্নানাড়ী স্থূলদেহের অংশ। শরীরতত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সুষুম্না নাড়ীর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছেন Canal Centralis; কিন্তু এই নাড়ীর দ্বারা দেহের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই, কারণ কুণ্ডলিনী ও তাহার উর্দ্ধগতি জড়চক্ষুর গোচর নহে এবং জড়-বিজ্ঞানের বিষয় নহে। কুণ্ডলিনী উদানবায়ু অবলম্বনে এক-একটি চক্র ভেদ করিয়া অনাহত চক্রে আসিলে জীবাত্মা উহাকে আধার করিয়া আজ্ঞাচক্রে, আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া কারণদেহে, এবং কারণদেহকে অতিক্রম করিয়া সহস্রারে উপনীত হয় বলিয়া শাস্ত্রে কুণ্ডলিনীকে আধারশক্তি নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। সুষুম্না কারণদেহের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে, কারণদেহের মধ্যে সুষুম্নার গতি নাই এবং সুষুম্নার মধ্যে গতিশীল উদানবায়ুরও গতি কারণ-দেহের মধ্যে নাই। কুণ্ডলিনী চিচ্ছক্তি, সুতরাং চিদ্বস্তু; ইহা কারণদেহকে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বাময় সহস্রারে যাইতে পারে। এইজন্য, সহস্রারে যাইতে সুষুম্না, উদানবায়ু বা দেহের কোন অংশই জীবাত্মার আধার হইতে পারে না। জীবাত্মার নিজেরই কুণ্ডলিনী নাম্নী চিচ্ছক্তি তাহার আধার হইতে পারে এবং উহাকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মার সহস্রারে গতি হয়; শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত গতি হইতে পারে না, এইজন্য জীবাত্মা স্বীয় কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা তাহার এই গতি বিধান করে। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া ষট্‌চক্র ভেদ না করিলে কোন মানবই সমাধি লাভ করিতে পারে না।

মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্নসিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্‌॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্‌॥ গৌতমীয় তন্ত্র

—যতদিন কুণ্ডলিনী মূলাধারে নিদ্রিতা থাকেন, ততদিন মন্ত্র যন্ত্র অর্চ্চনাদি সিদ্ধ হয় না। বহুপুণ্যসঞ্চয়ের ফলে যদি সেই দেবী জাগ্রতা হয়েন, মন্ত্র যন্ত্র অর্চ্চনাদি সিদ্ধ হয়।" কেবল সদ্‌গুরুই কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিতে পারেন। মূলাধারের বামপার্শ্ব হইতে ইড়া নামক একটী নাড়ী মেরুদণ্ডের বামপার্শ্ব দিয়া

এবং মূলাধারের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে পিঙ্গলা নামক একটী নাড়ী মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইড়াকে চন্দ্রনাড়ী এবং পিঙ্গলাকে সূর্য্যনাড়ী বলা হয়। সুষুম্না সত্ত্বপ্রধান, ইড়া তমঃপ্রধান, এবং পিঙ্গলা রজঃপ্রধান। সুষুম্নাপথে কুণ্ডলিণী উর্দ্ধগামী হইলে ইড়ার তমঃপ্রবাহ এবং পিঙ্গলার রজঃপ্রবাহ রুদ্ধ হয়। সুষুম্নাকে জ্ঞানবহা নাড়ীও বলা হয়।

১৩।৩।৬ বীর্য্যের নিম্নগতি, উর্দ্ধগতি, স্থিরতা

বীর্য্য (Semen) স্থূলদেহের চরম ধাতু। বীর্য্যকে বিন্দুও বলা হয়। বীর্য্যক্ষয় হইলে মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সকল শারীরিক অবয়বই দুর্ব্বল হয়। অধিক বীর্য্যক্ষয় হইলে নানারূপ ব্যাধি হয় এবং অকালমৃত্যুও হইতে পারে। বীর্য্যক্ষয় করিলে যোগসাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করা যায় না। এই সকল কারণে শাস্ত্র সর্ব্বপ্রযত্নে বীর্য্য রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দু ধারণম্ ॥ শিব সংহিতা

—"বীর্য্যক্ষয়ের ফলে অকালমৃত্যু হয় ; বীর্য্যধারণ করিলে পরিপূর্ণ জীবন লাভ হয়। এইজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে বীর্য্যরক্ষা করা কর্ত্তব্য।" সংসারে এবং ধর্ম্মক্ষেত্রে, উভয়ত্রই বীর্য্যরক্ষা প্রয়োজন, কারণ উভয়ক্ষেত্রেই সুস্থ এবং সবল দেহের প্রয়োজন। যাহারা সংসারে সুখভোগ চাহে, তাহাদেরও বীর্য্যরক্ষা করা কর্ত্তব্য। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা এবং রমণীও বীরভোগ্যা। হীনবীর্য্য ব্যক্তি বসুন্ধরার সম্পদও আহরণ করিতে পারে না এবং রমণীকেও তৃপ্তিদান করিতে পারে না। ধর্ম্ম যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদিগকে অধিকতর প্রযত্নে বীর্য্যরক্ষা করিতে হইবে, কারণ বীর্য্য ধারণ না করিলে ব্রহ্মদর্শন হয় না। এই সকল কারণে, শাস্ত্র সকলকে যৌবনাবধি ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া বীর্য্য রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বীর্য্য রক্তের সারাংশ ; দুগ্ধের মধ্যে মাখন যেমন ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত অবস্থায় অবস্থান করে, তদ্রূপ রক্তের মধ্যে বীর্য্য ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত অবস্থায় অবস্থান করে। দুগ্ধকে মন্থন করিলে যেমন মাখন দুগ্ধ হইতে পৃথক হইয়া যায়, তদ্রূপ চিত্তে বিকার উপস্থিত হইলে বীর্য্য রক্ত হইতে পৃথক হইয়া এবং নিম্নগামী হইয়া অণ্ডকোষে গিয়া সঞ্চিত হয়। তথা হইতে স্ত্রীসঙ্গমকালে অথবা স্বপ্নদোষ হইয়া অথবা হস্তমৈথুনের ফলে

সেই বীর্য্য স্খলিত হইয়া যায়। অধিক চিত্তবিকার, অধিক কামচিন্তা, এবং অধিক কামক্রিয়ার ফলে অধিক পরিমাণে বীর্য্য নিম্নগামী হয়, ইহার ফলে বীর্য্য তরল হয় এবং মেহ প্রমেহ প্রভৃতি ব্যাধির উৎপত্তি হয়। চিত্তে কামজ বিকার হইলেই যে বীর্য্য নিম্নগামী হয়, তাহা নহে; ক্রোধ বা অন্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন চিত্তবিকারের ফলেও বীর্য্য নিম্নগামী হয়; কামজ বিকারের ফলে অধিক পরিমাণে বীর্য্য নিম্নগামী হয়। বীর্য্যের নিম্নগতি নিবারণ করিবার উপায় আছে। সেই উপায়:—সর্ব্বসময়ে চিত্তের পরিপূর্ণ সমতা (Complete equilibrium) রক্ষা করা। যে সকল যোগী কামক্রোধাদি রিপুগণকে জয় করিয়াছেন এবং শীতোষ্ণসুখদুঃখে অথবা অন্য কোন কারণেই যাঁহাদের চিত্তে কোনরূপ বিকার হয় না, এইরূপ নিত্য সমভাবাপন্ন নিত্যপ্রসন্ন এবং নিত্যনির্ব্বিকারচিত্ত যোগীগণের বীর্য্য রক্ত হইতে পৃথকই হয় না; সুতরাং তাঁহাদের বীর্য্যের নিম্নগতি হয় না এবং বীর্য্যক্ষয়ও হয় না; ইহাই বীর্য্যের স্থিরতা। এইরূপ হইলে যোগীকে স্থিরবীর্য্য বলা হয়। কিন্তু স্থিরবীর্য্য হইতে বিলম্ব হয়। চিত্তবিকার ঘটাইবার মত বহু বস্তুর এবং ঘটনার সংস্পর্শে যোগীগণকেও আসিতে হয়। এইজন্য চিত্তের সমতা রক্ষা করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না। স্থিরবীর্য্য হইবার পূর্ব্বেও যাহাতে বীর্য্যক্ষয় না হয়, তজ্জন্য ঊর্দ্ধরেতা হইবার সাধনপ্রণালী অনুসারে সাধনা করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়। ঊর্দ্ধরেতা হইবার তিনটী সাধনপ্রণালী আছে। একটীর নাম সহজোলী পন্থা, অন্যটীর নাম বজ্রোলী পন্থা। অমরোলী নামক আরও একটী পন্থা আছে। পন্থাত্রয়ের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল না, কারণ অনেকে পুস্তকে পড়িয়া উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিতে গিয়া দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়। উক্ত পন্থাগুলিকে যোগের ভাষায় মুদ্রা বলা হয়। গুরুর দ্বারা সঞ্চারিত শক্তির সহায়ে গুরুর উপদেশ অনুসারে ঐ সকল প্রক্রিয়া করিতে হয়। রক্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া যে বীর্য্য নিম্নগামী হইয়া অণ্ডকোষে যায়, উক্ত প্রক্রিয়াত্রয়ের কোন একটীর সাধনার দ্বারা সেই বীর্য্যকে তথা হইতে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিতে হয়। এই আকৃষ্ট বীর্য্য মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী নাড়ীপথে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে থাকে। এই নাড়ীটীর নাম বজ্রা নাড়ী। ইহা উপস্থমূল হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই নাড়ীর অভ্যন্তরে বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল শক্তি আছে। উপস্থমূলে বজ্রা নাড়ীর যে মুখ আছে, সাধারণ মানবদেহে সেই

মুখটী সম্পূর্ণ বদ্ধ থাকে। সহজোলী, অমরোলী, বা বজ্রোলী প্রক্রিয়াত্রয়ের মধ্যে যে কোনটীর সাধনা বজ্রানাড়ীর বদ্ধ মুখকে উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং বীর্য্যকে আকর্ষণ করিয়া ঐ নাড়ীর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধদিকে গতিশীল করে। ঐ নাড়ীটী এরূপ শক্তিবিশিষ্ট যে উহার মধ্য দিয়া বীর্য্য ঊর্দ্ধে গমন করিতে থাকিলে উহা সেই বীর্য্যকে প্রথমে আপনাতে মিলাইয়া লইয়া (absorb করিয়া) পরে সমগ্র দেহে উহাকে দেহসাৎ করিয়া (assimilate করিয়া) দেয়। এইরূপ মিশ্রণের (assimilation) ফলে শরীরের ক্ষয় পূরণ হয়। এইজন্য, ঊর্দ্ধরেতা হইলে শরীরের ক্ষয় হয় না, এবং যোগী যেরূপ শরীর লইয়া ঊর্দ্ধরেতা হয়েন, তাঁহার শরীরটী আমরণ তদ্রূপই থাকে। ঊর্দ্ধরেতা হইলে অণ্ডকোষ হইতে বীর্য্যের লিঙ্গমধ্য দিয়া বহির্নির্গমনের নাড়ীটীর মুখ বদ্ধ হইয়া যায়। অণ্ডকোষ হইতে বীর্য্য লিঙ্গদ্বারে নির্গত হইবার কালে মানব যে পরিমাণ দৈহিক সুখ অনুভব করে, ঊর্দ্ধগামী বজ্রানাড়ী দিয়া বীর্য্যের ঊর্দ্ধগতিকালে ঊর্দ্ধরেতা যোগী তাহা অপেক্ষা বহু অধিক পরিমাণ দৈহিক সুখ অনুভব করেন। অধিকন্তু, ঊর্দ্ধরেতা হইলে যোগী কতকগুলি অলৌকিক ক্ষমতাও লাভ করেন। এইগুলি যোগীর পক্ষে বড় লোভনীয় বস্তু হইয়া পড়ে এবং এই কারণে অনেক যোগী ঊর্দ্ধরেতা হইয়া সেই অবস্থাতেই আটকাইয়া যান, আর অগ্রসর হয়েন না। ঊর্দ্ধরেতা অবস্থাকে কেবলমাত্র স্থিরবীর্য্য হইয়া ভগবানকে লাভ করিয়া পরিপূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য একটী উপায়মাত্ররূপে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা উক্তরূপ বিপদ ঘটিয়া থাকে। ঊর্দ্ধরেতা হইবার সাধনায় কঠোর চিত্তসংযমের প্রয়োজন। এইরূপ সাধনা স্থিরবীর্য্য হইতেও সহায়তা করে। স্থিরবীর্য্য হইবার পর ঊর্দ্ধরেতা যোগীকে আর বীর্য্যকে ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিতে হয় না, কারণ তাঁহার বীর্য্য নিম্নগামী হয় না। সংসারাশ্রমী ব্যক্তিগণ যদি যৌবনাবধি ব্রহ্মচর্য্যপালন এবং বীর্য্যরক্ষা করিবার পরে বিবাহ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্ত্রীসহবাস করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শরীরের ক্ষতি হয় না এবং যোগসাধনারও বিঘ্ন হয় না।

১৩।৩।৭ পঞ্চকোষ

সংখ্যদর্শন মানবদেহকে কারণদেহ, লিঙ্গদেহ, এবং স্থূলদেহ, এই ত্রিবিধ দেহে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকটীর কার্য্য বিবৃত করিয়াছে। বেদান্তদর্শন ও তাহা

করিয়াছে, অধিকন্তু মানবদেহকে পঞ্চকোষে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকটীর কার্য্য বিবৃত করিয়াছে। পঞ্চকোষ ঃ—অন্নময়কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। অন্নময় কোষ স্থূলদেহ। প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ এবং বিজ্ঞানময় কোষ লিঙ্গদেহের অন্তর্গত। আনন্দময় কোষ কারণদেহ। এইরূপ বিভাগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই; পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহটী অন্নময় কোষ। লিঙ্গদেহের দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র প্রাণময় কোষ। লিঙ্গদেহের অহঙ্কার এবং মন মনোময় কোষ। লিঙ্গদেহের বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ। এইরূপে লিঙ্গদেহ তিনটী কোষে বিভক্ত হইয়াছে। কারণদেহ এবং আনন্দময় কোষ একই। অন্নময় কোষে আহারের কামনা এবং আহারে তৃপ্তি, প্রাণময় কোষে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য, মনোময় কোষে সংকল্পবিকল্প, বিজ্ঞানময় কোষে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা, এবং আনন্দময় কোষে দ্বন্দ্বহীনতার আনন্দ। জীবাত্মা এই পঞ্চকোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং এই পঞ্চকোষ ভেদ করিলে মুক্ত হয়। জীবাত্মা কোন একটী কোষ ভেদ করিলে তাহা লক্ষণের দ্বারা বুঝা যায়। ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে বুঝা যায় যে অন্নময় কোষ ভেদ হইয়াছে। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য তিরোহিত হইলে বুঝা যায় যে প্রাণময় কোষ ভেদ হইয়াছে। সঙ্কল্পবিকল্প না থাকিলে বুঝা যায় যে মনোময় কোষ ভেদ হইয়াছে। ঈশ্বরের এবং জীবাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সংশয় না থাকিলে বুঝা যায় যে বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হইয়াছে। জাগতিক কোন ভোগ্য বিষয়ই যখন ভোগসুখ দিতে পারে না, তখন বুঝা যায় যে আনন্দময় কোষ ভেদ হইয়াছে। গুরুশক্তিতে যোগসাধনার দ্বারা জীবাত্মা পঞ্চকোষ ভেদ করিতে পারে। পঞ্চকোষ ভেদ করার অর্থ, স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ, এবং কারণদেহ, এই ত্রিবিধ দেহকে অতিক্রম করা। এই অবস্থায় জীবাত্মা মায়াতীত এবং মুক্ত হয়।

১৩।৩।৮ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা জীবাত্মার নহে; এই তিনটীই বুদ্ধির অবস্থা। বুদ্ধি দেহের প্রধান অংশ এবং পরিচালক; এইজন্য বুদ্ধির এই তিনটী অবস্থা দেহেরই অবস্থা। জীবাত্মা চিদ্বস্তু; চিদ্বস্তু নিত্যচেতন; নিত্যচেতন বস্তুর জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি নামক অবস্থাভেদ থাকিতে পারে না। দেহ জড় এবং অচেতন বস্তু; জীবাত্মার চেতনা এবং জ্ঞানশক্তি দেহকে চেতন

করে; তখন দেহের জাগ্রৎ অবস্থা। জীবাত্মা দেহ হইতে স্বীয় চেতনা এবং জ্ঞানশক্তিকে আপনাতে উপসংহৃত করিয়া লইলেই দেহ অচেতন হয়। উক্তরূপে উপসংহৃত করিবার কালে দেহের চেতনা ক্রমশঃ ক্ষীণায়মান হইবার সময় দেহের স্বপ্নাবস্থা, এবং সম্পূর্ণরূপে উপসংহৃত হইলে দেহের যে অচেতন অবস্থা হয় তাহা সুষুপ্তাবস্থা। এই তিনটী অবস্থা জীবাত্মার নহে, দেহের, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি নিরূপণ করিয়াছেন। "স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।" কঠ। ২।১।৪ —"জীবাত্মা স্বপ্ন এবং জাগরণ, এই উভয় অবস্থার অন্তর্গত সকল বস্তুই দর্শন করে।" ইহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া গেল যে জীবাত্মা নিত্যচেতন থাকিয়া দেহের স্বপ্ন জাগরণের সমস্ত বস্তুই প্রত্যক্ষ করে, এবং স্বপ্ন-জাগরণ দেহেরই অবস্থা। "স্বপ্নেন শরীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।" বৃহ ৪।৩।১১ —"জীবাত্মা স্বয়ং অসুপ্ত থাকিয়া, নিদ্রার দ্বারা দেহকে নিষ্ক্রিয় করিয়া, সুপ্ত বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে দর্শন করে।" ইহা হইতেও প্রাপ্ত হওয়া গেল যে জীবাত্মা নিত্যচেতন থাকিয়া দেহের স্বপ্ন-জাগরণের সমস্ত বস্তুই প্রত্যক্ষ করে, এবং স্বপ্ন জাগরণ দেহেরই অবস্থা।

বুদ্ধের্জ্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে।
মায়ামাত্রমিদং রাজন্! নানাত্বং প্রত্যগাত্মনি॥ ভাগবত ১২।৪।২৫

—"হে রাজন্, জাগরণ, স্বপ্ন, এবং সুষুপ্তি, এই তিনটী অবস্থাই বুদ্ধির, এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত অবস্থাত্রয়কে যে জীবাত্মার অবস্থা বলিয়া মনে হয়, তাহা মায়ার কার্য্য। বস্তুতঃ জীবাত্মার মধ্যে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিভেদে নানাত্ব নাই।" জীবাত্মা নিত্যচেতন হইলেও ত্রিগুণময় দেহে অধিষ্ঠানহেতু তাহার চেতনার বাহ্য বিকাশ এবং কার্য্য সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। জীবাত্মা যখন বহিষ্প্রজ্ঞ এবং স্থূলভুক্ থাকে, তখন দেহের জাগ্রদবস্থা। জীবাত্মা যখন অন্তঃপ্রজ্ঞ এবং প্রবিবিক্তভুক্ থাকে, তখন দেহের স্বপ্নাবস্থা। জীবাত্মা যখন প্রাজ্ঞ এবং আনন্দভুক্ থাকে, তখন দেহের সুষুপ্তাবস্থা। জীবাত্মার এবং দেহের উক্ত অবস্থাত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১৩।৩।৯ জাগ্রদবস্থা: মানবের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা

জীবাত্মা যখন বহিষ্প্রজ্ঞ এবং স্থূলভুক্, তখন দেহের জাগ্রদবস্থা (মাণ্ডূক্য ৩)। জীবাত্মার প্রজ্ঞা অর্থাৎ চেতনা ও জ্ঞানশক্তি যখন বুদ্ধি-

মন-ইন্দ্রিয়বর্গে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া ইহাদের কার্য্যের দ্বারা বাহ্য প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তখন জীবাত্মা বহিষ্প্রজ্ঞ। দেহের চিন্তা বাক্য এবং কার্য্যের দ্বারা জীবাত্মার চেতনার ও জ্ঞানশক্তির বাহ্য প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়। জীবাত্মা যখন বহিষ্প্রজ্ঞ, তখন দেহ জাগ্রত এবং কর্ম্মপরায়ণ। দেহ জড় বস্তু। তাহার ভোগ্য বিষয়ও জড় বস্তু; এইজন্য দেহ স্থূলভুক্। কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানী জীবাত্মা দেহের ভোগকে আপন ভোগ বলিয়া ভাবে। ইহা জীবাত্মার দেহাভিমানজাত সংস্কার। এইজন্য, যদিও জীবাত্মা বস্তুতঃ স্থূলভুক্ নহে, শ্রুতি তথাপি তাহাকে স্থূলভুক্ বলিয়াছেন। ভোক্তৃত্বাভিমানী জীবাত্মা যখন বহিষ্প্রজ্ঞ, তখন দেহ বাহ্য বিষয় ভোগে ব্যাপৃত, অর্থাৎ স্থূলভুক্; তখন দেহের জাগ্রদবস্থা। জীবাত্মার বহিষ্প্রজ্ঞ অবস্থা দেহের স্থূলভুক্ হইবার কারণ; দেহের স্থূলভুকত্বকে আপনাতে আরোপ জীবাত্মার অধ্যাস। এই জাগ্রদবস্থা মায়াময় অবস্থা এবং বিশ্বমায়ার প্রথম পাদ। কর্ম্মময় জগৎ দেহের জাগ্রদবস্থার পরিচায়ক। সকল মানবের জাগ্রদবস্থার বাক্য কার্য্য চিন্তা একই প্রকার নহে, সাত্ত্বিক মানবের সাত্ত্বিক, রাজসিক মানবের রাজসিক, এবং তামসিক মানবের তামসিক। জাগ্রদবস্থায় মানব যেরূপ কর্ম্ম করে, ইহকালে অথবা পরকালে তদ্রূপ ফল ভোগ করে। জাগ্রদবস্থায় স্বীয় ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা ঈশ্বর মানবকে দিয়াছেন। বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গের যতখানি শক্তি আছে, ততখানি শক্তির দ্বারা সাধ্য যে কোনও কর্ম্ম মানব স্বীয় ইচ্ছানু-সারে করিতে পারে; কিন্তু সেই শক্তির অসাধ্য কোন কর্ম্ম মানব ইচ্ছা করিলেও করিতে পারে না। মানবের কর্ম্মশক্তি উক্তরূপে সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহার কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতাও সেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাকে মানব ইচ্ছানুসারে সৎ বা অসৎ কর্ম্মের সম্পাদনে ব্যবহার করিতে পারে। ত্রিগুণময় বুদ্ধির এবং মনের ইচ্ছা এবং কর্ম্ম বিষয়সংক্রান্তই হইয়া থাকে এবং কর্ম্মফল ও বন্ধন সৃষ্টি করে। মানব তাহার এই স্বাধীনতাকে যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার স্বাধীনতার সার্থক ব্যবহার হয় এবং সেই কর্ম্ম বন্ধন সৃষ্টি করে না। যেরূপে কর্ম্ম করিলে বন্ধন সৃষ্ট হইবে না, ঈশ্বর তাহা শ্রুতি এবং স্মৃতি সকল শাস্ত্রেই ঘোষণা করিয়াছেন। এইজন্য, শাস্ত্রীয় বিধান ঈশ্বরের আদেশ। মানব শাস্ত্রীয় বিধান এবং সদ্‌গুরুর আদেশ ও উপদেশ অনুসারে

কর্ম্ম করিলে তাহার স্বাধীন ইচ্ছাকে ঈশ্বরের অধীন করিয়া কর্ম্ম করা হয় এবং এইরূপ কর্ম্ম বন্ধন সৃষ্টি করে না।

১৩।৩।১০ স্বপ্নাবস্থা

জীবাত্মা যখন অন্তঃপ্রজ্ঞ এবং প্রবিবিক্তভুক্, তখন দেহের স্বপ্নাবস্থা (মাণ্ডূক্য ৪)। বহিষ্প্রজ্ঞ জীবাত্মা যখন উদানবায়ু অবলম্বনে হৃদয়গুহা হইতে অন্তরাকাশে বামনরূপী কৃষ্ণের সহিত মিলনলাভ করিতে যায়, তখন সে দেহের সর্ব্বাংশ হইতে স্বীয় চেতনা এবং জ্ঞানশক্তিকে ক্রমশঃ আপনাতে উপসংহৃত করিয়া লইতে থাকে; যখন সে বামনের নিকট উপনীত হয় তখন উক্তরূপ উপসংহৃত করিয়া লওয়ার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় এবং জীবাত্মা প্রাজ্ঞ ও আনন্দভুক্ হয়; তৎকালে দেহের সুষুপ্তাবস্থা। আবার জীবাত্মা যখন প্রাজ্ঞ ও আনন্দভুক্ অবস্থা হইতে বহিষ্প্রজ্ঞ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে থাকে, তখন তাহার চেতনা ও জ্ঞানশক্তি ক্রমশঃ বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গে পুনরায় সঞ্চারিত হইতে থাকে এবং জীবাত্মা পুনরায় বহিষ্প্রজ্ঞ হইলেই দেহ জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মার বহিষ্প্রজ্ঞ এবং স্থূলভুক্ অবস্থা হইতে প্রাজ্ঞ ও আনন্দভুক্ অবস্থা প্রাপ্তির মধ্যবর্ত্তী কালে, এবং প্রাজ্ঞ ও আনন্দভুক্ অবস্থা হইতে বহিষ্প্রজ্ঞ ও স্থূলভুক অবস্থা প্রাপ্তির মধ্যবর্ত্তী কালে জীবাত্মা অন্তঃপ্রজ্ঞ হয় এবং তৎকালে দেহ স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়। উক্ত দুইটী মধ্যবর্ত্তী কাল দেহের স্বপ্নাবস্থা এবং এই দুই সময়ের মধ্যে স্বপ্নদর্শন হয়। জীবাত্মার উক্তরূপ গমনকালে যখন তাহার চেতনাকে এবং জ্ঞানশক্তিকে দেহের সর্ব্বাংশ হইতে আপনাতে উপসংহৃত করিয়া লইতে থাকে তখন চেতনার ও জ্ঞানশক্তির ক্ষীয়মান অবস্থায় বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গ বাহিরের বিষয়ের সহিত সংযোগ লাভ করিতে পারে না; আবার জীবাত্মার উক্তরূপ প্রত্যাবর্ত্তনকালে চেতনার ও জ্ঞানশক্তির স্বল্প সঞ্চার প্রাপ্ত অবস্থায়ও বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গ বাহিরের বিষয়ের সহিত সংযোগ লাভ করিতে পারে না। এই উভয় কালেই তাহাদের ক্ষীণ চেতনা ও জ্ঞানশক্তি তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। এই অবস্থায় জীবাত্মার প্রজ্ঞার অর্থাৎ চেতনার এবং জ্ঞানশক্তির বাহ্য প্রকাশ থাকে না, উহা কেবল দেহাভ্যন্তরেই নিবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহা জীবাত্মার অন্তঃপ্রজ্ঞ অবস্থা। অন্তঃপ্রজ্ঞ অবস্থায় জীবাত্মা প্রবিবিক্তভুক্ হয়। জীবাত্মার অন্তঃপ্রজ্ঞ অবস্থায় বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়গণ বাহিরের স্থূল

বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না ; এই সময়ে বুদ্ধি ও মন স্মৃতির দ্বারা এবং কল্পনার দ্বারা ভোগের কার্য্য করিয়া থাকে। বুদ্ধি ও মন পূর্ব্বে জাগ্রদবস্থায় ভুক্ত বিষয়সকলের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিষয়সকলকে এবং পূর্ব্বের ভোগক্রিয়াকে স্মৃতিশক্তির দ্বারা স্মরণ করিয়া পূর্ব্বাস্বাদিত সুখ দুঃখ ভয় অভয় ভোগ করে। কিন্তু স্মৃতির দ্বারা এই দর্শনটী সকল সময়ে যথাযথভাবে হয় না, কারণ তখন চেতনার ক্ষীণতাহেতু স্মৃতিশক্তিও ক্ষীণ থাকে ; এই প্রকারের স্মৃতিদর্শন কখনও যথাযথভাবে কখনও রূপান্তরিত হইয়া দৃষ্ট হয়। স্বপ্নে এইরূপ দৃষ্ট বস্তুর দর্শন, শ্রুত বস্তুর শ্রবণ, অনুভূত বস্তুর অনুভব হয়, শ্রুতি ও তাহা ঘোষণা করিয়াছেন (প্রশ্ন ৪।৫)। স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধির এইরূপ স্মৃতিসম্ভোগটী প্রবিবিক্ত ভোগ। আবার, বুদ্ধি ও মন জাগ্রদবস্থায় যে সকল বিষয় ভোগ করিবার কামনা করিয়াছিল কিন্তু যে কামনাসমূহ জাগ্রদবস্থায় পূর্ণ হয় নাই, স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল বিষয় অথবা তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতকগুলিকে কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করিয়া লইয়া ভোগ করে, কারণ তখন ইন্দ্রিয়গণ বহিরের বিষয়ের সহিত সংযোগ লাভ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট এই ভোগ্য বিষয়সমূহও সকল সময়ে যথাযথরূপে কল্পিত হয় না, কখনও যথাযথভাবে কখনও রূপান্তরিতভাবে কল্পিত হয় ; ইহারও কারণ স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধির ও মনের চেতনার ক্ষীণতা। স্বপ্নাবস্থার এইরূপ কল্পনাসম্ভোগের দ্বারাও বুদ্ধি-মন সুখ-দুঃখ, ভয়, অভয় অনুভব করে। স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ কল্পনাসম্ভোগও শ্রুতি কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছে (প্রশ্ন ৪।৫)। এই কল্পনাসম্ভোগও স্বপ্নাবস্থার প্রবিবিক্ত ভোগ। সকল প্রবিবিক্ত ভোগ লিঙ্গদেহের ভোগ ; ইহা স্থূলদেহের দ্বারা সাধিত হয় না ; কিন্তু লিঙ্গদেহের প্রবিবিক্ত ভোগ স্থূলদেহে বিকার উৎপন্ন করে। স্বাদু বস্তু ভক্ষণের স্বপ্নে জিহ্বায় লালানিঃসরণ, স্ত্রীসম্ভোগের স্বপ্নে রেতঃস্খলন, ভয়ঙ্কর বস্তুর দর্শনের স্বপ্নে দেহে কম্পন এবং ভীতিব্যঞ্জক শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি দৈহিক বিকার উপস্থিত হয়। এতদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে স্বপ্নাবস্থার ভোগ দেহেরই ভোগ। স্মৃতিসম্ভোগ এবং কল্পনাসম্ভোগ ব্যতীত আরও একপ্রকার প্রবিবিক্ত ভোগ স্বপ্নাবস্থায় হয় ; ইহা পরলোকদর্শন। স্বপ্নে পরলোকদর্শন হয় বলিয়া শ্রুতি স্বপ্নাবস্থাকে ইহ-পর-লোকের সন্ধিস্থান বলিয়াছেন। স্বপ্নাবস্থায় পরলোকদর্শন কিরূপ তাহাও শ্রুতি বিবৃত করিয়াছেন।

সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে

পশ্যতীদং পরলোকস্থানং চ। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তথাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্নন্ আনন্দাংশ্চ পশ্যতি। বৃহদারণ্যক ৪।৩।৯ —"ইহলোক এবং পরলোক ব্যতীত একটী তৃতীয় স্থান আছে। ইহা স্বপ্নস্থান। স্বপ্নস্থান ইহ-পর লোকদ্বয়ের সন্ধিস্থল। এই সন্ধিস্থানে অবস্থান-কালে মানব ইহলোকস্থান এবং পরলোকস্থান, এই উভয় স্থান দর্শন করে। মানব পরলোকস্থানের জন্য পাপ অথবা পুণ্য যেরূপ অবলম্বনযুক্ত হইয়াছে, সেই অবলম্বনকে আশ্রয় করিয়া পরলোকস্থানে ভোক্তব্য পাপকর্ম্মের দুঃখময় ফল এবং পুণ্যকর্ম্মের সুখময় ফল, উভয়ই দর্শন করে।" এই শ্রুতিবাক্যে যে ইহলোকস্থানদর্শনের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা এই জীবনেরই পরবর্ত্তী কালের কর্ম্মফলভোগের দর্শন এবং এই জগতে পুনর্জন্মলাভের পর পরজন্মেরও কর্ম্মফলভোগদর্শন। এই শ্রুতিবাক্যে যে পরলোকস্থানদর্শনের বিষয় বলা হইয়াছে তাহা মৃত্যুর পর পুণ্যবানের স্বর্গে যে সুখভোগ হইবে এবং পাপীর নরকে যে দুঃখভোগ হইবে তাহার দর্শন। পাপকর্ম্মের জন্য যে দুঃখময় ফল ভোগ করিতে হইবে তাহা দেখিয়া মানব ভীত এবং দুঃখিত হয়; পুণ্যকর্ম্মের জন্য যে সুখময় ফল ভোগ হইবে, তাহা দেখিয়া মানব নির্ভয় এবং সুখী হয়। ইহা পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগ নহে, তদ্দর্শনজাত ভীতি ও দুঃখ এবং অভয় ও সুখ ভোগ; এইজন্য ইহাও স্বপ্নাবস্থার প্রবিবিক্ত ভোগ। পাপফল দেখিয়া মানব পাপকার্য্যে বিরত হইবে এবং পুণ্যফল দেখিয়া মানব পুণ্যকর্ম্মে রত হইবে, এই মঙ্গলময় ইচ্ছায় করুণাময় কৃষ্ণ স্বপ্নে উক্তরূপ কর্ম্মফলভোগদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানবের সহস্রারে বিদ্যমান পরমাত্মা-রূপী কৃষ্ণ উক্তরূপে ভবিষ্যতের কর্ম্মফলভোগ দর্শন করান। স্বপ্নাবস্থায় পর-লোকগত ব্যক্তির এবং দেবদেবীর দর্শনও পরলোকদর্শনের অন্তর্গত। এইরূপ দর্শনের ফলেও সুখ বা দুঃখ ভোগ হয়। স্বপ্নাবস্থার এই সকল প্রকার ভোগই বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেহাভ্যন্তরে একান্ত নিভৃতে লব্ধ হয়, সেইজন্য শ্রুতি এইরূপ ভোগকে প্রবিবিক্ত ভোগ বলিয়াছেন (প্র=প্রকৃষ্ট-রূপে; বিবিক্ত=বাহ্যসম্পর্কহীন একান্ত নিভৃত)। ভোক্তৃত্বাভিমানী জীবাত্মা দেহের প্রবিবিক্ত ভোগকে স্বীয় ভোগ বলিয়া ভাবে, এইজন্য শ্রুতি অন্তঃপ্রজ্ঞ জীবাত্মাকে প্রবিবিক্তভুক্ বলিয়াছেন। জীবাত্মার অন্তঃপ্রজ্ঞ অবস্থা দেহের স্বপ্নাবস্থার কারণ। দেহের প্রবিবিক্তভুকত্বকে আপনাতে আরোপ জীবাত্মার

অধ্যাস। স্বপ্নদর্শনের বিবরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে সকল স্বপ্নই অলীক নহে। সাত্ত্বিক তামসিক এবং রাজসিক ভেদে মানবের স্বপ্নদর্শন এবং প্রবিবিক্ত ভোগ বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থার কর্ম্ম বন্ধন সৃষ্টি করে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার প্রবিবিক্ত ভোগের কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না (বৃহদারণ্যক ৪।৩।১৫-১৬)।

১৩।৩।১১ সুষুপ্তাবস্থা

জীবাত্মা যখন প্রাজ্ঞ এবং আনন্দভুক্ হয়, তখন দেহের সুষুপ্তাবস্থা (মাণ্ডূক্য। ৫।) সুষুপ্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই ৯।৬।১ অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে সেই বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। বহিঃপ্রজ্ঞ এবং অন্তঃপ্রজ্ঞ অবস্থার আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে স্থূলভুকত্ব এবং প্রবিবিক্তভুকত্ব জীবাত্মার দেহাভিমানজাত সংস্কার এবং অধ্যাস; কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞ অবস্থার আনন্দভুকত্ব তাহা নহে, কারণ জীবাত্মা স্বীয় স্বভাবানুযায়ী স্বয়ং এই আনন্দ সম্ভোগ করে। এই আনন্দভোগের লিপ্সা জীবাত্মার আনন্দাংশে আছে; ইহা পূর্ণ না হইলে জীবাত্মা দেহে থাকিতে পারে না; এইজন্য কৃষ্ণ মায়াময় বিশ্বলীলায় তাঁহার সহিত এইরূপ মিলনানন্দ সম্ভোগের বিধান করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি "স্বপিতি" শব্দের এইরূপ অর্থ করেন:—যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি। ছান্দোগ্য ৬।৮।১। —"হে সোম্য, যখন বলা হয় "জীবাত্মা স্বপিতি", তখন জীবাত্মা নিত্যসত্য পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। স্বম্ = পরমেশ্বরকে; অপীত = প্রাপ্ত হয়; এইজন্য জীবাত্মা তখন 'স্বপিতি' এইরূপ বলা হয়।" ছান্দোগ্য শ্রুতির "স্বপিতি" শব্দের উক্তরূপ ব্যাখ্যার দ্বারাও নিরূপিত হইয়াছে যে জীবাত্মা নিদ্রিত হয় না, পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ সম্ভোগ করে। জীবাত্মা প্রাজ্ঞ এবং আনন্দভুক্ হইলে দেহ সুষুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দেহ নিদ্রিত হইলেই যে জীবাত্মা প্রাজ্ঞ এবং আনন্দভুক্ হইবে তাহা নহে, অর্থাৎ, নিদ্রা-মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত সুষুপ্তি নহে। তামসিক মানবের সকল সময়ের সকল নিদ্রাই সুষুপ্তি নহে। দেহে তমোগুণের আধিক্য হইলে তমোগুণের প্রলয়ী শক্তির প্রভাবে দেহ অনেক সময় বাহ্যচেতনাহীন হইয়া থাকে; ইহা তমোগুণোৎপন্ন

নিদ্রা; (প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি—গীতা ১৪।৮)। মাদক দ্রব্য অথবা নিদ্রাকারী ঔষধ সেবন করিলে তদ্দ্বারা দেহের বাহ্যচেতনা লুপ্ত হয়; ইহা মাদকজ অথবা ঔষধজ নিদ্রা। মূর্চ্ছা অথবা অন্য কোন ব্যাধির বিকারবশতঃ দেহের বাহ্যচেতনা লুপ্ত হইলে তাহাও সুষুপ্তি নহে এবং নিদ্রাও নহে। সুতরাং, তামসিক নিদ্রা, মাদকজ নিদ্রা, ঔষধজ নিদ্রা, মূর্চ্ছা অথবা ব্যাধির অজ্ঞানতা কালে জীবাত্মা প্রাজ্ঞ এবং আনন্দভুক্ হয় না। নিদ্রাহীনতারোগে ঔষধজ নিদ্রা দেহেন্দ্রিয়গণকে বিশ্রাম দেয় বলিয়া শরীরের কল্যাণ হয়। সুষুপ্তি, তামসিক নিদ্রা, মাদকজ নিদ্রা, ঔষধজ নিদ্রা, মূর্চ্ছা, অথবা ব্যধিজাত অজ্ঞানতা, এই সমস্তই দেহের অবস্থা, কিন্তু জীবাত্মা সকল সময়েই নিদ্রাহীন ও জাগ্রত। চিরবিনিদ্র জীবাত্মার প্রাণশক্তি সকল সময়েই দেহের পঞ্চপ্রাণবায়ুতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহকে উক্ত সকল অবস্থাতেই সপ্রাণ ও জীবিত রাখে। যতদিন জীবাত্মা দেহে থাকে ততদিন প্রাণশক্তিও দেহে থাকে। জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিলে প্রাণশক্তিও দেহে থাকে না এবং দেহের মৃত্যু হয়। মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা হইয়াছে।

১৩।৩।১২ সঙ্ঘাত, চেতনা, ধৃতি

গীতা ১৩।৬ শ্লোকে সঙ্ঘাত, চেতনা, এবং ধৃতি, এই তিনটী বস্তুকেও ক্ষেত্রের অংশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কারণদেহ, লিঙ্গদেহ, এবং স্থূলদেহের সংহত অবস্থায় একত্র অবস্থিতির নাম সঙ্ঘাত। জীবাত্মা কারণদেহ এবং লিঙ্গদেহ সহ স্থূলদেহকে ত্যাগ করিলে সঙ্ঘাত নষ্ট হয় এবং স্থূলদেহের মৃত্যু হয়। জীবাত্মার চিতের চেতনা সমগ্র দেহের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; কেবল যে কারণদেহে এবং লিঙ্গদেহেই, তাহা নহে; স্থূলদেহেরও প্রতি অণুপরমাণুতে থাকে। স্থূলদেহের যে কোন অংশে কোনরূপ আঘাত লাগিলে কেবল বুদ্ধি ও মনই যে সেই আঘাতজনিত ব্যথা অনুভব করে, তাহা নহে, স্থূলদেহের যে অংশে সেই আঘাত লাগে, সেই অংশেও ব্যথা অনুভূত হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, দেহের সর্ব্বাংশে চেতনা ব্যপ্ত হইয়া আছে। জীবাত্মা দেহে অবস্থিত থাকিয়াও দেহ হইতে স্বতন্ত্র থাকে, এইজন্য জীবাত্মা দেহের অংশ নহে; কিন্তু চেতনা চিদ্বস্তু হইলেও, দেহের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত চেতনা দেহের প্রতি অণু-পরমাণুর সহিত ওতপ্রোতভাবে একত্র থাকে; এই দৈহিক চেতনাই গীতার ১৩।৬

শ্লোকের চেতনা। জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিলে মৃতদেহে এই চেতনা থাকে না। জীবাত্মাকে স্বীয় অভ্যন্তরে ধারণ করিয়া রাখিবার যে শক্তি ত্রিগুণময় দেহের আছে, তাহা, এবং সেই শক্তির উক্তরূপ ধারণক্রিয়া গীতার ১৩।৬ শ্লোকের ধৃতি। এই ধৃতি দেহের অংশ। সঙ্ঘাত, চেতনা, ধৃতিকে দেহের অংশ বলিতে এরূপ বুঝায় না যে ইহারা দেহের উপাদান। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই দেহের উপাদান।

১৩।৩।১৩ স্ত্রীদেহ এবং পুরুষদেহ : সিদ্ধযোগীর প্রকৃতিদেহ

স্ত্রীদেহের এবং পুরুষদেহের সংযোগে সন্তানের উৎপত্তি হইয়া সৃষ্টিরক্ষা এবং সৃষ্টির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে, ইহা ঈশ্বরের বিধান। স্থূল পাঞ্চভৌতিক সন্তানদেহ স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতেই উৎপন্ন হয়। এই উৎপাদন ক্রিয়ার নিমিত্ত স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহসমূহের কতকগুলিকে স্ত্রীদেহ এবং কতকগুলিকে পুরুষদেহ করিতে হইয়াছে। স্ত্রীদেহকে শোণিত প্রধান এবং পুরুষদেহকে শুক্রপ্রধান করা হইয়াছে। এই দ্বিবিধ দেহের সহবাসে যাহাতে সন্তানের দেহ উৎপন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য দ্বিবিধ দেহের যান্ত্রিকতা (mechanism) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের করিতে হইয়াছে। এই সকল কারণে স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহে স্ত্রীলিঙ্গের এবং পুরুষলিঙ্গের ভেদ বিধান করিতে হইয়াছে। লিঙ্গদেহ স্থূল সন্তানদেহ উৎপন্ন করে না, এইজন্য, স্থূলদেহে যেরূপ স্ত্রীপুরুষভেদে যান্ত্রিক বিভেদ (difference in mechanism) আছে, লিঙ্গদেহে তদ্রূপ নাই। লিঙ্গদেহের উপস্থ স্থূল পুরুষদেহের শিশ্নের ন্যায় অথবা স্থূল স্ত্রীদেহের যোনির ন্যায় নহে ; ইহা প্রজননশক্তির আধারভূত একটী প্রতীকচিহ্ন মাত্র ; লিঙ্গদেহ স্থূল পুরুষদেহে অবস্থিত হইলে তাহার এই প্রতীকচিহ্ন স্থূল পুরুষদেহের শিশ্নে মিলিত থাকিয়া, এবং স্থূল স্ত্রীদেহে অবস্থিত হইলে তাহার এই প্রতীকচিহ্ন স্থূল স্ত্রীদেহের যোনিতে মিলিত থাকিয়া শিশ্নকে এবং যোনিকে প্রজননশক্তিবিশিষ্ট করে। কারণদেহে প্রজননশক্তি মাত্র আছে, কিন্তু লিঙ্গদেহের ন্যায় কোন প্রতীক-উপস্থ নাই। আমরা পাইলাম যে, অধিভূত ক্ষরভাবের ভূমিতেও স্ত্রীপুরুষের স্থূল লিঙ্গভেদ কেবল স্থূলদেহেই আছে, লিঙ্গদেহে কেবল সূক্ষ্ম লিঙ্গচিহ্ন আছে কিন্তু লিঙ্গভেদ নাই এবং কারণদেহে লিঙ্গচিহ্নও নাই এবং লিঙ্গভেদও নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহে লিঙ্গভেদ নাই, কেবল ভাবের ও রসের ভেদের ভিত্তিতে পুরুষ ও পরাপ্রকৃতি, এই দুই প্রকারের মূর্ত্তিভেদ স্বীকার আছে; এইজন্য, ভগবানমূর্ত্তিতে যে পুরুষপ্রতীক চিহ্ন এবং ভগবতীমূর্ত্তিতে যে পরাপ্রকৃতি-প্রতীক চিহ্ন আছে তাহা ভাবের ও রসের ভেদসূচক অপ্রাকৃত চিহ্ন। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ক্ষরভাবের ভূমিতে সন্তানের জড়দেহ উৎপন্ন করিবার জন্য স্থূলদেহসমূহের মধ্যে যন্ত্রগতভাবে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গভেদ থাকিলেও, পুরুষ-দেহ এবং স্ত্রীদেহ, উভয়ই অপরাপ্রকৃতি। স্থূল পুরুষদেহের স্থূল শিশ্ন এবং স্থূল স্ত্রীদেহের স্থূল যোনি ব্যতীতও, পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়বিধ স্থূলদেহেই পায়ু এবং উপস্থের মধ্যবর্ত্তী স্থানের অভ্যন্তরে অপরাপ্রকৃতিত্বসূচক একটী পশ্চাদা-ভিমুখী যোনিবৎ চিহ্ন আছে। ইহার অস্তিত্ব শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে।

পশ্চিমাভিমুখী যোনির্গুদমেঢ্রান্তরালগা। শিবসংহিতা

—"পায়ু এবং উপস্থের মধ্যবর্ত্তী স্থানের অভ্যন্তরে একটী পশ্চাদাভিমুখী (inverted) যোনিবৎ চিহ্ন আছে।" মূলাধারচক্র এই যোনিমণ্ডলের অন্তবর্ত্তী এবং এই স্থান হইতেই কুণ্ডলিণীর উর্দ্ধগতি হয়। যে সকল পরিণয়-প্রাপ্ত সিদ্ধ যোগীগণের জীবাত্মা কুণ্ডলিণী সহ সহস্রারে গিয়া কৃষ্ণের সহিত মধুরভাবে মিলনসম্ভোগ করেন, সেই যোগীগণের মধুরভাবের ভাবনার ক্রিয়া তাঁহাদের দেহের উপর হয়। সেই ক্রিয়ার ফলে, উক্তরূপ যোগীগণের মধ্যে যাঁহাদের পুরুষদেহ, তাঁহাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও কখনও কখনও এই যোনিমণ্ডল হইতে, রজস্বলা নারীর রজঃস্রাবের ন্যায়, পায়ু অথবা উপস্থ দিয়া শোণিতস্রাব হয়। এইরূপ অবস্থালাভকে যোগীর প্রকৃতিদেহলাভ বলা হয়। পুরুষদেহও অপরাপ্রকৃতি এবং তাহাতে উক্তরূপ যোনিমণ্ডল আছে বলিয়া ঐরূপ হওয়া সম্ভব হয়। ইহা অতি সূক্ষ্ম এবং অতি গুহ্য তত্ত্ব; এই বিষয়টি বুঝাইয়া বলিবার মত নহে, ইহা অনুভববেদ্য।

১৩।৩।১৪ মানবের স্থূলদেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থূলদেহ

জগতে যত প্রকারের প্রাণী আছে, তৎসমূহের মধ্যে মানবের স্থূলদেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থূলদেহ; ইহার আকার ভগবৎ-বিগ্রহের আকারের অনুরূপ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সকল প্রাণীদেহে অবস্থিত জীবাত্মা এবং লিঙ্গদেহ একই বস্তু, কিন্তু সকল লিঙ্গদেহের বুদ্ধির পরিমাণ একই রূপ নহে। কিন্তু মানবের

স্থূলদেহের গঠন, বিশেষতঃ হৃদয়ের এবং মস্তিষ্কের গঠন এরূপ যে, অনুভূতি এবং চিন্তা বিষয়ক যান্ত্রিক কার্য্যকারিতা বিষয়ে মানবের হৃদয় এবং মস্তিষ্ক অন্য সকল মর্ত্ত্যপ্রাণীর হৃদয় এবং মস্তিষ্ক অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। এইজন্য লিঙ্গদেহের মন ও বুদ্ধি মানবের স্থূলদেহের হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত হইলে অনুভূতি ও চিন্তা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে এবং স্থূল বা সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার জড়বস্তু সম্বন্ধে এবং চিদ্বস্তু সম্বন্ধেও অনুভূতি, চিন্তা, ধ্যান করিতে পারে এবং জ্ঞানলাভ করিতে পারে। এই কারণে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ক্রমোন্নতির ঐশী বিধান অনুসারে জীবাত্মা লিঙ্গদেহ সহ বহু নিম্নযোনি ভ্রমণ করিবার পরে মানবদেহে অধিষ্ঠিত হইলে যোগ সাধনা করিয়া মুক্তি পরিণয় ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে। স্থূল মানবদেহেরও উত্তম, মধ্যম, এবং অধম আছে। অধম হইতে উত্তমে জীবাত্মার ক্রমোন্নতি হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অধ্যাত্মযোগসাধনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সনাতন সাধনপ্রণালী

১৪।১।১ অধ্যাত্মযোগসাধনাই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনা

অধ্যাত্মযোগসাধনাই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনা। যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে যোগী জীবাত্মাকে, ঈশ্বরকে, এবং তাঁহার নিত্যলীলাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্বিষয়ে বিজ্ঞান লাভ করেন, এবং নিত্যলীলায় ঈশ্বরের সহিত মিলনলাভ করিয়া পরমানন্দও সম্ভোগ করেন। যোগসিদ্ধ যোগীর নিকট স্থান ও কালের ব্যবধান না থাকায় তিনি সৃষ্টিতত্ত্বকেও প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্বিষয়ে বিজ্ঞান লাভ করেন। এইরূপ যোগীকে তত্ত্বদর্শী বলা হয়। শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ তত্ত্বদর্শী ছিলেন।

১৪।১।২ যোগসাধনা প্রণালী অনুসারে করণীয়

যেমন জড়বিজ্ঞানসাধনার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে এবং সেই প্রণালী অনুসারে সাধনা করিলে জড়তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তদ্রূপ অধ্যাত্মযোগসাধনারও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে এবং সেই প্রণালী অনুসারে যোগসাধনা করিলে অধ্যাত্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করা যায়। জীবাত্মার চিৎ অধ্যাত্মযোগের সাধনা করে এবং চিদ্বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান লাভ করে। চিতের এই যোগসাধনায় বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গ স্বভাবতঃ ব্যাঘাতই সৃষ্টি করে, কিন্তু প্রণালী অনুসারে সাধনা করিতে করিতে ইহারা ক্রমশঃ চিতের অনুগত এবং তাহার সাধনার সহায়ক হয়।

১৪।১।৩ সনাতন সাধনপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

যোগসাধনার প্রণালী মানবের সৃষ্ট নহে। শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে স্বয়ং কৃষ্ণই সদ্‌গুরু এবং বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি ব্রহ্মাকে বেদশিক্ষা, যোগসাধনায় দীক্ষা, এবং যোগসাধনার প্রণালীও শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই প্রণালী অনুসারে সাধনা করিয়া ব্রহ্মা যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যোগসিদ্ধ ব্রহ্মা কৃষ্ণের নিকট গুরুশক্তি প্রাপ্ত হইয়া দেবতাগণকে এবং আদি ঋষিগণকে এই যোগসাধনায় দীক্ষা এবং ইহার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই ঋষিগণের দ্বারা ইহা মানবসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া এই প্রণালী মানবকে শিক্ষা দিয়াছেন। দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ ইহা ব্রজলীলায় এবং গীতায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। কলিযুগে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। কালক্রমে মহাপ্রভুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ম্লান হইলে তিনিই সদ্‌গুরু-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই সনাতন সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যে সকল সুযোগ্য মহাপুরুষে স্বীয় সদ্‌গুরুশক্তির আবেশ দিয়াছেন, তাঁহারাও এই প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন এবং দিতেছেন। এইরূপে সদ্‌গুরু পরম্পরায় সনাতন সাধনপ্রণালী মানবসমাজে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, এবং শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রচারিত এই যোগসাধনার প্রণালী বৈদিক সনাতন সাধনপ্রণালী। ইহার শাখা প্রশাখা রূপে বহুবিধ সাধনপ্রণালীর উদ্ভব পরবর্ত্তী কালে হইয়াছে। তৎসমুদয় সম্বন্ধে আলোচনা

এখানে সম্ভব নহে। আমরা সনাতন সাধনপ্রণালী সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

১৪।১।৪ পঞ্চমপুরুষার্থ এই সাধনার লক্ষ্য

মোক্ষ এই সাধনার লক্ষ্য নহে; পঞ্চম পুরুষার্থ, অর্থাৎ পরিণয় এবং বিজ্ঞান ইহার লক্ষ্য। জন্মমৃত্যু হইতে চিরমুক্তিকে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ বলা হয়। কেবল মোক্ষই চরম ও পরম প্রাপ্তি নহে, কারণ :—(১) ইহারও মূলে কামনা আছে। এই কামনা বুদ্ধির কামনা। মানব দুঃখনিবৃত্তির কামনায় ঐশ্বর্য্য-সম্পদ চাহে, কিন্তু রাজ্যসম্পদ পাইলেও দুঃখনিবৃত্তি হয় না। ইহা দেখিয়া, রাজ্যসম্পদকামী ব্যক্তিগণের অপেক্ষা যাঁহারা অধিক বুদ্ধিমান, তাঁহারা সকল দুঃখের মূল যে জন্মমৃত্যু, তাহা হইতে চির মুক্তির কামনা করেন; মোক্ষলাভ করিলে সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। মোক্ষসাধনার মূলে দুঃখনিবৃত্তির কামনা আছে; সুতরাং মোক্ষসাধনা কামনামূলক। কিন্তু পঞ্চমপুরুষার্থের সাধনা তাহা নহে। বিজ্ঞান ও পরিণয়ের সাধকের দুঃখনিবৃত্তির বা আত্মসুখ-লাভের কামনা নাই। বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভের ইচ্ছা বুদ্ধির কামনা নহে। আত্মা এবং ঈশ্বর বিষয়ক বিজ্ঞান লাভ জীবাত্মার চিতের স্বভাব, পরিণয় ও পরমানন্দলাভ জীবাত্মার আনন্দাংশের স্বভাব। বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভের জন্য সাধনা জীবাত্মার স্বীয় স্বভাবানুযায়ী সাধনা; ইহাতে তাহার নিজের জন্য দুঃখনিবৃত্তির অথবা সুখলাভের কামনা নাই। পঞ্চমপুরুষার্থের সাধক মুক্তি-কামনায় মুক্তিলাভের জন্য সাধনা করেন না, তথাপি মোক্ষকামী সাধক অপেক্ষা শীঘ্র এবং সহজে তিনি মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। এই নিষ্কাম পঞ্চমপুরুষার্থের সাধনা সকাম মোক্ষসাধনা অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। (২) কেবল মোক্ষলাভে দুঃখের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু পরমেশ্বরে বিলীনতাহেতু স্বতন্ত্র সত্ত্বা না থাকায় ইহাতে আনন্দসম্ভোগ নাই। অপরপক্ষে পঞ্চমপুরুষার্থের সাধক পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত আনন্দ সম্ভোগ করেন। (৩) জীবের স্বরূপ বিচারেও মোক্ষ যোগসাধনার চরম ও পরম লক্ষ্য হইতে পারে না। কৃষ্ণের অপরা এবং পরাপ্রকৃতির সমাহার জীব, সুতরাং তাঁহাকে আনন্দ দিতে তাঁহার প্রকৃষ্ট সেবা জীবের স্বরূপগত কার্য্য; অতএব জীবের স্বরূপ, কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ-ভাবে লাভ, প্রেমের বিকাশ, এবং নিত্যলীলায় তাঁহার পরিকর রূপে তাঁহার

সেবা ও আরাধনা নিত্যদাসের স্বরূপগত পরম প্রাপ্তি। স্থতরাং, যোগসাধনায় মানবের স্বরূপগত লক্ষ্য পরিণয় এবং বিজ্ঞান। (৪) কৃষ্ণের সৃষ্টিলীলার উদ্দেশ্য-বিচারেও মোক্ষ যোগসাধনার চরম ও পরম লক্ষ্য হইতে পারে না। দ্বন্দ্ব-পরিণয়ের লীলায় মানবকে দ্বন্দ্বাতীত এবং পরিণয়প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের নিত্য-লীলায় তাঁহার নিত্য পরিকর হইতে হইবে, ইহাই সৃষ্টিলীলার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় অনুসারেও পরিণয় এবং বিজ্ঞান যোগসাধনার চরম ও পরম লক্ষ্য। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সাধনায় মোক্ষই শ্রেষ্ঠ বস্তু; কিন্তু পরিণয় এবং বিজ্ঞান মোক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু, এইজন্য ইহা পুরুষার্থের, অর্থাৎ মানবের প্রাপ্তব্য সকল বস্তুর, মধ্যে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বোত্তম; ইহা চতুর্ব্বর্গেরও অতীত বলিয়া ইহাকে পঞ্চমপুরুষার্থ বলা হয়। কেবল মোক্ষলাভই যখন যোগসাধনার লক্ষ্য নহে, তখন অনিমাদি সিদ্ধি এবং যোগৈশ্বর্য্যলাভ যে লক্ষ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য। যে যোগসাধনার লক্ষ্য যোগৈশ্বর্য্যলাভ, তাহা অধ্যাত্মযোগসাধনাই নহে। অধ্যাত্মযোগসাধনার অর্থ, পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সাধনা। কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ করা যায় না; অধ্যত্মযোগসাধনা না করিলে কৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায় না; এইজন্য, অধ্যাত্মযোগসাধনা ব্যতীত পরিণয় ও বিজ্ঞান লাভ করা যায় না।

১৪।১।৫ এই সাধনা জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি যোগের সমাহার এবং সমন্বয়

এই যোগসাধনা জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি যোগের সমাহার এবং সমন্বয়। পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভের সাধনায় জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, এবং ভক্তিযোগ নামক তিনটী পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন যোগসাধনা থাকিতে পারে না। এই সাধনাকেই সমগ্রভাবে ভক্তিযোগের সাধনা বলা যায়, কারণ ইহার জ্ঞান এবং কর্ম্ম ভক্তিমূলক। ৯।৭।৮ হইতে ৯।৭।১৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদগুলিতে পূর্ব্বেই এই ভক্তিযোগের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, স্থতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ভাগবত ৩।২৯।১২

—ভগবান কপিল দেবহূতিকে বলিতেছেন, "যে যোগসাধনার দ্বারা ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া মদ্ভাব (অর্থাৎ পরিণয় এবং বিজ্ঞান) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে আখ্যাত করা হয়।" যদিও

সমগ্রভাবে ইহা ভক্তিযোগ, তথাপি এই যোগসাধনাকে উক্ত ত্রিবিধ যোগের সমাহার এবং সমন্বয় বলা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, যোগসাধনার অন্তর্গত প্রধানতঃ ভক্তিমূলক জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাকে জ্ঞানযোগের সাধনা, প্রধানতঃ ভক্তিমূলক কর্ম্মসম্পাদনের প্রচেষ্টাকে কর্ম্মযোগের সাধনা বলা হয়। এই যোগসাধনার ফলে পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ হইবার পরে যোগী বিজ্ঞানানন্দ-যোগে স্থিতি লাভ করেন।

১৪।১।৬ এই সাধনপ্রণালী সাম্প্রদায়িকতাবর্জ্জিত

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ পরমেশ্বর, কৃষ্ণের ভজনা পরমেশ্বরের ভজনা, এবং যে কেহ পরমেশ্বরের ভজনা করে, সে কৃষ্ণেরই ভজনা করে। সুতরাং, কৃষ্ণকে লাভ করিয়া পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত এই সাধনায় সাম্প্রদায়িকতা নাই। এই যোগসাধনা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নহে; ইহা সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতাবর্জ্জিত। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল মানবের ইহা পাইবার অধিকার আছে। সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী মানবের সৃষ্ট, কিন্তু সকল মানবই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৃষ্ট। ঈশ্বরের নিকট ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সকল জাতির মানব, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানাদি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মানব সমান। স্বয়ং কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, "সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" কৃপাময় কৃষ্ণ যেমন আলোক বাতাস বৃষ্টি প্রভৃতি বস্তুসমূহ সকল মানবকে সমানভাবে দান করেন, তদ্রূপ, দ্বন্দ্বপরিণয়ের লীলায় তাঁহার সৃষ্ট সকল মানবই যাহাতে দ্বন্দ্বাতীত হইয়া বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য সকল মানবের নিমিত্তই এই যোগসাধনার প্রণালী জগতে প্রচার করিয়াছেন এবং স্বয়ং সদ্‌গুরু রূপে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল মানবকেই এই যোগসাধনায় দীক্ষাদান করেন। কৃষ্ণ পতিতপাবন এবং পাতকীতারণ; জ্ঞানগর্ব্বিত দাম্ভিক তার্কিক উচ্চজাতির ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধম পতিত এবং অনুতপ্ত তথাকথিত নীচজাতির মানবগণের এই সাধনায় অধিক অধিকার আছে। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ অবতারে এই সাধনার প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন বৃন্দাবনের গোপজাতির মধ্যে, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতারে ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ অবতারে ইহা সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বপ্রকারের লোককে বিতরণ করিয়াছেন। এই যোগসাধনা অতীব দুর্লভ বস্তু; ইচ্ছা করিলেই কেহ যে

ইহা পাইবেই তাহা নহে ; কিন্তু ইহা পাইবার যোগ্য অবস্থা যাহারই হইয়াছে, সে গৃহী হউক অথবা সন্ন্যাসী হউক, ব্রাহ্মণ হউক অথবা চণ্ডাল হউক, হিন্দু হউক অথবা অহিন্দু হউক, এই সাধনা সে পাইবেই। এই সনাতন সাধন-প্রণালী অনুসারে সাধনা করিয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ করিবার অধিকার আছে, স্বয়ং কৃষ্ণই তাহা গীতায় ঘোষণা করিয়াছেন।

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যন্তি পরাং গতিম্। গীতা ৯।৩২

—"নিকৃষ্ট জীবগণ, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, অথা শূদ্রও যদি আমাকে পাইবার জন্য সাধনা করে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই পরমা গতি অর্থাৎ পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।" সদ্‌গুরু-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ এই সাধনা ব্রাহ্মণকেও দিয়াছেন এবং অব্রাহ্মণকে ও অহিন্দুকেও দিয়াছেন। তিনি অহিন্দুকে এই সাধনা দিয়া হিন্দু করেন নাই। মানবকে পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত করাইবার জন্যই তিনি এই সাধনা দান করিয়াছেন, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইবার জন্য নহে। যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারে ধর্ম্মান্তরগ্রহণের প্ররোচনাদান থাকিতে পারে না ; স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান থাকিয়া ভগবানের ভজনা করিতে উপদেশদানই যথার্থ ধর্ম্মপ্রচার। যে ধর্ম্মপ্রচারক অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত (Converted) করিবার জন্য প্রচারকার্য্য করেন, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কূটনৈতিক প্রয়োজনপ্রসূত।

১৪।১।৭ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ

এই যোগসাধনায় ব্রতী হইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমেই সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। সদ্‌গুরু কে এবং তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ কেন প্রয়োজন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত এই সাধনার প্রণালী শিক্ষা করা যায় না। শাস্ত্রে বা কোন পুস্তকে পাঠ করিয়া এই প্রণালীটী সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। শাস্ত্রে ইহার সঙ্কেতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে ; ইহার মর্ম্ম এবং বিস্তৃত বিবরণ সদ্‌গুরু জানেন। অধিকন্তু, সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ না করিলে গুরুশক্তির আশ্রয়ও লাভ হয় না। দীক্ষাদানকালে সদ্‌গুরু গুরুশক্তি রূপে শিষ্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন। ইহাকে

গুরু কর্তৃক শক্তিসঞ্চার বলা হয়। সদ্‌গুরু কর্তৃক শক্তিসঞ্চার ব্যতীত যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

শক্তিপাতানুসারেণ শিষ্যোঽনুগ্রহমর্হতি।
যত্র শক্তির্ন পততি তত্র সিদ্ধির্ন জায়তে॥ কুলার্ণব তন্ত্র

—"গুরু কর্তৃক শক্তিসঞ্চার দ্বারা শিষ্য অনুগৃহীত হয়। যাহাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চারিত হয় না, তাহাদের সিদ্ধিলাভ হয় না।" এক্ষণে আমরা এই সাধনার প্রণালীটী কি এবং ইহার প্রত্যেকটী প্রক্রিয়ার দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হয়, তাহা বিবৃত করিব। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দীক্ষাদানকালে যে সাধনোপদেশ দিতেন, তাহা মূলতঃ দুইটী শীর্ষের অধীনে ব্যক্ত করা যায়, (১) নিয়মপালন (২) নামসাধনা।

১৪।১।৮ গুরুকে ভগবানজ্ঞানে ভক্তি

এই যোগসাধনার পরিচয় জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে, যোগসাধনায় প্রথম ও প্রধান কর্তব্য কি, তাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইতেছে, গুরুকে ভগবানজ্ঞানে ভক্তি এবং সেবা করা। দীক্ষাদানকালে গুরু স্বয়ং এই উপদেশ দেন না, কিন্তু ইহা সকল শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এবং গুরুতত্ত্বে অন্তর্নিহিত। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই তাঁহাকে ভগবান জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি লইয়া যোগসাধনার পথে চলিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই ভাগবত হইতে "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", "বন্ধুর্গুরুরহং সখে" প্রভৃতি কৃষ্ণের স্বমুখনিঃসৃত বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে স্বয়ং কৃষ্ণই সদ্‌গুরু রূপে কৃপা করেন। সকল শাস্ত্রেই এই তত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে। গুরুতে কখনও মনুষ্যবুদ্ধি করিতে নাই; "ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েৎ", ইহাও কৃষ্ণের আদেশ। গুরুগীতা, তন্ত্রশাস্ত্র, সর্ব্বত্রই এই আদেশ। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে সাধনা নিষ্ফল হয়, ইহাও শাস্ত্রের ঘোষণা। নাম, নামী, ও নামদাতা; এই তিনকে অভেদ-জ্ঞানে যোগসাধনা করিতে হইবে। গুরুর সেবার দ্বারা ভগবানের সেবা হয়; গুরুর ধ্যানে ভগবানের ধ্যান করা হয়; এই সকল তত্ত্বও শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। সাধক যখন কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন নাম-নামী-নামদাতার অভিন্নত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং "গুরুদেবঃ পরং ব্রহ্ম", শাস্ত্রোক্ত এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিয়মপালন

১৪।২।১ শাস্ত্রে বিশ্বাস

এই সনাতন সাধনপ্রণালীতে যোগসাধনা করিয়া ঋষিগণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক বেদ-বেদান্তে প্রকাশিত ঈশ্বরতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মনবতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা এবং তত্ত্বদর্শী হইয়া তাঁহাদের দ্বারা লব্ধ বিজ্ঞান তাঁহারা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের সকল তত্ত্বই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এবং তাঁহাদের দ্বারা আচরিত এবং প্রচারিত এই সাধন প্রণালীকে বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভের সনাতন পন্থা বলিয়া জানিতে হইবে। শাস্ত্রোল্লিখিত কোন তত্ত্ব বা তথ্য অসম্ভব বলিয়া মনে হইলে শাস্ত্র ভ্রান্ত এবং মিথ্যা এবং আমার মত অভ্রান্ত ও সত্য, এরূপ মনে করা চলিবে না। সাধন করিতে করিতে সাধক এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, যখন শাস্ত্রমতকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিতে পারিবেন। ঋষিপ্রণীত তত্ত্বপ্রকাশক গ্রন্থই শাস্ত্র; যাঁহারা ঋষি নহেন তাঁহাদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থ শাস্ত্র নহে; এইরূপ গ্রন্থকারগণের দ্বারা প্রণীত গ্রন্থোক্ত তত্ত্বের বা বিধানের সহিত ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে উক্ত তত্ত্বের বা বিধানের বা তথ্যের বিরোধ থাকিলে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের তত্ত্ব, বিধান, এবং তথ্যকেই অভ্রান্ত এবং প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিতে হইবে। শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রপাঠ করা কর্ত্তব্য। পাঠ করিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞ সাধু-মহাত্মাগণের এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট শাস্ত্রতত্ত্ব শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করা উচিত। এইরূপ করিলে জাগতিক সম্বন্ধের মধ্যে শান্তভাবের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস করিলে ঋষিগণকে অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস করা হয়। এইরূপ অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাসের দ্বারা মানব নিজের জীবনকে এবং জগতকেও দুঃখদ্বন্দ্বময় করে।

১৪।২।২ সত্যানুসরণ

উপনিষৎ পরমেশ্বরকে "সত্যস্য সত্যম্" এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" বলিয়াছেন। সত্যস্বরূপ, পরমসত্য পরমেশ্বরকে লাভ করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। উপনিষৎ বলেনঃ (১) সত্যং বদ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। তৈত্তিরীয় ১।১১।১ (২) সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা। মুণ্ডক। ৩।১।৫ ।

(৩) সত্যমেব জয়তি নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরং নিধানম্ ॥ মুণ্ডক।৩।১।৬

—"(১) সত্য বলিবে। সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। (২) পরমেশ্বর সত্যপালন-তপস্যার দ্বারাই লভ্য। (৩) সত্যেরই জয় হয়; মিথ্যার জয় হয় না। যে দেবযান পন্থা অবলম্বন করিয়া আপ্তকাম ঋষিগণ যেখানে সত্যের পরমাশ্রয় পরমেশ্বর আছেন সেই লোকে গমন করেন, সেই দেবযানপন্থা সত্যের দ্বারা আস্তীর্ণ।" বাক্যে কার্য্যে এবং চিন্তায় সত্যের অনুসরণ করিলে সত্য-রক্ষা করা হয়। যে বাক্যের বিষয় সত্য এবং উদ্দেশ্য সৎ তাহাই সত্য বাক্য। যে বাক্যের বিষয় মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য অসৎ তাহা মিথ্যা বাক্য। সত্য বাক্য বলিতে হইবে। যদি সত্য কথা বলিলে কাহারও অনিষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে সেরূপ স্থানে মৌনাবলম্বনই বিধেয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" এইরূপ করিলে বাক্যে সত্যানু-সরণ করা হইবে। সত্য হইতে বিচ্যুত না হইয়া, মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া, এবং কাহারও অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্য না লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ করিলে কার্য্যে সত্যানুসরণ করা হইবে। যে চিন্তার বিষয় সত্য এবং উদ্দেশ্য সৎ, তাহাই সত্য চিন্তা। সত্য চিন্তার দ্বারা নিজের ও পরের উপকার সাধিত হয়। যে চিন্তার বিষয় মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য অসৎ তাহা মিথ্যা চিন্তা। মিথ্যা চিন্তার দ্বারা নিজের ও পরের অনিষ্ট সাধিত হয়। সত্য চিন্তার দ্বারা চিন্তায় সত্যানুসরণ করিতে হইবে। এইরূপে, বাক্যে কার্য্যে এবং চিন্তায় সত্যানুসরণ করিতে হইবে। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সত্য রক্ষা করিতে হইবে।

১৪।২।৩ ব্রহ্মচর্য্য পালন : ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত যোগসাধনা হয় না।

উপনিষৎ এবং গীতা বলিয়াছেনঃ (১) ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি। ছান্দোগ্য ৮।৪।৩ (২) ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্টৃাত্মানমনুবিন্দতে। ছান্দোগ্য ৮।৫।১ (৩) সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্। মুণ্ডক ৩।১।৫

(৪) প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ গীতা ৬।১৪

এই যোগসাধনায় যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়, তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমগ্রহণের দ্বারাই করিতে হইবে, এরূপ নহে। আজীবন অবিবাহিত এবং স্ত্রীসঙ্গহীন হইয়া এবং কায়মনোবাক্যে মৈথুন ত্যাগ করিয়া নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিপালন করিতে হয়। এই যোগসাধনায় ব্রতী কেহ ইচ্ছা করিলে এই আশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কেহ গ্রহণ করুন বা না করুন্, যে কেহ এই সাধন পাইবেন, তিনি গৃহী, সন্ন্যাসী, অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যাহাই হউন্, তাঁহাকে অবশ্যই ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে হইবে। এই ব্রহ্মচর্য্যপালনের মূল কথা বীর্য্যরক্ষা। বীর্য্যরক্ষা এবং সত্যরক্ষা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। সত্যরক্ষা না করিলে বীর্য্যরক্ষা করা যায় না; আবার বীর্য্যরক্ষা না করিলে সত্যরক্ষা করা যায় না। বীর্য্য স্থূলদেহের সারাংশ। বীর্য্যক্ষয় হইলে স্থূলদেহ দুর্ব্বল এবং রুগ্ন হয়। দুর্ব্বল এবং রুগ্ন স্থূলদেহের মস্তিষ্ক, হৃদয় চক্ষুকর্ণাদি সমস্ত অংশই দুর্ব্বল হয়। শরীরের এইরূপ অবস্থায় মানব সাংসারিক বিষয়সংক্রান্ত কর্ম্মে অথবা পারমার্থিক যোগসাধনার কর্ম্মে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিতে পারে না বলিয়া কোন কর্ম্মই তাহার দ্বারা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না এবং সে অল্পপ্রয়াসেই ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করে। সুস্থ ও সবল দেহেই যোগসাধনা যথাযথরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই শ্রুতি বাক্য দেহের সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। শাস্ত্র বলেন, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"; অর্থাৎ শরীরকে সুস্থ এবং সবল রাখিবার সাধনাই প্রাথমিক ধর্ম্মসাধনা। যোগসাধনায় পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিবার জন্য অনেক যোগী প্রথমেই ঊর্দ্ধরেতা হইবার সাধনা করেন। যাহা হউক, ব্রহ্মচর্য্যপালনের নিমিত্ত বীর্য্যরক্ষার অর্থ ঊর্দ্ধরেতা হওয়া নহে। গৃহী সাধকের পক্ষে শাস্ত্র যখন এবং যে অবস্থায় বীর্য্যপাত করিবার বিধান দিয়াছেন, কেবল তখন এবং সেই অবস্থায় বীর্য্যপাত করিলে এবং অন্য সময়ে ও অন্য অবস্থায় বীর্য্যপাত না

করিলে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয়। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীকে বাক্যে কার্য্যে এবং চিন্তায় মৈথুন ত্যাগ করিতে হইবে এবং তাঁহারা কোনক্রমেই বীর্য্যপাত করিবেন না। কেবল যোনিমৈথুনই মৈথুন নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে মৈথুন অষ্টবিধ, যথা: স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গুপ্তভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায়, এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি। এই অষ্টবিধ মৈথুন ত্যাগ করিলে বাক্যে কার্য্যে এবং চিন্তায় মৈথুন ত্যাগ করা হয়। গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য-পালন এইরূপ:—অবিবাহিত ব্যক্তি কদাচ স্বেচ্ছায় বীর্য্যপাত করিবে না। সুতরাং, অবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীসহবাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সংসার পালনের দায় এড়াইবার জন্য অথবা অন্য উদ্দেশ্যেও অনেকে বিবাহ না করিয়া কুমারী, পরস্ত্রী, অথবা গণিকার সহিত সহবাস করিয়া কাম চরিতার্থ করে। যৌন-মিলনের দিক দিয়া বিচার করিলে উক্তরূপ ব্যক্তিগণের জীবন এবং পশুজীবনে কোন প্রভেদ নাই। বিবাহিত পুরুষ স্বীয় বিবাহিতা পত্নীর সহিত সহবাস করিবে। তাহাও যখন ইচ্ছা তখনই নহে। কাম চরিতার্থ করিয়া দৈহিক-সুখভোগের জন্য বিবাহ এবং স্ত্রীসহবাস নহে। ঈশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার উদ্দেশ্য-সাধন এবং পিতৃ-ঋণ-পরিশোধ করিবার নিমিত্ত সন্তান উৎপাদন করিবার জন্য বিবাহ এবং স্ত্রীসহবাস। এই উদ্দেশ্যে স্ত্রীসহবাস কামোপভোগ নহে; ইহাই ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম। ভগবান বলিয়াছেন: "ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।" গীতা ৭।১১। সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীয় মায়াশক্তির পরিণাম-ভূত কামকে প্রাণীদেহে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, দৈহিকসুখভোগের জন্য নহে; এইজন্য ভগবান বলিলেন যে তিনিই ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম। স্ত্রীদেহসম্ভোগের দ্বারা দৈহিকসুখ প্রাপ্ত হইবার জন্য যে কাম, তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম। এইরূপ কাম থাকিলে বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ হয় না। কিরূপ কাম ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ, তাহাও বিহিত হইয়াছে। পত্নীর মাসিক ঋতু যেদিন আরম্ভ হয় সেই দিন হইতে ত্রিরাত্রি গত হইলে পত্নী ঋতুস্নান করিবার পর মাসে মাত্র একবার স্ত্রীগমন করিবে। তিনটী সন্তানের জন্ম হইবার পর স্ত্রীসহবাস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে; তাহা না করিলে ব্যাভিচার এবং ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলন হইবে। বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাসের যে বিধি উক্ত হইল, এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া সহবাস করিলে তাহা স্বীয় পত্নীর সহিত হইলেও তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম এবং ব্যাভিচার, এবং তাহাও ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলন। গৃহস্থাশ্রমীগণ এই নিয়ম পালন

করিলেই তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয়। সংযম ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্যপালন সম্ভব নহে। সংযম দৃঢ়তার সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। কামক্রোধাদি রিপুগণকে দমন করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশীকরণের নাম সংযম। ইহাকেই দম বলা হয়। স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশা সংযমের পরিপন্থী। বিনা প্রয়োজনে পুরুষ স্ত্রীলোকের নিকট অথবা স্ত্রীলোক পুরুষের নিকট যাইবে না, এবং প্রয়োজন শেষ হইবামাত্র চলিয়া যাইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ভাগবত ৯।১৯।১৭

—"আপন মাতা, ভগ্নী, অথবা কন্যার সহিতও নির্জ্জনে থাকিবে না। বলবান ইন্দ্রিয়গণ বিদ্বান ব্যক্তিগণকেও আকর্ষণ করে।" কাশীর একজন দণ্ডী স্বামী ইহা বিশ্বাস না করিয়া "অপি কর্ষতি" কাটিয়া "নহি কর্ষতি" লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর একদিন ঝড়বৃষ্টির সময় একটী স্ত্রীলোককে আপন নির্জ্জন সাধনকুটীরে আশ্রয় দিয়া কামের পীড়নে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তিনি "অপি কর্ষতি" পাঠই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। কাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রিপু এবং মূল রিপু। কামরিপুকে দমন করিলে অন্য রিপুগুলিও শান্ত হইয়া যায়। তাই গীতা উপদেশ দিয়াছেন ঃ পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্। গীতা ৩।৪১। —"জ্ঞানবিজ্ঞাননাশকারী এই পাপ কামরিপুকে জয় কর।" দৃঢ়চিত্তে সংযম অভ্যাস করিয়া বীর্য্যরক্ষা করিতে হইবে। সংযমী ব্যক্তির অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি স্বপ্নে রেতঃস্খলন হয়, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না।

১৪।২।৪ গৃহস্থাশ্রমকে সাধনাশ্রমে পরিণত করিতে হইবে ঃ সন্ন্যাসী ঃ সন্ন্যাসাশ্রম

গৃহস্থাশ্রমকে সাধনাশ্রমে পরিণত করিতে হইবে। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "গৃহস্থাশ্রম সাধকের দুর্গ।" দুর্গের মধ্যে থাকিয়া সৈনিকগণ যেমন নিরাপদে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ, সাধক গৃহস্থাশ্রমে নিরাপদে থাকিয়া যোগসাধনা করিতে পারেন। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ না করিলে যে বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করা যায় না তাহা নহে। বর্ত্তমানকালে সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণে গুরুতর অসুবিধা আছে। সন্ন্যাসীর দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা প্রয়োজন, প্রাচীন

কালে সন্ন্যাসীগণ অল্প সময়ের মধ্যে অল্প চেষ্টার দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন; কিন্তু আজকাল তাহা হয় না। এখন বনজঙ্গলও সরকারের অথবা ব্যক্তিবিশেষের সংরক্ষিত সম্পত্তি; বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া দেহরক্ষা করিবারও উপায় নাই। দেশে সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীগণের অনেক মঠ আছে এবং তথায় সন্ন্যাসীগণ আহারাদি পাইয়া থাকেন বটে কিন্তু মঠে বহু সন্ন্যাসী থাকায় যোগসাধনা অপেক্ষা হট্টগোলই অধিক হয়; "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" এই প্রবাদ বাক্য মিথ্যা নহে। ভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে কুমারীকঙ্কণের আখ্যায়িকার দ্বারা ভগবান যোগীকে একাকী থাকিয়া যোগসাধনা করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। গীতায় ও ভগবান বলিয়াছেন: যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহ। গীতা ৬।১০। আপন গৃহে থাকিয়া যোগসাধনা করিলে একাকী নির্ব্বিঘ্নে সাধনা করা যায়। এইজন্য গৃহস্থাশ্রমকে সাধনাশ্রমে পরিণত করিয়া লইতে হয়। কিরূপে তাহা করিতে হইবে, তাহা বিবৃত করা হইতেছে। গৃহস্থাশ্রমী যোগী পিতামাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তিভরে তাঁহাদের সেবাযত্ন করিবেন। পিতামাতা জীবিত না থাকিলে শ্রাদ্ধতর্পণাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিতে হইবে। শ্রুতির আদেশ: "মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব।" তৈত্তিরীয় ১।১১।২ "মাতাকে এবং পিতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি এবং সেবা করিবে।" সকল গুরুজনগণকেই ভক্তি করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা সাংসারিক সম্বন্ধে দাস্যভাব স্থাপিত হইবে। পুত্র-কন্যাকে গোপাল ও গৌরী ভাবিয়া সস্নেহে লালনপালন করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা সাংসারিক সম্বন্ধে বাৎসল্যভাব স্থাপিত হইবে। স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভাবিয়া আদর, সম্মান, এবং সেবা করিবেন, স্ত্রী স্বামীকে নারায়ণজ্ঞানে ভক্তি এবং সেবা করিবেন। এতদ্দ্বারা সাংসারিক সম্বন্ধের মধ্যে মধুরভাব স্থাপিত হইবে। এইরূপ ভাব লইয়া পারস্পরিক সেবা করিলে সাংসারিক সম্বন্ধের মধ্যে ভগবৎ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে দৈহিক মোহ বিদূরিত হয়, স্বার্থের গণ্ডী ছিন্ন হয়, সর্ব্বজীবের সহিত আত্মীয়তাবোধ হয়। এইরূপ সম্বন্ধই আত্মিক সম্বন্ধ। অত্মিক সম্বন্ধ পরমভাবের সম্বন্ধ; পরমভাবের সম্বন্ধ ভগবৎ-সম্বন্ধ: সুতরাং এইরূপ ভাবের সেবার দ্বারা ভগবানেরই সেবা করা হয়। যে গৃহস্থে এইরূপে ভগবৎসেবা হয়, সেই গৃহস্থে ভগবানের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভগবান তাহাতে

বিরাজ করেন। তখন গৃহস্থাশ্রম সাধনাশ্রমে পরিণত হয়। এইরূপ গার্হস্থ সাধনাশ্রমে থাকিয়া গৃহী সাধক নির্ব্বিঘ্নে যোগসাধনা করিতে পারেন ; বাহিরের কোন লোক সেই গার্হস্থ সাধনাশ্রমের সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। এইরূপ গার্হস্থ সাধনাশ্রম সাধকের দুর্গ। এইরূপ গৃহস্থাশ্রমের সেবাকার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য গৃহী সাধক সত্যাশ্রয়ী হইয়া যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তৎসমুদয় তাঁহার যোগসাধনারই অঙ্গ ও অংশ। স্বয়ং ভগবান উপদেশ দিয়াছেন যে, কৃচ্ছ সাধনের দ্বারা অধ্যাত্মযোগ লাভ হয় না (গীতা ১৭।৬), অনাহারে এবং অনিদ্রায় থাকিয়াও হয় না (গীতা ৬।১৬); যোগলাভের জন্য যথোপযুক্ত আহার-বিহার এবং নিদ্রা-জাগরণ প্রয়োজন (গীতা ৬।১৭); এইরূপভাবে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে (গীতা ৩।৮)।

যথোপযুক্ত আহারবিহারাদির দ্বারা শরীরকে সুস্থ সবল এবং সাধনক্ষম রাখাই শরীরযাত্রানির্ব্বাহ। সন্ন্যাসী বা গৃহী সকল যোগীকেই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবেই। আহার্য্যবস্তুর জন্য ভিক্ষা সন্ন্যাসী সাধকের, এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্য চাকরী ব্যবসা কৃষিকর্ম্মাদি গৃহী সাধকের শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিহিত কর্ম্ম। সকল কর্ম্মেই কিছু না কিছু দোষ আছে, তথাপি স্বাভাবিক কর্ম্ম ত্যজ্য নহে, (গীতা ১৮।৪৮)। বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করিতেই হইবে, এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, বিষয়ে অনাসক্ত থাকিয়া, নিজের এবং গৃহস্থাশ্রমের পরিজনগণের শরীরযাত্রানির্ব্বাহের জন্য গৃহী সাধক সত্যপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে কর্ম্ম করেন, তাহা তাঁহার যোগসাধনার অঙ্গ এবং অংশ। এইরূপ কর্ম্মের দ্বারাও ভগবানের অর্চ্চনা হয় ; "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" গীতা ১৮।৪৬। গৃহী বা সন্ন্যাসী সাধক যখন সাধনার অতি উন্নত অবস্থায় আসেন, তখন তাঁহারা ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে পারেন না। এইরূপ অনন্যচিত্ত এবং নিত্যাভিযুক্ত সাধকগণ শরীরযাত্রানির্ব্বাহের জন্যও ভিক্ষা অথবা চাকরীব্যবসাদি করিতে পারেন না। তখন তাঁহারা আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ভগবান আহার দিলে ভোজন করেন, না দিলে অনাহারে থাকেন। কিন্তু ভগবান তাঁহাদিগকে অনাহারে রাখেন না ; তাঁহার অঙ্গীকার আছে "...যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" (গীতা ৯।২২) ভগবান কোন-না-কোন উপলক্ষ্য-অবলম্বনে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। অনন্যচিন্ত এবং নিত্যাভিযুক্ত না হওয়া

পর্য্যন্ত গৃহী বা সন্ন্যাসী সকল সাধককেই শরীরযাত্রানির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়।

এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে:—যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করা যায়, তাহা হইলে শাস্ত্র সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান কেন করিয়াছেন এবং অনেকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন কেন? উত্তর:—সন্ন্যাস বাহিরের কোন বস্তু নহে; সন্ন্যাস অন্তরের বস্তু। জটা, মালা, তিলক, গৈরিক বস্ত্র, দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি চিহ্নসমূহ সন্ন্যাসাশ্রমের ভেকমাত্র, সন্ন্যাস নহে। বিজ্ঞান এবং পরিণয়কে জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া, বিষয়াসক্তিকে সম্যক্‌রূপে ত্যাগই সন্ন্যাস। ইহা অন্তরের বস্তু। এই অন্তর-সন্ন্যাসই বৈরাগ্য। যাহার অন্তরে সন্ন্যাস নাই কিন্তু যে বাহিরে সন্ন্যাসের ভেকধারী, সে মর্কট সন্ন্যাসী। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও যাঁহার অন্তরে সন্ন্যাস আছে, তিনি ভেকধারী না হইলেও যথার্থ সন্নাসী।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ গীতা ৫।৩

—"যাঁহার কোন বস্তুর প্রতি দ্বেষ নাই এবং কোন বস্তুর জন্যই কামনা নাই, তিনি নিত্যসন্ন্যাসী, অর্থাৎ তিনি শরীরযাত্রানির্ব্বাহের জন্য গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী কর্ম্ম করিলেও তিনি সন্নাসী। এইরূপ সন্ন্যাসী অনায়াসে দ্বন্দ্বহীন হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।" যাঁহার অন্তর সন্ন্যাসী হইয়াছে তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের অধিকারী এবং তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণ সার্থক। যদিও গৃহী সন্ন্যাসী বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করিতে পারেন, তথাপি অনেক গৃহী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। যে গৃহী সন্ন্যাসীর অন্তরে শীঘ্র বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা আসে, তিনি আশা পূর্ণ করিবার জন্য তীব্র বৈরাগ্যবশে সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ ঐকান্তিক সাধনা করিবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। এইরূপ ব্যক্তি-গণের জন্যই শাস্ত্রে সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত হইয়াছে। মানবজীবনের কোন অবস্থাকেই শাস্ত্র যথাযোগ্য বিধির বহির্ভূত করিয়া রাখেন নাই; উক্তরূপ তীব্র বৈরাগ্যের অবস্থাকে এই অবস্থার উপযোগী বিধিসমূহের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শাস্ত্র সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান করিয়াছেন। শাস্ত্র সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান কেন করিয়াছেন এবং কেন অনেকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন তাহা বিবৃত হইল। এতদ্ব্যতীত, অনেকে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সন্ন্যাসের ভেক গ্রহণ

করিয়া মর্কট সন্ন্যাসী হয়; অনেকে মহান্ত হইবার জন্য, আবার অনেকে শিষ্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে মর্কট সন্ন্যাসী হয়; অনেকে অজ্ঞ জনগণের সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের সুযোগ লইয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মর্কট সন্ন্যাসী হয়; অনেকে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যও মর্কট সন্ন্যাসী হয়। অনেক নিরক্ষর ভিক্ষুকও অধিক ভিক্ষা পাইবে বলিয়া মর্কট সন্ন্যাসী হয়। ইহারা যে সন্ন্যাসী নহে তাহা বলাই বাহুল্য। লোকালয়বাসী জনসমাজ প্রায়ই এইরূপ মর্কট সন্ন্যাসীগণের সংস্রবে আসেন, অনেকে তাহাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েন, এইজন্য অনেকে বলেন যে সন্ন্যাসাশ্রম জনসমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক। কিন্তু এই মতটী ভ্রান্ত। যথার্থ সন্ন্যাসী সকলের শ্রদ্ধার পাত্র; ইহা দেখিয়া প্রতারকগণ সন্ন্যাসীর ভেক ধরিয়া নরসমাজকে প্রতারণা করিয়া বেড়ায়। এবিষয়ে নরসমাজেরও অজ্ঞতা আছে এবং দোষও আছে। অনেক নরনারীই যথার্থ সাধুর লক্ষণ জানে না বলিয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতারিত হয়। ইহাই অজ্ঞতা। যথার্থ সাধুর লক্ষণগুলি সকলের জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন। তিনি কখনও আত্মপ্রশংসা করেন না। তিনি কখনও পরচর্চ্চা এবং পরনিন্দা করেন না। তিনি কখনও যোগৈশ্বর্য্য অর্থাৎ যোগলব্ধ অলৌকিক শক্তি (occult power) প্রকাশ করেন না, এমন কি তাঁহার এইরূপ শক্তি আছে তাহাও অন্যকে জানিতে দেন না। তিনি কখনও পরধর্ম্মের নিন্দা করেন না, অন্যকে স্বীয় ধর্ম্মমতে আনিবার চেষ্টা করেন না, যিনি যে ধর্ম্মমতে আছেন, তাঁহাকে সেই মতেই দৃঢ় থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত ভগবদ্ভজনা করিতে উপদেশ দেন। উক্ত লক্ষণগুলির দ্বারা যথার্থ সন্ন্যাসী চিনিয়া লইতে হয় এবং ভণ্ড সন্ন্যাসীকেও চিনিয়া লইয়া তাহার নিকট হইতে সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। নরসমাজের অনেকেরই দোষ এই যে, অনেকেই রোগারোগ্য, চাকুরীলাভ, মোকর্দ্দমাজয় প্রভৃতি অশেষবিধ বৈষয়িক কামনা পূর্ণ করিবার জন্য সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির সাহায্য পাইবার জন্য লালায়িত হয়। তাহাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য প্রতারকগণ সন্ন্যাসীর ভেক ধরিয়া তাহাদিগকে প্রতারণা করে। সদুপদেশ, তত্ত্বজ্ঞান, এবং ধর্ম্মলাভের জন্যই সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিতে হয়, অর্থলাভের জন্য নহে। নরসমাজের এই অজ্ঞতার এবং দোষের সুযোগ লইবার জন্য প্রতারকগণ সন্ন্যাসাশ্রমের ভেক

গ্রহণ করিলে তজ্জন্য সন্ন্যাসাশ্রম দোষী এবং অমঙ্গলজনক হইতে পারে না। সকল কল্যাণজনক প্রতিষ্ঠানেই দুর্নীতিপরায়ণ লোক আছে। দেশশাসনের জন্য মন্ত্রীবিভাগ, বিচারবিভাগ, পুলিশবিভাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ কল্যাণজনক এবং অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানেই দুর্নীতিপরায়ণ লোক আছে; তাহারা এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্রবের সুযোগ লইয়া অসদুপায়ে স্বার্থসিদ্ধি করে। এজন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ দোষী নহে এবং অমঙ্গলজনকও নহে, এবং কেহ এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে উচ্ছেদ করিয়া দিতে বলে না। তদ্রূপ, সন্ন্যাসাশ্রম অতি মঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠান; দুষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার সংস্রবের সুযোগ লইয়া লোককে প্রতারণা করিলে তজ্জন্য সন্ন্যাসাশ্রম দোষী এবং অমঙ্গলজনক হইতে পারে না।

এইরূপ প্রশ্ন হইয়া থাকে :—যাঁহারা বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করিবার জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহারা কেবল আপনাদের কল্যাণেই যোগসাধনা করেন; তাঁহারা মানবসমাজের পক্ষে মৃত (lost to human Society)। যে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া মানব মানবসমাজের পক্ষে মৃত হয়, তাহা কিরূপে মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণজনক হইতে পারে? যাঁহারা অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, বিদ্যাহীনকে বিদ্যাদান, রোগীর চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা প্রভৃতি পরহিতকর কার্য্য করিবার জন্য সন্ন্যাসী হয়েন, তাঁহাদের সন্ন্যাসগ্রহণই মানবসমাজের পক্ষে সার্থক নহে কি? উত্তর :—যথার্থ সন্ন্যাসীগণ মানবসমাজের পক্ষে মৃত নহেন; মানবসমাজের পক্ষে তাঁহারাই যথার্থ জীবিত মানব। মানবসমাজের অধিকাংশ নরনারীই নিজেদের চতুর্দ্দিকে স্বার্থের তুঙ্গ প্রাচীর উত্তোলন করিয়া কেবল স্বার্থচিন্তাই করে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কর্ম্ম করে; তাহারাই সমাজের পক্ষে মৃত মানব। এইরূপ মানব যদি কখনও কোন পরহিতকর কার্য্য করে, তাহাও প্রতিষ্ঠালাভ বা পুণ্যসঞ্চয়ের কামনামূলক কর্ম্ম। যতক্ষণ মানবের স্বার্থ থাকে ততক্ষণ সে পরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিতে পারে না। মানব যখন সকল বিষয়কামনাকে দূরীভূত করিয়া সন্ন্যাসী হয়, তখন সে নিঃস্বার্থ হয়, তাহার চারিদিকের স্বার্থের প্রাচীর ধূলিসাৎ হইয়া যায়, তখন সমগ্র জীবজগৎ তাহার উন্মুক্ত বিশাল হৃদয়ে স্থান পায়, এবং তখনই নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রত আরম্ভ হয়। সন্ন্যাসী স্বীয় জীবনে লব্ধ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে সুস্পষ্ট দেখিতে পান যে, দারিদ্র্য রোগ শোক জরা প্রভৃতি

দুঃখযন্ত্রণা মূলব্যাধি নহে, মূলব্যাধির এক-একটী বাহ্যলক্ষণ (symptom) মাত্র এবং সংসারে জন্মমৃত্যু মূলব্যাধি, ইহাই ভবব্যাধি। সন্ন্যাসীর অন্তরে জীবের প্রতি অশেষ দয়া আছে এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত বাহ্যলক্ষণসমূহের উপশম হেতু যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ; কিন্তু সন্ন্যাসী জানেন যে, মূলব্যাধির বাহ্যলক্ষণ-গুলিকে দূর করিবার চেষ্টা করিয়া মূলব্যাধিকে বিনষ্ট করা যায় না, কারণ মূল-ব্যধি যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ বাহ্যলক্ষণসমূহ পুনঃ পুনঃ প্রকটিত হইতে থাকিবে। তিনি জানেন যে, মানব মুক্তি পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ করিলে তাহার ভবরোগ দূর হয় এবং সে নিত্য পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। মানব যাহাতে ভবরোগমুক্ত হইয়া বিজ্ঞান ও পরিণয়ের পরমানন্দ অনন্তকালের জন্য সম্ভোগ করিতে পারে, সন্ন্যাসী তজ্জন্য নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সন্ন্যাসীর এইরূপ নিঃস্বার্থ এবং অক্লান্ত কার্য্যই জগতের সকল দেশের সকল জাতির মানবের ব্যক্তিগত জীবনের, গার্হস্থ্য জীবনের, সামাজিক জীবনের, এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেরও শান্তিময় সৌধরূপে বিরাজমান থাকিয়া মানবকে ইহলোকে ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখময় এবং শান্তিপূর্ণ আশ্রয় দিতেছে এবং মানবকে ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য পরমানন্দপ্রাপ্তির জন্য ইহ-পর-লোকের সেতুও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। বাল্মিকী, ব্যাস, নারদ, শুকদেব প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ মানবজাতিকে রামায়ণ, মহাভারত, বেদ-বেদান্ত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি দান করিয়া মানবের জন্য উক্তরূপ ইহলোকের সৌধ এবং পরলোকের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সেন্ট্ জন্, সেন্ট্ লুথার, সেন্ট ম্যাথু প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ নিউ টেষ্টামেণ্ট (The New Testament) দিয়া মানবের জন্য উক্তরূপ সৌধ এবং সেতু নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সকল দেশের মানবের ইতিহাসেই দেখা যাইবে যে সন্ন্যাসীগণই উক্তরূপ সৌধ এবং সেতু নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, সংসারী মানবগণ করেন নাই। আজিও সন্ন্যাসী-গণই প্রাচীন কালের সন্ন্যাসীগণের ন্যায় নিঃস্বার্থ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মানবের জন্য উক্তরূপ সৌধ এবং সেতু নির্ম্মাণ করিতেছেন। উক্তরূপ পরহিত-কর কার্য্য সন্ন্যাসীই করিতে পারেন, সংসারী মানব পারে না, এবং এইরূপ পরহিতকর কার্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরহিতকর কার্য্য। ভগবানও মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়া হাঁসপাতাল, অন্নসত্র, এবং বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভবরোগের বাহ্যলক্ষণ দূর করিবার জন্য কার্য্য করেন না, মানবের ভবরোগমুক্তি এবং নিত্যানন্দপ্রাপ্তির

জন্যই কার্য্য করেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া হাঁসপাতাল, অন্নসত্র, এবং বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই, জীবের ভবব্যাধি দূর করিবার জন্য সন্ন্যাসী হইয়া এবং বুদ্ধ হইয়া মানবকে উক্তরূপ সৌধ এবং সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণও হাঁসপাতাল, অন্নসত্র, এবং বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই, মানবের জন্য উক্তরূপ সৌধ এবং সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আজিও যে মানবসমাজে মানবতা আছে এবং আজিও যে মানবসমাজের অনেকে ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সন্ন্যাসীগণের নিঃস্বার্থ এবং অক্লান্ত পরহিতকর কার্য্যের ফল। সন্ন্যাসীগণ উক্তরূপ মঙ্গলজনক কর্ম্ম না করিলে মানবজাতির ইতিহাস মারণাস্ত্রকে প্রস্তরনির্ম্মিত বর্ষাফলক হইতে হাইড্রোজেন বোমায় উন্নীতকরণের ইতিহাসে পরিণত হইত। এই ইতিহাসের মধ্যে স্বার্থপর মানবের স্বার্থময় দ্বন্দ্বের সমগ্র ইতিহাসটী অন্তর্নিহিত আছে। ইহা মানবজাতির ক্রমাবনতির ইতিহাস। কিন্তু ইহাই মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস নহে। ইহার পাশে পাশে মানবজাতির ক্রমোন্নতিসাধনের জন্য নিঃস্বার্থ এবং দ্বন্দ্বহীন কর্ম্মেরও ইতিহাস আছে। ইহা সন্ন্যাসীগণের কর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত গৃহী মানবগণেরও কর্ম্মের ইতিহাস। আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলাম; এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, বিদ্যাহীনকে বিদ্যাদান, রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা প্রভৃতি পরহিতকর কার্য্য করিবার জন্যই সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই; কেবল এই কার্য্য করিবার জন্য সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের প্রয়োজনও হয় না; এই সকল কর্ম্ম গৃহীগণের জন্যই বিহিত হইয়াছে; সকল দেশের ইতিহাসেই দেখা যায় যে মহানুভব গৃহী ব্যক্তিগণ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া আজীবন মানবসেবা করিয়াছেন। শাস্ত্র গৃহীগণের জন্য যে নিত্যকরণীয় পঞ্চযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন, গৃহীগণ সেই পঞ্চযজ্ঞের নিত্য অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারাই উক্ত পরহিতকর কার্য্য করা হয় এবং সমাজে কাহারও অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসাদির এবং বিদ্যার অভাব থাকে না। অধিকন্তু, প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য উক্তরূপ কল্যাণকর কার্য্য দেশের রাজসরকারের কর্ত্তব্য, এবং রাজসরকার তাহা করিয়া থাকেন। যদিও উক্তরূপ সেবাকার্য্য করিবার জন্য সন্ন্যাসাশ্রম নহে এবং সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের আবশ্যকও হয় না, তথাপি যাঁহারা কেবলই

সেবাকার্য্য করিবার জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ সেবাকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন, তাঁহাদের সত্ত্বগুণ ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ এবং প্রবল হইয়া রজস্তমোগুণকে অভিভূত করে এবং ইহার ফলে তাঁহারা ক্রমশঃ বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভের সাধনার পথে উপনীত হয়েন। বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করিয়া তাঁহারাও তখন ভবরোগের বাহ্যলক্ষণ দূর করিবার জন্যই কার্য্য না করিয়া ভবরোগ দূর করিবার জন্য কার্য্য করেন। তখন তাঁহাদের সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণ তাঁহাদের নিজেদের পক্ষেও সার্থক হয় এবং মানবসমাজের পক্ষেও সার্থক হয়।

১৪।২।৫ জীবে দয়া

জীবকে দয়া করিতে হইবে। দয়ায় অর্থ, সর্ব্বজীবের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি এবং সমবেদনা বোধ করিয়া যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। এই দয়া একটী আত্মিক বৃত্তি, অর্থাৎ জীবাত্মার আনন্দাংশের হ্লাদিনীর একটী বৃত্তি। হ্লাদিনীর স্বভাবানুযায়ী দয়ারও স্বভাব এই যে, সে অন্যের দুঃখ মোচন করিয়া তাহাকে সুখী করে এবং সুখী করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করে। কামক্রোধাদি দৈহিক বৃত্তিগুলি দয়ানুশীলনের অন্তরায় হয়; যথা :—দয়া দুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য তাহাকে অর্থ বা আহার্য্যাদি দান করিতে চাহে, কিন্তু কাম বাধা দিয়া বলে, "ঐ অর্থ এবং আহার্য্য আমার নিজের জন্য প্রয়োজন, উহা দান করা চলিবে না।" মায়াবদ্ধ বিষয়াসক্ত মানবের কাম দয়ার কণ্ঠরোধ করে। এইজন্য জগতে দয়ালু ব্যক্তির সংখ্যা বড় কম। যোগসাধনায় ব্রতী সাধককে দয়াবৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। অর্থ বা আহার্য্যাদি দান করিবার সামর্থ্য না থাকিলে দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা, অন্ততঃ সান্ত্বনাবাক্যের দ্বারাও অপরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল মানবের প্রতিই নহে, পশু পক্ষী বৃক্ষলতা প্রভৃতি সর্ব্বজীবে দয়া করিতে হইবে। এইরূপে দয়াবৃত্তির অনুশীলন করিতে করিতে সর্ব্বভূতে সমভাব আসিতে বিলম্ব হয় না। দয়ার কার্য্যে বিচারের আবশ্যক আছে। নিজেকে অথবা পরিজনবর্গকে অনাহারে রাখিয়া কিম্বা অসুবিধায় ফেলিয়া অথবা আপন যোগসাধনায় বিঘ্ন হয় এরূপে দয়ার কার্য্য করা উচিত নহে। যাহার জন্য দয়ার কার্য্য করা হইবে সে যথার্থ দয়ার পাত্র কিম্বা প্রতারক, তাহাও বিচার করা কর্ত্তব্য। বিচার করিয়া দয়ার কার্য্য করিতে হয়।

১৪।২।৬ অহিংসা

অহিংসা পালন করিতে হইবে। অহিংসাও একটী আত্মিক বৃত্তি; দয়ার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহার দয়াবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, সে কোন জীবকে হিংসা করিতে পারে না। হিংসা কি, তাহা পূর্ব্বেই ১।৩।১২ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। যেখানে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ সেখানে খাদক-কর্ত্তৃক খাদ্যের বধে হিংসা হয় না। প্রত্যেক প্রাণীকেই শরীর রক্ষা করিতে হইবে এবং শরীর-রক্ষার জন্য আহার করিতে হইবে, ইহা ঈশ্বরের বিধান। ঈশ্বরের বিধান অনুসারেই, প্রাণীদেহই প্রাণীর খাদ্য। পশুপক্ষীর ন্যায় বৃক্ষলতারও প্রাণ আছে। হংসডিম্বের মধ্যে যেমন জীবন্ত শিশুহংসটী থাকে, তদ্রূপ, ধান্য গোধূম যব ছোলা প্রভৃতি শস্যের প্রত্যেকটী এক-একটী ডিম্ব এবং ইহাদের প্রত্যেকটীর মধ্যে জীবন্ত শিশুবৃক্ষটী আছে। প্রাণীদেহ বাদ দিলে ইট মাটী পাথর প্রভৃতি যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা খাদ্য নহে। প্রাণীদেহ আহার করিব না বলিলে অনাহারে থাকিতে হইবে। সুতরাং, ঈশ্বরের বিধান অনুসারে খাদক-কর্ত্তৃক খাদ্যের বধে হিংসা নাই, কারণ সেখানে বধই মূল ইচ্ছা নহে, ঐশী বিধানে আহারের দ্বারা শরীর-রক্ষা মূল ইচ্ছা। বিনা প্রয়োজনে, অসদুদ্দেশ্যে, অথবা বিদ্বেষবশতঃ বধ বা ব্যথাদান করিলে হিংসা হয়। হিংসা না করিবার প্রবৃত্তি অহিংসা। যিনি জীবমাত্রেরই দুঃখকষ্ট দেখিলে সহানুভূতি এবং সমবেদনা বোধ করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করেন, এরূপ দয়ালু ব্যক্তি কাহাকেও হিংসা করিতে পারেন না। এইজন্য বলা হইয়াছে যে দয়া এবং অহিংসা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মিক বৃত্তি। এই যোগসাধনায় ব্রতী সাধককে অহিংস হইতে হইবে। দয়ালু এবং অহিংস সাধকের অন্তরে সর্ব্বজীবের প্রতি মৈত্রীভাব বিরাজ করে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সাধককে দয়ালু, অহিংস, এবং মৈত্রীভাবাপন্ন হইতে হইবে। গীতা বলিয়াছেন: "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।" গীতা ১২।১৩। এইরূপ হইলে জাগতিক সম্বন্ধে সখ্যভাব স্থাপিত হইবে।

১৪।২।৭ অতিথিসৎকার

অতিথি সৎকার করিতে হইবে। যাঁহার সহিত পূর্ব্ব হইতে পরিচয় নাই, যিনি আত্মীয়, কুটুম্ব, অথবা বন্ধু নহেন, যিনি পূর্ব্বে কখনও গৃহে আসেন নাই,

এবং যিনি এক তিথির অধিক কাল গৃহে থাকিবেন না, এরূপ ব্যক্তি পথশ্রমে ক্লান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহার ও বিশ্রামের জন্য গৃহে আসিলে তাঁহাকে অতিথি বলা হয়। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার সেবা ও যত্ন করিতে হইবে। সাধ্যানুযায়ী আহার্য্য পানীয় এবং আশ্রয়স্থান অতিথিকে দান করিতে হইবে। যদি গৃহে কোন আহার্য্য একেবারেই না থাকে, অন্ততঃ পানীয় জল দিয়াও অতিথির সেবা করিতে হইবে। শ্রুতির আদেশঃ "অতিথিদেবো ভব।" তৈত্তিরীয় ১।১১।২। "ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত।" তৈত্তিরীয় ৩।১০।১।—"অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার সেবা করিবে। আশ্রয়-প্রার্থী ব্যক্তি গৃহে আসিলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবে না।"

১৪।২।৮ কাহারও উদ্বেগ সৃষ্টি করিবে না

যোগী কাহারও উদ্বেগ সৃষ্টি করিবেন না। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাই যখন নিষিদ্ধ, তখন বিদ্বেষবশে কাহারও উদ্বেগসৃষ্টি করাও নিষিদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিদ্বেষবশে না হইলেও, নিজের সুখ ও সুবিধার জন্যও কাহাকেও উদ্বেগ দেওয়া নিষিদ্ধ। কাহাকেও উদ্বিগ্ন না করিবার জন্য নিজে অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও তাহাই করা কর্ত্তব্য। অন্য কাহারও ত্রুটী-বিচ্যুতি হইতে উদ্বেগ বোধ করিবে না। ভগবান বলিয়াছেনঃ

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ গীতা ১২।১৫

—"যিনি অন্যের উদ্বেগ সৃষ্টি করেন না এবং অন্য হইতেও যিনি উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়েন না, বিষয়লাভে হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয়, এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত সেই ব্যক্তি আমার প্রিয়।" এইরূপ হইতে পারিলে দ্বন্দ্বাতীত হইতে বিলম্ব হয় না।

১৪।২।৯ সাত্ত্বিক আহার

সাত্ত্বিক আহার করিতে হইবে। সকল আহার্য্যবস্তুই ত্রিগুণময়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সত্ত্বপ্রধান, কতকগুলি রজঃ-প্রধান, এবং কতকগুলি তমঃ-প্রধান। সত্ত্বপ্রধান আহার্য্যবস্তুর আহারকে সাত্ত্বিক, রজঃ-প্রধান আহার্য্য-বস্তুর আহারকে রাজসিক, এবং তমঃ-প্রধান আহার্য্যবস্তুর আহারকে তামসিক আহার বলা হয়। সাত্ত্বিক আহারের ফলে দেহের সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ এবং প্রবল

হইয়া রজস্তমোগুণকে অভিভূত করে; রাজসিক এবং তামসিক আহারের ফলে রজস্তমোগুণ প্রবৃদ্ধ এবং প্রবল হইয়া সত্ত্বগুণকে অভিভূত করে। স্থূলদেহ আহার্য্যবস্তুর স্থূলাংশ এবং লিঙ্গদেহ সূক্ষ্মাংশ (তন্মাত্রা) গ্রহণ করে। এইজন্য, সাত্ত্বিক, রাজসিক, অথবা তামসিক আহারের ফলে কেবল যে স্থূলদেহেরই রজঃ তমঃ অথবা সত্ত্ব গুণ প্রবৃদ্ধ এবং প্রবল হয় তাহা নহে, লিঙ্গদেহেরও তদ্রূপ হয়। যোগসাধনায় ব্রতী সাধকের পক্ষে সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক খাদ্য কি, তাহা জ্ঞাত হইয়া সাত্ত্বিক আহার করা আবশ্যক। শাকশব্জী, ফলমূল, চাউল, গোধুম, যব, জোয়ার, ডাল প্রভৃতি নিরামিষ দ্রব্যসমূহ সাত্ত্বিক আহার্য্য-বস্তু। নিরামিষ দ্রব্য আহারে হিংসা হয় না এবং আমিষ দ্রব্য আহারে হিংসা হয়, তাহা নহে; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে হিংসা হয় না। নিরামিষ আহারই সাত্ত্বিক আহার এবং তদ্দ্বারা সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া সাধকের পক্ষে নিরামিষ আহার বিহিত হইয়াছে। এইরূপ সাত্ত্বিক আহারই শুদ্ধ আহার। শুদ্ধাহার শ্রুতিরও নির্দ্দেশ। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ।" ছান্দোগ্য ৭।২৬।২।—"আহার শুদ্ধ হইলে অর্থাৎ সাত্ত্বিক আহার করিলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ স্থূলদেহ এবং লিঙ্গদেহ সত্ত্বপ্রধান হয়। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে ঈশ্বরবিষয়ক স্মৃতি নিশ্চলা হয়। এইরূপ স্মৃতি লাভ করিলে সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়।" নিরামিষ দ্রব্যের মধ্যেও অত্যন্ত কটু, অত্যন্ত লবণাক্ত, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত রুক্ষ, এবং অত্যন্ত উগ্র বস্তু মাত্রেই রাজসিক আহার। মাংস এবং ডিম্ব রজস্তমোগুণকে অত্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া সত্ত্বগুণকে ক্ষীণ করিয়া দেয়; এইজন্য মাংস ও ডিম্ব সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। মৎস্য মাংসডিম্বের ন্যায় অনিষ্টকারী নহে বলিয়া গৃহী সাধকদের পক্ষে মৎস্যাহার সম্বন্ধে বিধি বা নিষেধ নাই। কিন্তু সাধনা করিতে করিতে সাধক এমন অবস্থায় উপনীত হয়েন যে তখন মৎস্যাহার ত্যাগ না করিলে আর উন্নত হইতে পারেন না। পূতি এবং পর্য্যুষিত দ্রব্য তামসিক খাদ্য এবং বর্জ্জনীয়। উচ্ছিষ্ট বস্তু আহার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে তাহার স্থূলদেহের ব্যাধির বীজই যে ভোজনকারীর স্থূলদেহে সংক্রামিত হয়, তাহা নহে; তাহার মানসিক ভাবও ভোজনকারীর মনে সংক্রামিত হয়। পিতামাতার উচ্ছিষ্ট আহারে ক্ষতি হয় না, বরং ভক্তির সহিত পিতামাতার ভুক্তাবশিষ্টকে প্রসাদ

ভাবিয়া ভোজন করিলে কল্যাণই হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শশুর-শাশুড়ীর এবং স্বামীর উচ্ছিষ্টও প্রসাদস্বরূপ, তাহা ভোজন করিলে স্ত্রীলোকের কল্যাণ হয়। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আপন সন্তানের এবং তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপরের সন্তানের উচ্ছিষ্ট আহার করিলে ক্ষতি হয় না। শ্রাদ্ধান্ন প্রেতের উচ্ছিষ্ট; উহা সাধকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উচ্ছিষ্ট আহার করিলে গুরুশক্তির ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। যে কোন ব্যক্তির দ্বারা স্পৃষ্ট খাদ্যবস্তু আহার করিলেও ক্ষতি হয়, কারণ আহার্য্য বস্তু যাহার দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহার ব্যাধির বীজ এবং মানসিক ভাবও স্পর্শের দ্বারা আহার্য্যবস্তুতে এবং আহার্য্যবস্তু হইতে ভোজনকারীর দেহে ও মনে সংক্রামিত হয়। মাদক দ্রব্য মাত্রেই তামসিক বস্তু। যে বস্তু সেবন করিলে মত্ততা আসে, তাহা মাদক দ্রব্য। মাদকদ্রব্য মাত্রেই সাধকের পরিত্যজ্য। মাংস, ডিম্ব, অথবা মাদকদ্রব্য রুগ্নাবস্থায় ঔষধ বা পথ্য রূপে চিকিৎসক বিধান করিলে যে পরিমাণে যত দিনের জন্য বিহিত হয়, সেই পরিমাণে ততদিনের জন্য রোগী ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু রোগারোগ্য হইলেই তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। খুব সাবধানে এবং অতিশয় দৃঢ়তার সহিত সাধককে আহার সম্বন্ধীয় এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

১৪।২।১০ পরনিন্দা পরিত্যাজ্য

পরনিন্দা সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কাহাকেও অন্যের নিকট হেয় করিবার ইচ্ছায় তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট তাহার যথার্থ দোষ কীর্ত্তন করিলেও পরনিন্দা হয়। মিথ্যা দোষারোপ করিয়া পরনিন্দা আরও গুরুতর অন্যায়। দোষকীর্ত্তন কেবল যে বাক্যের দ্বারাই হয় তাহা নহে; বিদ্রূপাত্মক ভাবভঙ্গি প্রকাশের দ্বারাও হয়। পরনিন্দা করিলে সাধক কখনই যোগসাধনায় উচ্চাবস্থা লাভ করিতে পারিবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন: "পরস্বভাবকর্ম্মণি ন গর্হয়েৎ।" ভাগবত। ১১।২৮।১—"অন্যের স্বভাবের বা কর্ম্মের নিন্দা করিবে না।" কাহারও দোষ দেখিলে তাহা সংশোধনের জন্য তাহাকেই নিভৃতে তাহার দোষ বুঝাইয়া দিলে তাহার উপকার করা হয়; ইহাতে পরনিন্দা হয় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, অথবা ধর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রকাশ্যভাবে কার্য্য করেন, এইরূপ ব্যক্তিগণের কার্য্যের বা

মতামতের সমালোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা, সভাসমিতির দ্বারা, অথবা সংবাদপত্রাদির দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের বা মতামতের সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে পরনিন্দা হয় না। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মক্ষেত্রসমূহে কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই কর্ম্মসম্পাদনের অযোগ্য হইলে তাঁহাদের অযোগ্যতা প্রমাণের জন্য তাঁহাদের দোষত্রুটী প্রদর্শন করিলেও পরনিন্দা হয় না।

১৪।২।১১ আত্মপ্রশংসা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়

পরনিন্দার ন্যায় আত্মপ্রশংসাও সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিতে হইবে। নিজেই নিজের গুণকীর্ত্তন করিলে, অথবা অন্যের দ্বারা নিজের গুণকীর্ত্তন করাইলে আত্মপ্রশংসা হয়। আত্মপ্রশংসার কারণ সম্মান, প্রতিষ্ঠা, এবং অর্থ লাভের ইচ্ছা, অথবা ইহাদের মধ্যে কোন একটী লাভের ইচ্ছা। আত্মপ্রশংসা অতিশয় অনিষ্টজনক। গুণহীন ব্যক্তি যদি আপনাকে গুণবান বলিয়া প্রচার করে অথবা অন্যকে দিয়া করায়, তাহা আরও গুরুতর দোষ। সকল সাধককেই আত্মপ্রশংসা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে ; আত্মপ্রশংসা করিবার ইচ্ছারও যেন মনে না উদয় হয়, তদ্বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যোগীর মনে প্রতিষ্ঠালাভের কামনা আসিলে তিনি সাধন পথে আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিবেন না, এবং যদি তিনি কোন একটী ভাল অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহাকে হারাইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" উপদেশ স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা আপনাকে তৃণাপেক্ষাও নীচ মনে করিয়া যোগসাধনা করিতে হইবে। এইরূপ করিলে যোগী শীঘ্র ভগবানের কৃপা লাভ করেন। বিন্দুমাত্র অহঙ্কার এবং প্রতিষ্ঠাকামনা থাকিলে ভগবান তাহার নিকট হইতে দূরে থাকেন। প্রতিষ্ঠালাভের, অর্থলাভের, অথবা শিষ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনেক সাধক সামান্য যোগশক্তি লাভ করিয়া থাকিলে, নিজ মহিমাপ্রচারের জন্য তাহা লোককে দেখাইয়া থাকে এবং প্রচার করে। যে সকল সাধক এইরূপ আত্মপ্রচার (Self-advertisement) করে, তাহারা যোগভ্রষ্ট।

১৪।২।১২ সনাতন রীতি-নীতি পালনীয়

চিরাচরিত রীতি-নীতির সমর্থন করিতে হইবে। সমাজে যে সকল রীতি-

নীতি চিরকাল আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ বা যোগসাধনার পরিপন্থী না হইলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ না করাই সাধকের কর্ত্তব্য। সামাজিক বা পারিবারিক সকল রীতি-নীতির মূলে আছে শাস্ত্রীয় বিধান। ত্রিকালদ্রষ্টা ঋষিগণ ত্রিকালের মঙ্গলের জন্যই শাস্ত্রে ঐ সকল বিধান করিয়া গিয়াছেন। যাহারা আপনাদিগকে ঋষিদিগের অপেক্ষা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভাবিয়া শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থার উচ্ছেদ করিয়া নূতন বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহারা সমাজের কল্যাণ না করিয়া অকল্যাণই করিতেছেন। সমাজের অশিক্ষিত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য এবং অর্থ না বুঝিয়া তাহার অনুসরণ করিতে করিতে অনেক শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার বিকৃত আচরণ সমাজে হইতেছে। বিপ্লবের দ্বারা সমস্ত সমাজকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভিন্নদেশীয় সমাজের অনুকরণে সমাজগঠন করিবার চেষ্টা করিলে সমাজকে ধ্বংস করা হইবে, গঠন করা যাইবে না। সমাজের লোককে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য এবং অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বিকৃত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া উদ্দেশ্যগত আচরণে প্রবৃত্ত করিলে সমাজের যথার্থ কল্যাণ হইবে। এইরূপ সংস্কার কার্য্যের দ্বারা সমাজ পূর্ব্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এই যোগসাধনায় ব্রতী সাধকের পক্ষে বিপ্লবের পথ অনুসরণ করা নিষিদ্ধ; প্রয়োজন হইলে সাধক পূর্ব্বোক্তরূপে সংস্কারসাধনের দ্বারা সমাজের কল্যাণ করিতে পারেন।

১৪।২।১৩ সাম্প্রদায়িকতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়

সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন করিতে হইবে। পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। পরমেশ্বরই ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মও এক এবং অদ্বিতীয়। সকল দেশের সকল সমাজের লোকই এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে নানা নামে এবং নানা রূপে ভজনা করিতেছেন। সেই একই মহান্ ধর্ম্মবৃক্ষ সমগ্র জগতের সকল মানবের ত্রিতাপহরণকারী আশ্রয়। সুতরাং ধর্ম্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই এবং থাকিতে পারে না। যাহা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ তৎসমুদয় এক এবং অদ্বিতীয় ধর্ম্মকে লাভ করিবার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী। প্রচলিত রীতি অনুসারে আমরাও ইহাদিগকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতেছি। প্রত্যেক ধর্ম্মের অনুসরণকারী মানবগণ সমষ্টিগতভাবে এক-একটী সম্প্রদায়, যেমন হিন্দুসম্প্রদায়, খৃষ্টানসম্প্রদায়, মুসলমান সম্প্রদায়, ইত্যাদি।

এইগুলি মূলসম্প্রদায়। ইহারা আবার বহু শাখাসম্প্রদায়ে বিভক্ত। শাখা-সম্প্রদায়গুলিও আবার প্রশাখাসম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সকল মূল, শাখা, প্রশাখা, অথবা উপশাখাধর্ম্ম সমূহের মধ্যে কোন একটী সত্যধর্ম্ম এবং ঈশ্বরকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়, কিন্তু অন্যগুলি তাহা নহে, এইরূপ বুদ্ধিই সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতার জন্য জগতে বহু যুদ্ধবিগ্রহ এবং কলহ হইয়াছে এবং হইতেছে। আমাদের আলোচ্য এই যোগসাধনা সনাতন সাধনপন্থা ; যেমন পরমেশ্বরের কোন সম্প্রদায় নাই, তদ্রূপ এই সনাতন সাধনপন্থার মধ্যে সম্প্রদায় নাই। পূর্ব্বোক্ত মূল, শাখা, প্রশাখা, এবং উপশাখা সমূহের ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ে থাকিয়াই এই যোগসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, অনেকেই করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যাঁহারা এই সাধনায় দীক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনা-দিগকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিবেন না, সকল সম্প্রদায়কেই আপন বলিয়া ভাবিবেন, কোন সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবেন না, কোন সম্প্রদায়ের লোককে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন না এবং সকল সম্প্রদায়কে এবং সকল সম্প্রদায়ের সাধুমহাত্মাগণকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করিবেন। এইরূপ করিলেই সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন করা হইবে।

১৪।২।১৪ সদাচারপালন

যোগীকে বাহ্যাভ্যন্তরশুচিসম্পন্ন হইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মসমূহ নিষ্ঠার সহিত পালিত হইলে আভ্যন্তরীণ শুচিতা সম্পাদন করে। বাহ্যশুচিতাসম্পাদনের জন্য সদাচার পালন করিতে হইবে। দেহকে শুদ্ধ এবং পবিত্র রাখিবার জন্য যেরূপ আচরণ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে এবং সাধুমহাজনগণ দ্বারা অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাই সদাচার। দেহটী ইষ্টমন্দিরস্বরূপ। পূজারী যেমন দেব-মন্দিরকে সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং পবিত্র রাখে, সাধককেও তেমনি দেহটীকে সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং পবিত্র রাখিতে হইবে। স্থূলদেহের সহিত লিঙ্গদেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় স্থূলদেহ অশুচি থাকিলে মনও অশুচিভাবাপন্ন হয়। কেবল ধোলাই করা ফর্শা কাপড়জামা পরিয়া থাকিলেই সদাচার পালন করা হয় না। প্রত্যহ প্রাতে যথাসময়ে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিতে হয়। দন্তধাবন, মুখপ্রাক্ষালন, এবং শরীর অসুস্থ না থাকিলে স্নান প্রতঃকৃত্যের অবশ্যকরণীয় অঙ্গ। সুস্থ বা

অসুস্থ সকল অবস্থাতেই পায়খানার কাপড় ত্যাগ করিয়া শুচিবস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। প্রস্রাবের পরও জলশৌচ করিতে হইবে। মুখাভ্যন্তর সর্ব্বদাই উচ্ছিষ্ট। মুখে হস্তস্পর্শ হইলেই হাত উচ্ছিষ্ট হয়; উচ্ছিষ্ট হাত ধুইতে হইবে। শাস্ত্র যেমন উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তেমনি কাহাকেও উচ্ছিষ্ট দান করিতেও নিষেধ করিয়াছেন।

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবং হ্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্‌ব্রজেৎ॥ মনু ২।৫৬

—"কাহাকেও উচ্ছিষ্ট খাইতে দিবে না এবং কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইবে না। উচ্ছিষ্ট হাতে কোথাও যাইবে না।" উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র এবং পানপাত্র সকল মাজিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া বা করাইয়া লইতে হইবে। আসন, বসন, গৃহ শয্যা প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যেরই শুচিতা রক্ষা করিতে হইবে। সকল দৈহিক ব্যাপারেই শুচিতা রক্ষা করিতে হইবে।

১৪।২।১৫ আসন ও প্রাণায়াম

এই অধ্যাত্মযোগসাধনায় দীক্ষাদানকালে সদ্‌গুরু একপ্রকারের অতি শক্তিশালী প্রণায়াম শিক্ষা দেন। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় শুচিশুদ্ধ হইয়া আসনে বসিয়া এই প্রাণায়ামের সাধনা করিতে হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সময় না হইলে সুবিধামত অন্য সময়েই প্রাণায়াম করিতে হয়, কিন্তু প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে না করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়েই করিতে হয়। দাঁড়াইয়া, শয়ন করিয়া, অশুচি অবস্থায়, আহারের পর ভরা পেটে, খালি পেটে ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায়, অসুস্থ দেহে অথবা পরিশ্রান্ত অবস্থায় প্রাণায়াম করা নিষিদ্ধ। এই সাধনা যিনি বা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের সহিত ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে, অথবা অন্যে দেখিতে পায় এরূপ কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রাণায়াম করা নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোক গুরুভগ্নী হইলেও কোন স্ত্রীলোকের সহিত একসঙ্গে বসিয়া প্রাণায়াম করা নিষিদ্ধ। কেবল স্বামী-স্ত্রী এক ঘরে পৃথক পৃথক আসনে বসিয়া প্রাণায়াম করিতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ঋতুকালে, এবং গর্ভাবস্থায় গর্ভের প্রথম চারি মাস এবং নবম মাস হইতে প্রসবের পর তিন মাস পর্য্যন্ত প্রাণায়াম নিষিদ্ধ। যোগসাধনার জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষ রাখিতে হয়। সেই সাধনকক্ষে নির্জ্জনে শুদ্ধ স্থানে শুদ্ধ কম্বলের অথবা কুশের আসনে বসিয়া সুস্থ দেহে এবং শান্ত মনে

প্রাণায়াম করিতে হয়। আসনের উপর যোগসাধনার জন্য বসিবার প্রণালীকেও আসন বলা হয়। পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, বীরাসন, শবাসন, কূর্ম্মাসন, ময়ূরাসন, সিংহাসন প্রভৃতি বহু প্রকারের আসন শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই যোগসাধনার জন্য উক্তরূপ কোন আসন করিতেই হইবে, এরূপ কোন বিধান নাই। যেরূপভাবে বসিলে বিনাক্লেশে দীর্ঘসময় স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারা যায়, সাধক সেইরূপভাবে বসিয়াই যোগসাধনা করিবেন। ইহাকে শাস্ত্রে স্থিরসুখাসন বলা হয়। "স্থিরসুখমাসনম্।" পাতঞ্জল। ৪৩। স্থিরসুখাসনে বসিয়া সাধক প্রাণায়াম করিবেন। এই প্রাণায়ামের তিনটি অংশ, পূরক, রেচক, কুম্ভক। অভ্যন্তরে বায়ুগ্রহণ পূরক; গৃহীত বায়ুর নিঃসরণ রেচক; রেচকের পর অভ্যন্তরে বায়ুগ্রহণ না করিয়া অবস্থান কুম্ভক। শাস্ত্রে এই প্রকার প্রাণায়ামের নাম ভস্ত্রাপ্রাণায়াম। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন:

বাতপিত্তশ্লেষ্মহরং শরীরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
কুণ্ডলীবোধকং ক্ষিপ্রং পবনং সুখদং হিতম্॥
ব্রহ্মনাড়ীমুখে সংস্থকফাদ্যর্গলনাশকম্॥
সম্যগ্ গাত্রসমুদ্ভূত-গ্রন্থিত্রয়বিভেদকম্।
বিশেষেণৈব কর্ত্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকং ত্বিদম্॥ হঠযোগপ্রদীপিকা

—"ভস্ত্রাপ্রাণায়াম বাত পিত্ত শ্লেষ্মা নাশ করে, শরীরের অগ্নি বর্দ্ধিত করে, কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত রাখে; ইহা পবন, অর্থাৎ পবিত্র করে, কারণ ইহার দ্বারা শরীরের মল দূরীভূত হয়, ভূতশুদ্ধি হয়, এবং শরীর শুদ্ধ হয়। ইহা সুখদায়ক এবং কল্যাণকর। ব্রহ্মনাড়ীর অর্থাৎ সুষুম্নার মুখে কফাদি সঞ্চিত থাকিয়া উহার মুখকে বদ্ধ করিয়া রাখে, এই প্রাণায়াম তৎসমুদয় দূরীভূত করিয়া সুষুম্নার মুখ খুলিয়া দিয়া কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধগতির পথ করিয়া দেয়। ইহা সুষুম্নার অন্তর্গত গ্রন্থিত্রয় ভেদ করাইয়া দেয়। বিশেষ সাবধানতার সহিত সদ্গুরুর দীক্ষা এবং উপদেশ মতে এই ভস্ত্রা নামক প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়।" এই প্রাণায়ামের ভস্ত্রা নামের কারণ গোরক্ষসংহিতায় পাওয়া যায়।

ভস্ত্রৈব লৌহকারাণাং যথাক্রমেণ সংভ্রমেৎ।
ততো বায়ুঞ্চ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ॥ গোরক্ষসংহিতা

—"লোহকারের ভস্ত্রাযন্ত্র যেমন সজোরে বায়ু গ্রহণ করিয়া সজোরে বায়ুকে নির্গত করে, তদ্রূপ উভয় নাসারন্ধ্রের দ্বারা সজোরে বায়ু গ্রহণ করিয়া সজোরে

তাহা ত্যাগ করিতে হয়।" ভস্ত্রাযন্ত্রের বায়ু গ্রহণের ও ত্যাগের সহিত এই প্রাণায়ামের বায়ু গ্রহণের ও ত্যাগের উক্তরূপ সাদৃশ্যের জন্য ইহার নাম ভস্ত্রা-প্রাণায়াম। ভস্ত্রাপ্রাণায়ামের কুম্ভক রেচকের কুম্ভক, পূরকের কুম্ভক নহে, এবং কুম্ভক এই প্রাণায়ামের প্রধান অংশ বলিয়া ইহাকে ভস্ত্রাকুম্ভকও বলা হয়। পূরক, রেচক ও কুম্ভক করিবার সময় সর্ব্বদা গুরুদত্ত নামও জপ করিতে হয়। নামের সহিত প্রাণায়াম না করিলে সে প্রাণায়াম নিষ্ফল। সাধনার প্রথমাবস্থায় প্রাণায়াম আবশ্যক এবং উপকারী। শ্বাসেপ্রশ্বাসে নামজপ বেশ অভ্যস্ত হইলে পূরক এবং রেচক ব্যতীতও স্বাভাবিক কুম্ভক অভ্যস্ত হইয়া যায়। এইরূপ কুম্ভককে শাস্ত্র কেবলকুম্ভক নাম দিয়াছেন। ইহার উপকারিতা ঃ—

রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ ॥
কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচকপূরকবর্জ্জিতে।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

—"রেচক ও পূরক ব্যতীত যে সহজ ও সুখকর বায়ুধারণ, এরূপ প্রাণায়াম কেবলকুম্ভক নামে অভিহিত হয়। রেচকপূরকবর্জ্জিত কেবলকুম্ভক যাহার অভ্যস্ত হয়, তাহার ত্রিলোকে কোন বস্তু দুর্ল্লভ নহে।" কেবলকুম্ভক অজপা-সাধনায় একটী উন্নত অবস্থা; ইহা অভ্যস্ত হইবার পরে সমাধিলাভে অধিক বিলম্ব হয় না। এইজন্য শাস্ত্র বলিলেন যে কেবলকুম্ভক অভ্যস্ত হইলে ত্রিলোকে কিছুই দুর্ল্লভ নহে। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা এবং গুরুশক্তি না পাইয়া, অন্য কাহাকেও এই প্রাণায়াম করিতে দেখিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া যদি কেহ এই প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ হয় এবং তাহার অকালমৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। গুরুর উপদেশমত প্রাণায়াম করিলে ইহা বিশেষ উপকারী। পাতঞ্জল যোগসূত্র বলেন ঃ তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্ম্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি।—"প্রাণায়াম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছু নাই। প্রাণায়ামের ফলে দেহের মল দূরীভূত হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়।" ভস্ত্রাপ্রাণায়ামের ফলে উক্তরূপ উপকার পাওয়া যায়।

১৪।২।১৬ নিয়মপালন নামসাধনার সহিত অন্বিত

গুরুশক্তির সাহায্যে জীবাত্মার চিৎ পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মসমূহ পালন করে।

নিয়মপালনে দেহের যাহা করণীয়, চিৎ স্বীয় জ্ঞানশক্তি, স্মৃতিশক্তি, মননশক্তি, প্রাণশক্তি প্রভৃতি শক্তিসমূহের প্রয়োগ করিয়া দেহের দ্বারা তাহা করাইয়া লয়। অবিদ্যাশক্তির পরিচালনায় বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গ স্বভাবতঃই উক্ত নিয়ম-সমূহের বিপরীত কার্য্য করিতে চাহে। জীবাত্মার চিৎ স্বীয় শক্তিতে তাহাদিগকে নিয়ম পালন করাইতে পারে না। সদ্‌গুরু নামরূপে চিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। চিৎ নামের সাধনা করিলে গুরুশক্তির সহিত তাহার সংযোগ থাকে। এই সংযোগের দ্বারা শক্তিশালী হইয়া চিৎ তাহাদিগকে নিয়মপালনে বাধ্য করে। নামসাধনা না করিলে নিয়মপালন করা যায় না। এই আধ্যাত্মযোগসাধনায় নিয়মপালন তপস্যা এবং নামসাধনা উপাসনা। উপাসনার সহিত তপস্যা করিলে সেই তপস্যার ফলে সাধক ক্রমশঃ দ্বন্দ্বাতীত এবং মায়াতীত হয়েন। এই অধ্যাত্মযোগসাধনাই আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং ইহার প্রণালী যুদ্ধপ্রণালীর সদৃশ। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু যেখানে ব্যূহরচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে, তাহার চতুর্দ্দিকের পথ অবরুদ্ধ (Communications cut off) করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর রসদ ও রণসম্ভার সরবরাহ বন্ধ করিলে রসদ অভাবে শত্রু দুর্ব্বল হয় এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি রণসম্ভারের অভাবে শত্রু যুদ্ধ করিতে পারে না। এই অবস্থায় অস্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে শীঘ্র এবং সহজে পরাজিত এবং বশীভূত করা যায়। আধ্যাত্মিক সংগ্রামে অবিদ্যার সারথ্যে বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গ জীবাত্মাকে পরাজিত এবং বশীভূত করিবার জন্য যুদ্ধ করে, এবং সদ্‌গুরুর সারথ্যে জীবাত্মার চিৎ উহাদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিবার জন্য যুদ্ধ করে। চিৎ তপস্যারূপ অবরোধের দ্বারা বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গের জন্য রসদ ও রণসম্ভার সরবরাহ বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বল এবং যুদ্ধে অক্ষম করে, এবং তদবস্থায় উপাসনারূপ ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া শীঘ্র এবং সহজে তাহাদিগকে পরাজিত এবং বশীভূত করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামসাধনা

১৪।৩।১ নাম

এই যোগসাধনায় দুই প্রকারের নামসাধনা আছে, অন্তরঙ্গ নামসাধনা এবং বহিরঙ্গ নামসাধনা। দীক্ষাদানকালে সদ্‌গুরু শক্তিসমন্বিত নাম দান করেন। সেই নামের অজপাসাধনা অন্তরঙ্গ নামসাধনা। কৃষ্ণের নামের বাচনিক কীর্ত্তন বহিরঙ্গ নামসাধনা। এই অধ্যাত্মযোগসাধনায় অজপাসাধনাই মুখ্য সাধনা। অজপাসাধনার জন্য সদ্‌গুরু যে নাম দেন, তাহা কেবলই প্রণব নহে, অথবা কেবলই নাম নহে ; তাহা প্রণবযুক্ত নাম। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রণবযুক্ত নাম ধ্যান করিতে হইবে।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রজাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ গীতা ৮।১৩

গীতার এই ঘোষণা অনুসারে কেবল ওঙ্কারের ধ্যানে পরমা গতি অর্থাৎ বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করা যায় না ; ওঙ্কারের সহিত কৃষ্ণের ধ্যান করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া কৃষ্ণের ধ্যান বলিতে কৃষ্ণনামের ধ্যান বুঝিতে হইবে। আমরা পাইলাম, গীতা অনুসারে, ওঙ্কারযুক্ত কৃষ্ণনাম ধ্যানের দ্বারা বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ করা যায়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগাভ্যাসের উপদেশের মধ্যেও কৃষ্ণ নির্দ্দেশ দিয়াছেন : "মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।" ৬।১৪—"যোগী যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া মদ্‌গতচিত্ত এবং মৎপরায়ণ হইবেন।" এই নির্দ্দেশেও কেবল প্রণবধ্যানই বিহিত হয় নাই, কৃষ্ণের অর্থাৎ কৃষ্ণনামের ধ্যান বিহিত হইয়াছে। ইহাই বেদান্তেরও নির্দ্দেশ।

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ প্রশ্ন ৫।৬

এই বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য এই :—অ উ ম, ওঙ্কারের এই তিনটি মাত্রা বিশ্বমায়ার অন্তর্গত বলিয়া কেবল ওঙ্কার-ধ্যানের ফল বিনাশী। কিন্তু বাহ্য অবস্থায় (=চিত্ত যখন বাহ্যবিষয়ে যুক্ত থাকে তখন), অভ্যন্তর অবস্থায়

(=চিত্ত যখন বাহ্যবৃত্তিহীন হইয়া অন্তরনিবিষ্ট অবস্থায় ধ্যানে একাগ্র হয় তখন) এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় (=অর্দ্ধ বাহ্য এবং অর্দ্ধ আন্তর অবস্থায়), এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই ওঙ্কারকে পরমেশ্বরের নামের সহিত প্রকৃষ্টরূপে যুক্ত করিয়া যোগক্রিয়ায় (=প্রণবযুক্ত নামধ্যানে) প্রযুক্ত থাকিলে সেই জ্ঞানবান যোগী বিচলিত হয়েন না।" "ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্।" মুণ্ডক ২।২।৬। এই বেদান্তসূত্রেরও তাৎপর্য্য এই যে, কেবল ওঙ্কারের ধ্যান করিলে চলিবে না, আত্মার (=পরমেশ্বরের) ধ্যান করিতে হইবে, অর্থাৎ ওঙ্কারযুক্ত পরমেশ্বরের নাম ধ্যান করিতে হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন: "নামোপাস্স্ব।" ছান্দোগ্য ৭।১।৪। এই সূত্রেও বেদান্ত নামের উপাসনা করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, কেবল ওঙ্কারের নহে। গোঃ তাঃ শ্রুতিরও ইহাই উপদেশ :—

ওঁকারেণান্তরিতং যে জপন্তি গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং তম্।
তেষামসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং তস্মানমুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্যং শান্তৈঃ॥

—"যাঁহারা গোবিন্দের পঞ্চপদী নাম-মন্ত্রটী ওঙ্কারের সহিত যুক্ত করিয়া জপ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বীয় রূপ প্রদর্শন করেন। অতএব মুমুক্ষু এবং শান্ত ব্যক্তিগণ ওঙ্কারযুক্ত কৃষ্ণনাম নিত্য জপ করিতে অভ্যাস করিবেন।" শ্রুতি এবং স্মৃতি সকল শাস্ত্রমতেই ওঙ্কারযুক্ত কৃষ্ণনামের অন্তরঙ্গসাধনা বিহিত হইয়াছে। সদ্‌গুরু ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ, হিন্দু বা অহিন্দু, সকলকেই ওঙ্কারযুক্ত কৃষ্ণনাম দান করেন, কিন্তু কৃষ্ণের যে নাম ওঙ্কারের সহিত যুক্ত করিয়া দান করেন, তাহা সকলের জন্য একই নাম নহে। সদ্‌গুরু অন্তর্দ্রষ্টা। দীক্ষাপ্রার্থীর জীবাত্মার চিৎ কিরূপ জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিয়াছে বা করিবে, এবং আনন্দাংশের প্রেম শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুর, কি ভাব লইয়া বিকশিত হইবে, তাহা সদ্‌গুরু জানিতে পারেন। এইরূপ আত্মিক প্রাকৃতিটী জ্ঞাত হইয়া, কৃষ্ণের বহু প্রকারের বহু নামের মধ্যে যে নাম সেই প্রকৃতির উপযুক্ত, সেই নাম ওঙ্কারযুক্ত এবং শক্তিসমন্বিত করিয়া সদ্‌গুরু দীক্ষাকালে দান করেন। সদ্‌গুরুর নিকট হইতে যিনি যে নাম প্রাপ্ত হয়েন, সেইটীই তাঁহার নাম। এই নাম কাহারও নিকট বাক্যের দ্বারা, লিখনের দ্বারা, অথবা ইঙ্গিতের দ্বারাও প্রকাশ করিতে নাই, করিলে নামের শক্তি অন্তর্হিত হয়। এই ওঙ্কারযুক্ত শক্তিসমন্বিত নামকে নাম-মন্ত্র এবং মন্ত্রও বলা হয়। মন্ত্র শব্দের অর্থ :—মননাদ্ বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ। যতঃ করোতি সংসিদ্ধিং মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ॥"—

পিঙ্গলাতন্ত্র। এই সদ্‌গুরুদত্ত নাম-মন্ত্রের অজপাসাধনাই অন্তরঙ্গ নামসাধনা। সদ্‌গুরুদত্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র নিষ্ফল ঃ—"পুস্তকে লিখিতান্ মন্ত্রান্ বিলোক্য প্রজপন্তি যে। ব্রহ্মহত্যাসমং তেষাং পাতকং পরিকীর্ত্তিতম্।"—কুলার্ণব তন্ত্র। "গুরুং বিনা যস্তু মূঢ়ঃ পুস্তকাদি বিলোকনাৎ। জপবন্ধং সমাপ্নোতি কিল্বিষং পরমেশ্বরি!"—রুদ্রযামল। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা ব্যতীত বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ হয় না বলিয়া শাস্ত্রে দীক্ষা শব্দের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে ঃ—"দীয়তে জ্ঞানবিজ্ঞানং ক্ষীয়ন্তে পাপরাশয়ঃ। তেন দীক্ষেতি হি প্রোক্তা প্রাপ্তা চেৎ সদ্‌গুরুর্মুখাৎ॥"—মেরুতন্ত্র।

১৪।৩।২ অজপাসাধনার প্রক্রিয়া ঃ সুষুম্নাজপ ঃ অন্তরঙ্গ মহাসঙ্কীর্ত্তন

সাধারণতঃ বলা হয় যে শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপই অজপাসাধনা। কিন্তু অজপা সাধনার প্রক্রিয়া এবং ফল বিশেষরূপে না জানিলে কেবলমাত্র উক্ত সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার দ্বারা অজপাসাধনা কি তাহা কিছুই বুঝা যায় না। বচিক, উপাংশু, এবং মানসিক, এই ত্রিবিধ জপ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে।

জপশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকো মানসস্তথা।
বাচিকোপাংশুরুচ্চৈশ্চ দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি

—"জপ দুই প্রকারের বলিয়া কথিত হয়—বাচিক ও মানসিক। বাচিক জপের শব্দের উচ্চতার ভেদানুসারে বচিক জপ দুই প্রকারের, বাচিক এবং উপাংশু।" উক্ত ত্রিবিধ জপের মধ্যে মানসিক জপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

উচ্চৈর্জপাদুপাংশুশ্চ সহস্রগুণ উচ্যতে।
মানসশ্চ তথোপাংশোঃ সহস্রগুণ উচ্যতে॥

—"বাচিক অপেক্ষা উপাংশু জপ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ, এবং উপাংশু অপেক্ষা মানসিক জপ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ।" এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে কোনটীই জীবাত্মার চিৎ স্বয়ং করে না। চিতের প্রেরণায় এবং জ্ঞানশক্তি ও প্রাণশক্তির সাহায্যে লিঙ্গদেহ ও স্থূলদেহ উক্ত প্রকারের জপ করে। স্থূল বাগযন্ত্রের দ্বারা স্থূল শব্দ উচ্চারণ করতঃ অন্যের শ্রুতিগোচর করিয়া যে নাম জপ, তাহার নাম বাচিক জপ। যে নামজপে স্থূল বাগযন্ত্রের ওষ্ঠজিহ্বাদি অংশগুলি মৃদুভাবে সঞ্চালিত হয়, কিন্তু শব্দ জপকারীর ভিন্ন অন্যের শ্রুতিগোচর হয় না, তাহাকে উপাংশু

জপ বলে। মনের দ্বারা নামচিন্তাকে মানসিক জপ বলে। এই ত্রিবিধ জপেই হস্তের দ্বারা জপমালা ব্যবহারেরও বিধি আছে। অজপা সাধনা উক্ত ত্রিবিধ জপের মধ্যে কোনটীই নহে। অজপাসাধন দৈহিক জপ নহে; ইহা আত্মিক জপ; জীবাত্মার চিৎ স্বয়ং এই জপ করে; ইহা শাস্ত্রের উক্তি।

মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ।
তামেব পরমব্যোম্নি পরমানন্দবৃংহিতে॥ গৌতমীয় তন্ত্র

—"মন্ত্রাক্ষরসমূহকে জীবাত্মার চিচ্ছক্তিতে, এবং সেই চিচ্ছক্তিকে পরমানন্দময় পরব্যোমে প্রথিত বলিয়া জানিবে।" পরব্যোমে বিদ্যমান সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিযুক্ত চিদানন্দের অংশ জীবাত্মা, এবং তাঁহার সহিত পরিণয় ও বিজ্ঞান লাভ জীবাত্মার স্বভাব এইজন্য শাস্ত্র বলিলেন যে জীবাত্মার চিচ্ছক্তি পরব্যোমে প্রথিত এবং সেই চিচ্ছক্তি মন্ত্রকে ধারণ ও স্মরণ করে। এইজন্য, অজপা সাধন আত্মিক জপ। অজপাসাধনে জীবাত্মার চিৎ স্বয়ং নামজপ করে। চিৎ সদ্‌গুরুদত্ত নাম-মন্ত্রটীকে স্বীয় জ্ঞানশক্তিতে ধারণ করিয়া রাখে এবং স্মৃতিশক্তির দ্বারা স্মরণ করিতে থাকে। চিৎ তাহার এই নামস্মরণক্রিয়াকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দের সহিত মিলাইয়া লয়। শ্বাসের সহিত নামের প্রথমার্দ্ধ এবং প্রশ্বাসের সহিত নামের শেষার্দ্ধ স্মরণ করিলে ছন্দের মিল হয়। এইরূপ মিল করিতে না পারিলে একটী নিঃশ্বাসের সহিত নামের প্রথমার্দ্ধ এবং পরবর্ত্তী নিঃশ্বাসের সহিত নামের শেষার্দ্ধ স্মরণ করিতে হয় (১ নিঃশ্বাস = ১ শ্বাস + ১ প্রশ্বাস)। নাম-মন্ত্রটী যদি দীর্ঘ হয় এবং তাহাকে স্মরণ করিবার ছন্দকে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত মিল করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে দুইটী নিঃশ্বাসের সহিত মিল করিয়া লইতে হয়। ছন্দের মিল করিবার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনটীকে অন্যটী অপেক্ষা হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা বিধেয় নহে। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস সমানভাবে সহজগতিতে চলিতে থাকিবে এবং তাহাদেরই ছন্দের সহিত স্মরণের ছন্দটী মিলাইয়া লইতে হইবে। চিৎ যখন এইরূপে শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ছন্দ মিলাইয়া নাম স্মরণ করিতে থাকে, তখন তাহার প্রাণশক্তিকে নিয়োজিত করিয়া নাসিকার মধ্য দিয়া গমনাগমনকারী শ্বাসের অপানবায়ু এবং প্রশ্বাসের প্রাণবায়ুর দ্বারা নামটীর শব্দতন্মাত্রা, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দ, উৎপন্ন করে। প্রাণশক্তির দ্বারা নামের এই শব্দতান্মাত্রিক উচ্চারণের ছন্দটীও, চিতের স্মরণের ছন্দের ন্যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দের সহিত মিল করা হয়।

পিঙ্গলাতন্ত্র। এই সদ্‌গুরুদত্ত নাম-মন্ত্রের অজপাসাধনাই অন্তরঙ্গ নামসাধনা। সদ্‌গুরুদত্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র নিষ্ফল :—"পুস্তকে লিখিতান্ মন্ত্রান্ বিলোক্য প্রজপন্তি যে। ব্রহ্মহত্যাসমং তেষাং পাতকং পরিকীর্ত্তিতম্।"—কুলার্ণব তন্ত্র। "গুরুং বিনা যস্তু মূঢ়ঃ পুস্তকাদি বিলোকনাৎ। জপবন্ধং সমাপ্নোতি কিল্বিষং পরমেশ্বরি!"—রুদ্রযামল। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা ব্যতীত বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভ হয় না বলিয়া শাস্ত্রে দীক্ষা শব্দের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে :—"দীয়তে জ্ঞানবিজ্ঞানং ক্ষীয়ন্তে পাপরাশয়ঃ। তেন দীক্ষেতি হি প্রোক্তা প্রাপ্তা চেৎ সদ্‌গুরুর্মুখাৎ ॥"—মেরুতন্ত্র।

১৪।৩।২ অজপাসাধনার প্রক্রিয়া : সুষুম্নাজপ : অন্তরঙ্গ মহাসঙ্কীর্ত্তন

সাধারণতঃ বলা হয় যে শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপই অজপাসাধনা। কিন্তু অজপা সাধনার প্রক্রিয়া এবং ফল বিশেষরূপে না জানিলে কেবলমাত্র উক্ত সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার দ্বারা অজপাসাধনা কি তাহা কিছুই বুঝা যায় না। বচিক, উপাংশু, এবং মানসিক, এই ত্রিবিধ জপ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে।

জপশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকো মানসস্তথা।
বাচিকোপাংশুরুচ্চৈশ্চ দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি

—"জপ দুই প্রকারের বলিয়া কথিত হয়—বাচিক ও মানসিক। বাচিক জপের শব্দের উচ্চতার ভেদানুসারে বচিক জপ দুই প্রকারের, বাচিক এবং উপাংশু।" উক্ত ত্রিবিধ জপের মধ্যে মানসিক জপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

উচ্চৈর্জপাদুপাংশুশ্চ সহস্রগুণ উচ্যতে।
মানসশ্চ তথোপাংশোঃ সহস্রগুণ উচ্যতে ॥

—"বাচিক অপেক্ষা উপাংশু জপ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ, এবং উপাংশু অপেক্ষা মানসিক জপ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ।" এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে কোনটীই জীবাত্মার চিৎ স্বয়ং করে না। চিতের প্রেরণায় এবং জ্ঞানশক্তি ও প্রাণশক্তির সাহায্যে লিঙ্গদেহ ও স্থূলদেহ উক্ত প্রকারের জপ করে। স্থূল বাগযন্ত্রের দ্বারা স্থূল শব্দ উচ্চারণ করতঃ অন্যের শ্রুতিগোচর করিয়া যে নাম জপ, তাহার নাম বাচিক জপ। যে নামজপে স্থূল বাগযন্ত্রের ওষ্ঠজিহ্বাদি অংশগুলি মৃদুভাবে সঞ্চালিত হয়, কিন্তু শব্দ জপকারীর ভিন্ন অন্যের শ্রুতিগোচর হয় না, তাহাকে উপাংশু

জপ বলে। মনের দ্বারা নামচিন্তাকে মানসিক জপ বলে। এই ত্রিবিধ জপেই হস্তের দ্বারা জপমালা ব্যবহারেরও বিধি আছে। অজপা সাধনা উক্ত ত্রিবিধ জপের মধ্যে কোনটীই নহে। অজপাসাধন দৈহিক জপ নহে; ইহা আত্মিক জপ; জীবাত্মার চিৎ স্বয়ং এই জপ করে; ইহা শাস্ত্রের উক্তি।

মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ।
তামেব পরমব্যোম্নি পরমানন্দবৃংহিতে॥ গৌতমীয় তন্ত্র

—"মন্ত্রাক্ষরসমূহকে জীবাত্মার চিচ্ছক্তিতে, এবং সেই চিচ্ছক্তিকে পরমানন্দময় পরব্যোমে প্রথিত বলিয়া জানিবে।" পরব্যোমে বিদ্যমান সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিযুক্ত চিদানন্দের অংশ জীবাত্মা, এবং তাঁহার সহিত পরিণয় ও বিজ্ঞান লাভ জীবাত্মার স্বভাব এইজন্য শাস্ত্র বলিলেন যে জীবাত্মার চিচ্ছক্তি পরব্যোমে প্রথিত এবং সেই চিচ্ছক্তি মন্ত্রকে ধারণ ও স্মরণ করে। এইজন্য, অজপা সাধন আত্মিক জপ। অজপাসাধনে জীবাত্মার চিৎ স্বয়ং নামজপ করে। চিৎ সদ্‌গুরুদত্ত নাম-মন্ত্রটীকে স্বীয় জ্ঞানশক্তিতে ধারণ করিয়া রাখে এবং স্মৃতিশক্তির দ্বারা স্মরণ করিতে থাকে। চিৎ তাহার এই নামস্মরণক্রিয়াকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দের সহিত মিলাইয়া লয়। শ্বাসের সহিত নামের প্রথমার্দ্ধ এবং প্রশ্বাসের সহিত নামের শেষার্দ্ধ স্মরণ করিলে ছন্দের মিল হয়। এইরূপ মিল করিতে না পারিলে একটী নিঃশ্বাসের সহিত নামের প্রথমার্দ্ধ এবং পরবর্ত্তী নিঃশ্বাসের সহিত নামের শেষার্দ্ধ স্মরণ করিতে হয় (১ নিঃশ্বাস = ১ শ্বাস + ১ প্রশ্বাস)। নাম-মন্ত্রটী যদি দীর্ঘ হয় এবং তাহাকে স্মরণ করিবার ছন্দকে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত মিল করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে দুইটী নিঃশ্বাসের সহিত মিল করিয়া লইতে হয়। ছন্দের মিল করিবার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনটীকে অন্যটী অপেক্ষা হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা বিধেয় নহে। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস সমানভাবে সহজগতিতে চলিতে থাকিবে এবং তাহাদেরই ছন্দের সহিত স্মরণের ছন্দটী মিলাইয়া লইতে হইবে। চিৎ যখন এইরূপে শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ছন্দ মিলাইয়া নাম স্মরণ করিতে থাকে, তখন তাহার প্রাণশক্তিকে নিয়োজিত করিয়া নাসিকার মধ্য দিয়া গমনাগমনকারী শ্বাসের অপানবায়ু এবং প্রশ্বাসের প্রাণবায়ুর দ্বারা নামটীর শব্দতন্মাত্রা, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দ, উৎপন্ন করে। প্রাণশক্তির দ্বারা নামের এই শব্দতান্মাত্রিক উচ্চারণের ছন্দটীও, চিতের স্মরণের ছন্দের ন্যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দের সহিত মিল করা হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দই চিতের স্মরণের এবং প্রাণশক্তির শব্দতান্মাত্রিক উচ্চারণের ছন্দ বলিয়া ঐ স্মরণ ও উচ্চারণ সমসূত্রে গ্রথিত সমকালীন একই নামজপ। এইরূপ জপের সময় জপমালা ব্যবহার এবং স্থূলশব্দের দ্বারা নামোচ্চারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই জপের সময় স্থূল বাগ্‌যন্ত্রের জিহ্বা ওষ্ঠ কণ্ঠ তালু প্রভৃতি কোন অংশই বিন্দুমাত্র নড়িবে না। স্থূল শব্দের দ্বারা নামোচ্চারণ জপের সময় অথবা অন্য কোন সময়েই না থাকায় অজপাসাধক স্বীয় কর্ণেও নাম কখনই শুনিতে পান না। অজপাজপের সময় চিতের প্রাণশক্তি প্রাণাপান বায়ুর দ্বারা নামের যে শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনি উচ্চারণ করে, লিঙ্গদেহের বুদ্ধি ও মন লিঙ্গকর্ণের দ্বারা সেই শব্দতান্মাত্রিক নাম শুনিতে পারে। চিৎ নামজপ করিবার সময় বুদ্ধি ও মনকে নামের সেই শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনি শুনিতে বাধ্য করে। চিতের চেতনা, জ্ঞানশক্তি এবং প্রাণশক্তি প্রাপ্ত হইয়াই বুদ্ধি ও মন সচেতন এবং সপ্রাণ হয়, কিন্তু অবিদ্যাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কামনার বশে তাহারা বিষয়ানুধাবন করে। চিৎ গুরুশক্তির দ্বারা পুষ্ট স্বীয় জ্ঞানশক্তির দ্বারা জন্মমৃত্যুর দুঃখময়ত্ব, সংসারের অসারত্ব, কৃষ্ণতত্ব, আত্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভের পরমানন্দ প্রভৃতি অধ্যাত্ম জ্ঞান বুদ্ধিতে সঞ্চারিত করিয়া বুদ্ধির অজ্ঞানতা দূর করিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিকে নামশ্রবণে প্ররোচিত করে। তখন বুদ্ধি মনকে নিয়োজিত করিয়া লিঙ্গকর্ণের দ্বারা নামের শব্দ-তান্মাত্রিক ধ্বনি শুনিতে থাকে। কিন্তু অবিদ্যাশক্তির দ্বারা পরিচালিত বুদ্ধির অজ্ঞানতা একবারের চেষ্টাতেই দূরীভূত হয় না। এইজন্য সাধনের প্রথমা-বস্থায় বুদ্ধি স্থির হইয়া নামশ্রবণে নিযুক্ত থাকে না, কিছুক্ষণ নামশ্রবণ করে, আবার একটু পরই বিষয়ানুধাবন করে। মনোযোগের দ্বারাই বুদ্ধি নাম শ্রবণ করে; মনকে না পাইলে বুদ্ধি নাম শ্রবণ করিতে পারে না। সঙ্কল্প-বিকল্পময় অতি চঞ্চল মন সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সংযোগ চাহে এবং বিষয়-তন্মাত্রা উপহার দিয়া বুদ্ধিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে থাকে। বুদ্ধি নামশ্রবণে মনোযোগ না দিলেও চিতের নামজপ চলিতে থাকে। নামজপের সময় অন্য চিন্তা চলিতেছে অথচ নামজপও হইতেছে, এই অভিজ্ঞতা সকল সাধকেরই আছে। বুঝিতে হইবে যে তখন চিতের নামজপ চলিতেছে কিন্তু বুদ্ধি বিষয়চিন্তা করিতেছে। বুদ্ধি যখনই মনোযোগ দেয়, তখনই নামের শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনি শ্রবণ করে। সাধনার প্রথমাবস্থায় এইরূপ হইতে থাকে। চিৎ প্রাণ-

শক্তির দ্বারাও বুদ্ধি এবং মনকে নাম শ্রবণ করিতে বাধ্য করে। প্রাণশক্তি শ্বাসে প্রশ্বাসে নামের যে শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনি উৎপন্ন করে, নামের সেই ধ্বনিকে প্রাণশক্তিই প্রাণ ও অপান বায়ুতে ধারণ করিয়া অপানবায়ু হইতে সমানবায়ুতে, সমানবায়ু হইতে ব্যানবায়ুতে, এবং ব্যানবায়ু হইতে উদানবায়ুতে সঞ্চারিত করিতে থাকে। উদানবায়ুর সঞ্চারণ হয় সুষুম্নানাড়ীর মধ্য দিয়া; সুষুম্না মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। সুষুম্নায় সঞ্চরণশীল উদানবায়ুতে যখন নামের শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনি হইতে থাকে, তখন সেই অবস্থার জপকে সুষুম্নার জপ বলা হয়। উদানবায়ু মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত সুষুম্নায় সঞ্চরণ করে বলিয়া সুষুম্নার জপকে মেরুদণ্ডের শ্বাসের জপ বলা হয়। যখন সুষুম্নাজপ অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে তখন চিৎ বুদ্ধি ও মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করে।

সৌষুম্না ধ্বন্যুচ্চারিতা প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে। গৌতমীয় তন্ত্র

—"যে সকল যোগীর সুষুম্নাতে নামের ধ্বনি উচ্চারিত হইতে থাকে, তাঁহারা (বুদ্ধি ও মনের উপর) প্রভুত্ব লাভ করেন।" শ্রীবিজয়কৃষ্ণ এই তত্ত্বটী নিম্নলিখিত উক্তির দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন: "নাসিকার শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতে করিতে মেরুদণ্ড দিয়া যে শ্বাস বহে তাহার সঙ্গে জপ করিলে আশা পূর্ণ হয়।" সুষুম্নায় উদানবায়ুর সঞ্চরণই মেরুদণ্ডের শ্বাস; চিতের প্রাণশক্তি যখন নামের শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনিকে সুষুম্নায় সঞ্চরণশীল উদানবায়ুতে সঞ্চারিত করিতে থাকে তখন তাহাকে মেরুদণ্ডের শ্বাসের জপ বলা হইয়াছে। উদান-বায়ুতে নাম সঞ্চারিত হইতে থাকিলে কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ যত অধিকক্ষণব্যাপী ও নিরবচ্ছিন্ন হইবে, নামের শব্দ-তান্মাত্রিক ধ্বনিও তত অধিক পরিমাণে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান এবং উদান বায়ুতে সঞ্চারিত এবং মিশ্রিত হইতে থাকিবে। এইরূপে পঞ্চ প্রাণবায়ু নামময় হইয়া যায়। প্রাণশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত পঞ্চ প্রাণবায়ু স্ব স্ব নাড়ীতে থাকিয়া সমগ্র স্থূলদেহটীতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। পঞ্চ প্রাণবায়ু নামময় হইলে সমগ্র শরীরের মধ্যে নামের শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনি হইতে থাকে। ইহাই অন্তরঙ্গ মহাসঙ্কীর্ত্তন। চিতের দ্বারা নিয়োজিত প্রাণশক্তি বুদ্ধিকে ঘিরিয়া সমগ্র দেহব্যাপী এই শব্দতান্মাত্রিক মহাসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকে। নামজপযুক্ত প্রাণায়ামের ক্রিয়াটীও চিতের প্রাণশক্তির দ্বারা সাধিত হয়। দীক্ষাদানকালে সদ্গুরু মূলাধারে সুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া দেন।

জাগ্রত কুণ্ডলিণী নামজপযুক্ত প্রাণায়াম এবং নামজপযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নামধ্বনিযুক্ত উদানবায়ু অবলম্বনে এক-একটী চক্র ভেদ করিয়া সুষুম্নাপথে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। ইহার ফলে ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ এবং বিষয়গ্রহণে অক্ষম হইয়া পড়ে। এইরূপে সুষুম্নাজপযুক্ত যোগী বুদ্ধি-মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। নিয়মপালনরূপ তপস্যার দ্বারা অবরুদ্ধ থাকার জন্য ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের সহিত অবৈধ সংযোগও লাভ করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়গ্রহণে নিয়োজিত করিতে সক্ষম না হইয়া মন সঙ্কল্পবিকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং বুদ্ধিকেও বিষয়তন্মাত্রা উপহার দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিতে পারে না। বাহ্য বিষয় না পাইয়া মন স্থির ও অন্তর্নিবিষ্ট হয়, এবং তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া অন্তরঙ্গ মহাসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে হয়। তখন বুদ্ধি নামশ্রবণে মনোযোগ প্রাপ্ত হয় এবং নামের শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনি শুনিতে থাকে। শক্তিশালী নামের ধ্বনি শুনিতে শুনিতে সেই ধ্বনির দ্বারা ধৃত "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" বুদ্ধিও বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিশ্চল ও স্থির হয়। নিয়মপালনের জন্য এবং সমগ্র দেহটী নামময় হওয়ার জন্য রজস্তমোগুণদ্বয় ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হয় এবং সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ ও প্রবল হয়। অবিদ্যাশক্তি বুদ্ধির রজস্তমোগুণেই কামক্রোধমোহ প্রভৃতি রিপু উৎপন্ন করে। সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ এবং প্রবল হইয়া বুদ্ধি সাত্ত্বিক হয় বলিয়া তখন আর রিপুসমূহ উৎপন্ন হয় না। এইরূপে বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়গণ চিতের দ্বারা বশীভূত হইয়া যোগসাধনায় তাহার সহযোগী হয়। ইহার পরে এইরূপ "স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ঃ" যোগীর জীবাত্মা কুণ্ডলিণীকে অবলম্বন করিয়া সহস্রারে গিয়া সমাধি লাভ করে। ইহাই অজপাসাধনার প্রক্রিয়া। অধ্যাত্মযোগসাধনারূপ আধ্যাত্মিক সংগ্রামে সদ্‌গুরুর সারথ্যে এবং শক্তিতে চিৎ নিয়মপালনরূপ তপস্যার দ্বারা বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়গণকে অবরুদ্ধ রাখিয়া নামসাধনারূপ ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগকে অবিদ্যা-শক্তির প্রভাবমুক্ত, পরাজিত, বশীভূত, এবং সাধনায় সহযোগী করে। অজপাসাধনার এই প্রক্রিয়াটী আত্মিক যোগসাধনা; ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার; শব্দোচ্চারণ মালাজপ প্রভৃতি কোনরূপ বাহ্যিক জপলক্ষণ ইহাতে নাই; এইজন্য ইহাকে অজপাজপ বা অজপাসাধনা বলা হয়। এই অজপাসাধনা অন্য সর্ব্ববিধ জপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনপ্রণালী।

১৪।৩।৩ শাস্ত্রে অজপাসাধনার উপদেশ : ইহা উত্তম রহস্য

অজপাসাধনা সনাতন সাধনপন্থা। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "পূর্ব্বে আমি এই যোগসাধনা সূর্য্যকে দিয়াছিলাম ; সূর্য্য মনুকে দিয়াছিলেন ; মনু ইক্ষ্বাকুকে দিয়াছিলেন ; পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগসাধনা কালক্রমে নষ্ট হওয়ায় অদ্য আমি তোমাকে ইহা দিতেছি ; এই যোগসাধনা উত্তম রহস্য।" ইহা বেদগুহ্য যোগসাধনা ; এইজন্য ভগবান বলিলেন যে ইহা উত্তম রহস্য ; ইহা ঋষিমুনিদের পরম আদরের বস্তু। পূর্ব্বে গৃহীদের মধ্যে এই সাধনার অধিক প্রচলন ছিল না। গুরু নানক গৃহী শিষ্য-গণকে অজপাসাধনায় দীক্ষা দিতেন। তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিখধর্ম্মে অজপাসাধনাই নামসাধনার প্রণালী। "জপজী", "সুখমণি" প্রভৃতি শিখধর্ম্ম-গ্রন্থে শ্বাসে প্রশ্বাসে অজপাসাধনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কবীরও অজপা-সাধনা করিতেন এবং এই সাধনার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মাত্র চারি ব্যক্তিকে এই অন্তরঙ্গ নামসাধনায় দীক্ষা দিয়াছিলেন। সদ্গুরু-অবতার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ এই উত্তম রহস্যটী বহু গৃহীগণকেও দান করিয়াছিলেন। আজিও গৃহী বা সন্ন্যাসী যে কেহ এই সাধন প্রাপ্ত ব্যক্তির সংস্রবে আসিয়া ইহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছেন, তাঁহারাও শ্রীবিজয়কৃষ্ণের নিকট হইতে গুরু-শক্তি এবং দীক্ষাদান করিবার আদেশ প্রাপ্ত সদ্গুরুর নিকট হইতে এই সাধনা পাইতেছেন। শাস্ত্রে অজপাসাধনার যে উপদেশ আছে তাহা সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত মাত্র। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা, শক্তিসমন্বিত নাম, এবং গুরুশক্তি প্রাপ্ত না হইয়া কেহ শাস্ত্রে বা পুস্তকে পাঠ করিয়া এই প্রক্রিয়া করিলে ফললাভ হয় না, পরন্তু তিনি কঠিন ব্যধিগ্রস্থ হইয়া পড়েন। এইজন্য শাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয় নাই, কেবল সঙ্কেতটী দেওয়া হইয়াছে। সদ্গুরুর নিকট হইতে শিষ্য এই প্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন ; এইরূপে গুরুশিষ্য পরম্পরায় এই সাধনা প্রচলিত এবং প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বেদান্তে অজপাসাধনার সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ এই :—"প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিক-য়োচ্ছ্বসীত।" শ্বেতাশ্বতর ২।৯। ইহার তাৎপর্য্য :—এই যোগমার্গের সাধক নিয়মপালনের দ্বারা সংযুক্তচেষ্ট হইবেন। ইহার ফলে ইন্দ্রিয়গণ ক্ষীণ হইবে। তিনি প্রাণাপান বায়ুকে প্রপীড়িত করিয়া, অর্থাৎ শব্দতান্মাত্রিক জপে নিয়োজিত

করিয়া, নাসিকার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করিবেন।" গীতাও এইরূপ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করিয়াছেন।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ গীতা ৫।২৭-২৮

ইহার তাৎপর্য্য ঃ—যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্যবিষয় ত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ ত্যাগ করিয়া, চক্ষুর দৃষ্টিকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া, নাসিকার অভ্যন্তরে গমনাগমনকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান করিয়া তদ্দ্বারা নামজপ করেন, তিনি সর্ব্বদা মুক্ত।" নামের শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনি শুনিতে শুনিতে সেই ধ্বনির দ্বারা বিশেষরূপে ধৃত হইয়া বুদ্ধি নিশ্চল হয়, ইহাও গীতা ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ গীতা ২।৫৩

—"শ্রুতির দ্বারা অর্থাৎ নামের শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনি শুনিতে শুনিতে সেই ধ্বনিশ্রবণের দ্বারা বিশেষরূপে ধৃত হইয়া তোমার বুদ্ধি যখন নিশ্চল অর্থাৎ বিষয়ানুধাবন হইতে বিরত হইবে, তখন বুদ্ধি সমাধিতে স্থির হইবে এবং তুমি যোগ অর্থাৎ পরিণয় এবং বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।" ইতিপূর্ব্বে গৌতমীয় তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত বাক্যেও আমরা অজপাসাধনার সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়াছি। এই অজপাসাধনা উত্তম রহস্য এবং ইহার ফলে লব্ধ পরিণয় এবং বিজ্ঞানও উত্তম রহস্য। একমাত্র সদ্গুরুই এই উত্তম রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন এবং করেন।

১৪।৩।৪ অজপাসাধনার অভ্যাস

গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের শেষাংশে অজপাসাধনার নির্দ্দেশ দিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই সাধনার অভ্যাস কিরূপে করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তির পর হইতেই, নিয়মপালন এবং প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে অজপাসাধন করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায় লইয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত যোগাভ্যাস করিতে হইবে। যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক সাধকের ইহাই কর্ম্ম। "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।" গীতা ৬।৩। প্রতিদিন

শুচিশুদ্ধ হইয়া একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে, একই শুদ্ধ স্থানে, একই শুদ্ধ কম্বলাসনে বা কুশাসনে বসিয়া নির্জ্জনে অজপাসাধন করিতে হয়। অসনটীর উপর অন্য কাহাকেও বসিতে দিতে নাই। স্থির সুখাসনে বসিয়া অজপাসাধন করিতে হয়; পদ্মাসন অথবা সিদ্ধাসনও অভ্যাস করা যাইতে পারে। উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা অণামিকার মধ্য পর্ব্ব স্পর্শ করিয়া থাকিতে হয়। এইরূপ মুদ্রাকে কর-ধরা বলা হয়। কর-ধরা অবস্থায় দুই হস্তকে দুই জঙ্ঘার উপর স্থাপন করিয়া রাখিতে হয়। মেরুদণ্ড, গ্রীবা, এবং মস্তক সোজা রাখিতে হইবে। ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে দুই চক্ষুর দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে দর্শন করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত অথবা মুদ্রিত করিয়া অন্তর্দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। ইহাকে যোগশাস্ত্রে শাম্ভবী মুদ্রা বলে। শম্ভু (মহাদেব) এই মুদ্রায় ধ্যান করেন বলিয়া ইহার নাম শাম্ভবী মুদ্রা। এইরূপে আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে কিছুক্ষণ ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম করিতে হয়। যতক্ষণ প্রাণায়াম করা যায়, তাহার মধ্যে প্রাণায়াম হইতে বিরত না হইয়া একাদিক্রমে প্রাণায়াম করিতে হয় এবং প্রতি প্রাণায়ামের রেচকে ও পূরকে নামজপ এবং কুম্ভকে নামস্মরণ করিতে হয়। প্রাণায়াম মনের স্থিরতা সম্পাদনের সহায়ক। প্রাণায়ামের পর স্থির হইয়া শাম্ভবী মুদ্রায় স্থিত হইয়া প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ করিতে হয়। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ এক ঘণ্টা করিয়া আসনে বসিয়া উক্তরূপে যোগাভ্যাস করা কর্ত্তব্য; রাত্রি ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সময় সাধনার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ এক ঘণ্টা আসনে বসিয়া যোগাভ্যাস করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামও আনন্দময়। জীবাত্মার চিৎ যখন উক্তরূপে নামজপ করে, তখন জীবাত্মার আনন্দ নামানন্দ সম্ভোগ করে এবং সেই নামানন্দকে সমগ্র দেহে সঞ্চারিত করে। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অবিদ্যার প্রভাবে স্বীয় স্বভাববশতঃ বাহ্য বিষয় লইয়াই ব্যবসায় করে এবং বিষয়সুখকে শ্রেষ্ঠসুখ ভাবে বলিয়া সাধনার প্রথমাবস্থায় বুদ্ধি জীবাত্মার আনন্দ কর্ত্তৃক সঞ্চারিত নামানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এবং বিষয়সুখের জন্য বিষয়ানুধাবনই করিতে থাকে। বুদ্ধি যতদিন এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা থাকে, ততদিন সাধক সমাধি লাভ করিতে পারেন না। "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে।" গীতা

২।৪৪। কিন্তু অজপাসাধনার প্রক্রিয়ার ফলে বাধ্য হইয়া বুদ্ধি যতই নাম শ্রবণ করিতে থাকে, ততই সে বিষয়সুখ অপেক্ষা নামানন্দকে উৎকৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি করে এবং অধিক পরিমাণে নামানন্দ পাইবার জন্য বিষয়ানুধাবন ছাড়িয়া নাম শ্রবণকে ব্যবসায় করে ; তখন তাহার সেই ব্যবসায় যথার্থ ব্যবসায় এবং তখন সে সম্যগ্‌ব্যবসিত হয়।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীতা ৯।৩০

অনন্যচিন্ত হইয়া কৃষ্ণের নামজপই কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভজনা ; বুদ্ধি নামজপে যোগদান করিলেই সাধু ও সাম্যগ্‌ব্যবসিত হয়। নামের শব্দতান্মাত্রিক ধ্বনির এবং নামানন্দের দ্বারা ধৃত সম্যগ্‌ব্যবসিতা বুদ্ধিকে গীতা ধৃতিগৃহীতা বুদ্ধি বলিয়াছেন, এবং ধৃতিগৃহীতা বুদ্ধির দ্বারা মনকে বিষয় হইতে উপরত করিয়া জীবাত্মার সাধনার সহযোগী করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ গীতা ৬।২৫

—"সাধক ধৃতিগৃহীতা বুদ্ধির দ্বারা ক্রমশঃ বিষয় হইতে উপরত হইয়া মনকে জীবাত্মার সাধনায় যুক্ত করিবেন এবং অন্য বিষয় চিন্তা করিবেন না।" কিন্তু অবিদ্যাশক্তির দ্বারা পরিচালিত সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন অতি চঞ্চল এবং অস্থির। মন সর্ব্বদাই বিষয়সংযোগ চাহে এবং বিষয়তন্মাত্রা বুদ্ধিকে অর্পণ করিতে থাকে। এইজন্য, বুদ্ধি সম্যগ্‌ব্যবসিত এবং ধৃতিগৃহীত হইলেও সকল সময়ে মনোযোগ পায় না। মনের এই উপদ্রব নিবারণের জন্য গীতা উপদেশ দিয়াছেন :

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ গীতা ৩।২৬

—"চঞ্চল এবং অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, তত্তৎ বিষয় হইতে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া আনিয়া আত্মার বশীভূত করিবে।" এইরূপে মনকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া চিতের সাধনায় যুক্ত করিবার ক্রিয়াকে প্রত্যাহার বলা হয়। সাধক সম্যগ্‌ব্যবসিত এবং ধৃতিগৃহীত বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যাহার ক্রিয়া করিবেন। যখন যোগাভ্যাসের ফলে প্রত্যাহারটী অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন বুদ্ধি মনোযোগের দ্বারা একাগ্রভাবে নামশ্রবণ করিতে থাকে এবং বুদ্ধির

অহঙ্কারও বুদ্ধিতে নিবদ্ধ থাকে। বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মন, এই তিনটী সমবেত ভাবে চিত্ত। উক্তরূপে অবস্থিত চিত্তের সকল বাহ্যবৃত্তির নিরোধ হয়, এইজন্য এইরূপ অবস্থাকে চিত্তনিরোধের অবস্থাও বলা হয়। নিরুদ্ধ চিত্তের উক্তরূপে নামধ্বনিশ্রবণে একাগ্রতাকে গীতা ৮।১২ শ্লোকে যোগধারণা বলিয়াছেন এবং পাতঞ্জলযোগসূত্রে ইহাকে ধারণা বলা হইয়াছে। "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।" পাতঞ্জল।—"একটী নির্দ্দিষ্ট ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের নিবদ্ধ অবস্থার নাম ধারণা।" ধারণা অভ্যস্ত হইলে চিতের নামস্মরণ গাঢ় হইয়া ধ্যানে পরিণত হয়। "তত্র-প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" পাতঞ্জল।—"ধারণার অবস্থায় চিত্ত যখন জীবাত্মার চিতের সহিত একপ্রত্যয় অর্থাৎ একই ধ্যেয় বস্তুতে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র হয়, তখন তাহার নাম ধ্যান।" ধ্যান গাঢ় হইলে জীবাত্মার আত্মদর্শন হয়। ইহার পরে সাধক তন্ময়তা লাভ করেন। সাধক যখন তন্ময়তার অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন তখন তিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ গীতা ৬।৪

—"চিত্তনিরোধের ফলে সাধক যখন সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়েন এবং তাঁহার মন সর্ব্বপ্রকারের সঙ্কল্পবিকল্প ত্যাগ করে, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা হয়।" তন্ময়তাপ্রাপ্তিই যোগারূঢ় সাধকের পরম প্রাপ্তি নহে। ইহার পর তাঁহাকে সমাধিলাভের জন্য যোগসাধনা করিতে হইবে। "যোগারূঢ়স্য তস্যৈব সমঃ কারণমুচ্যতে॥" গীতা ৬।৩।—"সম অর্থাৎ সমাধি যোগারূঢ় সাধকের যোগাভ্যাসের কারণ, অর্থাৎ, যোগারূঢ় সাধককে সমাধিলাভের জন্য যোগসাধনা করিতে হইবে।" ইহার ফলে জীবাত্মা সহস্রারে াগয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া সমাধিলাভ করে। "সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" —"ঈশ্বরদর্শন হইলে সমাধিলাভ হয়।" সমাধিলাভ হইলে সিদ্ধি সাধকের করতলগত হয়। এই সিদ্ধির পথ অতীব দুর্গম। মহামায়া কখনও সাধককে দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা অপমান প্রভৃতির মধ্য দিয়া লইয়া যান। তৎসত্ত্বেও, মান-অপমান, নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করিয়া সাধককে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। মহামায়া কখনও বা সুন্দরী নারী, অর্থ, যশ, মান, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা সাধককে প্রলুব্ধ করেন। সাধককে অনপেক্ষ অর্থাৎ প্রলোভনের বিষয়বস্তুর প্রতি নিস্পৃহ, শুচি অর্থাৎ শুদ্ধমনা, এবং উদাসীন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য

বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়া ঐ সকল প্রলোভনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। আবার ইন্দ্রদেবও, পাছে সাধক তাঁহার ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লয়েন এই ভয়ে, সাধকের সিদ্ধিলাভে বিঘ্ন করিবার জন্য সাধকের উপর নানারূপ উপদ্রব করেন ; (ভাগবত ১১।৪।৭)। বিন্দুমাত্র ক্রোধ না করিয়া, সকল প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, এবং সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হইবে। সাধককে সাবধান করিবার জন্য শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন ঃ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" কঠ ১।৩।১৪।— "জ্ঞানীগণ বলেন, শাণিত ক্ষুরের অগ্রভাগের ন্যায় এই সাধনার পথ অতীব দুর্গম।" গুরুতে অটল বিশ্বাস, অচলা নিষ্ঠা, এবং ঐকান্তিকী ভক্তি রাখিয়া সুদৃঢ় সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায়ের সহিত সাধক যোগসাধনা করিয়া যাইতে থাকিলে গুরুর সাহায্যে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। "গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণ প্রশান্তয়ে।" ভাগবত ১০।৮০।৪৩।—"গুরুর কৃপায় পুরুষ পূর্ণতা এবং প্রকৃষ্ট শান্তি লাভ করে।"

১৪।৩।৫ অজপাসাধনায় ধ্যেয় বস্তু

অজপাসাধনায় যে ধ্যানের বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণ সেই ধ্যানযোগের ধ্যেয় বস্তু, ইহা সকল শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তম্।" গোপালতাপনী পূঃ বিঃ ৫৪।—"কৃষ্ণ পরমেশ্বর। তাঁহাকে ধ্যান করিবে।" "তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।" শ্বেত ১।১০।—"পরমেশ্বরের পুনঃ পুনঃ একাগ্র ধ্যানের ফলে তাঁহার সহিত যোজন অর্থাৎ মিলন লাভ হয় ; মিলন হইলে তত্ত্বভাব অর্থাৎ পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ হয় ; এইরূপ হইলে মৃত্যুযুক্ত মায়াময় সংসারে পুনর্জন্ম হয় না।" ভগবান গীতার ১২।৬-৭ শ্লোকদ্বয়ে বলিয়াছেন ঃ —"যাহারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, অনন্যযোগে আমার ধ্যান করিয়া আমার ভজনা করে (মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে), আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সকল যোগীকে আমি অচিরে মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে উদ্ধার করি।" আমারা পাইলাম যে কৃষ্ণই ধ্যেয়। এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে ঃ— কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব্বে সাধক কিরূপে কৃষ্ণের ধ্যান করিবে ? তবে কি কৃষ্ণের প্রতিমা বা চিত্রপট দেখিয়া সেই দৃষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান করিতে হইবে ?

উত্তর ঃ—এই যোগসাধনায় প্রতিমার বা চিত্রপটের ধ্যান নিষিদ্ধ। প্রতীক্-জ্ঞানে প্রতিমায় পূজা করা যাইতে পারে; এইরূপ পূজা করিবার বিধানও শাস্ত্রে আছে। কিন্তু ধ্যান করিতে হইবে সত্যবস্তুর, কল্পিত প্রতীকের নহে। "সত্যং পরং ধীমহি।" ভাগবত ১।১।১।—"পরম সত্যকে ধ্যান করিব।" পরমসত্য পরমেশ্বর কৃষ্ণের ধ্যান কল্পনার দ্বারা হইতে পারে না। কোন প্রতিমা বা চিত্রপট কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের সত্য প্রতিরূপ হইতে পারে না। কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ না করিয়া, কেবল শাস্ত্রের বর্ণনা পড়িয়া বা শুনিয়া অতি সুদক্ষ ভাস্কর বা চিত্রকরও কৃষ্ণের যথার্থ প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তাহাকে কল্পনার আশ্রয় লইতেই হয়। প্রতিমার বা চিত্রপটের ধ্যানের দ্বারা কল্পনার ধ্যান করা হয়। সাধক যদি নিজেই শাস্ত্রে কৃষ্ণের রূপবর্ণনা পাঠ করিয়া সেই বর্ণনানুযায়ী কৃষ্ণমূর্ত্তি ভাবনার দ্বারা গঠন করেন, তবুও তাঁহাকে বহুলাংশে কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু নাম, নামী, এবং নামদাতা সদ্‌গুরু অভিন্ন। এইজন্য, সাধক যতদিন কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ না করেন, ততদিন নামের সহিত গুরুমূর্ত্তির ধ্যান করিবেন। এরূপ ধ্যানও কৃষ্ণেরই ধ্যান। কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন পাইলে কৃষ্ণই ধ্যেয়। তখন কৃষ্ণের সহিত নামের এবং গুরুর অভিন্নতা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

১৪।৩।৬ অজপাসাধনার সমাধি

গভীরতম ধ্যানের ফলে তন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবাত্মার চিতের জ্ঞানশক্তিই স্মৃতিশক্তি, মননশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, বাক্‌শক্তি, আস্বাদনশক্তি, স্পর্শশক্তি রূপে বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়ে কার্য্য করে। তন্ময়তার অবস্থায় জ্ঞানশক্তির ঐ সকল কার্য্যকারী রূপগুলি জ্ঞানশক্তিতে বিলীন হইয়া থাকে এবং জ্ঞানশক্তি চিতে বিলীন হইয়া থাকে। তখন দৈহিক আমিত্ব থাকে না। চিতের সমগ্র চেতনায় একমাত্র কৃষ্ণ প্রতিভাত থাকেন এবং চেতনা কৃষ্ণময় হইয়া যায়। এইরূপ তন্ময়তাপ্রাপ্তির অবস্থায় জীবাত্মা যখন সহস্রারে গিয়া উপনীত হয়, তখন জীবাত্মার চিৎ কৃষ্ণের চিতে এবং আনন্দ কৃষ্ণের আনন্দে বিলীন হইয়া যায়। এই স্বতন্ত্রসত্তারহিত একীভূত মিলনের নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি। এই সমাধিতে জীবাত্মা আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে না এবং বিজ্ঞানও লাভ করিতে পারে না, কারণ তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় স্বতন্ত্র থাকে না।

এইজন্য নির্ব্বিকল্প সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলা হয়। ইহা অজপাসাধনার পরমপ্রাপ্তি নহে। অজপার সাধক নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। তাঁহার জীবাত্মার অহম্ কৃষ্ণের সহিত আনন্দের আদানপ্রদানের দ্বারা পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে চাহে। তাহার এই আকাঙ্ক্ষার ফলে জীবাত্মার চিতের সহিত বিলীন জ্ঞানশক্তি, এবং স্মৃতিশক্তি বিচারশক্তি মনন-শক্তি দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি স্পর্শশক্তি ঘ্রাণশক্তি আস্বাদনশক্তি বাক্‌শক্তি প্রভৃতি জ্ঞানশক্তির যে কার্য্যকারী রূপগুলি বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে উপসংহৃত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় জ্ঞানশক্তিতে বিলীন হইয়াছিল, সেই শক্তিসমূহ চিতের মধ্যে জাগরিত হয়, কিন্তু বহির্ম্মুখী হয় না। আত্মিক আমিত্বের পরিণয় ও বিজ্ঞান লাভের ব্যাকুলতার ফলে পূর্ব্বে যাহা নির্ব্বিকল্প সমাধি ছিল, তাহা তখন সবিকল্প সমাধিতে পরিণত হয়। সবিকল্প সমাধিতে জীবাত্মা স্বীয় স্বতন্ত্র সত্ত্বায় বিদ্যমান থাকিয়া স্বীয় দৃষ্টিশক্তির দ্বারা কৃষ্ণকে দর্শন করে, বাক্‌শক্তির দ্বারা কৃষ্ণের সহিত বাক্যালাপ করে, শ্রবণশক্তির দ্বারা কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করে, স্পর্শশক্তির দ্বারা কৃষ্ণকে স্পর্শ করে, ঘ্রাণশক্তির দ্বারা কৃষ্ণের অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণ করে। এই অবস্থায় জীবাত্মার অহম্-এর প্রেম দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মধুর ভাবের সহিত বিকশিত হয়। সেই ভাবানুযায়ী কৃষ্ণের সেবা ও আরাধনা করিবার জন্য জীবাত্মা তখন সেই ভবময় তনু পরিগ্রহ করে। দাস্যভাবের সাধকের জীবাত্মা ভাবময় দাস-দেহ ধারণ করে; সখ্যভাবের সাধকের জীবত্মা ভাবময় সখা-দেহ ধারণ করে; বাৎসল্যভাবের সাধকের জীবাত্মা ভাবময় পিতা মাতা অথবা অন্য গুরুজন দেহ ধারণ করে; মধুরভাবের সাধকের জীবাত্মা ভাবময় কান্তাদেহ ধারণ করে। কান্তাদেহই গোপীদেহ। এইরূপ ভাবময় তনুতে জীবাত্মা সবিকল্প সমাধির অবস্থায় স্বীয় সমগ্র শক্তির দ্বারা কৃষ্ণকে দর্শন, স্পর্শন, কৃষ্ণের সহিত আলাপন এবং কৃষ্ণের সেবা ও আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকে নিজ ভাবানুযায়ী আনন্দ দান করিয়া স্বয়ংও তাহা সম্ভোগ করে। ইহাই পরমানন্দসম্ভোগ এবং ইহাই ভূমানন্দসম্ভোগ। এতদ্ব্যতীত সবিকল্প সমাধিতে বিজ্ঞানও লব্ধ হয়; এইজন্য সবিকল্প সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলা হয়। সহস্রারে এই মিলনসম্ভোগ হয়। তখন কুণ্ডলিণীও ষট্‌চক্র ভেদ করিয়াছে। এই অবস্থায় জীবাত্মা ইচ্ছা করিলে, কেবল প্রাণশক্তির কিয়দংশ দেহে রাখিয়া, ভাবময় তনুতে দেহ হইতে উৎক্রামণ করিয়া অপ্রাকৃত গোলোক-বৃন্দাবনে গিয়া

নিত্যলীলা দর্শন এবং নিত্যলীলায় যোগদানও করিতে পারে এবং আবার দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই সমস্তই ভাবাতীত ভাবের ভূমির ব্যাপার। ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে ভেদবুদ্ধি নাই; ভাবময় তনুতে জীবাত্মা ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে যখন কৃষ্ণের সহিত পরিণয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার কৃষ্ণের সহিত অভেদভাব অর্থাৎ অদ্বৈতভাব হয়। সবিকল্প সমাধির মিলন দেহের মধ্যে সহস্রারেই হউক অথবা দেহ হইতে বহির্গত হইবার পরে গোলোক-বৃন্দাবনে হউক, তখন সমগ্র দেহের কোন অংশে চেতনা ও জ্ঞানশক্তি থাকে না, কেবল প্রাণশক্তি দেহের পঞ্চ প্রাণবায়ুকে পরিচালনা করিয়া দেহকে সপ্রাণ ও জীবিত রাখে। ইহাই অজপাসাধনার সমাধি। এই অবস্থায় সাধকের সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি জীবাত্মায় উপসংহৃত হয় বলিয়া সবিকল্প সমাধি যে কেবল যোগাসনে নিমীলিত নয়নে উপবিষ্ট অবস্থাতেই হয়, তাহা নহে। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আহার-বিহার প্রভৃতির সময়েও এইরূপ সমাধি হইতে পারে। তখন উন্মীলিত স্থূলচক্ষু কৃষ্ণকে দর্শন করে না, চক্ষুদ্বার দিয়া জীবাত্মা আপনাতে উপসংহৃত দৃষ্টিশক্তির দ্বারা কৃষ্ণকে দর্শন করে; স্থূলকর্ণ কৃষ্ণের কথা শুনে না, কর্ণদ্বার দিয়া জীবাত্মা আপনাতে উপসংহৃত শ্রবণশক্তির দ্বারা শ্রবণ করে। এইরূপে, আপনাতে উপসংহৃত সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা স্বয়ং জীবাত্মাই কৃষ্ণের সহিত মিলন সম্ভোগ করে। অপরের মনে হইতে পারে যে সাধক বাহ্যাবস্থায় বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শনাদি করিতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। উহাও বাহ্যাবস্থা নহে, সবিকল্প সমাধির অবস্থা; উহা যুক্তযোগীর উন্নততম অবস্থা-লাভের পরিচায়ক।

১৪।৩।৭ প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম জপ অজপাসাধনার মূল সিদ্ধি

প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ অজপাসাধনার মূল সিদ্ধি। ইহারই ফলে তন্ময়তা, সমাধি, পরিণয় এবং বিজ্ঞান লাভ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে ঃ—শরীর-রক্ষার জন্য সাধককে স্নানাহারাদি কর্ম্ম করিতে হয় এবং কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রাও প্রয়োজন। তখন শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ কিরূপ হইতে পারে? কথোপকথন, অধ্যয়ন, এবং সমাধির অবস্থায় শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ কিরূপে হইতে পারে? এই সকল সময়ে যদি নাম জপ না হয়, তাহা হইলে প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম-জপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উত্তর ঃ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চিতের

দ্বারা নামস্মরণ এবং প্রাণশক্তির দ্বারা শ্বাসে প্রশ্বাসে শব্দতান্মাত্রিক নামোচ্চারণ, এই দুইটী সমকালীন প্রক্রিয়া। সকল সময়েই শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত নামজপের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে ক্রমশঃ প্রাণশক্তির শ্বাসে প্রশ্বাসে শব্দতান্মাত্রিক নামোচ্চারণ এমনই অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, চিত্তের নামস্মরণ কোন কারণে বন্ধ থাকিলেও প্রাণশক্তির শব্দতান্মাত্রিক জপ প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসেই আপনা-আপনি চলিতে থাকে। দৃঢ় সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায় থাকিলে কাহারও দুই-তিন বৎসরেই এইরূপ হয়, এবং তাহা না থাকিলে দীর্ঘকালেও এরূপ হয় না। যাহাদের এইরূপ হয়, তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রাণশক্তির শব্দতান্মাত্রিক জপটী এমনই গাঁথিয়া যায় যে তখন আর এজন্য তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে হয় না; বিনা নামে তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসই হয় না; তাহারা যখনই শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে মনোযোগ দেয়, তখনই নামজপ শুনিতে পায়। স্নানাহার, অধ্যয়ন, কথোপকথন প্রভৃতি কর্ম্মসম্পাদনের সময়েও শ্বাসপ্রশ্বাসে নামজপ চলিতে থাকে। তন্ময়তার এবং সমাধির সময়েও উক্ত প্রকারে প্রাণশক্তির ক্রিয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাসে নামজপ চলিতে থাকে। জীবাত্মা চিরবিনিদ্র এবং তাহার প্রাণশক্তিও চির-বিনিদ্র; শ্বাসপ্রশ্বাস নিদ্রাকালেও চলিতে থাকে। সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা সমগ্র দেহ হইতে চেতনা উপসংহৃত করিয়া লয়, কিন্তু চিরজাগ্রত প্রাণশক্তি তখনও দেহের পঞ্চ প্রাণবায়ুর পরিচালনা করিয়া দেহকে জীবিত রাখে। এইজন্য, সুষুপ্তিকালেও শ্বাসপ্রশ্বাসে নামজপ চলিতে থাকে; সুষুপ্তিভঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসে মনোযোগ দিলেই নামজপ শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিলাম যে, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে নামজপ হইতে পারে। যখন প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে নামজপ হয়, তখন সাধকের দেহাভ্যন্তরে যে অন্তরঙ্গ মহাসঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকে, তাহার ধ্বনি ঐক্যতান সঙ্গীতের ন্যায় সুমধুর। ইহাকে সাধকদেহের অনাহত ধ্বনি বলা হয়। যাঁহারা যোগাভ্যাস করেন না, তাঁহারা সাধকদেহের অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাইবেন না। যাঁহারা যোগসাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা একাগ্র হইয়া লিঙ্গকর্ণের দ্বারা ঐরূপ সাধকের দেহাভ্যন্তরের অনাহত ধ্বনি শুনিতে পারেন। নামের এই ধ্বনি ব্যানবায়ুর সহিত সমগ্র দেহের সর্ব্বাংশে সঞ্চারিত হইতে হইতে দেহের অস্থি ও মাংস নামাঙ্কিত হইয়া যায়। এই মূল সিদ্ধির ফলে বুদ্ধি ও মন অবিদ্যার প্রভাবমুক্ত হয়, বুদ্ধি মনোযোগ লাভ করে, চিৎ বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হয়, একাগ্র ধ্যান করিতে সক্ষম হয়, তন্ময়তা লাভ

করে, নির্ব্বিকল্প সামাধি প্রাপ্ত হয়, এবং সবিকল্প সমাধিতে পরিণয় ও বিজ্ঞান লাভ করে। সুতরাং, সবিকল্প সমাধিতে পরিণয়সম্ভোগ এবং বিজ্ঞানলাভ এই মূল সিদ্ধির ফল। নামজপ হইতে এই পরমপ্রাপ্তি হয় :—

নাম্না হি লভ্যতে ভক্তির্ভক্ত্যা প্রেম হি লভ্যতে।
প্রেম্না লভ্যতে গোবিন্দস্ততো নাম্নঃ পরং ন হি ॥ বৃহন্নারদীয় পুরাণ

—"নামজপের দ্বারা ভক্তিলাভ হয় ; ভক্তিযোগের সাধনার ফলে প্রেমলাভ অর্থাৎ প্রেমের বিকাশ হইলে পরমানন্দস্বরূপ গোবিন্দকে নিত্যলীলায় প্রাপ্ত হওয়া যায় ; অতএব, নামজপ হইতে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর কিছুই নাই।"

১৪।৩।৮ অজপাসাধনায় লব্ধ বিজ্ঞান : যোগের সপ্ত ভূমি

সদ্‌গুরুদত্ত নাম পরাবিদ্যা। সদ্‌গুরুর নিকট পরাবিদ্যালাভের পূর্ব্বে মানবকে দুইটী অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়, জড়ত্ব এবং বুক্ষত্ব। জড়ত্বের অবস্থা নিম্নতম ভূমি। ইহা সম্পূর্ণ দেহাভিমানী অবস্থা। জড়দেহের অতিরিক্ত কিছু নাই, এবং জড়দেহের সুখই মানবজীবনের কাম্য বস্তু, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মানব ঈশ্বরের এবং জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, এবং ভাবে যে জগৎ একটা অন্ধ শক্তির দ্বারা পরিচালিত। এই অবস্থায় মানব পারিবারিক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় নীতি গঠন করিয়া পরিবার, সমাজ, এবং স্বদেশ রক্ষার চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকে। তাহার উক্তরূপ নীতিসমুদয় দেহতন্ত্র মাত্র। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে কলহ যুদ্ধ এবং অশান্তি সৃষ্টি করে। জড়ত্বের অবস্থায় মানব আধিভৌতিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই থাকে। বহু জন্ম এই অবস্থায় কাটিয়া যায়। উক্ত অবস্থার মানবেরও কোন-না-কোন জন্মে এমন সময় আসে যখন সে অন্তর্য্যামী পরমাত্মার প্রেরণায় বুঝিতে পারে যে জড়ত্বই অস্তিত্বের বিষয়ে শেষ কথা নহে এবং অন্ধ শক্তি জগতের নিয়ামক নহে। ইহার ফলে মানব প্রথম ভূমিকে অতিক্রম করিয়া বুক্ষত্বের অবস্থায় উন্নীত হয়। ইহা দ্বিতীয় ভূমি। এই অবস্থায় মানব কেবলই স্বার্থসাধনে লিপ্ত থাকে না, জীবের দুঃখ দেখিয়া কষ্ট বোধ করে এবং তাহা দূর করিবার জন্য সেবাকার্য্যেও ব্রতী হয়। বহুজন্ম এইরূপ করিতে করিতে মানব সাধুসঙ্গ এবং শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাধুদর্শন এবং সাধুসঙ্গ অতিশয় সুফলপ্রসূ। শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণও অতি সুফলপ্রসূ। শাস্ত্রপাঠকে স্বাধ্যায়ও বলা হয়। সাধুসঙ্গের এবং শাস্ত্রপাঠ বা

শ্রবণের ফলে দ্বিতীয় ভূমিতে স্থিত মানবের ঈশ্বরের এবং জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস হয়। তখন সে বুঝিতে পারে যে মানব কেবল দেহ নহে, জীবাত্মাই মানবের যথার্থ স্বরূপ, জীবাত্মা অবিনশ্বর এবং ঈশ্বরকে লাভ করিলে জীবাত্মার শাশ্বত কল্যাণ হয়। এইভাবেও অনেক জন্ম গত হইবার পরে মানব ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিতে থাকে। তখন মানব দ্বিতীয় ভূমি অতিক্রম করিয়া জীবত্বে উন্নীত হয়। ইহা তৃতীয় ভূমি। এই ভূমিতে আরূঢ় হইবার পরে আধিদৈবিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। বহু জন্ম ধরিয়া মানব এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিবার এবং ঈশ্বরকে লাভ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আপন শক্তিতে দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারে না। তাহার ব্যাকুলতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সদ্গুরুরূপে তাহাকে দীক্ষা দেন। সদ্গুরুর নিকট নাম পাইবার পরে মানবের আধ্যাত্মিক সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং তখন সে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্বের অবস্থা চতুর্থ ভূমি। এই অবস্থায় যদি সাধক সুদৃঢ় সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায়ের সহিত সাধনা করেন, তাহা হইলে তিনি সেই জন্মেই দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান এবং পরমাত্মসংযোগ প্রাপ্ত হয়েন এবং তৎপরে পরিণয়ও লাভ করেন। যদি সুদৃঢ় সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায়ের অভাব হয়, তবে তাঁহাকে আরও দুই জন্ম এই সাধন করিতে হয়; তৃতীয় জন্মে তাঁহার মুক্তিলাভ হইবেই, ইহা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন। দীক্ষার পর হইতে সাধক নিয়মপালন এবং অজপাসাধন করিয়া অন্নময়কোষ এবং প্রাণময়কোষ ভেদ করিয়া দেবত্বের ভূমিতে আরূঢ় হয়েন। ইহা পঞ্চম ভূমি। দেবত্বের ভূমিতে সাধনা করিতে করিতে সাধক ক্রমে ক্রমে মনোময় কোষ এবং বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ করিয়া আধিদৈবিক দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্বাতীত হয়েন এবং কৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। ইহাই দেবত্বের ভূমিতে ব্রহ্মদর্শন। এখন সাধক আনন্দময় কোষ ভেদ করিয়া মায়াতীত এবং মুক্ত হয়েন এবং ব্রহ্মত্বের ভূমিতে আরূঢ় হয়েন। ইহা ষষ্ঠ ভূমি। এই ভূমিতে আরূঢ় সাধক গীতার ভাষায় "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে", অর্থাৎ ব্রহ্মসদৃশ হয়েন; ইহাই ব্রহ্মভূত অবস্থা। অজপার সাধক ব্রহ্মভূত হইয়াও পরিতৃপ্ত হয়েন না, কারণ তাঁহার লক্ষ্য পঞ্চমপুরুষার্থ; এই অবস্থালাভের পর তাঁহার কৃষ্ণের সহিত পরিণয়লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যাকুলতা তীব্রতম হইয়া উঠে। ইহার ফলে সাধক সপ্তম ভূমিতে আরূঢ়

হয়েন। সপ্তম ভূমি প্রেমবিকাশ এবং পরিণয়সম্ভোগের ভূমি। ইহার পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে। এখন আমরা পাইলাম যে, সাধককে জড়ত্ব, বৃক্ষত্ব, জীবত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, এবং ব্রহ্মত্ব, এই ছয়টি ভূমিকে অতিক্রম করিয়া পরিণয়-সম্ভোগের সপ্তম ভূমিতে আরূঢ় হইতে হয়। এই ভূমিতে সাধক অনন্ত বিজ্ঞানও লাভ করিতে পারেন। কৃষ্ণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্"; তিনি ভূমা; ত্রিকালের সমস্ত বস্তু ও ঘটনা তাঁহাতে আছে; এইজন্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত বিজ্ঞান লাভ করা যায়।

১৪।৩।৯ অজপাসাধনায় লব্ধ যোগৈশ্বর্য্য

শস্ত্রে অনেক প্রকারের যোগৈশ্বর্য্যের উল্লেখ আছে। কয়েকটীর উল্লেখ করা হইতেছে। লঘিমা—নিজ দেহকে বাষ্পের ন্যায় লঘু করিবার শক্তি। অণিমা—নিজ দেহকে অণুপরিমাণ ক্ষুদ্র করিবার শক্তি। মহিমা—নিজ দেহকে বৃহৎ করিবার শক্তি। প্রাপ্তি—যথায় ইচ্ছা তথায় গমন করিবার শক্তি। প্রাকাম্য—ইচ্ছানুযায়ী বস্তু প্রাপ্ত হইবার শক্তি। দূরদর্শন—বহু দূরের বস্তু দেখিবার শক্তি। দূরশ্রবণ—বহু দূরের শব্দ শ্রবণ করিবার শক্তি। বশিতা বা বশিত্ব—যাহাকে বশ করিবার ইচ্ছা তাহাকেই বশ করিবার শক্তি। ঈশিতা বা ঈশিত্ব—যাহাকে আজ্ঞাধীন করিবার ইচ্ছা তাহারই উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তি। কামবসায়িতা—কামনাপূরণ করিবার শক্তি। মনোজব—মনের ন্যায় ত্বরিত গতিতে গমনের শক্তি। কামরূপতা—যে মূর্ত্তি ধরিবার ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিবার শক্তি। পরকায়প্রবেশ—লিঙ্গদেহ সহ জীবাত্মার স্বদেহ হইতে উৎক্রামণ করিয়া অন্য দেহে প্রবেশ করিবার শক্তি। ইচ্ছামৃত্যু—যখনই মরিবার ইচ্ছা তখনই মরিবার শক্তি। এই সকল যোগৈশ্বর্য্যের প্রত্যেকটীকে সিদ্ধি বলা হয়। এই সিদ্ধিলাভ অজপাসাধনার লক্ষ্য নহে। অজপাসাধনার লক্ষ্য পরিণয় ও বিজ্ঞান; তাহার তুলনায় এই সকল সিদ্ধি অতিশয় নগণ্য বস্তু। অজপাসাধক এই সকল সিদ্ধি চাহেন না; কিন্তু ব্রহ্মত্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এই সকল সিদ্ধি আপনিই তাঁহার আয়ত্ত হয়। গুরুর ইচ্ছা এবং আদেশ ব্যতীত কখনও ইহা প্রয়োগ করিতে নাই, করিলে অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এই সকল সিদ্ধিলাভে মনে গর্ব্ব আসিতে পারে এবং স্বেচ্ছায় প্রয়োগ করিবার প্রলোভনেও সাধক পতিত হইতে পারেন, এইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিষ্যের

কল্যাণের নিমিত্ত সদ্‌গুরু শিষ্যের এই সকল শক্তিকে আপনাতে আকর্ষণ করিয়া রাখেন এবং প্রয়োজনমত ব্যবহারকালে দান করেন। এই সকল যোগৈশ্বর্য্য লাভ হইলে তাহা সম্পূর্ণ গোপনে রাখিতে হয়, লোকে যেন জানিতে না পারে যে ইহা লব্ধ হইয়াছে।

১৪।৩।১০ অজপাসধনায় লব্ধ পরিণয়

কৃষ্ণ কেবলই "সত্যং জ্ঞানম্" নহেন: তিনি "রসো বৈ সঃ", তিনি "বিজ্ঞানমানন্দম্"। কৃষ্ণকে কেবল "সত্যং জ্ঞানম্" স্বরূপে জানিলে তাঁহার অর্দ্ধস্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানলাভ হয়। "রসো বৈ সঃ" স্বরূপের সম্ভোগই উহার বিজ্ঞান; ইহাকে সম্ভোগ করিলে ইহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করা যায় এবং তখন বিজ্ঞানলাভও পরিপূর্ণ হয়। "সত্যং জ্ঞানম্" স্বরূপকে জানিলে জীবাত্মার চিদংশের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, কিন্তু আনন্দাংশের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। "রসো বৈ সঃ" স্বরূপকে পাইলে আনন্দাংশের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। সুতরাং, কৃষ্ণকে সমগ্ররূপে পাইলে জীবাত্মার চিৎ এবং আনন্দ উভয়েরই সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ সার্থকতা হয়। এইজন্য, অজপাসাধনার লক্ষ্য কেবল বিজ্ঞান নহে, পরিণয় এবং বিজ্ঞান। ষষ্ঠ ভূমিতে ব্রহ্মভূত অবস্থা লাভ করিয়া অজপা-সাধকের কৃষ্ণের সহিত মিলনের ব্যাকুলতা অধিকতর তীব্র হয়। তখন সাধক সপ্তম ভূমিতে আরূঢ় হয়েন। ইহা প্রেমের ভূমি। এই অবস্থায় সাধকের জীবাত্মার আনন্দাংশের আত্মিক আমিত্ব প্রেমের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, অথবা মধুর ভাব লইয়া বিকশিত হয় এবং সবিকল্প সমাধিতে কৃষ্ণের সহিত অন্দরের লীলায় নিজ ভাবানুযায়ী আনন্দ কৃষ্ণকে দান করিয়া নিজেও পরমানন্দ সম্ভোগ করে। ইহাই বেদান্তের "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্", গীতার "বিশতে তদনন্তরম্" এবং ভাগবতের "তদঙ্গোপচিতাশিষঃ" অবস্থা। এই অবস্থাপ্রাপ্তির অধিক প্রাপ্তব্য আর কিছু নাই।

১৪।৩।১১ বহিরঙ্গ নামসাধনা

কৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা প্রভৃতির কীর্ত্তন বহিরঙ্গ নামসাধনা। বহিরঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন সদ্‌গুরু-দত্ত নামের নহে, কারণ সেই নাম অন্যের এবং নিজেরও শ্রুতিগোচর করা নিষিদ্ধ। কৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা গানকে সঙ্কীর্ত্তন বলা হয়।

বহিরঙ্গ নামকীর্ত্তন অধ্যাত্মযোগসাধনার বিশেষ প্রয়োজনীয় ভজনাঙ্গ। ইহা অজপাসাধনায় সিদ্ধি এবং পরিণয় লাভের সহায়ক। পরিণয়লাভের পরেও বিয়োগের অবস্থায় বিরহতাপ নিবারণের নিমিত্ত নামকীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনশ্রবণ আবশ্যক হয়। পরিণয়প্রাপ্ত সাধক প্রেমের প্রেরণায় প্রিয়তমের নাম গুণ লীলা কীর্ত্তন করেন; অন্য কাহারও মুখে তাঁহার প্রিয়তমের নাম শুনিলেও তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়েন এবং যিনি নাম শ্রবণ করান তাঁহাকে পরম বন্ধু মনে করেন। নামকীর্ত্তন যাহারা শ্রবণ করে তাহারাও উপকৃত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবযান গতি

১৪।৪।১ আমরণ যোগসাধনা ঃ যুঞ্জানসিদ্ধি

যোগীকে বিজ্ঞান এবং পরিণয় লাভ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া উহা প্রাপ্ত না হওয়া অবধি প্রতিনিয়ত যোগসাধনা করিতে হইবে—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ"—গীতা ৮।৭। "যুধ্য" অর্থাৎ "যোগসাধনা কর।" "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্ত ভবার্জ্জুন।"—গীতা ৮।২৭। দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত এইরূপ প্রাত্যহিক যোগসাধনার অভ্যাসকে যুঞ্জানসিদ্ধি বলা হয়। ইহা বিজ্ঞান ও পরিণয় লাভেচ্ছু যোগীর যুঞ্জানসিদ্ধি। গীতায় এই যুঞ্জানসিদ্ধি উপদিষ্ট হইয়াছে ঃ—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ গীতা ৬।১৫

—"সংযতচিত্ত যোগী সর্ব্বদা আপনাকে যোগসাধনায় নিযুক্ত রাখিলে, আমার মধ্যে স্থিত যে পরাশান্তি মুক্তির পরে পাওয়া যায়, তাহা তিনি লাভ করেন।" এইরূপ যুঞ্জানসিদ্ধ যোগী বিজ্ঞান ও পরিণয় প্রাপ্ত হইলে পর আর তজ্জন্য যোগসাধনা করিবার প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু তখনও তাঁহাকে নিত্য নিয়ত কৃষ্ণের সহিত মিলন লাভ করিয়া নব নব বিজ্ঞান এবং আনন্দ প্রাপ্ত হইবার জন্য যোগসাধনা করিতে হয়। তাঁহার এই যোগসাধনা সমাধিযোগ, অর্থাৎ সমাধি অবলম্বনে কৃষ্ণের সহিত মিলন এবং বিজ্ঞান ও আনন্দ লাভ। নিত্য

নিয়ত এই সমাধিযোগ লাভের ইচ্ছা এবং অভ্যাসও আর এক প্রকারের যুঞ্জানসিদ্ধি ; ইহাও গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে ঃ

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ গীতা ৬।২৮

—"বিগতকল্মষঃ, অর্থাৎ যাঁহার অজ্ঞানতা এবং পাপ বিদূরিত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি মায়াতীত এবং মুক্ত। মুক্ত যোগী এইরূপে সর্ব্বদা আপনাকে যোগযুক্ত রাখিলে ব্রহ্মসংস্পর্শ অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত মিলন লাভ করিয়া অনায়াসে অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।" ইহা গীতার ৬।১৫ শ্লোকের "নিয়তমানসঃ" যোগীর যোগসিদ্ধি লাভের জন্য যুঞ্জানসিদ্ধি নহে ; ইহা "বিগতকল্মষঃ" সিদ্ধ যোগীর মিলনানন্দলাভের জন্য যুঞ্জানসিদ্ধি। সিদ্ধ যোগীর এইরূপ যুঞ্জানসিদ্ধি তাঁহাকে সর্ব্বদাই সমাধির মিলনে রাখিতে চাহে, কিন্তু জাগতিক প্রয়োজনে সমাধি হইতে তাঁহার ব্যুত্থান আবশ্যক হয়। বাহ্যাবস্থায়ও তিনি কৃষ্ণের স্মরণে, মননে এবং সাধুসজ্জনগণের সহিত কৃষ্ণকথায় কালাতিপাত করেন, কিন্তু আবার কতক্ষণে সমাধিযোগে কৃষ্ণের সহিত মিলন লাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার মূল চিন্তা থাকে। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে এবং তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গোষ্ঠে যাইবেন বলিয়া যেমন ব্রজের কৃষ্ণসখাগণ উৎকণ্ঠিত থাকেন, কতক্ষণে কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিবেন বলিয়া যেমন মা যশোদা উৎকণ্ঠিতা থাকেন, কতক্ষণে কৃষ্ণের বংশীসঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়া কুসুমকুঞ্জে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন বলিয়া যেমন রাধা এবং গোপীগণ উৎকণ্ঠিতা থাকেন, তদ্রূপ সিদ্ধ যোগীও কৃষ্ণের সহিত নিজ প্রেমভাবানুযায়ী মিলন আবার কতক্ষণে লাভ করিবেন বলিয়া উৎকণ্ঠিত থাকেন। এইজন্য সিদ্ধ যোগীরও এইরূপ যুঞ্জানসিদ্ধি প্রয়োজন, এবং সেইজন্যই ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন ঃ "আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্"—ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১২।—"ইহা দৃষ্ট হয় যে মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই যোগসাধনার প্রয়োজন",—অর্থাৎ, যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন নাই, সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁহাদের আমরণ যোগসাধনার প্রয়োজন, এবং মিলনানন্দলাভের জন্য সিদ্ধ যোগীরও আমরণ সমাধিযোগের প্রয়োজন।

১৪।৪।২ মরণের পরে দেবযান গতি

বিজ্ঞান ও পরিণয় প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত সিদ্ধ যোগী আমরণ প্রতিদিন সমাধি

অবলম্বনে বিজ্ঞান এবং আনন্দ লাভ করিতে থাকেন। তাঁহার নামময় শুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ রোগ, জরা, এবং মৃত্যুর অধীন নহে। "ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥" শ্বেত ২।১২।—"যাঁহার শরীর যোগাগ্নিময় হইয়াছে, তাঁহার রোগ, জরা, এবং মৃত্যু নাই।" সিদ্ধ যোগীর নামময় শুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহই যোগাগ্নিময় দেহ। এইরূপ যোগীর রোগভোগ হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি অপরের ভোগ লইয়া স্বয়ং ভুগিতেছেন, যেমন যিশু খৃষ্ট অপরের ভোগ নিজে ভুগিবার জন্য ক্রুশের উপর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। মানবের যে সকল কর্ম্মফলের ভোগ আছে, তাহা অন্য কেহ গ্রহণ না করিলে মানবকে তৎসমুদয় ভুগিতেই হয়। বিজ্ঞান ও পরিণয় প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত যোগী যাহাদিগকে কৃপা করেন, তাহাদের অনেক ভোগ স্বয়ং ভুগিয়া তাহাদিগকে দুর্ভোগ হইতে রক্ষা করেন। এইরূপ পরিবর্ত্ত ভোগ (Vicarious suffering) ব্যতীত কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি হয় না। সদ্‌গুরু শিষ্যের বহু কর্ম্মফলভোগ স্বয়ং গ্রহণ করেন বলিয়া শিষ্য শীঘ্র মুক্তিলাভ করিতে পারেন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ এইরূপে যে সকল ভোগ গ্রহণ করেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে ভোগ করান না, প্রতীক ভোগ (Token suffering) করাইয়া অব্যাহতি দেন। এইরূপ সিদ্ধযোগী ইচ্ছামৃত্যু হয়েন। তিনি যতদিন ইচ্ছা ততদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার নিজের ইচ্ছা বলিয়া কিছু নাই; কৃষ্ণের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার নিজের বাঁচিয়া থাকিবার অথবা মরিবার ইচ্ছা থাকে না। কৃষ্ণ তাঁহাকে মানবকল্যাণের নিমিত্ত কার্য্য করাইবার জন্য যতদিন দেহে রাখেন, তিনি ততদিন দেহে থাকিয়া তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করেন। কৃষ্ণ যখন তাঁহাকে দেহত্যাগ করাইয়া নিত্যলীলায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার দেহের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার মুক্ত আত্মা সমগ্র দেহের সর্ব্বাংশে যেখানে তাঁহার যে শক্তি আছে, তৎসমুদয় আপনাতে উপসংহৃত এবং একীভূত করিয়া হৃদয়গুহা হইতে বহির্গত হইয়া সুষুম্নাপথে কুণ্ডলিনী সহ সহস্রারে উপনীত হয়েন। তথায় সেই মুক্ত আত্মার কুণ্ডলিনী তাঁহার সহিত একীভূত হয়। তখন তিনি নিজ প্রেমভাব অনুযায়ী তনু গ্রহণ করেন এবং সহস্রারের সৎ অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বা তাঁহার সেই তনুর বহিরাবরণ ও আধার হয়। চিদানন্দ আত্মা সৎকে আধার করিয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হয়েন এবং ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া দেহ

হইতে উৎক্রামণ করেন। ব্রহ্মতালু-ভেদের অর্থ মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ-বিদারণ নহে; মস্তক অটুটই থাকে, কিন্তু সচ্চিদানন্দদেহ মুক্ত আত্মা তাহারই মধ্য দিয়া উৎক্রামণ করেন, কারণ চিন্ময় বস্তু অব্যাহতগতি, জড়বস্তুর মধ্য দিয়া গমন করিতে পারে, জড়বস্তু তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। সচ্চিদানন্দ মুক্ত আত্মা স্বয়ংজ্যোতি হইয়া দেহত্যাগ করেন, কারণদেহ এবং লিঙ্গদেহ সহ উৎক্রামণ করেন না। বেদবাক্য ইহার প্রমাণ। "যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহোত নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে।" বৃহদারণ্যক ৩।২।১১।—আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যখন মুক্ত পুরুষের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার প্রাণবৃন্দ অর্থাৎ বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়সমূহও উৎক্রামণ করে কি?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, না। ইহারা এখানেই প্রলীন হইয়া যায়।" "যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি।" বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬।

—"যাঁহার কোন বিষয়কামনা নাই, যিনি নিষ্কাম, পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়াই যাঁহার একমাত্র কামনা এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন, এবং যিনি পরমেশ্বরের সহিত মিলনানন্দ সম্ভোগ করিয়া আত্মকাম হইয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গ উৎক্রামণ করে না।" প্রাণ শব্দ বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গকে বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়; এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাণবৃন্দ উৎক্রামণ করে না বলিলে কারণদেহ এবং লিঙ্গদেহ উৎক্রামণ করে না, ইহাই বুঝায়। প্রশ্নোপনিষদের ৬।৫ সূত্রেও এই তত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে। সিদ্ধ যোগীর মৃত্যু সাধারণ মানবের মৃত্যুর ন্যায় নহে। সাধারণ মানবের মৃত্যুকালে তাহার বদ্ধ জীবাত্মা লিঙ্গদেহ এবং কারণদেহ সহ সুষুম্নাপথে কুণ্ডলিনী-অবলম্বনে উদানবায়ু সহ বিশুদ্ধচক্রের নিম্নভাগে আসিয়া আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইয়া নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, অথবা মুখবিবর দিয়া দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়, এবং এবং তখনই কুণ্ডলিনী সেই আতিবাহিক দেহের মূলাধারদেশে গিয়া পূর্ব্ববৎ নিষ্ক্রিয় হয়; বামন আতিবাহিক দেহের হৃদয়াকাশে অধিষ্ঠিত হয়েন, এবং সহস্রারের শুদ্ধসত্ত্বা সহ পরমাত্মা আতিবাহিক দেহের ব্রহ্মতালুতে অধিষ্ঠিত হয়েন। এইরূপ অবস্থায় বদ্ধ জীবাত্মা স্বীয় গতি প্রাপ্ত হয়। সিদ্ধ যোগীর দেহত্যাগ এইরূপ মৃত্যু নহে, ইহা আত্যন্তিক প্রলয়। সিদ্ধযোগীর মুক্ত আত্মা সচ্চিদানন্দদেহে স্বয়ংজ্যোতি হইয়া দেহ ত্যাগ করিবার পরে কারণদেহ বিশ্বের

সমষ্টিকারণদেহে এবং লিঙ্গদেহ বিশ্বের সমষ্টি লিঙ্গদেহে প্রলীন হইয়া যায়, স্থূলদেহের পঞ্চভূত বিশ্বের স্থূল বিরাটদেহে প্রলীন হইয়া যায়, এবং বামন ও পরমাত্মা কৃষ্ণে প্রলীন হইয়া যান্। বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩।২।১১ সূত্রের "ইহারা এখানেই প্রলীন হইয়া যায়" বাক্যটীর ইহাই অর্থ। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়েও এই তত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে। মুক্ত আত্মার এইরূপ সচ্চিদানন্দদেহ ধারণই বেদান্তোক্ত "নবতর কল্যাণতর রূপ" গ্রহণ (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৪)। এবম্বিধ রূপ ধারণ করিয়া দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত মুক্ত আত্মার দেবযান গতি আরম্ভ হয়। বিজ্ঞান ও পরিণয় প্রাপ্ত মুক্তাত্মা বিশ্ববিজয়ী। তিনি পৃথিবীর রাজত্ব চাহেন নাই, স্বর্গের রাজত্ব চাহেন নাই, ব্রহ্মার পদ লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বের উপর সার্ব্বভৌম প্রভুত্বও চাহেন নাই, এমন কি মোক্ষকামনাও করেন নাই। এই সমস্তকেই তুচ্ছ বোধ করিয়া তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য আধ্যাত্মিক সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সদ্গুরুর সারথ্যে তিনি মহামায়ার প্রলোভন, ইন্দ্রের অত্যাচার প্রভৃতি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে জয় করিয়া তিনি দেবতাজয়ী হইয়াছেন। এখন সকল দেবতাগণ তাঁহার সেবা করিবার জন্য উন্মুখ। দেবতাগণই মুক্ত আত্মাকে বহন করিয়া মায়াময় বিশ্বের বিবিধ স্তরসমূহকে অতিক্রম করাইয়া দেন। বদ্ধ জীবের আত্মা মৃত্যুকালে আতিবাহিক দেহে আপন গতি প্রাপ্ত হয়; মুক্ত আত্মার সচ্চিদানন্দ দেহ আতিবাহিক দেহ নহে; তাঁহার আতিবাহিক দেবতাগণ, অর্থাৎ দেবতাগণ তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যান। এই মর্ত্ত লোক হইতে যে সকল স্তরকে অতিক্রম করিলে পরব্যোমে যাওয়া যায়, সেই সকল স্তরের প্রত্যেকটীর একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। বেদান্ত সেই স্তরগুলির নামোল্লেখের দ্বারা তত্তৎ স্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেই সূচিত করিয়াছেন, ইহা ব্রহ্মসূত্রে নিরূপিত তত্ত্ব। "আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ।" ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।৪।—"মুক্ত আত্মার পরব্যোমে গতির স্তরসমূহের নামোল্লেখের দ্বারা বেদান্ত তত্তৎ স্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকেই মুক্ত আত্মার আতিবাহিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।" বেদান্তে নিরূপিত স্তর ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ক্রম এবং নাম এইরূপ :—"অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসংভবন্ত্যর্চ্চিষোহহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ

দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে ॥" ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫।

এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য :—বিজ্ঞান ও পরিণয় প্রাপ্ত মুক্ত যোগীর মৃত্যুর পরে শবদাহ এবং অন্যান্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হউক বা না হউক, তাঁহার মুক্ত আত্মা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্চ্চিতে (আলোকে) গমন করেন, আলোক হইতে অহঃ (দিবসে), দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে (সূর্য্যে), আদিত্য হইতে চন্দ্রে, এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুতে গমন করেন। তথায় পরব্যোম হইতে আগত অমানব পুরুষ তাঁহাকে লইয়া পরমেশ্বরের নিকট গমন করেন। ইহাই দেবযান বা ব্রহ্মযান গতি। যে মুক্ত আত্মা এই পথে পরব্যোমে গিয়া পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাকে আর কখনও এই মানবজাগতে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, কখনও পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।" ছান্দোগ্য শ্রুতি ৫।১০।১-২ সূত্রেও ঠিক এই তত্ত্বই ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৬।২।১৫ সূত্রে এই তত্ত্বই ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বয়ংজ্যোতি, জ্যোতির্ম্ময়, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মুক্তাত্মা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই দীক্ষাদাতা সদ্‌গুরু রূপে কৃষ্ণ প্রসন্ন হাস্যের সহিত তাঁহাকে দর্শন দিয়া এবং পথের নির্দ্দেশ দিয়া অন্তর্হিত হয়েন। অতঃপর মুক্ত আত্মা সর্ব্বপ্রথমে আলোকস্তরে উপনীত হয়েন। এই স্তরে কখনও অন্ধকার হয় না বলিয়া ইহার নাম আলোক বা আলোকস্তর। এই স্তরের দেবতা তাঁহাকে ইহা অতিক্রম করাইয়া দিবস নামক পরবর্ত্তী স্তরে পৌঁছাইয়া দেন; এই স্তরে সূর্য্যাস্ত নাই, সেইজন্য ইহার নাম দিবস। ইহার দেবতা মুক্ত আত্মাকে ইহা অতিক্রম করাইয়া শুক্লপক্ষ নামক পরবর্ত্তী স্তরে পৌঁছাইয়া দেন; এই স্তরে চন্দ্রের অস্ত নাই, সেইজন্য ইহার নাম শুক্লপক্ষ। ইহার দেবতা মুক্ত আত্মাকে ইহা অতিক্রম করাইয়া উত্তরায়ণ নামক পরবর্ত্তী স্তরে পৌঁছাইয়া দেন; সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি যে স্তরের উপর দিয়া হয়, তাহার নাম উত্তরায়ণ। ইহার দেবতা মুক্ত আত্মাকে ইহা অতিক্রম করাইয়া সংবৎসর নামক পরবর্ত্তী স্তরে পৌঁছাইয়া দেন; সূর্য্য যে স্তরে থাকিয়া দ্বাদশ রাশিকে পর পর অতিক্রম করিবার ফলে দ্বাদশ মাস এবং ষড়ঋতুর উৎপত্তি হয়, তাহার নাম সংবৎসর। ইহার দেবতা মুক্ত আত্মাকে ইহা অতিক্রম করাইয়া আদিত্য নামক পরবর্ত্তী স্তরে পৌঁছাইয়া দেন; ইহা সূর্য্যলোক। ইহার দেবতা মুক্ত

আত্মাকে ,ইহা অতিক্রম করাইয়া চন্দ্র নামক পরবর্ত্তী স্তরে পৌঁছাইয়া দেন ; ইহা স্বর্গলোক। ইহার দেবতা মুক্ত আত্মাকে ইহা অতিক্রম করাইয়া যে স্তরে পৌঁছাইয়া দেন, তাহার নাম বিদ্যুৎ, অর্থাৎ বিদ্যুল্লোক। বিদ্যুল্লোকের পরে কারণাব্ধি এবং কারণাব্ধির পরপারে পরব্যোম। বিদ্যুল্লোকের দেবতার কারণাব্ধির পরপারে গতি নাই, কারণ দেবতা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নহেন। তিনি মুক্ত আত্মাকে পরব্যোমে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন না, কারণাব্ধির প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। তথায় পরব্যোম হইতে কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত সচ্চিদানন্দদেহ দূত আসেন। ইঁহাকেই বেদান্তে ব্রহ্মলোক হইতে আগত অমানব পুরুষ এবং পুরাণে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুদূত বলা হইয়াছে। পরব্যোমের দূত মুক্ত আত্মাকে কারণাব্ধি অতিক্রম করাইয়া পরব্যোমে বৈকুণ্ঠে অথবা গোলোকে লইয়া যান। যে মুক্ত আত্মার উপাসনা শান্তভাবের অথবা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত দাস্যভাবের ছিল, তিনি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন, এবং যাঁহার উপাসনা মাধুর্য্যজ্ঞানযুক্ত দাস্য, অথবা সখ্য, বাৎসল্য, অথবা মধুর ভাবের ছিল, তিনি গোলোকে অবস্থান করেন। অজপাসাধকের মুক্ত আত্মা দেহত্যাগ কালেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সারূপ্য লাভ করিয়াছেন, এখন কৃষ্ণের সহিত বৈকুণ্ঠের বা গোলোকের, একই লোকের অধিবাসী হইয়া সালোক্য প্রাপ্ত হয়েন। সারূপ্য এবং সালোক্য প্রাপ্ত মুক্ত আত্মা অনন্তকাল কৃষ্ণের সমীপে থাকেন, এইজন্য তিনি সামীপ্যও লাভ করিলেন। কেবলই মোক্ষকামী যোগীর সাযুজ্য মুক্তি কৃষ্ণে বিলীনতা-প্রাপ্তি ; পরিণয়প্রাপ্ত যোগীর আত্মা কৃষ্ণের সহিত নিত্যলীলায় মিলনসংযোগ লাভ করেন, তাহাই তাঁহার সবিকল্প স্থিতিতে সাযুজ্য মুক্তি। সারূপ্য, সালোক্য সামীপ্য, এবং সাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্ত আত্মা সৃষ্টিশক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের সমান আনন্দ এবং বিভূতি লাভ করিয়া সার্ষ্টিও লাভ করেন। "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্ প্রকরণাৎ অসন্নিহিতাচ্চ।" ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭।—"মুক্ত আত্মা জগদাদি সৃষ্টি করিবার শক্তি ব্যতীত ঈশ্বরের সমান বিভূতি প্রাপ্ত হয়েন, কারণ শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে যে একমাত্র ঈশ্বরেরই সৃষ্টিশক্তি আছে, মুক্ত আত্মা সৃষ্টিশক্তি লাভ করে, এরূপ কোথাও উক্ত হয় নাই।" কিন্তু মুক্ত আত্মার আনন্দসম্ভোগ ঈশ্বরের সমান, তাহা ব্রহ্মসূত্র ঘোষণা করিয়াছেন। "ভোগ-মাত্রাসাম্যলিঙ্গাচ্চ।" ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২১। ইহার অর্থ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। মুক্ত আত্মার এই "ভোগমাত্রাসাম্যলিঙ্গ" তাঁহার সার্ষ্টি অর্থাৎ কৃষ্ণের সমান

ঋদ্ধি। বিজ্ঞান ও পরিণয় প্রাপ্ত আত্মা সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, এবং সার্ষ্টি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে অথবা গোলোকে কৃষ্ণের নিত্যলীলার নিত্য পরিকর হইয়া থাকেন। তাঁহার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের ন্যায় জড়াতীত, মায়াতীত, অপ্রাকৃত, বিকারবিহীন এবং নিত্য। "বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ।" ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৮।—"শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে যে মুক্ত আত্মার বিকারবিহীন, অপ্রাকৃত, এবং শাশ্বত বিগ্রহ আছে।" ইহাই পঞ্চম-পুরুষার্থসাধকের মুক্ত আত্মার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। মুক্ত আত্মার এইরূপ শরীর তাঁহার প্রেমভাবের অনুরূপ হয় এবং এইরূপ শরীরের দ্বারা নিত্যলীলায় কৃষ্ণের সেবা এবং আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকে অনন্ত আনন্দ দান করিয়া অনন্ত আনন্দ সম্ভোগ করেন। পরমানন্দস্বরূপ কৃষ্ণের সহিত পরমানন্দময় গোলোক-বৃন্দাবনে পরমানন্দময় নিত্যলীলায় পরমানন্দস্বরূপ মুক্ত আত্মা কৃষ্ণকে যে পরমানন্দ দান করেন এবং স্বয়ং সম্ভোগ করেন, তাহা নিত্য, সত্য, অক্ষয়, অব্যয় এবং অনন্ত পরামৃত। নিত্যধামের পরামৃতভোগী সেই মুক্ত আত্মাকে আর কখনও মায়াময় প্রাকৃত বিশ্বে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে ॥—বেদান্ত
মুক্ত প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ অনাবৃত্তি শব্দাৎ, অনাবৃত্তি শব্দাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥—গীতা

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি
হরি ওম্
সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ
ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু